

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন-এর

দ্য ক্লাশ অব সিভিলাইজেশনস্

অ্যান্ড

দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

স্যামুয়েল পি হান্টিংটন-এর

দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস্ অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওর্য়াল্ড অর্ডার

স্যামুয়েল পি.হান্টিংটন-এর *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশনস্ অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওর্য়াল্ড অর্ডার;* বর্তমান এবং পরবর্তী শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতির চালিকাশক্তিসমূহের পরিজ্ঞানসম্পন্ন বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ: *Foreign Affairs*-জার্নালের ১৯৯৩ সালের গ্রীষ্ম সংখ্যায় স্যামুয়েল পি.হান্টিংটন-এর *'The Clash of Civilizations?'* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই বিশিষ্ট জর্নালের সম্পাদকগণের মতে, ১৯৪০-এর দশকের 'রাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ে বাধাদান সম্পর্কিত' জর্জ কিনানের বিগত লেখার ('X') পরে অদ্যাবধি হান্টিংটন -এর লেখাটির মতো আর কোনো লেখা নিয়ে এত আলোচনার ঝড় ওঠেনি। এই পুস্তকে হান্টিংটন তাঁর উক্ত লেখা এবং লেখাটির সমালোচনা ও এ-সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন আলোচনা ও ইস্যুসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্য-বিশ্লেষণসহ আরও অনেক কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করে তাঁর ধারণাকে সুতীক্ষ্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে হান্টিংটন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংঘাত ভবিষ্যৎ বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবশালী হয়ে বহাল থাকবে কি-না। এই পুস্তকে তিনি সে-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, সেসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন সভ্যতাসমূহের মধ্যে চলমান সংঘাত বিশ্বশান্তির প্রশ্নে সবচেয়ে বড় হুমকি; তবে সেইসঙ্গে তিনি আরও দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিক ধারা ও বিধিবিধান সম্বলিত সভ্যতা কীভাবে যুদ্ধভীত বিশ্বের জন্য বড় রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল



ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

জন্ম: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, সাঁথিয়া, পাবনা। পড়ালেখা : এস.এস.সি. সাঁথিয়া হাই স্কুল, এইচ.এস.সি. এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা। বি.এ. (সম্মান) ও এম.এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পিএইচডি., সোফিয়া, বুলগেরিয়া। ১৯৭৯ সালে লেকচারার হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান। ১৯৯৬ সালে প্রফেসর পদ লাভ। ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৯ সালে পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন-এর দায়িত্ব পালন। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রফেসর হিসেবে যোগদান। ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যনিটিজ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর ডিনের দায়িত্ব পালন। বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর। দেশবিদেশের অ্যাকাডেমিক জার্নালে তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালে *বাংলাদেশের রাজনীতি : দুঃসময়ের চালচিত্র* এবং ২০০৭ সালে *বাংলাদেশের রাজনীতি : দুঃসময় উত্তরণ প্রয়াস* শীর্ষক দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৮ সালে *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গিপ্রসঙ্গ* শীর্ষক একটি পুস্তক (সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়েছে। এবছর ২০১০ একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ঐ পুস্তকের ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খণ্ড।

তাঁর ভাষান্তরিত নোয়াম চমস্কি-এর *ফেইল্ড স্টেটস্* এবং *গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস্ ডিসকনটেন্টস* প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়াত কথা সাহিত্যিক শহীদুল জহির-এর স্মারকগ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন।

ISBN 978 984 414 111 7

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন-এর

দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্‌স
অ্যান্ড
দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার

সংশোধিত ও পরিমার্জিত
৩য় সংস্করণ

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন-এর

দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্‌স অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

সংশোধিত ৩য় সংস্করণ
মাঘ ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩১/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭২৯৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭২৯৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা

Samuel P. Huntington's THE CLASH OF CIVILIZATIONS AND THE REMAKING OF WORLD ORDER, by Dr. Mohammad Abdur Rashid
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100 Phone 712 44 03
email : anindyaprokash@yahoo.com
First Published : February 2009

2nd Edition : February 2010
Price : Taka 460.00
US $ 20.00

উৎসর্গ

প্রয়াত কথাসাহিত্যিক প্রিয় বন্ধু *শহীদুল হক (শহীদুল জহির)*-এর
স্মৃতির উদ্দেশে–
বন্ধুত্বের দায় যে এত ভারী
তা আমার জানা ছিল না

পেঙ্গুইন বুক

দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেসনস্ অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অব ওয়ার্ল্ড অর্ডার

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাবার্ট জে III, ওয়েদারহেড প্রফেসর ছিলেন। সেখানে তিনি জন এম. ওলিন ইনস্টিটিউটের স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ বিভাগের পরিচালক এবং হার্ভার্ড অ্যাকাডেমি ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। কার্টার-প্রশাসনের সময় সিকিউরিটি প্ল্যানিং ফর দি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। 'ফরেন পলিসি'-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক। ২০০৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সূচিপত্র

(ক) বিশ্বের সভ্যতাসমূহ

(খ) সভ্যতার ভারসাম্যের বদল

(ঙ) সভ্যতার ভবিষ্যৎ

টেবিলসমূহ

ফিগারসমূহ (রেখাচিত্র)

মানচিত্রসমূহ

প্রারম্ভিক বক্তব্য

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন নিম্নলিখিত কৈফিয়ত তুলে ধরেছেন :

১৯৯৩ সালের গ্রীষ্মে Foreign Affairs-এ "The Clash of Civilizations?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। Foreign Affairs জার্নালের সম্পাদকের মতে এই প্রবন্ধটি টানা তিন বৎসর সবচেয়ে বেশি মানুষকে আলোচনায় প্রমত্ত করেছিল যা জার্নালটির ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশের শুরু থেকে অদ্যাবধি অন্যকোনো প্রবন্ধের বেলায় দেখা যায়নি। এটিও সত্য, গত তিন বৎসর ধরে এ লেখাটি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ করেছি তা আমার অন্যকোনো লেখার ক্ষেত্রে দেখিনি। প্রায় প্রত্যেক মহাদেশ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ থেকেই লেখাটি সম্পর্কে মতামত ও সাড়াশব্দ পেয়েছিলাম। আমার লেখাটির ওপর মানুষ মুগ্ধ, উৎসুক, নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধংদেহী, সন্দেহের বাণ নিক্ষেপণ—এ সবই করেছেন। প্রবন্ধে সেই বিপদজ্জনক দিকটি তুলে ধরা হয়েছিল যার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে : আবির্ভূত বৈশ্বিক রাজনীতি হয়ে উঠবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভেদের কারণে সংঘাতময়। সে যেভাবেই হোক না কেন বলা যায়, এ লেখাটি প্রত্যেক সভ্যতার মানুষকে আন্দোলিত করতে পেরেছে।

অনেক ক্ষেত্রেই আমার লেখাটির অপব্যাখ্যা লক্ষ করা গিয়েছে। এ লেখাটি যে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, তা নিরসনে লেখাটি নিয়ে পুনরায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার নিমিত্তে আমার মধ্যে তীব্র অভিপ্রায় সৃষ্টি হয়। লেখাটিকে একটি প্রাগ্-অনুমানের ওপর স্থাপন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্থির করা দরকার ছিল। একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে লেখাটির শিরোনাম নির্ধারণ করা হলেও সাধারণভাবে তার প্রতি যথাযথ সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। এই পুস্তকে আরও পরিপূর্ণ, আরও গভীর এবং আরও বিস্তারিতভাবে প্রবন্ধে উত্থাপিত বিষয়গুলো তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে, যাতে করে নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর এ থেকে পাওয়া যায়। এই বই-এ আমি যে শুধু বিগত প্রবন্ধটির বিস্তারিত আলোচনা করেছি তাই নয়, সেসঙ্গে নতুন কিছু চিন্তার উদ্ভাবন ও তা সংযোজন করতে চেষ্টা করেছি, এবং তা আরও বিস্তারিত, পরিমার্জনসহ আগের ধারণার

পরিপূরণ ও তার আরও স্ববিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করতে চেয়েছি। তাই স্বভাবত এখানে আরও অনেক অধ্যায় সংযোজিত করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র বিগত প্রবন্ধের প্রয়োজনেই নয়। পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : সভ্যতার ধারণা, সর্বজনীন সভ্যতার প্রত্যয়, ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক; সভ্যতাসমূহের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের অদলবদল; অপাশ্চাত্য সমাজে সাংস্কৃতিক দেশীয়করণ প্রক্রিয়া; সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক কাঠামো, পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বজনীনতা নিয়ে উত্থাপিত সংঘাত, মুসলমানদের মারমুখিতা; চীনের দৃঢ়োক্তি; চীনের ক্ষমতা বিন্যাসে ভারসাম্যমুখী ও তাঁবেদারিত্ব প্রবণতা; ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও তার কারণ; পশ্চিমাবিশ্ব ও সমগ্র বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ। প্রবন্ধে অনুপস্থিত অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন জন্মহার বৃদ্ধি ও এ-সম্পর্কিত অস্থিরতা এবং শক্তির ভারসাম্যের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে বর্তমান বইতে আলোচনা করা হল। প্রবন্ধে অনুপস্থিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পুস্তকের শিরোনামের সংক্ষেপ হিসেবে শেষ বাক্যে উল্লেখ করা হল, যেমন— 'সভ্যতার সংঘাত বিশ্বশান্তির প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বিপদ'।

অথচ 'সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মানুবর্তিতাই হল বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ'। এই পুস্তকটি সমাজবিজ্ঞানের বই হিসেবে লেখার ইচ্ছা ছিল না বরং শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক রাজনীতির বিবর্তন ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণের নিমিত্তে এটি লেখা হয়েছে। পুস্তকটিতে বৈশ্বিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অর্থবহভাবে বুঝে ওঠার জন্য একটি 'নির্মাণ কাঠামো' (ফ্রেমওয়ার্ক)-এর 'প্যারাডাইম' উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞজন ও নীতিনির্ধারকরা উপকৃত হতে পারেন। তবে বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে বা ব্যাখ্যা করতে যা-কিছু দরকার, তার সকল কিছুই এখানে পাওয়া যাবে এমন নয়। আসল কথা হল, এখানে এমন একটি ব্যবহারযোগ্য ও অর্থবহ 'লেন্স' উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, যে 'লেন্সের' ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি অন্যকোনো বিকল্প প্যারাডাইমের চাইতে উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপরন্তু, বলা চলে, কোনো প্যারাডাইমই সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ বা সিদ্ধ নয়। বৈশ্বিক রাজনীতি উপলব্ধি করতে সভ্যতাকেন্দ্রিক অভ্যাগম (এ্যাপ্রোচ) বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায় থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ব্যবহার-উপযোগী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে; এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, বিগত বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিংবা একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে এর আবেদন ছিল বা থাকবে।

প্রবন্ধটি এবং এ পুস্তকটি ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে ব্রাডলি বক্তৃতাকালে 'আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ইন ওয়াশিংটন'-এ প্রথম জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। তারপর 'ওলিন ইনস্টিটিউট'-এর 'দি চেনজিং সিকিউরিটি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড আমেরিকান ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট' (স্মিথ রিচার্ডসন ফাউন্ডেশন) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য অনিয়মিতভাবে প্রস্তুত করা হতে থাকে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আমি অগণিত সেমিনার ও সভায় 'সংঘাতের বিষয়' তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, যেখানে অ্যাকাডেমিক, সরকারি লোকজন, ব্যবসায়ীসহ সমগ্র আমেরিকাব্যাপী অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষজন উপস্থিত থাকতেন। উপরন্তু, আমি সৌভাগ্যবান এজন্য যে, আমি প্রবন্ধ ও পুস্তকটির বিষয়বস্তু নিয়ে অন্যান্য দেশ, যেমন—আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, কোরিয়া, জাপান, লুক্সেমবার্গ, রাশিয়া, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এবং তাইওয়ানে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিয়েছি। এসব দেশের আলোচনায় আমি হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্যান্য প্রধান প্রধান সভ্যতা সম্পর্কে জানার ও বোঝার সুযোগ পেয়েছিলাম। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫ সালে আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অনেক মূল্যবান ধারণা ও সমালোচনা পেয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে নেবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করেছি। এ কাজটি করতে গিয়ে আমি হার্ভার্ড-এর জন এস ওলিন ইনস্টিটিউট স্ট্র্যাটেজি স্টাডিজ সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর নিকট থেকে সমর্থন পেয়েছি।

মাইকেল মি. ডিচ্ রবার্ট ও কেওহানি, ফরিদ জাকারিয়া এবং আর স্কট জিমেরম্যান এ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পাঠপূর্বক আমাকে যে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন, তা গ্রহণ করে আমি পুস্তকটির বিষয়বস্তু ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উন্নতি ঘটাতে পেরেছি। পুস্তকটি রচনার সকল সময়ব্যাপী স্কট জিমেরম্যান গবেষণার কাজে অপরিহার্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন; তাঁর শক্তি, মেধা ও আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ সাহায্য ব্যতীত এ পুস্তকটি সময়মতো প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। আমাদের স্নাতক পর্যায়ের গবেষণা সহকারী পিটার জান এবং ক্রিস্টিনা ব্রিগ্‌স গঠনমূলকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। গ্রেস ডি ম্যাজিস্ট্রিস পাণ্ডুলিপির প্রথম অংশ কম্পোজ করেছেন এবং ক্যারল এডওয়ার্ডস তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং দক্ষতা দিয়ে পাণ্ডুলিপি বহুবার পুনঃলিখন কাজে সহযোগিতা করেছেন। ডেনিস স্যাননন লুন কক্স, জর্জেস বরচার্ডত এবং রবার্ট আসাহিনা, রবার্ট বেনডার এবং জোয়ানা লি এবং সিমন অ্যান্ড সুসটার পেশাগত দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের বিষয়টি

দেখাশুনা করেছেন। আমি সর্বতোভাবে তাঁদের সকলের নিকট ঋণী। তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার ফলেই এটি আজ পুস্তকাকারে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের শ্রমসাধ্য বলেই পুস্তকটি পূর্ণতা পেয়েছে। পুস্তকের অন্যান্য ঘাটতির দায়দায়িত্ব আমার নিজের।
আমার এ বইটি প্রকাশের যাবতীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমি জন এস ওলিন এবং স্মিথ রিচার্ডসন ফাউন্ডেশন-এর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের এ অবদান ব্যতীত বইটি প্রকাশ পেতে হয়তো আরও এক বৎসর অপেক্ষা করতে হত। অন্যান্য ফাউন্ডেশন যেখানে ঘরোয়া বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে তাদের কাজকর্ম সীমিত রাখে, সেখানে ওলিন এবং স্মিথ রিচার্ডসন ফাউন্ডেশন আমার যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে গবেষণায় দৃঢ়তার সঙ্গে সহযোগিতা করে গিয়েছে।

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন

সংশোধিত ৩য় সংস্করণ
আমার কথা

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের বিগত শতাব্দীর শেষ হতে শুরু করে অদ্যাবধি সমগ্র বিশ্বব্যাপী অন্যতম আলোচিত *'The Clash of Civilizations and the Remaking of world order'* গ্রন্থের এটি হুবহু বা আক্ষরিক কোনো অনুবাদ নয়; এ কাজটিতে হান্টিংটনের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিশ্বের চল্লিশটির অধিক ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। ইংরেজিভাষার স্বকীয়তা, শৈলী এবং এর গতিধারা ঠিক রেখে সেসঙ্গে বিশ্বরাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, চলমান ইতিহাস ও কূটনৈতিক তৎপরতা, সমরবিদ্যা সংক্রান্ত সভ্যতার সংঘাতভিত্তিক এ গ্রন্থটির তথ্যাদি ও প্রবণতা ঠিক রেখে আমাকে অতি সতর্কভাবে এগুতে হয়েছে। কাজটি করতে গিয়ে হান্টিংটনের প্রতি আমি যথাসাধ্য সুবিচার করার চেষ্টা করেছি। সতর্কতার পরও কোনো কোনো স্থানে সামান্য বিচ্যুতি বা ছন্দোপতন হয়ে থাকতে পারে। এজন্য পাঠকসমাজের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই বহুলালোচিত পুস্তকটির বক্তব্য মাতৃভাষায় নিয়ে আসার প্রবলবোধ আমাকে প্রায় এক দশক থেকে তাড়িত করলেও বইটি হাতে আসতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। অবশেষে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি পুস্তকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শান্তি ও সংঘর্ষ' বিভাগের সেমিনারকক্ষ থেকে ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন ও বিভাগীয় সভাপতি ড. রফিক-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত হই।

আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, কাজটি যত সহজ ভেবেছিলাম আসলে তত সহজ নয়। তবুও আমার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে পাঁচ মাস সময়ের ব্যবধানে এটি এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে পেরেছি। আমার সহকর্মী জনাব মো. আনিছুর রহমান, মেহেরুন নেসা, খান মো. মনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ এমনভাবে আমার পেছনে লেগে ছিলেন যে, কাজটি শেষ না করে আমার আর গত্যন্তর ছিল না।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন পাণ্ডুলিপির প্রায় পুরোটাই পাঠ করে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়েছেন এবং আমি সে-মতো সংশোধন, পরিমার্জন করে নিতে চেষ্টা করেছি। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা থাকল।

বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হান্টিংটনের সরাসরি শিক্ষার্থী এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর ড. রওনক জাহান-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের আমার সহকর্মী ড. আনিসুজ্জামান-এর সঙ্গে দু-একটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে

হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম-এর সঙ্গে কিছু ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে পরিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করেছি। তাঁদের সবার প্রতি আমার ঋণ থাকল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, ড. নূরুল আমিন বেপারী, ড. গিয়াসউদ্দীন মোল্লা, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আব্দুল হাকিম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম মঞ্জু, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ত্রিশাল নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শামসুর রহমান আমাকে কাজটি সমাপ্ত করতে উৎসাহিত করেছেন।

আমার সহকর্মী মেহেরুন নেসা আমাকে পুস্তকে ব্যবহৃত কিছু ফরাসি শব্দ ভাষান্তরে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া তিনি কয়েকটি অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পাঠপূর্বক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশোধনী দিয়েছেন যা আমি গ্রহণ করেছি। আমার অপর সহকর্মী সায়মা আহমদ পাণ্ডুলিপির তিনটি অধ্যায় বিস্তারিতভাবে পাঠ করেছেন এবং ভাষা ও স্টাইল বিষয়ে সংশোধনী দিয়েছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ড. মোবাশ্বেরা খানম আমাকে কিছু লাটিন শব্দের অর্থ উদ্ধারে সহযোগিতা করেছেন এবং কাজটির অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটির কিছু প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন আমার সাবেক সহকর্মী জনাব জি.এম তারিকুল ইসলাম। তবে চূড়ান্তভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রুফ দেখেছেন জনাব সেলিম আলফাজ। পুস্তকটি কম্পোজ এবং স্টাইলগত কাজ সম্পন্ন করেছেন কমলেশ ধর; আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির প্রকাশক মো. আফজাল হোসেন-কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার প্রয়াত কথা সাহিত্যিক বন্ধু শহীদুল হক (শহীদুল জহির) কথা দিয়েছিল, কাজটি সে সম্পাদনা করবে, কিন্তু তার আগেই পরপারের ডাকে তাঁকে চলে যেতে হল। এজন্য আমি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে বইটি উৎসর্গ করছি।

গ্রন্থটি ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সুধীমহলে সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। গ্রন্থটির পরিমার্জন, উন্নতি সাধন ও ভুলত্রুটি সংশোধনে যে-কারো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করব। বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রমাণ করিয়ে দেয় যে বইটি পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ কারণে আমার শ্রমকে আমি কিছুটা হলেও স্বার্থক মনে করছি।

১০ জানুয়ারি ২০১৬

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
প্রফেসর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫

(ক)

বিশ্বের সভ্যতাসমূহ

অধ্যায় - ১

বিশ্বরাজনীতির নবযুগ

সূচনা : পতাকা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়

১৯৯২ সালের ৩ জানুয়ারি, রাশিয়া এবং আমেরিকার বিজ্ঞজনদের মাঝে একটি সভা মস্কোর সরকারি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এর মাত্র দুসপ্তাহ আগে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন হয় এবং সেখান থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্ম হয়। এর ফলে লেনিনের মূর্তি অডিটোরিয়ামের সম্মুখভাগ থেকে অপসারণ করে নবগঠিত রাশিয়ান ফেডারেশনের পতাকা দেয়ালে টানানো হয়। কিন্তু একজন আমেরিকান লক্ষ করলেন যে, পতাকাটি উল্টোভাবে স্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি জানানো হলে তারা তা বিনাবাক্যে এবং নীরবে সংশোধন করে নেন।

শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ের এক বছরের মধ্যে মানুষের মনের গভীরে 'প্রতীক' এবং 'পরিচয়ের' গণ্ডিতে নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গেল। বিশ্বরাজনীতি সাংস্কৃতিক অবয়বে নতুন মোড় নিল। পতাকার উল্টো স্থাপনকে এই উত্তরণকালের 'নমুনা' বলা যায়। আর ওই পতাকা যতই ঊর্ধ্বে উড়তে লাগল, রাশিয়ার জনগণ ততই যেন নতুন স্বাদের অন্বেষণে, নতুন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সন্ধানে মেতে উঠতে লাগল।

১৯৯৪ সালে ১৮ এপ্রিল। দুহাজার মানুষ সারায়াভোতে সৌদিআরব ও তুরস্কের পতাকা দোলাতে লাগল। জাতিসংঘ এবং ন্যাটো অথবা আমেরিকার পতাকার পরিবর্তে দুটি মুসলমান দেশের পতাকা দুলিয়ে সারায়াভোবাসী সমগ্র দুনিয়াকে বুঝাতে চাইল তাদের বন্ধু-সুহৃদ মুসলমান সমাজ এবং কারা তাদের প্রকৃত মিত্র, আর কারা তাদের শত্রু।

১৯৯৪ সালের ১৬ অক্টোবর, লস এঞ্জেলস-এ ৭০,০০০ মানুষ মেক্সিকোর পতাকা নিয়ে মিছিল করে 'প্রস্তাবনা ১৮৭'-এর বিরুদ্ধে, যে প্রস্তাবনার মাধ্যমে অনেক অঙ্গরাজ্যে অবৈধ অভিবাসী এবং তাদের সন্তানদের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য গণভোটের দাবি করা হয়েছিল। কেন তারা মেক্সিকোর পতাকা নিয়ে মিছিল করতে রাস্তায় নেমে এল এবং কেন তাদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, এরূপ দাবি উত্থাপনের কারণটি এখন অনেকের জিজ্ঞাস্য। 'তারা আমেরিকার পতাকা নিয়ে মিছিল করবে'— এটাই ছিল বিশ্বজুড়ে পাশ্চাত্যের প্রত্যাশা। দুসপ্তাহ পরে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিবাদী মানুষ আমেরিকার পতাকা নিয়ে রাস্তায় পাল্টা মিছিল করল। এই মিছিল প্রকৃতপক্ষে 'প্রস্তাবনা ১৮৭'-এর বিজয় সুনিশ্চিত করল। এই প্রস্তাবনা ক্যালিফোর্নিয়ার শতকরা ৫৯ ভাগ ভোটারের সমর্থন অর্জন করল।

শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে রাষ্ট্রীয় পতাকাগুলো বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত চেতনাকেই ধারণ করতে লাগল, যেমন— ক্রুসচিহ্ন, ক্রিসেন্ট ইত্যাদি। বাস্তবে সাংস্কৃতিক চেতনাই মানবগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর সে-কারণেই তা এত অর্থবহ। মানুষ নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করে সামনে এগিয়ে চলছে, কিন্তু পুরাতন পরিচয়কে অস্বীকার করে বা এড়িয়ে যেতে পারছে না। সে-কারণেই পুরাতন পতাকার প্রভাব কমছে না। বরং তা প্রকারান্তরে পুরাতন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সংঘাতকে নতুনরূপে এগিয়ে নিচ্ছে।

বর্তমান সময়ের একটি নির্মম সংঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে মাইকেল ডিবডিন নামক একজন বক্তৃতাবাগীশ নেতার *ডেড লেগুন* (*Dead lagoon*) উপন্যাসটিতে। তিনি বলেন, 'প্রকৃত শত্রু না থাকলে প্রকৃত বন্ধু থাকতে পারে না। ঘৃণার বিষয়কে ঘৃণা না করলে প্রকৃত উত্তমকে ভালোবাসা যায় না। ...যারা তা অস্বীকার করে, তারা তাদের পরিবার, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, জন্মগত যোগসূত্রকে অস্বীকার করে। তারা দাসতুল্য। তারা কখনও ক্ষমার যোগ্য নয়।' দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হয়, প্রাচীন সভ্যতাসমূহকে দেশহিতৈষী বা পণ্ডিতজনেরা অবজ্ঞা করতে পারেন না। যেসব মানুষ আত্মপরিচয় ও নৃতাত্ত্বিক ধারাকে পুনঃউন্মোচন করতে চায়, তারা তাদের শত্রুকে অবশ্যম্ভাবীভাবে চিহ্নিত করে; সেইসাথে এর ভেতর দিয়ে বিশ্বের শত্রুভাবাপন্ন প্রধান সাংস্কৃতিক অঞ্চলসমূহের 'ফাটলরেখা'সমূহের ক্ষমতা ও চিহ্নও গোচরীভূত হয়।

এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল, তথা সভ্যতাসমূহ সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি এই সভ্যতাসমূহের পারস্পরিক একত্রীকরণের দৃঢ়তা, অনৈক্য বা বিভেদ, অথবা সংঘাতময়তা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা দেয়া।

পুস্তকটিকে পাঁচটি ভাগে বিন্যস্ত করে মূল প্রস্তাবসমূহ সন্নিবেশিত করা হবে। যথা :

প্রথম খণ্ড : বিশ্ব ও বহুধাবিভক্ত সাংস্কৃতিক, বহুপক্ষভিত্তিক সভ্যতার বাস্তবতায় প্রথমবারের মতো বিশ্বরাজনীতি এমন একটি মোড় নিয়েছে যেখানে 'আধুনিকায়ন' আসলে 'পাশ্চাত্যকরণের' ধারণা থেকে পৃথক বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই নতুন ধারাটি বিশ্বজনীন সভ্যতার ধারণাকে কোনো যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে এগিয়ে নিচ্ছে না, বা অপাশ্চাত্য বিশ্বকে পাশ্চাত্যমুখী করতে পারছে না।

দ্বিতীয় খণ্ড : সভ্যতার ওপর নির্ভরশীল 'শক্তিভারসাম্য' পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে। বাস্তব পরিস্থিতিতে, অপাশ্চাত্যের ওপর পাশ্চাত্য তার আপেক্ষিক প্রভাব হারাচ্ছে। এশীয় সভ্যতা তার অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ইসলাম জনসংখ্যাগত দিক থেকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্থির হয়ে উঠেছে, এবং অপাশ্চাত্য সভ্যতাসমূহ নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ক্রমাগত আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে উঠছে।

তৃতীয় খণ্ড : নিজস্ব সভ্যতাভিত্তিক বিশ্ব জোরালো হলেও বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় কিন্তু এগুচ্ছে না, বরং তার উল্টোটিই ঘটে চলেছে। এভাবে দেশগুলো বিভিন্নভাবে জোটবদ্ধ হচ্ছে বা নিজেরাই 'কোর'-রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

চতুর্থ খণ্ড : পশ্চিমের সর্বজনীনতার ধারণাগুলো ক্রমাগত বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হচ্ছে। এই ধারণাগুলো ক্রমেই ইসলাম এবং চীনের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘাত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে 'ফাটলরেখায়' অবস্থিত যুদ্ধগুলো; বিশেষত বৃহত্তরভাবে মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদের সমমনা আপন বা বন্ধুসুলভ রাষ্ট্রগুলোর একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। ফলে 'কোর'-রাষ্ট্রগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে ও কালক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে।

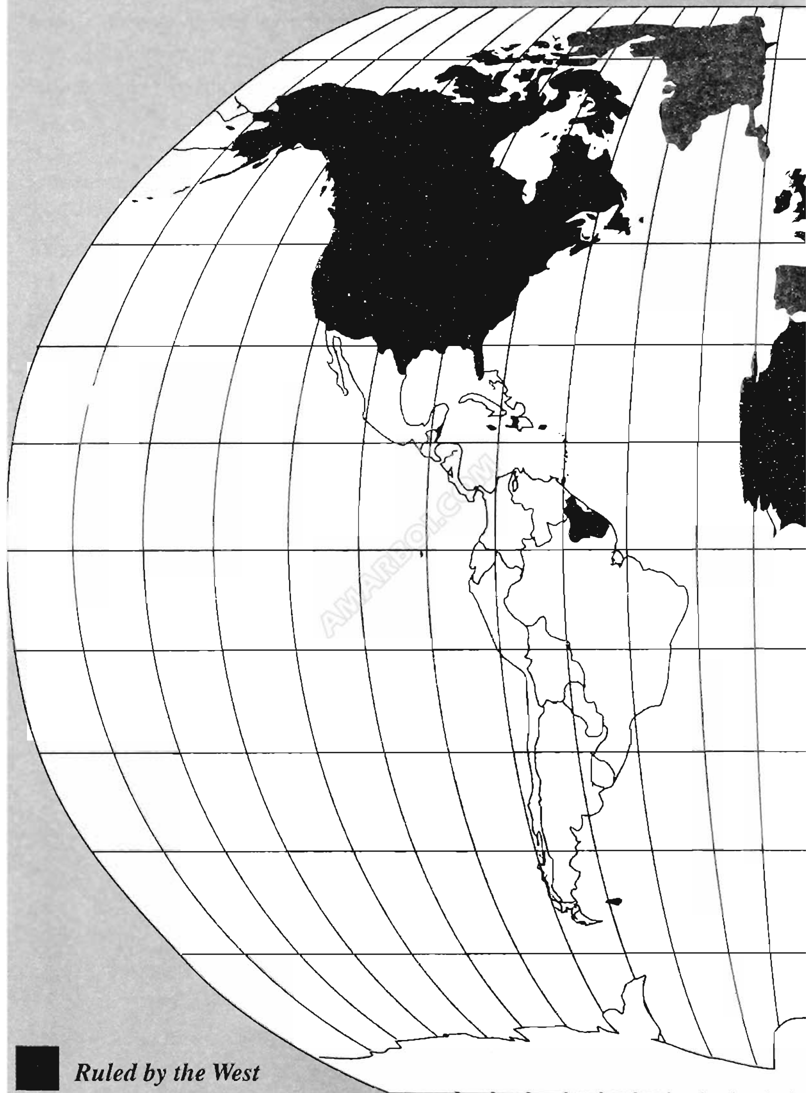
পঞ্চম খণ্ড : পশ্চিমাদের অস্তিত্ব মূলত আমেরিকার পশ্চিমা-পরিচয় রক্ষার মনমানসিকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কেননা, পশ্চিমাবিশ্ব তাদের সভ্যতাকেই অদ্বিতীয় বলে গণ্য করে, যা সর্বজনীন দৃষ্টিতে পুরোপুরি সঠিক নয়। তারা তাদের নিজসত্ব রক্ষার জন্যই অপাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে আগ্রহী। ফলে, মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে সংঘাত অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সংকট থেকে সৃষ্ট এই সংঘাত ও যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বিশ্বনেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও কর্মতৎপরতা। বিশ্বরাজনীতির বহুধাবিভক্ত সভ্যতাগুলোর মধ্যে সঠিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মনোভাব বলিষ্ঠ করতে বিশ্বনেতৃত্বের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

বহুপাক্ষিক এবং বহুধাবিভক্ত সভ্যতাসম্বলিত বিশ্ব

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিশ্বরাজনীতি হয়ে পড়েছে বহুপাক্ষিক ও বহুধাবিভক্ত সভ্যতাকেন্দ্রিক। বিগত দিনের মানবেতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্নধর্মী সভ্যতার মধ্যে সংযোগ ছিল ধীর লয়ে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা একবারেই ছিল না। তারপর আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) বিশ্বরাজনীতির 'দ্বিবিধ' অবস্থা লক্ষ করা গিয়েছে। প্রায় চারশত বৎসর জাতিরাষ্ট্রে পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে একটি বহুপাক্ষিক বিশ্ব সৃষ্টি করেছিল এবং তারা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধবিগ্রহও করেছে। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যজগৎ অবশিষ্ট বিশ্বের বহুরাষ্ট্র পদানত করেছে, স্থাপন করেছে কলোনি ও সাম্রাজ্য বিস্তার করে অপাশ্চাত্যের ওপর তাদের অর্থবহ ও কার্যকর প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রাখতে সচেষ্ট ছিল (ম্যাপ নং ৯ দ্রষ্টব্য)।

শীতলযুদ্ধের সময়ে বিশ্বরাজনীতি ছিল দ্বিপক্ষীয় (বাইপোলার) এবং বিশ্ব ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ ছিল সম্পদশালী ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতীক, যার নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই অংশটি দরিদ্র এবং কম্যুনিস্টভাবাপন্ন সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং একসময়ে সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দুই শক্তির এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে তাদের দেশের বাইরে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে, যেখানে দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিত্যদিনের সঙ্গী, যারা সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং যারা উভয় জোটের বাইরে একটি জোটনিরপেক্ষ অবস্থানে আছে বলে দাবি করত (ম্যাপ- ১.২)।

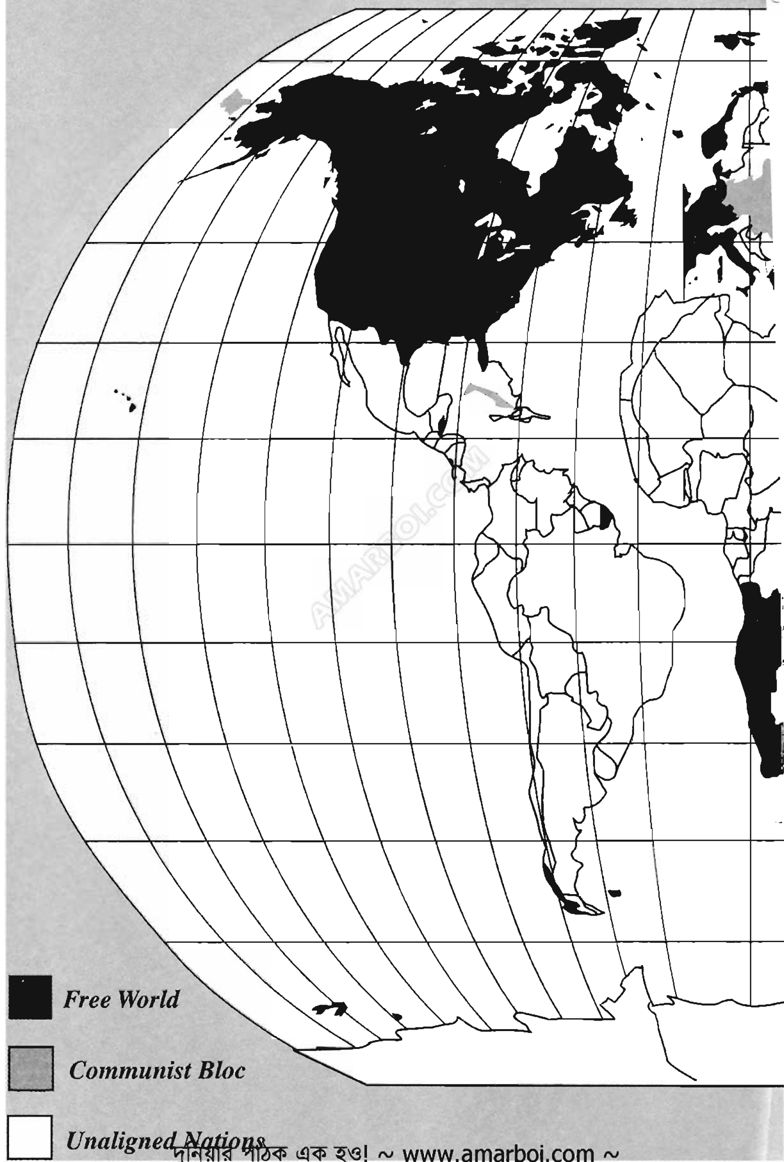
The West and the Rest: 1920

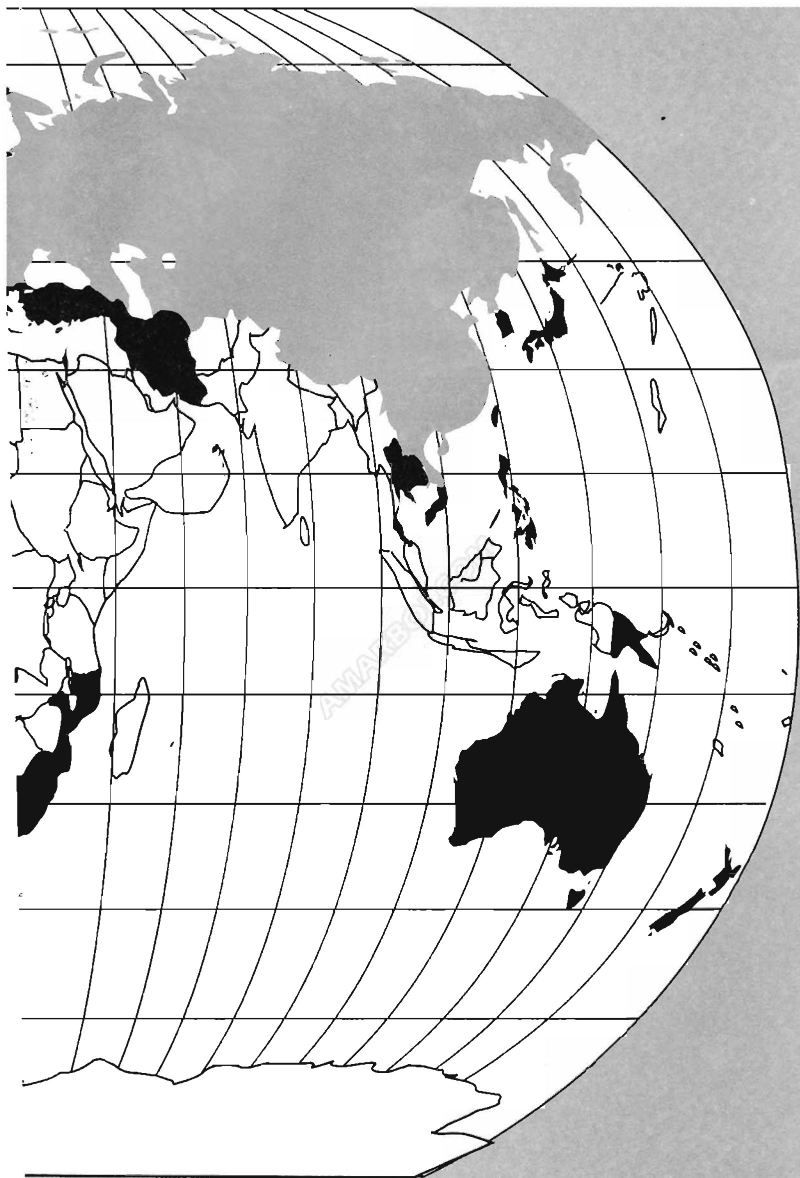




Map1.1

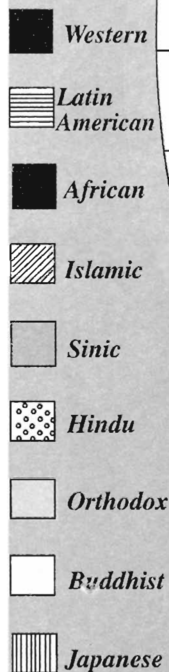
The Cold War World: 1960s

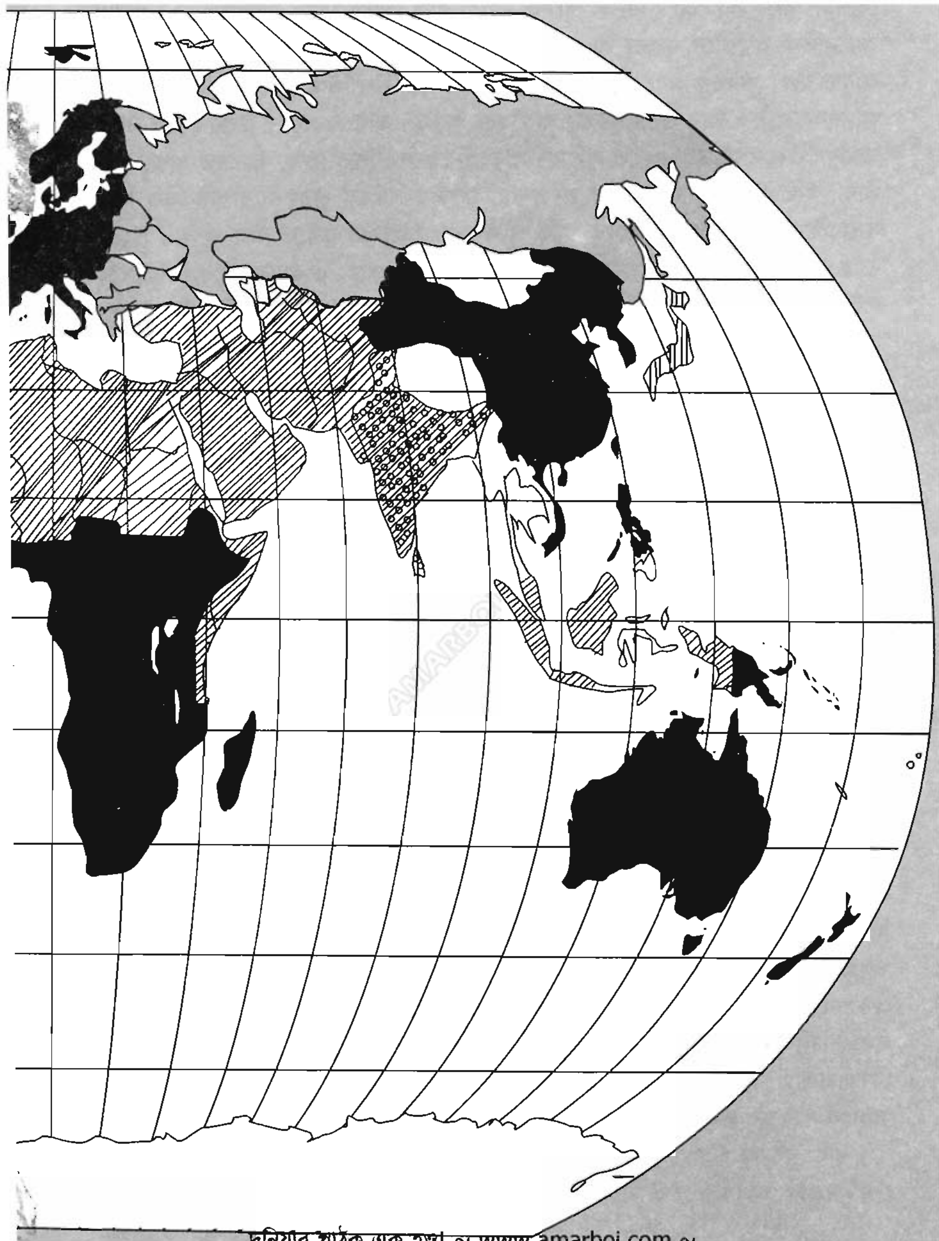




Map 1.2

The World of Civilizations: Post-1990





১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে কম্যুনিস্টবিশ্ব ভেঙে পড়ে এবং শীতলযুদ্ধের সময়ের বিশ্বব্যবস্থা অতীত ইতিহাসের বুকে ঠাঁই নেয়। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল এই যে, মানুষ পূর্বের ন্যায় আর মতাদর্শিক, রাজনৈতিক, অথবা অর্থনৈতিক অবস্থানে থাকল না। বরং তারা সংস্কৃতিমুখী হয়ে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হল। জনগণ এবং জাতিসমূহ তাদের সামনে উত্থাপিত মৌলিক প্রশ্ন, যেমন : আমরা কারা?— তার উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে তারা গতানুগতিক ধারাতেই এগুতে লাগল। মানুষ নিজেদের পিতৃপুরুষ, সহজাত ধারা, ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতীয় পরিচয় এবং সর্বোপরি নিজ নিজ সভ্যতার মাপকাঠিতে নিজেদের প্রাপ্তি ও বঞ্চনার বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। পূর্বের ন্যায় মানুষ রাজনীতিকে তাদের স্বার্থসমূহ এগিয়ে নেবার 'একমাত্র' মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না-করলেও রাজনীতির মাধ্যমে আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে শুরু করল। 'আমরা কারা' তা জানতে মানুষ জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল : 'আমরা কারা নই' এবং এভাবেই তারা তাদের বিরুদ্ধশক্তি চিহ্নিত করতে থাকল। ফলে বিশ্ব হয়ে পড়ল সংঘাতপ্রবণ।

জাতি ও রাষ্ট্র এখনপর্যন্ত বিশ্বব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তাদের আচরণ পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা এবং সম্পদভিত্তিক হলেও, সেইসঙ্গে সংস্কৃতিক বন্ধন, সম্প্রদায়গত চেতনা এবং তাদের মধ্যকার মতবিরোধনির্ণয়ে তারা ব্রতী হয়েছে। শীতলযুদ্ধের সময়ের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিরাজমান গোষ্ঠীবদ্ধতা বা 'ব্লক' এখন আর বজায় নেই। তার স্থলে সাত অথবা আটটি প্রধান সভ্যতাসম্পৃক্ত জাতি এখন একক গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছে (ম্যাপ-১.৩)। অপাশ্চাত্য সমাজ, বিশেষ করে পূর্বএশিয়া তাদের অর্থনীতিকে দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এরই অনুষঙ্গী হিসেবে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাচ্ছে। অপাশ্চাত্য সমাজের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে তারা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করছে এবং তা করছে পাশ্চাত্য থেকে চাপিয়ে দেয়া সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেই। হেনরি কিসিঞ্জার 'একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা' সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন এভাবে : '... কমপক্ষে ছয়টি প্রধান শক্তি— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, চীন, জাপান, রাশিয়া এবং সম্ভবত ভারত এবং সেসঙ্গে কিছু মধ্যম আকৃতির রাষ্ট্র হবে অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের মূল নিয়ন্তা।' কিসিঞ্জার কর্তৃক বিবৃত ছয়টি প্রধান শক্তির পাঁচটি দেশই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার গণ্ডিভুক্ত। উপরন্তু রয়েছে কিছু ইসলামি রাষ্ট্র, যাদের কুশলী অবস্থান, ব্যাপক জনসংখ্যা এবং তৈলসম্পদের মালিকানা বিশ্বরাজনীতিতে তাদেরকে প্রভাবশালী করে তুলেছে। এই নতুন বিশ্বে আঞ্চলিক রাজনীতি নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রপ্রবণ। বিশ্বরাজনীতি বাস্তবে বিভিন্নধর্মী সভ্যতাকেন্দ্রিক। বৃহৎ শক্তিসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা আসলে সভ্যতার সংঘাত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

এই নবতর বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক সংঘাতসমূহ সামাজিক শ্রেণীগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব নয়, এমনকি নয় তা ধনী ও দরিদ্রের অথবা অন্যান্য

অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত; বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর ভেতরে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ উপজাতিগুলোর মধ্যে আন্তঃযুদ্ধ এবং নৃগোষ্ঠীভিত্তিক সংঘাত দেখা দেবে বলে মনে করা যায়।

অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন সভ্যতার এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংসতা দেখা দেবে এবং এতে 'আত্মীয় বা বন্ধুতুল্য' দেশগুলো মিলে 'জোট' গঠন করবে। সোমালিয়ার রক্তাক্ত গোত্রগত সংঘাত দেশের সীমানা সম্পর্কিত নয়। রোয়ান্ডায় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ মূলত উগান্ডা, জায়ার এবং বুরুন্ডির ওপর অংশত বর্তায়, তবে তা খুব ব্যাপকভাবে নয়। বসনিয়া, ককেসীয় এবং মধ্যএশিয়া অথবা কাশ্মীরের সভ্যতা সংক্রান্ত রক্তাক্ত সংঘাত বৃহৎ আকারের যুদ্ধে রূপ নিতে পারে।

যুগোস্লাভিয়া সংঘর্ষে রাশিয়া সার্বীয়দেরকে কূটনৈতিকভাবে সমর্থন প্রদান করেছে; অন্যদিকে সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান এবং লিবিয়া অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে বসনীয়দেরকে সমর্থন দিয়েছে। উভয়পক্ষের এ কার্যক্রম কোনোভাবেই মতাদর্শিক বা ক্ষমতার রাজনীতি কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয় বরং এটি মূলত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিল বা অমিলের কারণেই ঘটেছে। 'সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ' সম্পর্কে ভ্যাকলভ হাবেল বলেন, 'দিনদিন বাড়ছে এবং ইতিহাসের যে-কোনো সময়ের তুলনায় তা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে।' জ্যাকব ডেল্যুর যুক্তি দেখান যে, 'ভবিষ্যতের সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক ঘটনার নিরিখে; অর্থনৈতিক বা মতাদর্শের নিরিখে নয়।'[৩] বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সভ্যতার ক্রটিরেখা বরাবরই সবচেয়ে বেশি এবং সেসব স্থানেই সবচেয়ে মর্মান্তিক সংঘর্ষ হবে বলে ধারণা করা যায়।

পুনরায় উল্লেখ করা যায়, শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সংস্কৃতিই হল মূল উৎস, যা সভ্যতাকে প্রভাবিত করে সমগোত্রীয় সংস্কৃতিসম্পন্নদের একত্রিত করে চলেছে। মানুষ মতাদর্শিক দৃষ্টিতে পৃথক হয়েও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দুই জার্মানির একত্রীকরণ হল এর প্রকৃত উদাহরণ। কোরিয়াতেও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সমাজসমূহ কখনও কখনও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে একত্রিত হলেও তা আবার সাংস্কৃতিক চেতনার দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত হয়েছে। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি সভ্যতার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। অন্যদিকে, এ-ধরনের চাপের মুখে রয়েছে বসনিয়া, ইউক্রেন, নাইজেরিয়া, সুদান, ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ অন্যান্য কিছু দেশ। সাংস্কৃতিকভাবে পরস্পর কাছাকাছি দেশগুলোই আবার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ঐক্য গড়ে তোলায় সচেষ্ট থাকে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের বেলায় জোটবদ্ধতার পেছনে থাকে সাংস্কৃতিক মিল বা অমিল। অন্য কথায় বলা যায় : সাংস্কৃতিক দিক থেকে কাছাকাছি সভ্যতাসমূহই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জোটবদ্ধ হচ্ছে। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন; এ ইউনিয়নটি অনেক সংগঠনের চাইতে অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী। পূর্ব ইউরোপের জাতিগুলোর মধ্যে যে লৌহকঠিন দেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল, আজ তা অপসারিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বেও বিভিন্নতা নতুনভাবে সৃষ্টি

হচ্ছে, যার একদিকে থাকছে খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত পাশ্চাত্য এবং অন্যদিকে মুসলমান ও অন্যান্য গোঁড়া জনগোষ্ঠী। সামাজিক, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও প্রথাসহ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতার পার্থক্যরেখা সূচিত হয়। ধর্মীয় চেতনা সেই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্যবোধ সৃষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি ও চেতনাকে আরও উস্কে দেয়। কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। সেইসাথে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাবও পরিবর্তশীল এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের ব্যাপ্তিতে এটি স্থির থাকে না। তারপরও বলা যায়, এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের মূলে অবস্থান করে সাংস্কৃতিক চেতনাসমূহ। পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্য আসলে পূর্বএশিয়ার সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই ঘটেছে, আর একই কারণে পূর্বএশিয়ায় একটি স্থায়ী ও টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে বারবার বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। ইসলামি সংস্কৃতির কারণে সামগ্রিকভাবে মুসলমানবিশ্বে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার পতন-পরবর্তী পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের উন্নয়নসমূহ তাদের সাংস্কৃতিক ধারার ওপরই ঘটে চলেছে। সেখানকার পাশ্চাত্যমুখী খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ দৃষ্টিতে দেখা যায় গোঁড়াপন্থী দেশসমূহে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, আর মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের জন্যও ওই একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

পাশ্চাত্যজগৎ আগামী পৃথিবীতে শক্তিশালী সভ্যতা হিসেবে বজায় থাকবে। তবে অবশিষ্ট সভ্যতার ওপর তার প্রভাব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। পাশ্চাত্যজগৎ অপাশ্চাত্য জগতের ওপর যতই তাদের মূল্যবোধগুলো আরও বিস্তার করতে চাচ্ছে, ততই অপাশ্চাত্য জগতে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। সেইসাথে তৈরি হচ্ছে প্রতিরোধবোধ। কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজ ক্রমাগত তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে 'ভারসাম্য' সৃষ্টি করা, এমনকি পাশ্চাত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে রাজনীতি, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুষম ধারায় পরস্পরের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বের একটি বাস্তবতা।

শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্ব কার্যত সাত কিংবা আটটি বড় সভ্যতায় বিভক্ত। সাংস্কৃতিক মিল ও অমিল দ্বারাই বিভিন্ন সভ্যতার স্বার্থগুলো চিহ্নিত হচ্ছে, বৈরিতা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নির্ণীত হচ্ছে, অথবা মিত্র বা শত্রু দেশগুলো একত্রিত হচ্ছে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে কোথাও কোথাও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে যা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণেই ঘটছে বলে মনে করা যায়। এককথায় : একটি সভ্যতা থেকে অন্য একটি সভ্যতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের ভিন্নতা সাংস্কৃতিক পার্থক্য থেকেই তৈরি হচ্ছে।

তাই বলা চলে, অধুনা আন্তর্জাতিক এজেন্ডাগুলোর মূলে রয়েছে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতার বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা, প্রভাব ও প্রতিপত্তির ধারা অপাশ্চাত্যের শক্তি বৃদ্ধির নিরিখে পরিচালিত হচ্ছে এবং সোজা কথায় বলা চলে : পাশ্চাত্য বিশ্ব অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর আধিপত্য হারাচ্ছে। বৈশ্বিক শক্তি ক্রমান্বয়ে বহুপাক্ষিক ও বহুধারায় বিভক্ত সভ্যতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে।

অন্যরকম বিশ্ব?

মানচিত্রসমূহ ও নমুনা

শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতির ধারা কার্যত সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ এবং বিভিন্নধর্মী রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীর বলয়ে গড়ে উঠেছে। তবে এ চিত্রটি কিন্তু অতিসরলীকরণ বৈ কিছু নয়। এর মধ্যে অনেককিছুই নেই, আবার যা আছে তারও হয়তো অনেককিছুই বিকৃতভাবে রয়েছে এবং হয়তো সেখানে অনেক কিছুই অস্পষ্ট। তবুও আমরা যদি এই বিশ্বকে নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করি এবং সেমতো কাজ করতে চাই, তাহলে একধরনের সরলীকৃত অথচ বাস্তব কিছু তত্ত্ব, ধারণা, মডেল ও নমুনা (প্যারাডাইম) প্রণয়ন করা দরকার। বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম ব্যতীত এ-কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম জেমস-এর বক্তব্য বিবেচনা করা যায়। তিনি বলেন : মেধা ব্যতীত কাজটি করা হলে তা হবে শুধুমাত্র 'মারাত্মক ভুলে ভরা গুঞ্জন' এবং বিভ্রান্তিকর। শীতলযুদ্ধকালীন বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে হ্যারি ট্রুম্যান একটি মডেল দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'ভূ-রাজনীতির নিরিখে মানচিত্র প্রণেতার চর্চা আন্তর্জাতিক ভূদৃশ্যাবলি সকলের বোধগম্য করে তোলে। সেইসাথে পরিশীলিতভাবে অন্য রাষ্ট্রের ওপর প্রভাববিস্তার করার পথও তা বলে দেয়। এই পথগুলো যথাশীঘ্র অনুসরণীয় বলে প্রতিভাত হয়।' বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার কার্যকারণ সম্পর্কিত তত্ত্ব আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫]

প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষার্থী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত মাঠপর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞ কর্মীরা শীতলযুদ্ধ সম্পর্কিত নমুনা নিয়ে বিশ্বের চলমান ঘটনাবলির অত্যন্ত উপযোগী কিছু কাজ সমাপ্ত করেছিল। তবে, এই নমুনাসমূহের নানাধরনের অসংগতির ফলে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির সকল বিষয় তারা তাদের চর্চার আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়নি। যেমন—কুহনের ভাষায় নমুনায়ন পণ্ডিতজনদের একসময়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়, তথা চীন-সোভিয়েটের আলাদা হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়েছিল।

এই পর্যন্ত বৈশ্বিক রাজনীতির সাদামাটা এই মডেলটি বিশ্বরাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত করেছে, যা পূর্বে হয়নি। আদতে, এটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি রচনা করেছে। আর সেজন্যই এটি সর্বজনগ্রাহ্যতা পেয়েছে এবং পরবর্তী দুটি প্রজন্মের বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নূতনভাবে ভাবনাচিন্তা করার কার্যকর অবকাশ এনে দিয়েছে।

সহজবোধ্য নমুনা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কার্যত মানচিত্র আসলে মানুষের চিন্তা এবং কর্মের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। সুনির্দিষ্টভাবে প্রণীত তত্ত্বাবলি অথবা মডেলসমূহ আমাদের চিন্তার খোরাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে পারে। এর বিকল্প হিসেবে, আমরা ওই ধরনের পথপ্রদর্শকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে শুধুমাত্র সুনিদিষ্ট 'লক্ষ্য' ও সত্যঘটনা মাফিক এবং কোনোকিছুর 'সঠিক যোগ্যতা' নিরূপণের মাধ্যমে কাজ করতে পারি। যাইহোক, যদি আমরা আগেই সেটা ধরে নিই, তবে আমরা নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করব। আমাদের মনের পশ্চাতে গোপনভাবে বেড়ে ওঠা ধারণাগুলোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং সংস্কারগুলো আদতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা, অর্থাৎ কী ধরনের সত্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই এবং সেগুলোকে কীভাবে বিচার বা মূল্যায়ন করি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মডেলসমূহ সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে উপায়েই চাই না কেন, বাস্তবে যা পাওয়া যাবে, তা হল :

১. বাস্তবতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ও সাধারণীকরণ;
২. বিভিন্ন সত্তার মধ্যে পরস্পরের কার্যকারণ সম্পর্ক;
৩. যা ঘটতে পারে সে-সম্পর্কে আগাম কিছু বলার ক্ষমতা অর্জন করা;
৪. গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা;
৫. আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথগুলোকে দেখতে পাওয়া।

প্রত্যেক মডেল অথবা মানচিত্রই হল একটি বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি, যা বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—রাস্তায় ঠিকমতো ও যথাযথভাবে মোটরযান চালানোর জন্য রোডম্যাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্লেন চালনার জন্য সড়কপথের জন্য প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ অকার্যকর। এর জন্য চাই বিমানবন্দর, রেডিও স্টেশন, বিমান চলাচল পথের নির্দেশ সম্বলিত মানচিত্র। যাহোক, কোনো মানচিত্রই আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারি না। যে মানচিত্রে যতবেশি বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে, সেই মানচিত্র তত উত্তম। অতিরিক্ত বিশদ বিবরণসম্পন্ন মানচিত্র অনেক সময় তেমন কার্যকরী নাও হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই বলা যায়, আমরা এমন মানচিত্র প্রত্যাশা করব যা বাস্তবসম্মত, তথ্য বিবৃত হবে সহজ ও সাবলীলভাবে এবং থাকবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রাস্তার নির্দেশনা। শীতলযুদ্ধের সময়ে বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র ও মডেল প্রস্তুত ও তা প্রয়োগ করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

একক বিশ্ব : রমরমা ও প্রীতিকর

কতিপয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত বহুলপ্রচারিত একটি নমুনা মডেল ছিল এরূপ : শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে রাজনীতির দ্বারা সৃষ্ট সংঘাতসমূহ দূরীভূত হবে এবং বিশ্ব আগের

তুলনায় অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় হয়ে উঠবে। এই মডেলের বহুকথিত ধারাটি ফ্রান্সিস ফুকোওয়ামা *ইতিহাসের পরিসমাপ্তি* নামে প্রচার করেছেন। তাঁর যুক্তি ছিল এমন : '...ইতিহাসের পরিসমাপ্তির (End of History) অর্থ হল এমন যে, মানবেতিহাসে মানুষের কল্যাণে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান হয়েছে এবং এখন এমন পরিস্থিতি এসেছে যে বিশ্বব্যাপী এখন সর্বজনীন চেতনা ও পাশ্চাত্য উৎসারিত উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের সমাজের জন্য স্থায়ী এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।' আরও নিশ্চিত করে তিনি বলতে চান, কিছুসংখ্যক সংঘাত হয়তো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে হতে পারে, কিন্তু বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সংঘাতের সমাপ্তি ঘটেছে, এবং তা শুধুমাত্র ইউরোপে নয় বরং সমগ্র বিশ্বজুড়ে। 'বিশেষ করে অ-ইউরোপীয় বিশ্বে' এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। চীন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে এ পরিবর্তন ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। মতাদর্শিক যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মাকর্সীয়-লেনিনবাদ মানাগুয়া, পয়োনজিয়াংগ, ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্ প্রভৃতি স্থানে হয়তো এখনও বহাল রয়েছে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রায় সর্বত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্র স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে আর সময় বা অর্থ ব্যয় করতে হবে না বরং অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য সবাই কাজ করে যাবে। তবে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'এ সবই হবে খুবই বিরক্তিকরভাবে।'

শীতলযুদ্ধোত্তর তাৎক্ষণিক সময়ে কাঙ্ক্ষিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বেশ ভালোমতো দানা বেঁধেছিল। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলও এ-বিষয়ে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। বার্লিনের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়, কম্যুনিস্ট সরকার ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটে, জাতিসংঘ আশাবাদী হয়ে ওঠে; এবং ধরে নেয় যে, শীতলযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাবেক শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও 'অংশীদারিত্ব' এবং একটি বড় মাপের দেনা-পাওনাসুলভ সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং এভাবে শান্তিস্থাপন ও শান্তিরক্ষার প্রক্রিয়াই হবে যুগের অর্জন বা সময়ের যথোপোযুক্ত চাহিদা। বিশ্বের বড় বড় দেশের রাষ্ট্রপতিগণ একটি 'নবতর বিশ্বব্যবস্থার' ঘোষণা দেন। পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুক্তি দেখাতে থাকে যে, নিরাপত্তা বিষয়ক অধ্যয়নের দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং এ বিভাগে আর প্রফেসর পদে নিয়োগ দানের প্রয়োজন নেই— 'খোশ আমদেদ। আমরা আর যুদ্ধ সম্পর্কে পঠন-পাঠন করব না; কারণ আর যুদ্ধ হবে না।'

শীতলযুদ্ধাবসানের পরের রমরমাভাব আসলে একধরনের 'ভ্রম' সৃষ্টি করেছিল, যাতে মনে করা হত সত্যিই বুঝি বিশ্ব সংঘাতমুক্ত হয়ে সৌহার্দ্যের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব আগের চেয়ে পরিবর্তিত হল সত্য, তবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি পাওয়া গেল না। পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী; তবে অগ্রগতি হল না কোনো ক্ষেত্রেই। সৌহার্দ্যের মোহ বাস্তবায়িত হল না। বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি নতুন ধরনের সংঘাত আবির্ভূত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ধরে নেয়া হয়েছিল এটিই হবে 'শেষযুদ্ধ' এবং পৃথিবী এখন গণতন্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ অবস্থা ও পরিবেশ অর্জন করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট চিত্রিত করেছেন এভাবে : 'এটি

হবে একক কর্তৃত্বমূলক কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তের শেষ অঙ্ক এবং অন্যকে বাদ দিয়ে জোট বা আঁতাত করার দিনও শেষ হবে। সেইসঙ্গে শক্তির 'ভারসাম্য' সৃষ্টি হবে। আর যাবতীয় অশুভ তৎপরতা যা বিশ্বকে অস্থির করে তোলে; তারও পুনরাবৃত্তি হবে না।' একটি সর্বজনীন সংস্থা যা শান্তিকামী দেশসমূহের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত স্থায়ী শান্তির প্রক্রিয়া আমরা খুঁজে পেতে পারি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে উপহার দিল কম্যুনিজম এবং শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা গণতন্ত্রের পশ্চাৎ যাত্রা। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সৃষ্টি করল শীতলযুদ্ধ, যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। আর শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তির 'মিথ্যা প্রত্যাশা' অতিদ্রুত নৃগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নৃগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্নকরণ (ethnic cleansing), আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, সন্ত্রাস, সংঘাতপ্রবণ নতুন নতুন জোট বা সংঘ, নব্য কম্যুনিস্ট ও নব্য ফ্যাসিস্ট আন্দোলন, ধর্মীয় মৌলবাদের উগ্র বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদির দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেল। সেইসাথে 'সহাস্য কূটনীতির' বদলে 'হ্যাঁ'সূচক নীতির সম্প্রসারণ ঘটল, যা রাশিয়া পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে চর্চা করে যাচ্ছে। উপরন্তু, জাতিসংঘের দুর্দশা ও অস্থিরতা, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অন্যান্য আঞ্চলিক সংঘাতের রক্তাক্ত পরিণতি, আর আগামীতে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য সৃষ্ট হওয়া চীনের অপূর্ব সুযোগ, ইত্যাদি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল।

বার্লিনের দেয়াল পতনের পাঁচ বৎসর পর 'গণহত্যা' নামক শব্দটি বারবার শ্রুত হতে লাগল, যা শীতলযুদ্ধ চলাকালীন পাঁচ বৎসরে শোনা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, শীতলযুদ্ধাবসানের ভেতর দিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টির কোনোপ্রকার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হল না।

বহুধা বিভক্ত বিশ্ব

দুই বিশ্ব : 'আমাদের' এবং 'তাদের'

মানবেতিহাসে যখন 'এক বিশ্বজনীন' চেতনায় ছেদ পড়ল, দ্বন্দ্বের বিচারে তখন 'দুই বিশ্ব' ধারণাটি মানবেতিহাসে পুনরায় সবল হতে থাকল। মানুষ প্রায়শই 'আমাদের' এবং 'তাদের', গোষ্ঠীভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত নয়; 'আমাদের সভ্যতা' অন্যদিকে 'বর্বরদের সভ্যতা' ইত্যাদির নিরিখে ভাবতে ভালোবাসে। পণ্ডিতেরা জগৎকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উত্তর ও দক্ষিণ, কেন্দ্র ও প্রান্তিক, এভাবে ভাগ করে দেখতে আগ্রহী। ওদিকে, মুসলমানেরা একদিকে 'দারুল ইসলাম' এবং 'দারুল হার্ব', 'শান্তির নীড়' আর অন্যদিকে 'অশান্তির যুদ্ধ'—এভাবে ভাবতে চায়। শীতলযুদ্ধ শেষের দিকে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যায়। একজন আমেরিকান পণ্ডিত বিশ্বকে একদিকে 'শান্তির এলাকা' আর অন্যদিকে 'হাঙ্গামার এলাকা' এইভাবে ভাগ করে দেখতে থাকেন। আর সেক্ষেত্রে শান্তির এলাকা বলতে পশ্চিমাবিশ্ব ও জাপান যার মোট জনসংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগের বেশি নয়, আর অন্যদিকে বাদবাকি শতকরা ৮৫ বিশ্বকে 'হাঙ্গামা' বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৮]

খণ্ডিত বিশ্ব নিয়ে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁরা খণ্ডিত অংশকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চান তার ওপর অনেককিছু নির্ভরশীল। তবে দ্বিখণ্ডিত বিশ্ব-সম্পর্কিত বিশ্বধারণার সঙ্গে বাস্তবতার কিছু মিল আছে। অতি সাধারণ বিভাজন, যেমন—ধনী (আধুনিক ও উন্নত) এবং দরিদ্র (গতানুগতিক, অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল) দেশসমূহের পার্থক্য সম্পর্কে বুঝাতে চাওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে এ-ধরনের বিভাজন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরে নিলেও তার গভীরে আসলে সাংস্কৃতিক চেতনাই কাজ করে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। কেননা, এখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য যতটা না বিবেচিত হয়, তার চেয়েও বেশি বিবেচিত হয়ে থাকে উপাদানসমূহ, যেমন—মূল্যবোধ, জীবনযাপন প্রণালী ইত্যাদি।[৯] উল্লিখিত সব ক্ষেত্রেই বাস্তবতার ছাপ থাকলেও তার সীমাবদ্ধতার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ধনী এবং আধুনিক দেশসমূহে দরিদ্র এবং গতানুগতিক দেশগুলো থেকে বৈশিষ্ট্যাবলি অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন এবং উভয়পক্ষের ক্ষেত্রে 'মিশ্র' অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। তবে, এজন্য মাত্রাগত পার্থক্য নির্ণয়ই হল বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিসঙ্গত কার্যাবলির লক্ষণ।

সম্পদের বৈষম্য প্রকারান্তরে উভয় সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্ম দিতে পারে, তবে নজির ও ঘটনা থেকে দেখা যায় যে, সংঘাত তখন আসে যখন ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশসমুহ দুর্বল দেশকে ভৌগোলিকভাবে জয় করতে চায়; কিংবা উপনিবেশ হিসেবে রাখতে চায়। পাশ্চাত্যরা বিগত চারশত বৎসর এই কাজটি করে এসেছে। তাই দেখা গিয়েছে, কোনো কোনো উপনিবেশিত দেশ স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিমাশক্তির (দখলদার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, করেছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই দখলদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে দখলকৃত সমাজে স্বাধীনতা প্রদান করে ঘরে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু চলতি বিশ্বে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বাতিলকরণ প্রক্রিয়ার যুদ্ধ ও সংঘাত প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে।

সাধারণ পর্যায়ে ধনী ও দরিদ্রের সংঘাত তত প্রকট নয়। কারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত দারিদ্র্যকবলিত দেশগুলোতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব রয়েছে। এছাড়া, তারা অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বড় দেশগুলোর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেও সক্ষম নয়।

এশিয়া ও লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনী-দরিদ্রের বিভাজনের ওপর একটি কলঙ্কতিলক বিশেষ। ধনীদেশগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ চালিয়ে যায়; আর দরিদ্রদেশগুলো পরস্পরের মধ্যে সহিংস ও রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু দক্ষিণের দারিদ্র্যপীড়িত ও উত্তরের ধনবান দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাস্তবতাবিবর্জিত।

আদর্শিক দিক থেকে বিশ্বের বিভেদগুলো আজ আর তত কার্যকর নয়। প্রায় সর্বত্রই পশ্চিমা জগৎ একটি বাস্তব সত্তা। অপাশ্চাত্য দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে কোন্ উপায়ে ও কত পরিমাণ গভীরতায় একই সূত্রে গাঁথা তা একটি বড় প্রশ্ন। কেননা, এক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মধ্যে মিল একটিই, আর তা হল, তারা সবাই অপাশ্চাত্য।

জাপানি, চৈনিক, হিন্দু, মুসলমান এবং আফ্রিকান সভ্যতা খুব কমই একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায়। বিশেষ করে ধর্ম, সমাজকাঠামো, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং চলমান মূল্যবোধের দৃষ্টিতে এই ঐক্য বেশি দেখা যায়। তাই বলা চলে, অপাশ্চাত্যের দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য বা পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন একটি কল্পকাহিনী যা পশ্চিমাবিশ্ব নিজেরাই তৈরি করেছে।

এইসব কল্পকাহিনীর সঙ্গে প্রাচ্যের বিশ্বাসের দুঃখজনক যোগ রয়েছে, যাকে এডওয়ার্ড সাঈদ সঠিকভাবেই সমালোচনা করে বলেছেন : 'আমাদের' বলতে ইউরোপ ও পশ্চিমাবিশ্বকে বুঝানো হয়েছে এবং অন্যদিকে 'তাদের' বলতে প্রাচ্য এবং পূর্বকে বুঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, 'আমাদের' শ্রেণীই উচ্চমার্গের বলে অন্তঃস্থায়ী। তাই 'আমরা' 'তাদের' ওপর আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারকারী।[১০] শীতলযুদ্ধকালীন বিশ্ব ছিল মতাদর্শিক কারণে দুই মেরুতে বিভক্ত। সেখানে কোনোপ্রকার একক সাংস্কৃতিক ধারা ছিল না। মেরুকরণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বিক দৃষ্টিতে একে অপরের অংশ হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে পশ্চিমা সভ্যতা হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। 'পূর্ব' এবং 'পশ্চিমের' পরিবর্তে আসলে 'পশ্চিমাবিশ্ব' ও 'বাকি অপরাপর বিশ্ব' বলাই বোধহয় যথার্থ হতে পারে। তাহলে অন্ততপক্ষে অপাশ্চাত্যের অনেককিছুই এর আওতাভুক্ত হতে পারবে। এটি আসলেই খুবই জটিল বিষয়। আগাম মন্তব্য ও বিশ্লেষণ করা কঠিন, বিশ্বকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিভাজন, যেমন—উত্তর-দক্ষিণ আর সাংস্কৃতিকভাবে বিভাজন, যেমন পূর্ব-পশ্চিম একই পর্যায়ভুক্ত।

১৮৪টি রাষ্ট্র, কম অথবা বেশি

শীতলযুদ্ধাবসান-পরবর্তী তৃতীয় মানচিত্রটি হল সেই মানচিত্র যার মাধ্যমে বলতে চাওয়া হয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় 'বাস্তব' তত্ত্বের কথা। এই তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয়, রাষ্ট্র হল একমাত্র প্রাথমিক ও যথার্থ সংগঠন, যার মাধ্যমে বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকা রাখা যায়। কারণ, রাষ্ট্র এই সম্পর্কের ভেতর দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নৈরাজ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিজে টিকে থাকার মতো ক্ষমতা অর্জনের প্রশ্নে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে অন্যরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের ক্ষমতার দাপট প্রকাশ করতে চায়, যদি কোনো রাষ্ট্র দেখে যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রাষ্ট্র ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, আর সেই ক্ষমতা যদি তার জন্য ভবিষ্যৎ হুমকি হিসেবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ওই রাষ্ট্রও তার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে, অথবা বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সঙ্গে 'আঁতাঁত' করে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চাইবে। শীতলযুদ্ধাবসানোত্তর পরিস্থিতিতে ১৮৪টি রাষ্ট্রের স্বার্থ ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়।[১১]

'বাস্তববাদী' এই চিত্রটির ব্যবহারিক দিক খুবই উজ্জ্বল, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাসহ রাষ্ট্রসমূহের প্রকৃত আচরণ জানা যায়। সংগতভাবে বলা যায়, রাষ্ট্র হল বিশ্বপরিস্থিতির শক্তিশালী নিয়ামক। রাষ্ট্র সৈন্যবাহিনী লালনপালন করে, কূটনৈতিক তৎপরতা বজায় রাখে, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি স্থাপন করে, যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করে,

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে ও তা নিয়ন্ত্রণ করে। তদুপরি, রাষ্ট্র উৎপাদনব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করে ও ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্র তার ভূখণ্ড ও জনগণকে বহিঃশক্তির আক্রমণের ও অভ্যন্তরস্থ অশান্তি সৃষ্টিকারীর হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। সুতরাং, রাষ্ট্রকে একটি 'একক নমুনা' হিসেবে অবশ্যই বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য অন্যতম প্রধান উপাদান বলে বিবেচনা করতে হবে।

তবে 'একবিশ্ব' বা 'দ্বি-বিশ্ব' নমুনার পরিবর্তে রাষ্ট্রসুলভ এই নমুনার কিছু প্রকট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই নমুনায় ধরে নেয়া হয় যে, সকল রাষ্ট্র নির্বিশেষে তাদের প্রয়োজনগুলো হৃদয়ঙ্গম করে একইভাবে এবং একই উপায়ে সে-সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে। এতে মনে করা হয়, ক্ষমতাই সবকিছুর উপরে এবং এর মাধ্যমেই প্রারম্ভিকভাবে রাষ্ট্রের আচরণ বুঝতে হবে। কিন্তু এভাবে বাস্তবে কেউ খুব বেশিদূর এগুতে পারে না। ক্ষমতার দ্বারাই রাষ্ট্রের স্বার্থসমূহ চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এর বাইরেও কিছু বিষয় রয়ে যায়, যা অনুধাবন করা আবশ্যক। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সবসময় ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। তবে এই বিষয়টি যদি রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের ভাণ্ডার হত কিংবা তা অন্যভাবে না হত তবে ১৯৪০ সালে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে যেতে পারত।

রাষ্ট্রগুলো প্রাথমিকভাবে সকলপ্রকারের ভীতির মোকাবিলা করে থাকে; পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সামরিক ভয়ভীতি অনুভব করছিল। তারা মনে করতে থাকল যে, তাদের স্বার্থসমূহ আগের তথা সনাতন প্রথাগত তত্ত্বের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। মূল্যবোধ, কৃষ্টি এবং বিভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান খুবই স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের ওপর প্রভাববলয় বিস্তার করতে সচেষ্ট থাকে এবং কার্যত রাষ্ট্রের স্বার্থ সেভাবেই নির্ণীত হয়। রাষ্ট্রের স্বার্থসমূহ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা স্থির হয় না, সেসঙ্গে তার ওপর বাহ্যিক তথা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানাদিরও একটি বিরাট প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকে। নিরাপত্তা সম্পর্কিত রাষ্ট্রের প্রধান বিষয়ের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র বিভিন্নরকমের স্বার্থ চিহ্নিত করে থাকে। একই ধরনের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানাদি সম্বলিত দেশগুলো পরস্পরের জন্য একই রকমের (সাধারণ) স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

সেই সূত্রে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ প্রায় একই রকম হওয়া স্বাভাবিক এবং ধারণা করা যায়, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোনো কর্মকাণ্ডে কানাডা জোটভুক্ত হবে না।

মৌলিক এবং প্রারম্ভিক পর্যায়ে 'রাষ্ট্রসুলভ মডেল' ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তবে সেই মডেল দ্বারা আমরা বুঝতে সক্ষম হব না যে, শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক

রাজনীতি কীভাবে এবং শীতলযুদ্ধাবস্থায় বিরাজমান বিশ্বরাজনীতি কিংবা তার পূর্বের রাজনীতি কোন্ ধারায় পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্বার্থগুলো বিভিন্ন কৌশলে এগিয়ে নিতে চেয়েছে। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে রাষ্ট্রগুলো ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে তাদের স্বার্থগুলো সভ্যতার নিরিখে তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছে। তারা পরস্পরের মধ্যে সাধারণত কৃষ্টি ও সভ্যতাগত মিল বা অমিলের মাধ্যমেই জোটবদ্ধ হচ্ছে এবং যাদের সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মিল নেই তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে।

একটি রাষ্ট্রের প্রতি অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধের হুমকি মূলত উভয় রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক পার্থক্য থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক দেশের জনগণ এবং জননেতাগণ অন্যদেশের জনগণের সংস্কৃতি, ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাদি সম্পর্কে সহজে বুঝতে পারলে তারা পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে ও সেটাই সকলের কাম্য। এই ধরনের মনমানসিকতার ফলে পরস্পরের সাংস্কৃতিক ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদূরিত হয়। অপরদিকে, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি যা তারা বুঝতে অক্ষম, সেখান থেকেই ভীতি বা শত্রুতা কিংবা অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারই ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মার্কস ও লেনিন অনুসারিত সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন আর কোনো শক্তি হিসেবে জীবিত নেই। তাই তার নিকট থেকে মুক্তবিশ্ব বা যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি বা ভীতির বিষয়টি অকার্যকর। অধুনা সাবেক কম্যুনিস্ট ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বুঝতে পারছে যে, ভয়ভীতির নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, আর তা প্রকৃতপক্ষে বহুধাবিভক্ত সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত বিশ্বরাজনীতির মুখ্য ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু রাষ্ট্রের নিজেরও রয়েছে বহুমাত্রিক যাতনা। কারণ, রাষ্ট্র ক্রমশ তার সার্বভৌমত্ব, কর্মতৎপরতা ও পরিধি এবং ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রাষ্ট্রের স্থলে অধুনা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি চর্চার অধিকারপ্রাপ্ত হচ্ছে। এমনকি বিশেষ একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূখণ্ডে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রকেও তা স্পর্শ করছে এবং ক্রমাগত প্রভাবিত করছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ : কোনো কোনো বিষয়ে, ইউরোপে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এমন সকল কাজকর্ম করছে, যা পূর্বে রাষ্ট্র তার আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে করত। এভাবে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে অধুনা একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র সৃষ্টি হচ্ছে, যারা তাদের কর্মপরিধি, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে ফেলেছে। বৈশ্বিকক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকার এই বিকল্প শক্তির আবির্ভাবের কারণে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক এবং তৃণমূল পর্যায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিসমূহ অনেককে বুঝতে সক্ষম করে তুলেছে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রমশ অবনতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রগুলোর অবস্থার সাথে তুলনা করা চলে।

রাষ্ট্রসমূহের দুর্বলতা ও 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের' (*Failed State*) ধারণা মূলত বিশ্বব্যাপী চতুর্থ ধাঁচের নৈরাজ্যের নির্দেশক। রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার কর্তৃত্ব ভেঙে পড়া, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ছত্রভঙ্গকরণ, উপজাতি, গোষ্ঠীগত, নৃগোষ্ঠীগত এবং ধর্মীয় সংঘাত, আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের উদ্ভব, উদ্বাস্তুর সংখ্যাধিক্য, পরমাণুশক্তিসহ অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্রের সীমাহীন ও ব্যাপক বিস্তার, সন্ত্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্নকরণ কার্যক্রম ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহের নিয়ন্ত্রণশক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশ্বের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত দুটি পুস্তকের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে। যথা : লেখক জিবিগনিউ ব্রিজেনসস্কি (*Zbignew Brzezinski*) কর্তৃক রচিত *'Out of control'* এবং লেখক প্যাট্রিক মইনিহান (*Patrick Moynihan*) রচিত *'Pandae monium'* রাষ্ট্র-সম্পর্কিত নমুনার ন্যায়, বিশৃঙ্খলা সম্পর্কিত নমুনা (প্যারাডাইম) বাস্তবতার কাছাকাছি বলে মনে করে। বর্তমান বিশ্বে চলমান ঘটনা ও পরিস্থিতির একটি গ্রাফিক এবং নির্ভেজাল প্রতিচ্ছবি এই নমুনার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। তদুপরি, এই 'বক্স' বা চিত্রের মাধ্যমে শীতলযুদ্ধাবসানের পর বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে যথাযথভাবে মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৩ সালের শুরুতে, ৪৮টি নৃগোষ্ঠীগত যুদ্ধ সারা বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হয়েছে। ১৬৪টি সীমানা ও ভূখণ্ড সম্পর্কিত নৃগোষ্ঠীগত সংঘাত হতে দেখা গিয়েছে, যার অধিকাংশই হয়েছে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে। তন্মধ্যে ৩০টি সংঘাত ছিল সশস্ত্র। এই সংঘাতগুলো তীব্র এবং ভয়ানক রূপ নেয়।[১৪] তবুও এই নমুনা বা মডেল সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। রাষ্ট্রসম্পর্কিত মডেলের মতো এ মডেলেরও বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্ব বিশৃঙ্খল ও উত্তপ্ত হলেও একথা বলা যাবে না যে, বিশ্বের ঐক্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। বরং বিশৃঙ্খলার মাঝেও বিশ্বে একপ্রকারের শৃঙ্খলাপ্রবণতারও উপস্থিতি আছে।

সর্বজনীন নৈরাজ্য কিছু দিকনির্দেশনা দেয়, যার মাধ্যমে বিশ্বকে উপলব্ধি করা যায়; কেননা এর ফলে নিয়মমাফিকতা ও এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়, নৈরাজ্যের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুমান করা যায়; বিভিন্ন ধাঁচের বিশৃঙ্খলার ধরন, এর উৎপত্তির কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় এবং বলাবাহুল্য, সেমতো সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে নেয়া যেতে পারে।

তুলনার মানদণ্ডে বিশ্ব, বাস্তববাদিতা, কৃপণতা এবং ভবিষ্যদ্বাণী

শিরোনামে উল্লিখিত চারটি নমুনার প্রত্যেকটি পৃথকভাবে, অথবা মিলিতভাবে বাস্তববাদিতা ও কৃপণতার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করে, যদিও প্রত্যেক নমুনার অপ্রতুলতা এবং সীমাবদ্ধতা অনস্বীকার্য।

উক্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত নমুনা হিসেবে এটিকে ধরে নেয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশ্ব একই সঙ্গে 'বিভেদ' ও 'ঐক্য' বা 'সংহতি', উভয়

প্রক্রিয়াই ধারণ করে চলেছে।[১৫] উভয় প্রবণতাই আসলে কাজ করে যাচ্ছে এবং বলা যায়, অতি জটিল কোনো মডেল প্রকৃতপক্ষে সহজীকরণের পরিবর্তে প্রকৃত এবং প্রায় বাস্তবতা উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে জটিলতার জন্ম দেয়। তবে, এভাবে ভাবলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় কার্পণ্যের পরিচয় দিতে হয় এবং এতে করে কার্যত যে-কোনো মডেলকেই পরিত্যাজ্য মনে হতে পারে। অধিকন্তু, একই সঙ্গে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা তথা 'বিভেদ প্রবণতা' এবং 'সংহতি প্রবণতা' সংক্রান্ত মডেল কীভাবে বজায় থাকে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে দুটির একটি এগিয়ে যাবে বা অন্যটি যাবে না, কিংবা কোন্ ধারায় তা সমানতালে এগিয়ে যাবে এবং এভাবে এগিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব কি-না সে-বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং, আমাদের মেধা ও মনন দিয়ে এমন মডেল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, যার মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলোও সহজভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেয়া যায়।

উল্লিখিত চারটি নমুনা পরস্পরবিরোধী। বিশ্ব কখনও একই সঙ্গে একক (সমন্বিত) আবার মৌলিকভাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ভাগে কীভাবে বিভক্ত হতে পারে? বিশ্ব 'এক' বা 'দুই' বা ১৮৪ রাষ্ট্রে বিভক্ত, এমনটি নয়; বরং প্রকৃত সত্য হল : বিশ্ব অগণিত সংখ্যক উপজাতি, নৃগোষ্ঠীগত চেতনা, ধর্ম এবং জাতিরাষ্ট্রের অবয়বে বিভাজিত।

বিশ্বকে সাত বা আটটি সভ্যতায় বিভক্তকরণের মাধ্যমে অনেক ধরনের অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এভাবে ধরলে 'একবিশ্ব' বা 'দ্বিবিশ্ব' নমুনার মতো সত্যকে ধামাচাপা দেবার কোনোপ্রকার কার্পণ্য বা সুযোগ থাকে না। তাছাড়া রাষ্ট্রসুলভ অথবা বিশৃঙ্খল নমুনার ন্যায় সত্যকে গলাটিপে মারার প্রয়োজন পড়ে না। বলা যায়, এটি বিশ্বপরিস্থিতি সহজে বোঝার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক সহজ মডেল (প্যারাডাইম) হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব। এই মডেলের ভেতর দিয়ে বহুধা বিভক্ত বিশ্বে বিভিন্নধর্মী সংঘাত উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের জন্য কর্মপন্থা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। এভাবে নীতিনির্ধারকগণও তথ্য পেয়ে উপকৃত হতে পারেন।

এই নমুনার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, এটি অন্যান্য নমুনার গুণগুলোকেও সংযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে ও অন্যান্য মডেলের সঙ্গে সুসংগতভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম। এই 'সভ্যতাভিমুখী মডেলের' নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচ্য, যথা :

- বিশ্বের সংহতি রক্ষার জন্য যে শক্তি রয়েছে তা খুবই বাস্তবসম্মত এবং কোন্ কোন্ উপাদানসমূহ এই সংহতির বিপরীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সে-সম্পর্কেও এই মডেলটি সতর্ক রাখতে সক্ষম।
- একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব-প্রতিপত্তি তাকে অন্যান্য সভ্যতা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক করে রেখেছে। বিশ্ব হল সংক্ষেপে দুটি ভাগে বিভক্ত—এর একদিকে থাকে পাশ্চাত্য বিশ্ব, আর অন্যদিকে থাকে অবশিষ্ট বিশ্ব, যার ভেতর লুক্কায়িত থাকে নানাপ্রকারের সভ্যতা।
- জাতিরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকবে।

জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থসমূহ সংগঠনমূলক প্রত্যয় এবং এর দ্বন্দ্বগুলো সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার নানা উপদানের প্রভাবে দিনদিন ধারালো হতে থাকবে।

- একথা অনস্বীকার্য, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মাত্রার নৈরাজ্য বিরাজমান। বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতিবোধ, জাতিগত অহমিকার কারণে সর্বদা এবং সর্বত্র সংঘাতপূর্ণ। যে-ধরনের সংঘাত বিভিন্ন সভ্যতামুখী রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই ধরনের সংঘাত স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

উপর্যুক্ত সভ্যতামুখী মডেল আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ এবং সরল মনে হলেও আসলে কিন্তু বিংশ শতাব্দী-পরবর্তী বিশ্ব উপলব্ধি করার জন্য এই মডেলের মানচিত্র তত সহজ সরল নয়। একথা সত্য, কোনো নমুনা বা মডেলই কিন্তু নির্বিশেষে সকল সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়। শীতলযুদ্ধকালীন মডেল প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল প্রভাববিস্তারকারী মডেল হিসেবে চালু থাকলেও ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে এসে এ মডেল তার কার্যকারিতা হারাতে থাকে। সেজন্য বলা যায়, সভ্যতামুখী এই মডেলও অদূর ভবিষ্যতে তার কার্যকারিতা হারাবে। তবুও বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই মডেলটি আমাদের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মোচিত করে দেয় যে, কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কোন্‌টি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত ৪৮টি নৃগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের প্রায় অর্ধেক দ্বন্দ্ব ঘটেছিল বিভিন্ন সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব এক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনের জন্য কাজ করেছিলেন, যাতে ওইসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত সীমান্তযুদ্ধের দিকে মোড় নিতে না পারে।

উল্লিখিত মডেলটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে কী ঘটবে বা ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব এবং এ-বিষয়ে অপরাপর মডেল থেকে এ মডেলটি অধিকতর সঠিক ও কার্যকর বলে মনে করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রসুলভ মডেলের একজন সমর্থক জন মেয়ারসেইমার (John Mearsheimer) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, 'ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা শীঘ্রই পরিণতি পেতে যাচ্ছে। বড় শক্তিগুলোর সঙ্গে ইউক্রেনের অরক্ষিত সীমান্ত এলাকা রয়েছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যকার সীমান্ত এলাকা প্রায়শই নিরাপত্তাজনিত হুমকি ও ভয়ভীতির মধ্যে নিপতিত হয়। রাশিয়া এবং ইউক্রেন এই অসহনীয় অবস্থা উত্তরণের জন্য পারস্পরিকভাবে এগুতে পারে এবং এভাবে তারা ভীতিহীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এটি করা কতটুকু সম্ভব তা একটি বড় প্রশ্ন।'[১৬]

অন্যদিকে, সভ্যতামুখী মডেল, খুব নিকট থেকে সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত এবং ঐতিহাসিক পটভূমি এবং এদের মাঝে অবস্থিত আন্তঃসংযোগ নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। এ দুটি দেশের মধ্যে সভ্যতার দৃষ্টিতে ফাটল ধরবার কারণ, অবস্থা, এবং কীভাবে তা দূর করা যায়, কিংবা পূর্ব ইউক্রেনের অর্থোডক্স অংশের সঙ্গে পশ্চিম ইউক্রেনের সম্পর্ক কী তা দেখতে চাওয়া হয়। এই পরিস্থিতিগুলো দীর্ঘদিন থেকে একটি 'ঐতিহাসিক সত্য' হিসেবে চলে আসছে। এ সবকিছুই কিন্তু

সভ্যতামুখী মডেলের ইতিবাচক এবং 'বাস্তববাদী' দিক। অথচ জন মেয়ারসেইমার (John Mearsheimar) এসব বাস্তব দিকগুলোকে উপেক্ষা করেই তাঁর মডেল তৈরি করেছেন। রাষ্ট্রসুলভ মডেল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ভেতর একটি যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে, অপরদিকে সভ্যতামুখী মডেল সেই বিরোধের মীমাংসার প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে। তাছাড়া এ মডেল ইউক্রেনের বিভাজনকেও গুরুত্ব দেয় না, যদিও সাংস্কৃতিক দিকগুলো বিবেচনায় আনলে যে-কেউ মনে করতে পারে যে, ইউক্রেনের বিভক্তি চেকোস্লোভাকিয়া বা যুগোস্লাভিয়ার চেয়েও রক্তাক্ত হতে পারে। সভ্যতামুখী মডেল ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলে থাকে। ইউক্রেনকে তার পারমাণবিক অস্ত্র পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে বলে এবং ইউক্রেনের ঐক্য ও সংহতি বিধানের পরামর্শ দেয়।

শীতলযুদ্ধোত্তর অবস্থার সঙ্গে সভ্যতামুখী মডেল সুসংগত বিধায় এই মডেল দ্বারা পরিবর্তিত অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সে-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। এসবের মধ্যে ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার পতন এবং ওই ভূখণ্ডে জাতি-সম্প্রদায়গত সন্ত্রাসী এবং সংঘাতমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান ইত্যাদি। তুরস্ক ও মেক্সিকোর পরিচয়সংক্রান্ত প্রশ্ন, জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের প্রসার, ইরাক ও লিবিয়ার প্রশ্নে ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক পশ্চিমি দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ; ইসলামি ও কনফুসীয় রাষ্ট্রগুলো পারমাণবিক অস্ত্র সহযোগিতার ফলে শক্তি অর্জন করবে এবং এর ব্যবহারবিধি জোরদার করবে। চীন এখন পর্যন্ত 'বহিরাগত' বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে, কিন্তু কিছু বাছাই-করা দেশে গণতন্ত্রের যাত্রা অব্যাহত থাকলেও পূর্বএশিয়া অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠবে।

১৯৯৩ সালে ৬ মাস ব্যাপী ঘটে যাওয়া সভ্যতামুখী মডেলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইতিমধ্যে আবির্ভূত বিশ্বের ঘটনাবলির নমুনা নিম্নরূপ :

- পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার ক্রোয়াট মুসলমান এবং সার্বীয়দের মধ্যে যুদ্ধ তীব্র ও ব্যাপক আকারে চলছে।
- পশ্চিমাশক্তি যুক্তিপূর্ণ ও সঠিকভাবে বসনিয়ার মুসলমানদের সমর্থনদানে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। অন্যদিকে, তারা ক্রোয়াটদের ও সার্বীয়দের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিরোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রোয়েশিয়ার সার্বীয়দের সাথে সরকারের সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাশিয়ার অনিচ্ছা দেখা যায়। বসনিয়ার মুসলামদের রক্ষা করতে ইরানসহ অন্যান্য মুসলমান দেশ থেকে ১৮০০০ সৈন্য সংগ্রহের বিষয়টি তথৈবচ।
- আরমেনীয়দের সঙ্গে আজেরিসদের যুদ্ধে তুরস্ক ও ইরানের দাবি হচ্ছে আরমেনিয়া অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দেবে, সেখানে তুরস্কের বাহিনী নিয়োগ করা এবং আজারবাইজান সীমানায় ইরানি সৈন্য সমাবেশ এবং এ-বিষয়ে রাশিয়ার

সর্তকবাণী হচ্ছে ইরানের কর্মতৎপরতা আসলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে যার ফলে 'যুদ্ধ ও সংঘাত আরও গতি পাবে'। অর্থাৎ, এ সিদ্ধান্ত হবে উস্‌কানিমূলক। এবং 'তা আসলে আন্তর্জাতিকীকরণের সীমারেখার উপর সংঘাতিক ধাক্কা দেবে।'

- মধ্যএশিয়ায় রুশবাহিনীর সঙ্গে মুজাহিদিন গেরিলাদের যুদ্ধ চলতে থাকবে।
- মানবাধিকার সম্পর্কিত ভিয়েনা সম্মেলনে উক্ত বিষয়ে পাশ্চাত্য ও অবশিষ্ট বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উক্ত কনফারেন্সে পশ্চিমাজগতের নেতৃত্ব দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব ওয়ারেন ক্রিস্টোফার যিনি সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার প্রতি প্রকাশ্য নিন্দা জ্ঞাপন করেন। আর সংঘাতের অন্যদিক হল, এ সম্মেলনে ইসলামি ও কনফুসীয় দেশগুলো পশ্চিমা সর্বজনীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে।
- ন্যাটো এবং রাশিয়ার সামরিক নীতিনির্ধারকেরা সমান্তরালভাবে দক্ষিণদিক থেকে হুমকি আসতে পারার বিষয়টি উল্লেখ করে।
- সভ্যতামুখী ধারায় অলিম্পিকের প্রশ্নে প্রায় ২০০ ভোট বেজিং-এর বিপরীতে সিডনির দিকে পড়ে।
- পাকিস্তানের কাছে চীনের ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত প্রযুক্তি বিক্রি করা এবং চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকা কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সেসঙ্গে ইরানে গোপনে পরমাণু-প্রযুক্তি চালান দেয়া নিয়ে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ গণনাযোগ্য।
- উভয়পক্ষ হতে সম্মতিক্রমে গৃহীত চুক্তি ভঙ্গ করে চীন কর্তৃক পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষাকরণ এবং এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র প্রতিবাদ এবং উত্তর-কোরিয়া কর্তৃক পরমাণু-অস্ত্র সম্পর্কে পুনরায় কোনো আলোচনায় যোগ না-দেওয়ার ঘোষণা।
- এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইরান এবং ইরাকের ক্ষেত্রে 'শাস্তিমূলক নীতি' গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বৈতনীতির আশ্রয় নেয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক দুটি প্রধান আঞ্চলিক বিবাদ সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়। এর একটি উত্তর-কোরিয়ার বিরুদ্ধে, অন্যটি ইরাকের বিরুদ্ধে।
- চীন এবং ভারতের সঙ্গে জোট গঠনের নিমিত্তে ইরানের রাষ্ট্রপতির আহ্বান, 'যার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে শলাপরামর্শ করা হবে'।
- জার্মানরা সাংঘাতিকভাবে শরণার্থী দমনে নতুন আইন প্রণয়ন করে যাবে।
- রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলৎসিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট লিওনিচ ক্রাভচুকের মধ্যে কৃষ্ণসাগরে যুদ্ধজাহাজ চলাচলসহ অন্যান্য বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়।
- বাগদাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমাবর্ষণে পশ্চিমাশক্তির সক্রিয় সমর্থন

ছিল, কিন্তু নির্বিশেষে সকল মুসলিম রাষ্ট্র এ-ঘটনার নিন্দা করে এবং এ-ঘটনা আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈতনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সুদানকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং মিশরের শেখ ওমর আবদেল রহমান ও তাঁর অনুসারীদের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা, মার্কিন ভাষায় তারা 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি শহুরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দিয়েছে।'
- পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক এবং স্লোভাকিয়ার ন্যাটো (NATO) জোটে অন্তর্ভুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।
- ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচার করা হয় যে, রাশিয়া একটি ছিন্ন রাষ্ট্র যার মানুষ এবং এলিটগণ জানে না যে তারা কী করবে; তারা পশ্চিমাবিশ্বকে সমর্থন দেবে নাকি তার বিরোধিতা করবে।

শীতলযুদ্ধের প্রথমদিকে কানাডার রাষ্ট্রহিতৈষী লেসটার পিয়ারসন অপাশ্চাত্য সমাজের পুনরুত্থানের ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'এটি হবে অহেতুক যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, নতুন রাজনৈতিক সমাজগুলো জন্ম নিচ্ছে প্রাচ্যে আর তা পশ্চিমের মতো সেখানে কার্বনকপি হবে বরং সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যগুলো ওই দেশকে নতুন অবস্থায় নিয়ে যাবে।' তিনি বলেন যে, 'ভবিষ্যৎ সমস্যা সৃষ্টি হবে একটি বিশ্বের সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নয়, বরং তা হবে এক সভ্যতার সঙ্গে অন্য সভ্যতার মধ্যে।' [১৭] শীতলযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং দ্বিধাবিভক্তি পিয়ারসনের বক্তব্যের বাস্তবতাকে পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র; শীতলযুদ্ধাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতার শক্তি দ্রুত জেগে ওঠে যা তিনি ১৯৫০-এর দশকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং বলাবাহুল্য, বিশ্বের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং বিশ্বরাজনীতির ধারা বিশ্লেষণের স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৮] যারা বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী, তাদের প্রতি কারন্যান্ড ব্রাউডেল বক্রভাবে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যে-কেউ বিশ্বমানচিত্র নিয়ে কাজ করতে চান, তাকে জানতে হবে কীভাবে এটি নিয়ে কাজ করতে হয়। যে মানচিত্রের উপর আজ বিশ্বসভ্যতা দণ্ডায়মান, তাদের সীমানা নির্ধারণ করতে হবে তাদের কেন্দ্র ও চৌহদ্দিসমূহ, তাদের প্রদেশ এবং যে বায়ুদ্বারা তারা শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় তা সহ সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট 'ধরন' যা তার সাথে সম্পর্কিত সবই জানতে হবে। অন্যথায়, সেখানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।'[১৯]

অধ্যায় - ২

সভ্যতাসমূহ : ইতিহাসে এবং বর্তমানে

সভ্যতাসমূহের প্রকৃতি

মানবেতিহাস মূলত সভ্যতার ইতিহাস। মানুষের মানবিক দিকগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিহাস ভিন্ন অন্যকোনোভাবে বা পদবাচ্যে চিন্তা করার উপায় নেই। মানবসভ্যতার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্কের গল্প প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত প্রলম্বিত করা যায়। এটি সুমেরু এবং মিশরীয়, ধ্রুপদী, মেসো আমেরিকান হতে খ্রিস্টীয় এবং ইসলামি সভ্যতা এবং সেসঙ্গে সিনিক ও হিন্দুসভ্যতা পর্যন্ত বিস্তৃত। অতীত ইতিহাস থেকেই সভ্যতাসমূহ মানুষের বৃহত্তর পরিচয় প্রদান করে আসছে। ফলে উদ্ভবের কারণসমূহ, উত্থান, পরস্পরক্রিয়া, সাফল্য, পতন এবং সভ্যতার ধ্বংস ইত্যাদি বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিকগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতজনের মধ্যে ম্যাক্স ওয়েবার, এমিলি ডার্কহেইম, ওসওয়ার্ড স্পেংলার, প্রিটিরিম সবোকিন, আরনল্ড টয়েনবি, আলফ্রেড ওয়েবার, এ.এল. ক্রোয়েবার, ফিলিপ বগবি, ক্যারল কুইংগলি, রাসটন কাউলবর্ন, ক্রিসটোফার ডাউসন, এস. এন. আইজেনস্টান, ফার্নান্ড ব্রাউটেল, উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনেইল, আদ্দা ব্রেজিম্যান, ইমানুয়েল ওয়ালার স্টেইন এবং ফিলিপি ফার্নোভেজ আমেস্টো[১]-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এইসব বিজ্ঞজনেরা বিপুল আয়তনের জ্ঞানগর্ভ এবং পরিশীলিত রচনা তৈরি করেছেন যার দ্বারা তুলনামূলকভাবে সভ্যতার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করা যায়। বিষয়বস্তুর পদ্ধতিগত দৃষ্টিনিক্ষেপণ, ধারণাগত দিক থেকে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তারপরও তাদের সকলের কাজের দ্বারা সভ্যতাসমূহের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, স্বাতন্ত্র্য, গতিশীলতা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রথমত, কোনো একক সভ্যতা ও সভ্যতাসমূহের মধ্যে 'সভ্যতা' সম্পর্কিত বিস্তর ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি চিন্তাবিদদের চিন্তায় প্রকাশ পায় মূলত বর্বরতন্ত্র (বারবারিজম) শব্দটির বিপরীত শব্দ হিসেবে। সভ্যসমাজ আদিম সমাজের চেয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক: বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠিত রূপ, শহুরে জীবনধারা এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা মানবসমাজের বিচারে। সুসভ্য হওয়া যেমন উত্তম, তেমনি অসভ্য হওয়া অধম। সভ্যতার

ধারণা একটি মানদণ্ড বিশেষ, যা দিয়ে কোনো সমাজকে বিচার করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা বুদ্ধিবৃত্তিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে নিজেদেরকে যে পর্যায়ে নিয়ে যায়, অ-ইউরোপীয়গণ এ অবস্থাকে 'সুসভ্য' বলে গণ্য করে। বিশেষ করে ইউরোপীয় প্রভাব ও বলয়াবদ্ধ দুনিয়ার ধারণা সেরকমই ছিল। একই সঙ্গে মানুষ কিন্তু সভ্যতার বহুমাত্রিকতা নিয়েও কথা বলতে শুরু করে। এর অর্থ হল : 'সভ্যতা সম্পর্কে স্বীকৃতিকে আদর্শ বলে গণ্য করা হয়, কিংবা আদর্শ বলে মনে করা হয়।' এভাবে সুসভ্যতা কী সে-সম্পর্কে এর প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে আসা ব্রাউডেল-এর প্রবচনের মাধ্যমে একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায়, যেমন : 'সমগ্র সমাজের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ বা গোষ্ঠীই মানবতার নামধারী হিসেবে পরিচিত এবং তারা এলিট।'

অন্যদিকে, এমন অনেক সভ্যতা রয়েছে যার প্রত্যেকটি সভ্যতা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে আছে। সভ্যতার একবাচনিক রূপে সভ্যতা 'তার বৈশিষ্ট্য কিছুটা হারিয়েছে' এবং 'বহুবাচনিক' অবয়বের সভ্যতা হয়তো একবাচনিক ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ অসভ্যতার মতো।[২] আলোচনা থেকে বলা যায়, সভ্যতার বহুবাচনিক দিকই গ্রহণযোগ্য এবং বলাবাহুল্য, সভ্যতার বহুবাচনিক দিকই এ বইয়ে মূল আলোচ্য বিষয়। যদিও সভ্যতার একবচন ও বহুবচনের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বহাল রাখাই যুক্তিযুক্ত। সভ্যতার একবাচনিক দিক তখনই যথার্থ বলে মনে হবে, যখন এটির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী একটি 'সর্বজনীন' সভ্যতার জন্ম নেবে। এ যুক্তির হয়তো শেষ রক্ষা নাও হতে পারে, কিন্তু এটি যা ধারণ করে তা এগিয়ে নেবার দরকার রয়েছে। এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে আদৌ 'সভ্যতা' সামনের দিনগুলোতে 'অসভ্য' হবে নাকি 'সুসভ্য' হবে।

দ্বিতীয়ত, জার্মানির বাইরে সভ্যতা হল সাংস্কৃতিক সত্তা। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান চিন্তাবিদগণ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য যন্ত্র, প্রযুক্তি এবং বস্তুগত বিষয়াবলি। অন্যদিকে, সংস্কৃতি; যেখানে থাকে একটি সমাজের মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা, উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক শৈল্পিক অবস্থা, নৈতিক গুণাবলি। জার্মানির এই চিন্তা জার্মানিতে টেকসই হলেও অন্যত্র তা গৃহীত হয়নি। কিছুসংখ্যক নৃবিজ্ঞানী সংস্কৃতিতে আদিম সমাজের মধ্যকার বিষয়াদিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তাঁদের মতে সংস্কৃতি অপরিবর্তিত গ্রামীণ সমাজের সত্তা, অথচ শীঘ্রই তা জটিল হতে থাকে। উন্নয়ন, শহুরে ধাঁচ এবং গতিশীল সমাজের অংশ হিসেবে সভ্যতা পরিচিত হতে লাগল। তাহলে দেখা যায়, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ভেতর একটি পার্থক্যরেখা রয়েছে জার্মান-বহির্ভূত বিশ্বে। কিন্তু ব্রাউডেল বলতে চান 'এটি বিভ্রান্তিমূলক যে, জার্মানগণ সংস্কৃতিকে সভ্যতা থেকে পৃথক ভাবেন।'[৩] সে যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই কিন্তু মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা ও জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ এবং একথাও সত্য যে, সভ্যতাও একটি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি বা নির্দেশ। সভ্যতা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠানাদি, চিন্তাচেতনার ধরন-ধারণ ইত্যাদি যা একটি প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে।[৪] ব্রাউডেল সভ্যতা বলতে বুঝেন 'একটি স্থান', একটি 'সাংস্কৃতিক এলাকা', 'সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়াদির সংগ্রহশালা, যাতে

থাকে নিজস্ব সত্তা'। ওয়ালেরস্টেইন বলতে চান, 'এটি হল বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধকরণ, যার ভেতর থাকে প্রথাসমূহ, কাঠামোগুলো এবং সংস্কৃতি (বস্তুগত অর্থেও) এর প্রকারগুলো ঐতিহাসিকভাবে একটি সামগ্রিকতা গঠন করে থাকে, যা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার সত্তার সঙ্গে একত্রে সহাবস্থান করে।' সভ্যতা হল, ডাউসন-এর মতে, 'নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কর্তৃক মৌলিক সাংস্কৃতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিশেষ।' অন্যদিকে ডার্কহেইম এবং মাউসি'র মতে, 'এটি হল একপ্রকার নৈতিক পরিবেশ, যা একটি জাতিকে বেষ্টন করে থাকে। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি আসলে একটি বৃহত্তর সংস্কৃতির খণ্ডিত অংশ মাত্র।' স্পেংলার-এর মতে 'সভ্যতা হল সংস্কৃতির অপরিহার্য গন্তব্যস্থান... ।'

প্রাচীন গ্রিকসভ্যতার এথেন্স-এর বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য। সাংস্কৃতিক উপাদান সভ্যতার সংজ্ঞায়নে বিবেচ্য হতে পারে। গ্রিসের এথেনীয়দের সেই বক্তব্য যা দিয়ে তারা শঙ্কামুক্ত হতে চেয়েছিল স্পার্টানদের নিকট থেকে; যখন তারা তাদের বলেছিল যে, স্পার্টানরা যেন পারসিয়ানদের বিরুদ্ধ ইস্যুতে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে এথেন্স এবং স্পার্টা যেন ভাই ভাই।

রক্তের সম্পর্ক, ভাষা, ধর্ম, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি নগররাষ্ট্র বিভক্ত গ্রিসীয় জীবনে সকলের জন্য প্রায় একইরূপ ছিল, যা তাদেরকে (সমস্ত গ্রিকদের) সম্মিলিতভাবে পারস্য এবং অন্যান্য অ-গ্রিসীয়দের নিকট থেকে করেছিল পৃথক।[৬] যে সকল উপাদান একটি সভ্যতা গঠনে ভূমিকা রাখে, তার মধ্যে সম্ভবত ধর্ম হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এথিনীয়রা তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিল। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিশ্বের সকল প্রধান সভ্যতার সঙ্গে কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধর্মের সংযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে মানুষের আত্মপরিচয়ের বেলায় নৃগোষ্ঠীগত ও ভাষাগত ঐক্য থাকলেও ধর্মের অনৈক্য তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়। এরকম ঘটনা লেবানন, পূর্বতন যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘটতে দেখা গিয়েছে।[৭]

মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধের পার্থক্যের নিরিখে সভ্যতার প্রকারভেদের সঙ্গে বস্তুগত বা প্রাকৃতিক ধারা উৎসারিত বিষয়, যেমন কুলপরিচয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সভ্যতা ও কুলপরিচয়ের বিষয় দুটি সর্বতোভাবে একরূপ নয়। একই কুলবংশপরিচয়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সভ্যতায় বিভক্ত হতে পারে। অন্যদিকে, ভিন্ন ভিন্ন কুলবংশের মানুষ আবার একই সভ্যতার পতাকার নিচে একত্রিত হতে পারে। বড় বড় মিশনারি ধর্ম, যেমন খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম সমাজের বিভিন্ন কুলবংশপরিচয়ের মানুষকে একত্রিত করতে পেরেছে।

অবশ্য, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একত্মবোধের সংকটের মূলে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আর তা হল তাদের মূল্যবোধ, বিশ্বাসসমূহ, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি, সমাজকাঠামো ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তাদের দৈহিক গড়ন, মাথার আকৃতি বা গাত্রবর্ণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তৃতীয়ত, সভ্যতা বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেননা, সভ্যতার কোনো উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনকারী সভ্যতাসমূহের

আঙ্গিকেই সভ্যতার বিষয়টি বুঝতে হয়। টয়েনবি সভ্যতা সম্পর্কে যা দেখেন, তা হল 'অন্যান্যদের দ্বারা বুঝে ওঠার পূর্বেই উপলব্ধি করার মতো'। সভ্যতা হল একটি 'সামগ্রিকতা'। মেলকো সভ্যতা সম্পর্কে বলতে চান, সভ্যতা হল কিছু মাত্রার সংগতিপূর্ণ অবস্থা। এর গঠিত উপাদানসমূহ পরস্পরের আঙ্গিকে এবং বৃহত্তরভাবে সামগ্রিকতার দৃষ্টিতে নিরূপণ করতে হয়। যদি সভ্যতা কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়, তবে সেইসব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজন আছে, এবং বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগের চেয়ে সমসভ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অধিক কার্যকর। হয়তো রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতরভাবে সংঘাত ও কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার তৎপরতায় মনোনিবেশ করতে হবে। তারা একে অপরের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। হয়তো সেখানে পরিব্যপ্ত, নান্দনিক এবং দার্শনিকোচিত বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।[৯] সভ্যতা হল সর্বোচ্চ এবং বিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক সত্তা। গ্রাম, অঞ্চল, নৃজাতিগোষ্ঠী, জাতীয় পরিচয়সমূহ, ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ—প্রত্যেকটি একটি পৃথক সাংস্কৃতিক উপাদান এবং বিভিন্ন মাত্রিক সাংস্কৃতিক তথা বহুমাত্রিকতার মধ্যে সভ্যতার পরিচয় মেলে। দক্ষিণ ইটালির একটি গ্রামীণ সংস্কৃতি ইটালীয় উত্তরাঞ্চলের কোনো গ্রামের সংস্কৃতি থেকে পৃথক, কিন্তু তারপরও কিন্তু একথা সত্য যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বৃহত্তরভাবে ইটালীয় সভ্যতার মধ্যে তারা একীভূত এবং সেসঙ্গে বলা যায়, ইটালির উক্ত উভয় গ্রামের সংস্কৃতি কিন্তু জার্মানির গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে পৃথক। ইউরোপীয় কমিউনিটি সম্মিলিতভাবে যে 'সাধারণ সংস্কৃতি' বহন করে, তা অবশ্যই চীনা বা হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি থেকে পৃথক। চীনা, হিন্দু এবং পাশ্চাত্য সম্প্রদায় কেউই কোনো বৃহত্তর সংস্কৃতির অংশ নয়, তারা বড়জোর সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং বলা চলে, সভ্যতা হল মানবসমাজের সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সেই মানবসম্প্রদায় সভ্যতার মাধ্যমেই যে সংস্কৃতি গড়ে তোলে তা তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করে। সভ্যতাকে কিছু সাধারণ লক্ষ্য ও উপাদান দ্বারা চিহ্নিত করা যায়; যেমন ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম, প্রথাসমূহ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং মানুষের বিশেষ আত্মপরিচয় দেবার মতো বিধানসমূহ। মানুষের আত্মপরিচয়ের একটি স্তর থাকে; যেমন রোমের প্রেসিডেন্ট নিজেকে 'রোমান' বলেই পরিচয় দেবেন, যদিও তিনি একই সঙ্গে একজন ইটালিয়ান, একজন ক্যাথলিক, একজন খ্রিস্টান, একজন ইউরোপিয়ান, একজন পাশ্চাত্যের মানুষ। সুতরাং, সভ্যতা হল একটি 'বৃহত্তর আমরা' যার ভেতর দিয়ে তারা অন্যান্যদের থেকে নিজেদের পৃথকভাবে এবং অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব মানুষ মনে করে থাকে।

সভ্যতার সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ জড়িত থাকে। যেমন চৈনিক সভ্যতা, অথবা খুবই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সভ্যতা, যেমন এঙ্গেলাফোন ক্যারিবিয়ান। মানবেতিহাসের সকল পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে খুবই ক্ষুদ্র জনসম্প্রদায়ের পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকলেও তারা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়নি। এই পুস্তকের মাধ্যমে সাধারণভাবে চিহ্নিত মানবেতিহাসের উল্লেখযোগ্য সভ্যতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সভ্যতার পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত কোনো সীমানা নেই, এবং সত্যিকথা বলতে কী এর কোনো সুনির্দিষ্ট শুরু বা শেষও নেই। মানুষের পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে, এর ফলে সভ্যতারও পরিবর্তন আসতে পারে। মানুষের সভ্যতা পরস্পর ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে ডিঙিয়ে যেতেও পারে। যেসব বিষয়গুলোর দ্বারা সংস্কৃতি ও সভ্যতা গঠিত বা পুনর্গঠিত হয় সেগুলোর মধ্যে ভিন্নতা আসা ও একটিকে অন্যটি ছাড়িয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

চতুর্থত, সভ্যতা মরণশীল, কিন্তু দীর্ঘজীবী; সভ্যতা বিকশিত হয়, খাপখাইয়ে নেয় এবং মানবসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : সভ্যতার সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা থাকে। মোটামুটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সভ্যতা এগিয়ে যায়। এজন্য বলা চলে, সভ্যতার গল্পই পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম গল্প। সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন আছে, সরকার আসে এবং যায়, সভ্যতা টিকে থাকে এবং 'টিকে থাকে এর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি মতাদর্শিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত'।[৯] বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যতা হয় সহস্রবর্ষ টিকে থাকবে, অথবা লাটিন আমেরিকার মতো তা নতুন সভ্যতার সন্তান প্রসবের ভেতর দিয়ে দীর্ঘজীবী হতে চাইবে। সভ্যতা যখন দুঃখকষ্টের মধ্যে নিপতিত হয় তখনও সভ্যতা বিকশিত হয়। গতিশীলতা হল সভ্যতার আর একটি গুণবাচক দিক। সভ্যতার উত্থান এবং পতন আছে, সভ্যতা অন্যকিছুর ভেতর বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং এর বিভক্তি ঘটতে পারে। ইতিহাসের যে-কোনো শিক্ষার্থীই জানেন সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে; সময়ের বালুকার অতলে সভ্যতার কবর রচনাও হতে পারে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তন বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে ঘটতে পারে। কুইগলি (Quigley) বিষয়টিকে সাতটি স্তরে ভাগ করে দেখতে চেয়েছেন, যথা : মিশ্রণ, ইঙ্গিত, সম্প্রসারণ, সংঘাত, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, ক্ষয় এবং বহিরাক্রমণ। মেলকো (Melko) একটি মডেল প্রদান করেছেন যাতে বলা হয়েছে, সভ্যতা পরিবর্তন হয়ে অস্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছ পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যথা, স্বচ্ছ সামন্ততন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রের ভেতর দিয়ে স্বচ্ছ রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর, স্বচ্ছ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে স্বচ্ছ সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় রূপান্তর। টয়েনবি (Toynbee) মনে করেন যে, সভ্যতা আসলে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য আবির্ভূত হয়। তারপর তা কালের আবর্তে ক্রমবিকশিত হয় এবং তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টায় অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় কর্তৃক সৃষ্ট অসুবিধাগুলো দূর করতে সচেষ্ট থাকে যা পরবর্তীতে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত এবং পরিশেষে খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। যখন উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তখন তত্ত্বসমূহ থেকে জানা যায় যে, সভ্যতাসমূহ স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত অতিক্রম করে তা একটি সর্বজনীনতার দিকে এগিয়ে যায় কার্যত ধ্বংস ও খণ্ডবিখণ্ডিত হওয়ার জন্য।[১১]

পঞ্চমত, সভ্যতা হল সাংস্কৃতিক সত্তা, তবে রাজনৈতিক নয়। সভ্যতা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, কর আদায় করবে, যুদ্ধে অংশ নেবে, চুক্তির

মধ্যস্থতা করবে, অথবা এইসব কাজ করবে যা সাধারণত সরকার করে থাকে, এমনটি আশা করা যায় না।

সভ্যতার সঙ্গে রাজনীতির একত্রীকরণ বা সংমিশ্রণ বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্নরূপে ও প্রকারে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং তা সময়ের আবর্তে পরিবর্তনশীল। অতএব, একটি সভ্যতা একটি বা একাধিক রাজনৈতিক 'একক' ধারণ করতে পারে। এই 'একক' হতে পারে নগররাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমূহের সংঘ, জাতিরাষ্ট্রসমূহ, বহুজাতিক রাষ্ট্র ইত্যাদি, যা একটি থেকে অন্যটি মাত্রা ও গুণগত দিক থেকে পৃথক। একটি সভ্যতা কখনও স্থির থাকে না বরং তা বিকশিত হয়। সুতরাং, সভ্যতার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্তন সাধারণত ঘটে থাকে সভ্যতার গঠিত রাজনৈতিক উপাদানসমূহের মধ্যে। একটু কড়া ভাষায় বলা যায়, একটি সভ্যতা ও একটি রাজনৈতিক একক 'একবিন্দুতে' মিলে যেতে পারে। লুসিয়ান পাই (Lucian Pye) বলেছেন, 'চীন হল এমন একটি সভ্যতা যা একটি রাষ্ট্র বলে ভান করে থাকে। জাপান হল একটি সভ্যতা যা প্রকারান্তরে একটি রাষ্ট্রও বটে।'[১২]

প্রায় সকল সভ্যতা এক বা একাধিক রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক একক ধারণ করে থাকে। আধুনিক বিশ্বে প্রায় সকল সভ্যতাকেই দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের আঙ্গিকে থাকতে দেখা যায়। পরিশেষে, পণ্ডিতজনেরা বর্তমান বিশ্বের প্রধান সভ্যতাগুলোর পরিচয় সম্পর্কে সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। বিশ্ব-ইতিহাসে কতগুলো সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল সে-বিষয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কুইগলি যুক্তি দেখান যে, ইতিহাসে ১৬টি সভ্যতার পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে সম্ভবত আরও ৮টি সভ্যতাকে অতিরিক্তভাবে যুক্ত করা যায়। টয়েনবি (Toynbee) বলতে চান এ সংখ্যা ২১টি, তারপর তিনি আবার বলেন, সংখ্যা আসলে ২৩টি। স্পেংলার মাত্র ৮টি প্রধান সভ্যতার কথা স্বীকার করে থাকেন। ম্যাকনিল বিশ্বের ৯টি সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ব্যাগবাই (Bagby) মাত্র ৯টি সভ্যতার কথা বললেও পরে বলেন : যদি জাপান, আর্থোডক্স ও চীনকে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে ভিন্ন ধরা হয়, তবে সভ্যতার সংখ্যা দাঁড়াবে ১১টিতে। ব্রাডভেলও মাত্র ৯টি সভ্যতাকে চিহ্নিত করেছেন। আর রোসটোভনই ৭টি সভ্যতার কথা বলেছেন, যা বর্তমান বিশ্বে বজায় রয়েছে।[১৩]

সভ্যতা চিহ্নিতকরণে এই পার্থক্য কেন? কারণ হল, কোথাও কোথাও চীন এবং ভারতকে একক সভ্যতা হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়ে থাকে। অথবা আরও দু-একটি সভ্যতার কথা বলা হয়, যা ওই বৃহৎ সভ্যতার শেকড়বাকড় বিশেষ। এ পার্থক্যের পরও বলা যায়, বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলো একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এ প্রসঙ্গে মেলকো (Melko) সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, 'যুক্তিসঙ্গত চুক্তি', যা কমপক্ষে ১২টি সভ্যতার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, তন্মধ্যে ৭টি এখন টিকে নেই, যেমন মেসোপটেমিয়ান, মিশরীয়, ক্রিটান, ধ্রুপদী, বাইজানটাইন, মধ্যআমেরিকান, এনডেন এবং ৫টি, যেমন চৈনিক, জাপানি, ভারতীয়, মুসলিম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনও জীবিত ও সক্রিয় রয়েছে।[১৪] একাধিক পণ্ডিতজন আর্থোডক্স

রুশসভ্যতাকে তার জনকতুল্য বাইজানটাইন পশ্চিমি খ্রিস্টীয় সভ্যতা থেকে পৃথক করে দেখতে আগ্রহী। এই ৬টি সভ্যতা আমাদের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেসঙ্গে লাটিন আমেরিকান ও আফ্রিকান সভ্যতাও সংযুক্ত।

আমরা বর্তমান বিশ্বের সভ্যতাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে দেখতে পারি :

সিনিক (Sinic) : পণ্ডিতজন চীনের দুটি ভিন্নধর্মী সভ্যতার অস্তিত্বের কথা বলেছেন যা খ্রিস্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব হতে শুরু হয়েছে। এ দুটি সভ্যতার মধ্যে একটি শুরু হয়েছে খ্রিস্টের যুগ থেকে। এই সভ্যতাটিকে আমি (হানটিংটন) *'Foreign Affaris'* নামের লেখায় কনফুসিয় সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

এই সভ্যতাটিকে 'সিনিক' সভ্যতা বলাই অধিকতর সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। কনফুসিয়াস-এর মতবাদ চৈনিক সভ্যতার একটি বড় অংশ। চৈনিক সভ্যতা কিন্তু বাস্তবে কনফুসিয় মতবাদ থেকেও বৃহৎ ও বিস্তৃত, যা চীনকে একটি রাজনৈতিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছে। সিনিক শব্দটি অনেক পণ্ডিতজনদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, যার ভেতর দিয়ে চীনের জনগণের সাধারণ সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এবং এর সঙ্গে মিল রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ, যেমন ভিয়েতনাম এবং কোরিয়া।

জাপানি : কোনো কোনো পণ্ডিতজন 'একটি একক' দূরপ্রাচ্যের সভ্যতার দৃষ্টিতে জাপানি ও চৈনিক সভ্যতাকে এক করে দেখে থাকেন। অনেকেই জাপানি সভ্যতাকে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ বরং জাপানি সভ্যতা হচ্ছে চৈনিক সভ্যতার ডালপালা, যার আগমন ঘটেছিল এবং তা ঘটেছিল ১০০ সালে এবং ৪০০ সালে।

হিন্দু : বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত এক বা একাধিক ক্রমাগত চলমান সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকেই ছিল। এটি ছিল ইন্ডিয়ান, ইন্ডাস অথবা হিন্দু এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত তা এই 'হিন্দু' নামটিই ধারণ করে আছে। যে-কোনোভাবেই হোক না কেন, বিগত সহস্রাব্দে হিন্দুধর্ম উপমহাদেশের সবচেয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রভাবশালী কৃষ্টি হিসেবে কাজ করেছে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলা হয় 'এটি ধর্মের চেয়েও বৃহৎ অথবা এটি একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা এটি উপমহাদেশের সভ্যতার সবচেয়ে 'কোর' বিষয়।'[১৫] আধুনিক হিন্দুধর্ম তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রেখেছে, যদিও ভারতে একটি বড় অংশ মুসলমান ও অন্যান্য ছোটখাটো সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী দ্বারা ভারত পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। সিনিক-এর মতো, 'হিন্দু' শব্দটি নিজে একটি সভ্যতা হিসেবে পরিচিত হয়, যা রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে পৃথক।

ইসলামি : ইসলাম যে একটি স্বতন্ত্র ধরনের সভ্যতা তা প্রধান প্রধান পণ্ডিতজনই মেনে নিয়েছেন। সপ্তম শতাব্দীতে আরবিয় এলাকায় এই ধর্মের সূচনা হয় এবং দ্রুত তা উত্তর আফ্রিকা, ইবেরিয়ান উপদ্বীপসহ পূর্বদিকে এশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণএশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে ইসলামিক সভ্যতার ভেতর বিভিন্ন উপ-সভ্যতা, যেমন আরবিয়, তুর্কি, পার্শীয়, মালয় প্রভৃতি যুক্ত হয়ে রয়ে যায়।

পাশ্চাত্য : সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু হয়েছিল বলে ধরে

নেয়া হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার তিনটি মূল অংশ রয়েছে বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করে থাকেন, যথা : ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও লাটিন আমেরিকা।

লাটিন আমেরিকা : লাটিন আমেরিকার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে, যা পাশ্চাত্যজগৎ থেকে তাকে পৃথক করে। যদিও লাটিন আমেরিকার সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার একটি সন্তান তবুও লাটিন আমেরিকায় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সভ্যতার বাইরে নিজস্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এখানকার সংস্কৃতি কর্তৃত্বমূলক এবং অংশত বাধ্যবাধকতাপূর্ণ, যে সংস্কৃতি ইউরোপে আংশিক উপস্থিত থাকলেও উত্তর আমেরিকায় মোটেই নেই। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল এবং সেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় মতের সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল : লাটিন আমেরিকায় শুধুমাত্র ক্যাথলিক সংস্কৃতি রয়েছে। লাটিন আমেরিকার সভ্যতা নিজভূমির আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তৈরি হয়েছে যা ইউরোপে নেই। তবে লাটিন আমেরিকার সংস্কৃতি সর্বত্র একরূপ নয়। মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা, পেরু এবং বালিভিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে আর্জেন্টিনা, চিলি এবং অন্যান্যদের সংস্কৃতির মিল এবং অমিল উভয়ই রয়েছে। লাটিন আমেরিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর ইত্যাদি উত্তর আটলান্টিক দেশসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক। লাটিন আমেরিকার অধিবাসীগণ মনোগতভাবে একে অন্যদের থেকে আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিভক্ত। কেউ বলে, 'হ্যাঁ, আমরা পশ্চিমের অংশ বিশেষ।' অন্যরা দাবি করেন, 'না, আমাদের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং আরো রয়েছে ব্যাপক ও বিস্তৃত সাহিত্যসামগ্রী, যার দ্বারা লাটিন আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার পার্থক্য চিহ্নিত হয়।'[১৬]

লাটিন আমেরিকাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপসভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা যায় নতুবা পৃথক সভ্যতা, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার অতিনিকটবর্তী এবং তারা নিজেরাই দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত এ-প্রশ্নে যে, তারা কি পৃথক না পাশ্চাত্যের অন্তর্ভুক্ত। বলা যায়, আসলে তারা পাশ্চাত্যের প্রভাববলয়ের অধীনস্থ সভ্যতার ধারক ও বাহক।

পাশ্চাত্য বলতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, সেইসঙ্গে ইউরোপীয়দের দ্বারা বসতিস্থাপনকৃত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে বুঝায়। পাশ্চাত্যের দুটি প্রধান গঠিত উপাদান কালের আবর্তে পরিবর্তিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকানরা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই তাদের সমাজ গঠন করেছিল। আমেরিকায় ছিল স্বাধীনতা, সাম্য, সুযোগসুবিধা ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎসহ বসবাসের স্থান; অন্যদিকে ইউরোপ ছিল নিপীড়িত, শ্রেণীসংগ্রাম, পুরোহিততান্ত্রিক এবং পশ্চাৎপদ। আমেরিকার একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। আমেরিকা এবং ইউরোপের সিদ্ধ বলে ধরে নেয়া বিরোধের ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি আমেরিকা অপাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে খুবই স্বল্পসংখ্যক যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। যখন আমেরিকা বহিঃবিশ্বের সন্ধানে বের হল তখন থেকে তাদের বৃহত্তর পরিচয় বিশ্বের মধ্যে ইউরোপের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল।[১৭] অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা ইউরোপের বিরুদ্ধে নিজেকে পৃথক পরিচয়ে পরিচিত করতে সক্ষম হয়। আর বিংশ

শতাব্দীতে আমেরিকা নিজেকে বিশ্বপরিমণ্ডলে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

'পাশ্চাত্য' শব্দটি এখন সর্বজনীনভাবে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে খ্রিস্টীয় জগৎ বলা হয়। বিশ্বে এই একটি সভ্যতা রয়েছে, যা কম্পাস নির্দেশনার মতো এবং যা কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, ধর্ম, অথবা ভৌগোলিক সীমারেখার আবদ্ধ নয়। ফলে এ সভ্যতা ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উর্ধ্বে থেকে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে। ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুতপক্ষে ইউরোপীয় সভ্যতা। আধুনিক সময়ে সে-অবস্থার অবসান হয়ে এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা কিন্তু ইউরোপীয় এবং উত্তর আটলান্টিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর আটলান্টিক অঞ্চল মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া গেলেও 'পাশ্চাত্য' কিন্তু কোনোপ্রকার মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'পাশ্চাত্য' শব্দটি আরও একটি ধারণাকে জাগিয়ে তুলেছে, আর তা হল 'পাশ্চাত্যকরণ' এবং এভাবে বিভ্রান্তিকর অবস্থা, যথা 'পাশ্চাত্যকরণ' ও 'আধুনিকীকরণের' উদ্ভব ঘটেছে। জাপানকে সহজেই 'পাশ্চাত্যকরণকৃত' বলা যায়, যতটা না যায় ইউরোপীয়-আমেরিকাকরণ। ইউরোপীয়-আমেরিকান সভ্যতা হল সর্বজনগ্রাহ্য এবং নির্দেশিত পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং যদিও এ শব্দটির মধ্যে সারবত্তার সাংঘাতিক অভাব রয়েছে তবুও এ পুস্তকে তা ব্যবহার করা হবে।

আফ্রিকা (সম্ভাব্য) : ব্রাউডেল ব্যতীত সভ্যতা সম্পর্কিত অন্যান্য পণ্ডিতজন আফ্রিকাকে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা বলে মানতে নারাজ। আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে বলা যায়, ইথিওপিয়ার নিজস্ব সভ্যতা রয়েছে। আফ্রিকার অন্যত্র ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী থাবার কারণে পশ্চিমা সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচ, ফরাসি এবং ইংরেজ বসবাসকারীগণ একটি বহুধা চরিত্রের ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।[১৮] আরও একটি গুরুত্বহ দিক হল এই যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধারা আফ্রিকায় ও সাহারায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আফ্রিকার সর্বত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচয় খুবই স্পষ্ট এবং সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এর পরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, আফ্রিকার সামগ্রিক পরিচয়ের চেতনাও এখানে কাজ করে চলেছে। তবে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে সাবসাহারা এগিয়ে যেতে চায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা একটি 'কোর' রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

ধর্ম হল সভ্যতার একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয়। এ বিষয়ে ক্রিস্টোফার ডাউসন বলেন, 'প্রধান ধর্মগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রধান সভ্যতাসমূহের ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে থাকে।'[১৯] ওয়েবারের মতে পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে চারটি, যেমন খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম এবং কনফুসীয়বাদ সরাসরি প্রধান প্রধান সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত। ৫মটি, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কিন্তু এমনটি হওয়ার অর্থ কী? ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের মতো প্রথমদিকে বৌদ্ধধর্ম দুটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টধর্মের মতো তা তার নিজস্ব জন্মভূমিতে টিকে থাকতে বা প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। প্রথম শতাব্দীর শুরুতে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চীনে রপ্তানি হয় এবং পরবর্তীতে তা কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং জাপানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এসব সমাজে

বৌদ্ধধর্ম নিজের ক্ষমতাবলে গৃহীত এবং আত্তীকৃত হয় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীনে এজন্য কনফুসীয় ও টয়ইজম নিপীড়িত হয়েছিল। কিন্তু যদিও বৌদ্ধধর্ম তাদের কৃষ্টির একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়, কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে, ওইসব দেশের সমাজ বৌদ্ধধর্মকে তাদের সভ্যতার অংশ হিসেবে পরিচিত করতে চায়নি। বৈধভাবেই যাকে 'দেরেভেদা' বৌদ্ধসভ্যতা আখ্যা দেয়া যায় তা শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস এবং কম্বোডিয়ার রয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, ভুটান প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিকভাবে লামাপন্থী মহারানা বৌদ্ধধর্ম একটি সমাজ গঠন করেছে, যাকে বৌদ্ধসভ্যতার দ্বিতীয় অবস্থা বলা চলে। এরপরও বলা সঙ্গত হবে যে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম একটি প্রধান ধর্ম হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেও তা সভ্যতা বির্নিমাণে কোনো ভূমিকা রাখেনি।[২০*]

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

শত্রুভাবাপন্ন সাক্ষাৎ : পনেরোশত শতাব্দী (১৫০০ শতাব্দী) পূর্ববর্তী সভ্যতা

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আগে দুটি পর্যায়ে ব্যক্ত করা হলেও বর্তমানে তা তিনটি ধারায় ব্যক্ত করা হয়। সভ্যতাসমূহের প্রথম আবির্ভাবের প্রায় তিন হাজার বৎসর পরে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন, যোগাযোগ হয় একেবারেই ছিল না, আবার কখনও কখনও তা ছিল প্রগাঢ়। এসব সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্ব-ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, সে-সম্পর্ক ছিল শত্রুভাবাপন্ন।[২১] সভ্যতাসমূহ স্থান এবং কালভেদে একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। স্বল্পসংখ্যক সভ্যতা মাত্র বিশেষ সময়ে সজীব ছিল এবং কার্যত সেখানে একের অপরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয় ছিল। বেনজামিন সোয়ার্জ এবং স্যামুয়েল আইজেনড্যাট যুক্তি দেখান যে, 'এক্সিয়াল' এবং 'এক্সিয়াল পূর্ব' যুগের সভ্যতাসমূহকে যদি পৃথক সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া বা না-দেয়ার প্রশ্ন আসে, তবে সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, তা ছিল যথাক্রমে 'অলৌকিক' এবং 'ইহজাগতিক নিয়ম' এ দুটি ধারার অধীনে।

এক্সিয়াল যুগে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্নধারায় বৈসাদৃশ্য নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর দ্বারা অলৌকিক কল্পকাহিনীর বিষয়টি প্রচার করা হত। পরবর্তীতেও এ ধারা চলমান

---

* ইহুদি সভ্যতা সম্পর্কে কী বলা যায়? সভ্যতা সম্পর্কিত বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়ে পূর্বে কমই উল্লেখ করেছেন। ইহুদি ধর্মাবলম্বী লোকদের দ্বারা তেমন কোনো বাস্তবসম্মত প্রধান সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিক টয়েনবি এ সভ্যতাকে "বন্দিত্ব" বা "থামিয়ে দেয়া" সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যে সভ্যতা মূলত প্রথমদিকে সিরীয় সভ্যতার জঠর থেকে বিকশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে এটি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং একথাও সত্য যে, কয়েক শতাব্দী ধরে ইহুদিরা পাশ্চাত্য অর্থোডক্স এবং ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টির সঙ্গে ইহুদিরা একটি সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, যেমন ধর্ম, ভাষা, মূল্যাবোধ, সাহিত্য, প্রতিষ্ঠানাদিসমূহ এবং একটি ভূমি ও একটি নিজস্ব রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পেয়ে যায়। কিন্তু মনোজাগতিক বিষয়গুলো কেমন ছিল? ইহুদিবাদ ও ইসরায়েল নামসর্বস্ব ইহুদিবাদ হয়ে উঠেছে। কারণ তারা যেখানে বসবাস করেছে সেখানকার সভ্যতা দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে এবং কার্যত পশ্চিমাদেশে তারা পশ্চিমা সভ্যতা দ্বারাই জীবনাচার গড়ে তুলেছে।

থাকে, এদের মধ্যে 'ইহুদিদের নবি এবং পুরোহিতগণ, গ্রিক দার্শনিক এবং সফিস্ট সম্প্রদায়, চৈনিক বোদ্ধাগণ, হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সংঘ এবং ইসলামি ওলেমা সম্প্রদায়' বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[২২] কোনো কোনো অঞ্চলে দুই কিংবা তিন প্রজন্ম একটানাভাবে সভ্যতার প্রতি অধিভুক্ত থেকেছে; তারপর ওই সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে, কিংবা মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ অন্য প্রজন্ম সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। ২.১-এ রেখাচিত্রের (ফিগার) মাধ্যমে এই রেখাচিত্রটিতে (ক্যারল কুইগলি [Carrol Quigly] কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) ইউরোএশিয়ার প্রধান সভ্যতাসমূহের সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সভ্যতাসমূহ আবার ভৌগোলিকভাবেও পৃথক হয়েছে। ১৫০০ সাল পর্যন্ত এনডিয়ান (Andean) এবং মেসোআমেরিকার সভ্যতাসমূহের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগাযোগ ছিল না, বা তাদের পরস্পরের মধ্যেও কোনো সংযোগ ছিল না।

অবশেষে নীলনদের তীর বেয়ে এবং টাইগ্রিস, পূর্ব ইউফ্রেটিস, ইনডাস এবং ইয়োলো রিভার বরাবর যে সভ্যতাসমূহ গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ মোটেও ছিল না। ক্রমশ পূর্ব মেডিটেরানিয়ান, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তরভারতের বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল সীমিত আবর্তের মধ্যে। কারণ, সভ্যতাসমূহের ভৌগোলিক দূরত্বকে যোগাযোগব্যবস্থা দ্বারা জয় করা দুরূহ ছিল। মেডিটেরানিয়ান এবং ভারত মহাসাগরের জলপথের ভেতর দিয়ে কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। বুদ্ধি-বিবেচনা এবং প্রযুক্তি এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু প্রায়শই তার জন্য শত শত বৎসর লেগেছে। সম্ভবত যুদ্ধের মাধ্যমে না ছড়িয়ে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক শক্তিতে চীন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল উত্তরভারতে তার উৎপত্তির ৬শত বৎসর পরে। চীনে মুদ্রণশিল্প অষ্টম শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় এবং স্থানান্তরযোগ্য টাইপমেশিন একাদশ শতাব্দীতে আবিস্কৃত হয়, কিন্তু ওই প্রযুক্তি ইউরোপে যায় পনেরোশ শতাব্দীতে। তাছাড়া দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনে কাগজ আবিষ্কৃত হলেও তা সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে চালান হয় এবং পরবর্তীতে তা মধ্যএশিয়ায় যায় অষ্টম শতাব্দীতে; উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে দশম শতাব্দীতে; স্পেন-এ পৌঁছেছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে আর উত্তর ইউরোপে যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। চীনে বারুদ আবিষ্কৃত হয়েছিল ৯ম শতাব্দীতে, অথচ আরবে তা কয়েক বৎসর পর বিতরণ করা হলেও ইউরোপে বারুদ পৌঁছে চর্তুদশ শতাব্দীতে।[২৪]

আসলে সভ্যতার পারস্পরিক যোগাযোগের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটতে থাকে তখন, যখন একটি সভ্যতার মানুষের দ্বারা অন্য একটি সভ্যতা রাজ্যজয়ের মাধ্যমে পদানত হতে থাকে। সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার এহেন সংযোগ ছিল সহিংস, তবে সংক্ষিপ্ত এবং তা থেমে থেমে ঘটতে দেখা যায়। ৭ম শতাব্দীতে আপেক্ষিকভাবে অধিক স্থায়ী এবং অর্থবহ আন্তঃসভ্যতার মধ্যে মূলত ইসলাম ও পশ্চিমাবিশ্ব আর ইসলাম ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসাবাণিজ্য, সাংস্কৃতিক, সামরিক কর্মকাণ্ডের পরস্পর ক্রিয়া বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভারত এবং চীন যথাক্রমে কখনও কখনও মোগল এবং মঙ্গোলদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল; কিন্তু

আবার উভয় সভ্যতাই বিশাল সময় 'যুদ্ধরত রাষ্ট্র হিসেবে' নিজেদের অভ্যন্তরস্থ সভ্যতাসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তেমনি গ্রিসের অধিবাসীরা পার্সিয়ান বা অন্যান্য অ-গ্রিসীয়দের সঙ্গে যত যুদ্ধ করেছে, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধ করেছে নিজেদের মধ্যে।

অভিঘাত : পাশ্চাত্যের উদয়

ইউরোপের খ্রিস্টান জগৎ একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা হিসেবে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয় এবং বেশ কয়েকশত বৎসর তার সমমানের অন্যান্য সভ্যতাসমূহকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। চীনে ট্যাং সাং এবং মিং রাজবংশের শাসনকাল, ৮ম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামি বিশ্ব এবং ৮ম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজানটাইন শাসন সম্পদে, ভূখণ্ডে, সামরিক শক্তিতে, শৈল্পিক দৃষ্টিতে ও অর্জনে, কি সাহিত্যে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকে ইউরোপকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২৫] একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতি উন্নত হতে শুরু করেছিল এবং এটিও ঘটেছিল 'উন্নততর ইসলামি এবং বাইজানটাইন সভ্যতার সক্রিয় সহযোগিতার কারণে'। এই একই সময়ে হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান, বাল্টিক তীরে খ্রিস্টানধর্মের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। রোমান আইনসহ ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যান্য দিকগুলো এখানে প্রসারিত হয় এবং পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে প্রাচ্যের সীমানা স্পষ্ট হতে থাকে।

১২শ শতাব্দী থেকে ১৩শ শতাব্দীতে পশ্চিমারা স্পেন-এর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং সেইসঙ্গে মেডিটেরানিয়ান এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে অবশ্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রসারতা ইউরোপের প্রথম সমুদ্রপাড়ের দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণকে ব্যর্থ করে দেয়।[২৬] তবুও ১৫০০ সালের দিকে রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি উন্নত হতে থাকে; সামাজিক ক্ষেত্রে বহুত্ববাদিতা, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, প্রযুক্তিগত অর্জন ইত্যাদি একটি নতুন বিশ্বপরিস্থিতি ও সে-সম্পর্কিত রাজনীতির উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। এরপর ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যকে আর পেছনে যেতে হয়নি। তারা সামনে এগিয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য সভ্যতার বিবিধ ধারা ইউরোপের একক ধারার দিকে ধাবিত হতে থাকে। বিশ্বসভ্যতাসমূহের ওপর পশ্চিমি বিশ্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

১৫০০ শতাব্দীর শেষের দিকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ মোরস (Moors)-এর নিকট থেকে জয় করে নেয়া হয়। পর্তুগিজেরা এশিয়ায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত করে। আর অন্যদিকে স্প্যানিশরা আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। পরবর্তী দুইশত পঞ্চাশ বছরে প্রায় পশ্চিম গোলার্ধের সবটুকুসহ এশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ ইউরোপীয়দের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের প্রত্যক্ষ শাসনের ও প্রভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপর হেইতিও অনুরূপ ঘটনা ঘটায়। অতঃপর প্রায় সমগ্র লাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ইউরোপের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে এবং ফলস্বরূপ তারা স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যায়, কেননা তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকার

প্রায় সর্বত্র থাবা বিস্তারে সক্ষম হয়। এশিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশসহ অন্যান্য এলাকার ওপর আধিপত্য পাকাপোক্ত করে ফেলে। আরও দেখা যায়, কেবলমাত্র তুরস্ক ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ইউরোপীয়রা বা ইউরোপীয় কলোনির মাধ্যমে (আমেরিকাসহ) ১৮০০ সালে বিশ্বের সমগ্র ভূখণ্ডের শতকরা ৩৫ ভাগ ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিল। দেখা যায়, ১৮৭৪ সালে তারা শতকরা ৬৭ ভাগ ভূমি নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৯১৪ সালে এ প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮৪ ভাগে। অটোমান সাম্রাজ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হওয়ার জের হিসেবে ১৯২০ সালে বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয় বলয়ের শতকরা মাত্রা ও ভাগ আরও বেড়ে যায়। ১৮০০ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় ১.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে বিস্তৃত ছিল, যার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ মিলিয়ন। ১৯০০ সালে ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের যুগে বলা হত যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে 'সূর্য অস্ত যায় না'। তখন ১১ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল ভূমি এবং ৩৯০ মিলিয়ন মানুষ এই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল।[২৭] ইউরোপীয় সভ্যতার এই আগ্রাসী প্রসারের ফলে আদতে এনডিয়ান ও মোসোআমেরিকান সভ্যতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; ইসলামি, আফ্রিকান ও ভারতীয় সভ্যতা সংকুচিত হয় এবং অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আর চৈনিক সভ্যতার ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয় এবং এতে করে চৈনিক সভ্যতাও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে তার অধীনস্থ হয়ে যায়। শুধুমাত্র রুশ, জাপানি এবং ইথিওপীয় সভ্যতা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় প্রতিরোধের শক্ত দেয়াল তৈরি করতে সক্ষম হয়। এভাবে তারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছিল। প্রায় চারশত বৎসর যাবৎ সভ্যতাসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নে দেখা যায়, অন্যান্য সভ্যতাও পাশ্চাত্যের অধীনস্থ ছিল।

সভ্যতার প্রশ্নে এই অনন্য এবং নাটকীয় পরিবর্তন ও উন্নয়নের কারণ খুঁজতে গেলে তাকে ইউরোপীয় সমাজকাঠামো এবং শ্রেণীসম্পর্কের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া নগরায়ন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার, রাজতন্ত্রের আপেক্ষিক ক্ষমতা হ্রাস, ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় কর্তৃত্বের সম্পর্ক, জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে আমলাতন্ত্রের অপরিহার্যতা ও তার আগমন ইত্যাদি উক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল মূলত প্রযুক্তিগত। সমুদ্রপথে দূরের মানুষের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের প্রযুক্তি এবং সামরিক শক্তির প্রসার প্রকৃতপক্ষে ইউরোপকে অন্যান্য এলাকা দখলে আনতে সাহায্য করেছে। জিওফ্রি পার্কার বলেন, 'পাশ্চাত্যের উদ্ভব কার্যত শক্তির ওপর নির্ভর করেই ঘটেছে। সত্যিকথা হল, সামরিক শক্তির ভারসাম্য পাশ্চাত্যের পক্ষে ছিল, যতটা না ছিল অবশিষ্টদের পক্ষে।' এর ওপর নির্ভর করে পাশ্চাত্য জগৎ অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর ১৫০০ সাল থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে প্রথমবারের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং এ ঘটনাকে তাই বলা যায় 'সামরিক বিপ্লব'। অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের কারণ হিসেবে তাদের সাংগঠনিক উৎকৃষ্টতা, নিয়মানুবর্তিতা, সামরিক বাহিনীর উন্নততর প্রশিক্ষণকে বিবেচনা করা যায়। এসব কারণে পশ্চিমাদের হাতে চলে এসেছিল উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, যোগাযোগপ্রযুক্তি, সামরিক বাহিনী চলাচল ও অবস্থানের ক্ষেত্রে সুনিশ্চয়তা, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি, আর এসবই ছিল শিল্পবিপ্লবের ফল।[২৮]

পশ্চিমারা বিশ্বকে পদানত করতে পেরেছিল তাদের উন্নত চিন্তাচেতনা বা ধর্মবোধ দিয়ে নয় বরং এটি সম্ভব হয়েছিল তাদের যুদ্ধবিগ্রহে পরিচালনার সুদক্ষতার কারণে। এ সত্যটি পাশ্চাত্য বিশ্ব প্রায়শই ভুলে যায়, আর অপাশ্চাত্যের মানুষ এটি ভুলতে চায় না।

মানবেতিহাসের যে-কোনো সময়ের চেয়ে ১৯১০ সালের দিকে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক বিশিষ্ট অবস্থায় চলে এসেছিল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল, এমনকি এর পরিমাণ ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকের প্রায় সমকক্ষ ছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ছিল পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।[২৯] সভ্যতা বলতে তখন পশ্চিমা সভ্যতাকেই বুঝানো হত। আন্তর্জাতিক আইন বলতে হুগো গ্রোসিয়াস প্রদত্ত ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমা আন্তর্জাতিক আইনকেই বুঝানো হত। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও ছিল মূলত পশ্চিমাবিশ্বের প্রদত্ত ব্যবস্থা; কিন্তু 'সুসভ্য জাতিরাষ্ট্র' এবং 'উপনিবেশিত ভূখণ্ড' তারা একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করত।

১৫০০ সালের পরে পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক নির্ধারিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার এই আবির্ভাব ছিল বৈশ্বিক রাজনীতির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। আরও একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তা হল, পশ্চিমাবিশ্ব অপাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বমূলক ও অধীনস্থ করে রাখার মনোভাবের পরিচয় দিলেও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সমতা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ-ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। কেননা, একই সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমতা নীতি চীন, ভারত এবং গ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা গিয়েছিল। তারা ছিল একই বা সমরূপ সংস্কৃতির অধীনস্থ; যেমন তাদের ভাষা, আইন, ধর্ম, ইতিহাস, প্রশাসনিক চর্চা, কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমি দখলীকরণ নীতি এবং সম্ভবত আত্মীয়তার গণ্ডি ছিল একই রূপ। ইউরোপের জনগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচয়ে বিভক্ত থাকলেও তারা 'একই রকম সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ অন্যান্য দিকেও তাদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি।'

অবশ্য তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং তারা তা করেছে কোনোপ্রকার শেষ পরিণতি ছাড়াই। তাছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে শান্তি ছিল নিয়মের ব্যত্যয় মাত্র।[৩০] যদিও ইউরোপের বিরাট অংশ, প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা অটোম্যান সাম্রাজ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত ছিল, তারা কখনও ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিল না।

প্রায় ১৫০ বৎসর কালব্যাপী ইউরোপের অভ্যন্তরীণ সভ্যতা ধর্মীয় মতভেদ এবং রাজবংশীয় ও তৎসম্পর্কিত যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। এরপর প্রায় আরও দেড়শত বৎসরকাল ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি পর্যন্ত পশ্চিমাবিশ্বের সংঘাত ছিল মূলত রাজপুত্র, সম্রাট, পরিপূর্ণ রাজা বা রানী এবং সাংবিধানিক রাজা বা রানী; তাদের আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী; তাদের ব্যবসাবাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির শক্তিসমূহ এগিয়ে নিতে এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে ভূখণ্ড তারা শাসন করত তা সম্প্রসারিত করতে চাইত। আর এ কারণে যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য হয়ে উঠত।

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের শুরুতে সংঘাতের প্রধান ধারা ছিল কিন্তু 'জাতি' 'রাজপুত্র' নয়। ১৭৯৩ সাল সম্পর্কে আর. আর. পালমার (R.R. Palmer) বলেন, 'রাজার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে; কিন্তু জনগণের যুদ্ধ সবে শুরু হল।'[৩১] উনবিংশ শতাব্দীর এই ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৯১৭ সালে রুশবিপ্লবের ফলে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সঙ্গে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরম্ভ হল। প্রথমে এটি ছিল ফ্যাসিজম, কম্যুনিজম, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত। পরবর্তীতে কম্যুনিজম ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে সংঘটিত হতে থাকল। শীতলযুদ্ধের সময় এ দুটি মতাদর্শ দুটি বৃহৎশক্তিশিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু, এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের কোনোটিই ইউরোপীয় গতানুগতিক অর্থে খাঁটি 'জাতিরাষ্ট্র' ছিল না। পর্যায়ক্রমে প্রথমে রাশিয়া, তারপর চীনে এবং শেষে ভিয়েতনামে মার্কসীয় শক্তি ক্ষমতায় আসার ফলে একটি উত্তরণপর্ব শুরু হল, যেখানে ইউরোপীয় দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গিয়ে দাঁড়াল ইউরোপ-পরবর্তী বহুধাবিভক্ত সভ্যতাকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়। মার্কসীয় দর্শন আসলে কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার পরিমণ্ডলে সৃষ্ট মতাদর্শ। কিন্তু ইউরোপে মার্কসবাদ শেকড় গাড়তে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, আধুনিকতামুখী এবং বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তনেচ্ছু এলিটগণ অপাশ্চাত্য সমাজের জন্য এটি মহৌষধ হিসেবে 'আমদানি' করে। লেনিন, মাউসেতুং এবং হু (HO)-ও নিজস্ব ধারায় নিজ নিজ দেশের ও সমাজে মার্কসবাদকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে, এবং তাঁরা তাদের দেশের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর এটি মনে করা সংগত হবে না যে, ওই দেশগুলো পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে বা তাদের দেশে পশ্চিমা ধাঁচের উদারগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে যাচ্ছে। অনেক পশ্চিমা চিন্তাবিদগণ তেমনি ঘটবে বলে মনে করে পরে হতাশ হয়েছেন। কেননা, তাঁরা দেখতে পেলেন ওই সকল দেশ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের নিজস্ব সভ্যতাকেই চাঙা করতে শুরু করল।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া : বহুআকারবিশিষ্ট বিশ্বসভ্যতা

বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের প্রবণতা দূর হতে থাকে এবং একমুখী সভ্যতার আধিপত্য শুরু হয়। বিগত শতাব্দীতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা বিলুপ্ত হতে থাকে।

প্রথমত, পাশ্চাত্যঘেঁষা ঐতিহাসিকগণের প্রিয় শব্দ 'পাশ্চাত্যের অনবরত প্রসার'-এর পরিসমাপ্তি ঘটতে থাকে এবং 'পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যাত্রা' শুরু হয়। দেখা গেল, এতদিনের অসমভাবে ব্যবহৃত পাশ্চত্যের ক্ষমতা অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ১৯৯০ সালের বিশ্বের মানচিত্র, ১৯২০ সালের বিশ্বমানচিত্রের সঙ্গে খুব কমই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। সামরিক শক্তির ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমাবিশ্ব এখনও অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি চালিয়ে গেলেও সত্যিকথা বলতে, অপাশ্চাত্যের সভ্যতাসমূহ নিজস্বধারায় বিকশিত হওয়ার কারণে পশ্চিমাপ্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আরও একটি বিষয় যোগ করতে হয়, আর তা হল

পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক প্রণীত ইতিহাস অবশিষ্ট বিশ্ব কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এমনকি প্রায় প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজস্ব ধারায় ইতিহাস তৈরি করতে শুরু করছে।

দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত কারণে যে ফলাফল ও অগ্রগতি অর্জিত হয়, তার প্রভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে তা পশ্চিমাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হতে শুরু করে এবং বিশ্ব ক্রমান্বয়ে বহুধাবিভক্ত সভ্যতার দিকে এগুতে থাকে। একইসঙ্গে, পশ্চিমাবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত যা শতাব্দীব্যাপী চলমান ছিল তা বর্ণহীন হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, পশ্চিমাবিশ্ব তাদের 'যুদ্ধ যুদ্ধ' মনোভাবসম্পন্ন রাষ্ট্রচরিত্র থেকে সরে আসতে থাকে। এভাবে পশ্চিমাবিশ্ব 'সর্বজনীন অবস্থার' প্রতি আকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার অধিকতর সুযোগ পায়। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদও তারা এই নবযাত্রার কোনো ফলপ্রসূ অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে সম্ভবত পশ্চিমাবিশ্বের ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার নামে প্রায় আন্তর্জাতিকভাবে বিভক্ত হয়ে থাকার অবস্থাটি অনেকটা দায়ী। এ-ধরনের বিভক্ত অবস্থা এবং তাদের গঠিত উপাদানসমূহ এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নানাধরনের জটিলতার সৃষ্টি করেছে। পূর্বের আন্তর্জাতিক অবস্থা ছিল মূলত সাম্রাজ্যের অবয়বে আবদ্ধ।

গণতন্ত্র হল পাশ্চাত্য ধাঁচের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, তাই নতুন আবির্ভূত পাশ্চাত্য সভ্যতা সাম্রাজ্যনির্ভর না হয়ে বরং যুক্তরাষ্ট্রীয়, কনফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংগঠননির্ভর হয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে একটি সর্বজনীন সভ্যতার পদযাত্রার ধ্বনি শ্রুত হতে থাকে।

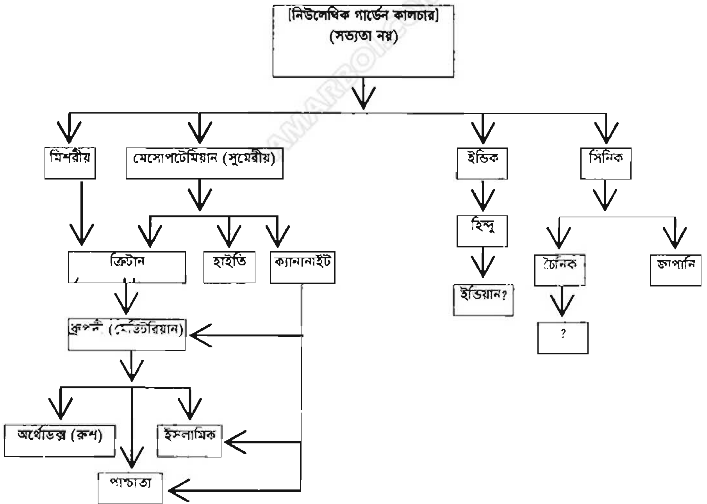
বিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক গণতন্ত্র, রক্ষণশীলবাদ, জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিজম, খ্রিস্টীয় গণতন্ত্র, বাণিজ্যতন্ত্র ইত্যাদি। এ সকল কিছুরই কিন্তু উদ্ভব ঘটেছে পাশ্চাত্য বিশ্বে। অন্যকোনো সভ্যতা এমন রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্ম দিতে পারেনি। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, পশ্চিমাবিশ্ব কোনো প্রধান ধর্মের জন্ম দেয়নি। তা হলে দেখা যায়, বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলো অপাশ্চাত্য সভ্যতার জঠরে জন্ম নিয়েছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তার জন্ম হয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার পূর্ববর্তী সময়ে।

তা হলে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, বিশ্ব এখন পশ্চিমাবলয়ের বাইরের পানে ছুটে চলেছে। পশ্চিমা সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে পরিচিত আদর্শগুলো বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে দিনদিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। আর ধর্মীয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো তার স্থান দখল করে চলেছে। এভাবে অপাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। ওয়েস্টফালিয়ন (Westphelian) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বা অন্যভাষায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে ধর্মকে বাদ দেবার প্রচেষ্টা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে। অন্যদিকে তার স্থলে ধর্ম জোরদার হচ্ছে। তাই এডওয়ার্ড মরটিমার বলেন, 'ধর্ম ক্রমাগত আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি করছে।'[৩২] বিশ্বে এখন বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আর তেমন সুযোগ নেই। কারণ, রাজনৈতিক

মতাদর্শ এখন গৌণ বিষয়। কিন্তু তার স্থলে বিশ্ব বিভিন্ন সভ্যতার ও তার অন্তরস্থ ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বৈশ্বিক রাজনৈতিক ভূগোল এখন ১৯২০ সালের 'এক বিশ্বতত্ত্ব', ১৯৬০ সালের 'তিন বিশ্বতত্ত্ব' থেকে ১৯৯০ সালে এসে বলতে গেলে 'অর্ধডজন বিশ্বতত্ত্বের' কবলে নিপতিত হয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে ১৯২০ সালের সহগামী 'বিশ্ব সাম্রাজ্য', 'মুক্ত বিশ্বের' নিকট নিমজ্জিত হয়ে যায় (এ অবস্থায় অপাশ্চাত্য বিশ্বের অনেক দেশই কম্যুনিজমকে অস্বীকার করেছিল), তবে ১৯৯০-এর দশকে নিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য ধারা ওইসব দেশের ওপর প্রভাব বজায় রেখেছে। আক্ষরিকভাবে বলা যায়, এই পরিবর্তন ঘটেছিল বিশ্বে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে, যখন মতাদর্শিক অর্থে ব্যবহৃত মুক্তবিশ্ব, কার্যত পশ্চিমাবিশ্ব দ্বারা দ্রুত অপসারিত হচ্ছে (দেখুন টেবিল নং ২.১)। আরও দেখা যায় যে, ইসলাম একটি সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে এগিয়ে আসছে। তাছাড়া বৃহত্তর চীন, রাশিয়া এবং এর নিকটতম বিদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ সবকিছুই সভ্যতা ধারণ করে আছে।

ফিগার (রেখাচিত্র) ২.১
পূর্ব গোলার্ধের সভ্যতাসমূহ



Source : Carrol Quigley, the evolution of Civilizations. An Introduction of Historical Analysis (Indianapolis : Liberty Press, 1979) 2nd ed. 1979, p-83

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এই তৃতীয় পর্যায় পূর্বের যে-কোনো সময়ের চাইতে সুগভীর, যা প্রথমপর্যায়ে ততটা ছিল না, অথবা সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নিমিত্তে চালিত দ্বিতীয় পর্যায়েও তত ছিল না। তদুপরি, শীতলযুদ্ধের মতো কোনো একক বিভেদ সৃষ্টিকারী সত্তা পুরো বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারছে না বরং বিবিধ প্রকারের অনৈক্য বা ফাটল বজায় থাকছে পশ্চিমাবিশ্ব ও অপাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে।

টেবিল ২.১
শব্দের ব্যবহার
'মুক্তবিশ্ব' এবং 'পশ্চিমাবিশ্ব'

	সূত্র নম্বর ১৯৮৮	১৯৯৩	% সূত্রের পরিবর্তন
নিউইয়র্ক টাইমস			
মুক্ত বিশ্ব	৭১	৪৪	—৩৮
পশ্চিমাবিশ্ব	৪৬	১৪৪	+২১৩
ওয়াশিংটন পোস্ট			
মুক্ত বিশ্ব	১১২	৬৭	—৪০
পশ্চিমাবিশ্ব	৩৬	৮৭	+১৪২
কংগ্রেসের রিপোর্ট (রেকর্ড)			
মুক্ত বিশ্ব	৩৫৬	১১৪	—৬৮
পশ্চিমাবিশ্ব	৭	১০	+৪৩

Source : Lexis/Nexis. Reference numbers are numbers of stories about or containing the terms "free world" or "the west". Reference to "the west" were reviewed for contextual appropriateness to ensure that the term referred to "the west" as a civilization or political entity.

হেডলি বুল (Hedley Bull) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বহাল থাকায় প্রশ্নে বলেছেন : 'যখন দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরস্পর অংশ নেয় এবং এমনভাবে আচরণ করে থাকে যাতে মনে হয় তারা সবাই একটি 'পরিপূর্ণ' ব্যবস্থার 'অংশ' হিসেবে কাজ করছে।' একটি আন্তর্জাতিক সমাজ বলতে বুঝায়, যখন তাদের 'পরস্পর স্বার্থ, দৃষ্টিভঙ্গি একরূপ থাকে এবং ওই 'সাধারণ' বিষয়ে তারা একত্রিত হয় এবং তারা সবাই একই ধরনের বিধিনিষেধের আওতাধীন হয়, একই প্রতিষ্ঠানিক ধারায় একত্রে কাজ করে থাকে এবং সর্বোপরি তাদের মধ্যে থাকে একটি 'সাধারণ' কৃষ্টি বা সভ্যতাবোধ।'[৩৩] সুমেরীয়, গ্রিক, হেলেনিস্টিক, চৈনিক,

ভারতীয় এবং ইসলামি ধারায় চালিত পূর্ববর্তী নেতৃত্বকে এবং বলা যায়, সতেরো শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিভূ। সতেরোশো সাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সভ্যতার ওপর প্রভাব রেখেছিল। ইউরোপের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ও তার ব্যবহার অন্যান্য দেশে 'রপ্তানি' হয়ে গিয়েছিল। তবুও ওইসব সমাজে এখন পর্যন্ত ইউরোপীয় ধারায় কোনো সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্ব মোতাবেক বিশ্ব হল একটি উত্তমভাবে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা; কিন্তু সমাজ হল প্রাচীন ধারার কবলে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংঘ।

প্রত্যেক সভ্যতাই নিজেকে পৃথিবীর 'সভ্যতার কেন্দ্র' বলে মনে করে থাকে এবং তারা সেভাবেই তাদের সভ্যতার ইতিহাস লিখে থাকে। এ কথাটি সম্ভবত অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে পশ্চিমাজগতের সভ্যতার জন্য অধিক সত্য। 'একক সভ্যতার মাহাত্ম্য' সম্পর্কিত এ মনোভাব অধুনা বিশ্বে ক্রমাগত হ্রাস পেতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা, এখন বিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার চেতনাগুলো ধারালো হচ্ছে এবং সভ্যতার 'এককত্বের' পরিবর্তে 'বহুত্ব' ধারা বেশি অগ্রগামী হচ্ছে। সভ্যতা সম্পর্কিত বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন এবং বলাবাহুল্য, সভ্যতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তনকে তারা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করে থাকেন। ১৯১৮ সালে স্পেংলার পশ্চিমাবিশ্বের দ্বারা প্রভাবিত যুগগুলোকে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিক ধারায় বিভক্ত করার কার্যক্রমকে অদূরদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, এটি কেবলমাত্র পশ্চিমাজগতের জন্য বড়জোর সত্য হতে পারে। এর কিছুকাল পর টয়েনবি দেখান যে, পশ্চিমাবিশ্বের 'সংকীর্ণতার ধৃষ্টতা' আসলে অহংবোধের ভ্রম বৈ কিছু নয় এবং বিশ্ব ওইপথেই চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান, যেখানে মনে করা হয় 'অপাশ্চাত্য বিশ্ব স্থবির বা অপরিবর্তনীয়' এবং সেখানে 'অগ্রগতি' আনার দরকার রয়েছে। স্পেংলারের ন্যায় তিনি ইতিহাসের সমন্বয় বা ঐক্যের বিষয়ে কোনো পূর্বধারণা করেননি, যেখানে ধারণা করা হয় 'সভ্যতার নদী একটিই যা আমাদের নিজস্ব।' এ ছাড়া অন্যান্যদের সভ্যতার দাবি যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা সেখানে নদীর কোনো স্বাধীন প্রবাহ নেই, থাকলেও তা মরুভূমির বালুকায় পথ হারিয়ে বা শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।[৩৫] টয়েনবির পঞ্চাশ বছর পরে ব্রাউডেল বলেন যে, বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বুঝতে হলে জগতের সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং বহুধাবিভক্ত সভ্যতার বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। এ সকল পণ্ডিত যেসব ভ্রম এবং কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ, মনে করা হয়ে থাকে যে, ইউরোপীয় সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সেরা এবং সর্বজনীন সভ্যতা।

অধ্যায় - ৩

সর্বজনীন সভ্যতা?
আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ

সর্বজনীন সভ্যতার অর্থ

ভি. এস. নাইপাল বলেন : 'সর্বজনীন সভ্যতা'র আবির্ভাব ঘটছে। কিন্তু এ শব্দের অর্থ কী দাঁড়ায়? সাধারণভাবে এর অর্থ : মানবতার সম্মিলনের সংস্কৃতি এবং বিশ্বব্যাপী সাধারণ মূল্যবোধ, বিশ্বাস, পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিতিকরণ প্রক্রিয়া, রীতি, প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, সর্বজনীন সভ্যতা বলতে যা বুঝায়, তা প্রগাঢ় কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক। আবার বিপরীতভাবে তা কিছু অপ্রাসঙ্গিক কিন্তু প্রগাঢ় নয়। আবার কিছু আছে যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অগভীর।

প্রথমত, সকল সমাজের মানবজাতি নির্বিশেষে কার্যত কিছু মৌলিক মূল্যবোধ ধারণ করে থাকে যেমন হত্যাকে সকলেই পাপকাজ বলে মনে করে থাকে। তাছাড়া পরিবারের মতো প্রতিষ্ঠান মানবসমাজে সর্বত্র এবং সকলের জন্যই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমরূপ 'নৈতিক বোধ', যেমন কোন্‌টি সঠিক বা কোন্‌টি সঠিক নয় সে-সম্পর্কে একটি ন্যূনতম মাত্রার চিন্তা কাজ করে থাকে। এই বিষয়টিকে যদি 'সর্বজনীন সভ্যতা' বলে মনে করা হয়, তবে তা হবে অবশ্যই সুগভীর এবং প্রগাঢ়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি কোনোক্রমেই নতুন বা প্রাসঙ্গিক নয়। যদি মানুষ ইতিহাসের সকল পর্যায়ে সর্বত্র কিছু মৌলিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদি একইভাবে গ্রহণ করে থাকে, তবে তাকে মানুষের আচরণে ধ্রুব এবং স্থির বলে গণ্য করা চলে। একথাও সত্য যে, তা কখনও সে-ইতিহাসকে আলোকিত বা ব্যাখ্যা করে না যা মানুষের আচরণ বা স্বভাবগত পরিবর্তনকে ধারণ করে। আবার, সকল মানুষের জন্য যদি সর্বজনীন সভ্যতার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে আমরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সভ্যতাসমূহের জন্য কী ধরনের পরিচিতিমূলক শব্দ ব্যবহার করব? মানবগোষ্ঠী বিবিধ রকমের উপগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ

হয়ে পড়েছে, যেমন–উপজাতি, জাতি এবং বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, যাকে সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। যদি সভ্যতা শব্দটিকে উন্নীত করা হয়, এবং কেবলমাত্র সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য সাধারণ বিষয়াদিকে সভ্যতা বলা হয়, তাহলে সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বিভেদিত অবস্থাকে বুঝাবার জন্য নতুন শব্দ চর্চা করা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অথবা ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্বহীনতাকে প্রকাশ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভ্যাকলভ হাবেল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, 'আমরা এখন মাত্র 'একটি' বিশ্বসভ্যতার মধ্যে অবস্থান করছি।' 'এটি একটি অগভীর প্রলেপ ব্যতীত কিছু নয়', যা অসংখ্য বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয়বিশ্বসমূহ, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্য, সাধারণ বিশ্বসভ্যতা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছের অন্তরালে এ সবকিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদিকে আচ্ছাদন করছে বা গোপন করছে। 'সভ্যতা'কে সংকীর্ণ করে যদি শুধুমাত্র বৈশ্বিক উচ্চতায় সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং সংস্কৃতিসমূহ বা 'উপসভ্যতাসমূহ' নামগুলি যদি বৃহৎ সাংস্কৃতিক সত্তাগুলোর জন্য প্রয়োগ করা হয় তবে তা শুধুমাত্র শব্দার্থিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, 'সর্বজনীন সভ্যতা' শব্দটি দ্বারা যা বুঝায়, তা হল, সুসভ্য সমাজসমূহের ভেতর 'সাধারণ' বিষয়াদি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শহরাঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষা তাদেরকে আদিম সমাজ ও বর্বরদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক করে থাকে। এটি মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিভাষা। এবং এই ধারণাকে কেন্দ্র করে সর্বজনীন সভ্যতার আবির্ভাব হচ্ছে যা নৃতত্ত্ববিদদের আতঙ্কিত করছে, কারণ সভ্যতার এ সংজ্ঞা আদি জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে না। মানবেতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, সভ্যতার এ ধারণা সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সভ্যতার এই বিশেষ ধারণা সভ্যতার বহুজাতিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত, 'সর্বজনীন সভ্যতার' বিষয়টি কিছু ধারণাকে বহন করে, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ এবং মতবাদসমূহ যা বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্বের মানুষ ধারণ করে আছে এবং সেইসঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের কেউ কেউ ধারণ করে থাকেন। এ-ধরনের সংস্কৃতিকে সম্ভবত 'ড্যাভোস (Davos) সংস্কৃতি' বলা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৎসর কম করে হলেও হাজারখানেক ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, সরকারি কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ব-অর্থনৈতিক ফোরামে (World Economic Forum) যোগদানের উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ডের ড্যাভোস শহরে জমায়েত হয়। সম্মেলনে সমবেত হওয়া প্রায় সকলেরই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসাবাণিজ্য, আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি রয়েছে। তাছাড়া তাঁরা সকলেই ইংরেজিভাষায় কথাবলায় দক্ষ, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তা, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রায়শই এক দেশ থেকে অন্যদেশে ভ্রমণ করে থাকেন। তাঁরা সাধারণত

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদের তত্ত্ব বিশ্বাস করেন, বাজার অর্থনীতির সমর্থক, রাজনৈতিভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পূজারি। এসবই কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার মৌল বিষয়। ড্যাভোস-সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানাদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা, বিশাল আয়তনের অর্থনীতি, সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ড্যাভোস-সংস্কৃতি ব্যাপক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে, সারা বিশ্বব্যাপী কত মানুষ ড্যাভোস-সংস্কৃতির অংশীদার—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

পশ্চিমা দেশের বাইরে ড্যাভোস-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত সম্ভবত ৫০ মিলিয়ন মানুষ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১% ভাগ। এটি অবশ্যই বিশ্বজনীন সংস্কৃতি থেকে বহুযোজন দূরে। যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড্যাভোস-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা তাঁদের নিজেদের সমাজে ও দেশে খুব ভালো অবস্থানে নেই। হেডলি বুল বলেন, এই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি টিকে আছে 'কেবলমাত্র এলিটশ্রেণীর মধ্যে এবং অনেক সমাজে কূটনৈতিক পর্যায়েও এর শেকড় খুবই দুর্বল... এবং সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি বস্তুত সাধারণ নৈতিক সংস্কৃতি বা সাধারণ মূল্যবোধ কতটা ধারণ করে।'[৪]

চতুর্থত, আরও একটি ধারণা অগ্রবর্তী হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী ধরন এবং সারা বিশ্বব্যপী বিস্তৃত জনপ্রিয় সংস্কৃতি 'বিশ্বজনীন সভ্যতার' সৃষ্টি করছে। এই যুক্তি প্রগাঢ় বা প্রাসঙ্গিক নয়। সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অতীত ইতিহাস থেকে বর্তমান অবধি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়েছে। একটি সভ্যতা কর্তৃক ভালোকিছু আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত হলে তা আপনাআপনিই অন্য সভ্যতার দিকে চলে যায়। সভ্যতাসমূহের এই গ্রহণযোগ্যতায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রভাব থাকে না এবং এ সাংস্কৃতিক প্রবাহ গ্রহীতা সভ্যতাসমূহের প্রকৃত সংস্কৃতিকে একেবারেই পরিবর্তন করতে পারে না। সভ্যতা আমদানির বিষয়টি নির্ভর করে এর চাকচিক্য বা চাপিয়ে দেয়া নীতির ওপর। উদ্বেলিত হয়েছিল আগের শতকে পশ্চিমা দুনিয়া, চীনা বা ভারতীয় সংস্কৃতি জনপ্রিয় হয়েছিল; কারণ তারা পশ্চিমা শৌর্যবীর্যের প্রতিফলন নিজেদের ভেতর দেখেছিল। উনিশ শতকে চীন এবং ভারতে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক আমদানি 'পপ সংস্কৃতি' ও 'ভোগপণ্য সংস্কৃতি' পশ্চিমা সভ্যতার জয়ধ্বনি দিচ্ছে—এ ধারণা পশ্চিমা সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলশক্তি কিন্তু ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta); ম্যাগনা ম্যাক (Magna Mac) নয়। আসল সত্য হল, অপাশ্চাত্য সমাজের মানুষ 'ম্যাগনা ম্যাক'-এ কামড় বসায়, তবে এটি ম্যাগনা কার্টার গ্রহণ বুঝায় না।

ম্যাগনা ম্যাক গ্রহণ পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে মনোভাব-বিষয়ক কোনো ব্যঞ্জনা ও তার প্রকাশ করে না। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো স্থানে অর্ধডজন যুবক জিন্‌স (Jeans) পরিহিত হয়ে কোকাকোলা পান করে, র‍্যাপ শ্রবণ করে, কিন্তু তাদের আনুগত্য মক্কার প্রতি; আর আমেরিকার এয়ারলাইনে বোমা ছুড়তে তাদের চিত্ত দ্বিধাহীন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকানরা মিলিয়ন মিলিয়ন জাপানি মটোরজান ক্রয় করেছে, ব্যবহার করেছে জাপানি টেলিভিশন সেট, ক্যামেরা এবং অন্যান্য ইলেট্রোনিক্স দ্রব্যাদি; কিন্তু নিজেরা

'জাপানি' হয়নি এবং বাস্তবে তারা জাপানের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল। বিবেচনাহীন অহংবোধ থেকে পশ্চিমাবিশ্ব ধারণা করতে পারে যে, অপাশ্চাত্যের মানুষ 'পশ্চিমাপন্থী' হয়ে উঠবে যদি তারা পশ্চিমা ভোগ্যসামগ্রী পেয়ে যায়। এ অবস্থা বিশ্বকে কী বলে? পশ্চিমারা যখন তাদের সভ্যতাকে. গ্যাসযুক্ত পানীয়, রংচটা প্যান্ট, চর্বিযুক্ত খাদ্য এমন খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে এক করে ফেলে?

বিশ্বজনীন জনপ্রিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও কিছু পরিশীলিত যুক্তি দেবার চেষ্টা লক্ষ করা যায়; যা ভোগ্যপণ্যকেন্দ্রিক না হয়ে মিডিয়াকেন্দ্রিক বলে মনে হয়। অর্থাৎ কোকাকোলা সংস্কৃতির বদলে এখানে হলিউডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আমেরিকা-নিয়ন্ত্রিত ছায়াছবি, টেলিভিশন এবং ভিডিও শিল্প আসলে আমেরিকার এয়ারক্রাফট শিল্পকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমেরিকার তৈরি শত শত ছায়াছবি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রতি ১০০ ছায়াছবির ৮৮টি ছিল আমেরিকায় তৈরি। তাছাড়া দুটি আমেরিকান এবং দুটি ইউরোপীয় সংস্থা বিশ্বব্যাপী সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে প্রাধান্য বিস্তার করছে।[৫] এ অবস্থা মোটামুটি দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তুলে ধরে। প্রথম হল, সর্বজনীনভাবে মানুষের প্রেম, যৌনতা, সংহিসতা, রহস্যময়তা, সম্পদ, ব্যবসায় লাভজনক অবস্থান ইত্যাদি মানবিক ঝোঁকসমূহকে মার্কিনিরা তাদের নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার্থে ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত হল, বিশ্বব্যাপী ব্যাপক যোগাযোগব্যবস্থা যে মানুষের বিশ্বাস ও চেতনার ও সম্মিলন ঘটাচ্ছে এমন প্রমাণ মেলা দুরূহ।

মাইকেল ভ্ল্যাহোস (Michael Vlahos) বলেছেন : 'চিত্তবিনোদন' অর্থ সাংস্কৃতিক রূপান্তর বা পরিবর্তন নয়। তাছাড়া মানুষ 'যোগাযোগ' ধারণাটিকে নিজের পূর্বলব্ধ মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্বব্যাপী একই সময়ে প্রচারিত একই দৃশ্যমান চিত্রকল্প একেবারেই বিপরীতধর্মী ধারণা বা উপলব্ধির জন্ম দিতে পারে। পাশ্চাত্যের বসতঘর প্রশংসায় মেতে ওঠে, যখন তারা যোগাযোগমাধ্যমে বাগদাদে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে দেখে। পাশ্চাত্যের বাইরে মানুষ মনে করে পাশ্চাত্যবিশ্ব প্রয়োজনে প্রায় কালো ইরাকি এবং সোমালীয়দের সমুচিত শাস্তি দিতে দ্বিধা না-করলেও সাদা চামড়ার সার্বীয়দের শাস্তি দেয় না, যে-কোনো মাপকাঠিতেই এটি ভয়ংকর সংকেত।'[৬]

বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সাম্প্রতিককালে পশ্চিমাদের শক্তির অন্যতম প্রধান প্রদর্শন। ফলে পশ্চিমাদের এই আধিপত্যবাদী মনোভাব অপাশ্চাত্য সমাজের অনেক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিমুখী করে তুলছে।

সুতরাং, অবস্থা কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে গিয়েছে। যেভাবে বৈশ্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পশ্চিমাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে চলে গিয়েছে, এর মাধ্যমে যা প্রচার হচ্ছে তাতে কিন্তু অপাশ্চাত্য দেশসমূহ পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ মনোভাব সৃষ্টি করছে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে অপাশ্চাত্য সমাজে আধুনিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যত অঞ্চলভিত্তিক মিডিয়াশিল্প গড়ে উঠতে সাহায্য করছে, যার ভেতর দিয়ে তারা তাদের নিজেদের কৃষ্টি, সভ্যতা, মূল্যবোধ ঐতিহ্য প্রচার করছে।[৭]

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালে সিএনএন (CNN) ইন্টারন্যাশনাল আনুমানিক হিসাবে দেখায় যে, তাদের প্রায় ৫৫ মিলিয়ন সম্ভাবনাময় দর্শক রয়েছে, অথবা প্রায় শতকরা ১ ভাগ পৃথিবীর মানুষ এর দর্শক (ডেভোসের সংস্কৃতির সদস্যসংখ্যার প্রায় সমান)। সিএনএন-এর সভাপতি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, এদের ইংরেজি অনুষ্ঠানে দর্শকের সংখ্যা শতকরা ২ থেকে ৪ ভাগ। সুতরাং, আবার আঞ্চলিক ভাষায় (সভ্যতা সম্পৃক্ত) অনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবির্ভাব ঘটছে স্প্যানিশ, জাপানি, আরবি, ফরাসি (পশ্চিম আফ্রিকার জন্য) এবং অন্যান্য ভাষায় সম্প্রচার। তিনজন পণ্ডিত-এর মতে 'বৈশ্বিক সংবাদ কক্ষ' এখনও টাওয়ার অব ব্যাবেল-এর সাথে সংঘাতরত।[৮] রোনাল্ড ডোর আরেকটি হৃদয়গ্রাহী পরিস্থিতির কথা বলেছেন, যেখানে কূটনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের একটি সমশ্রেণীর বৃদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি জন্ম নিচ্ছে। তিনি উপসংহারে একত্রীভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন : 'অন্যান্য বিষয় যদি সমপর্যায়ের হয় তবে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক মিলন বিভিন্ন জাতির মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা কূটনীতিকবৃন্দের ভেতর সমঝোতা ও সহানুভূতি তৈরি করবে, কিন্তু যে বিষয়গুলি সমমান বা পর্যায়ের নয় সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে।'[৯]

ভাষা, এবং ধর্ম যে-কোনো সভ্যতার অথবা সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় উপাদান। যদি একক বিশ্বজনীন সভ্যতার বিকাশ হয়, তবে সর্বজনীন ভাষা ও ধর্মের বিকাশেরও একটা প্রবণতা থাকে। এই ধরনের দাবি বা মন্তব্য সবসময়ই ভাষার প্রতি সম্মান দেখিয়েই বলা হয়ে থাকে। 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' (*Wall Street Journal*)-এর সম্পাদক বলেন যে, "বিশ্বের ভাষা হল ইংরেজি।"[১০] এই বক্তব্যের দুটি দিক থাকতে পারে, যার একটি বৈশ্বিক সভ্যতাকে সমর্থন করবে। আর তা হল, বর্তমান বিশ্বে ক্রমান্বয়ে ইংরেজিভাষায় কথাবলা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এ বক্তব্যের পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং যে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তা ঠিক বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করে।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, (১৯৫৮-১৯৯২) পৃথিবীতে মোটের ওপর ভাষার ব্যবহারে তেমন কোনো নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়নি। বরং দেখা যায় ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ এবং জাপানি ভাষার ব্যবহার বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া মান্দারিন ভাষার ব্যবহারও পূর্বের চেয়ে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে হিন্দি, মালয়, ইন্দোনেশীয়, আরবি, বাংলা, স্প্যানীয়, পর্তুগিজ এবং অন্যান্য ভাষায় কথাবলা লোকের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। ১৯৫৮ সালে বিশ্বব্যাপী ইংরেজিভাষায় কথাবলা লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯.৮, কিন্তু ১৯৯২ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭.৬ ভাগে (টেবিল নং ৩.১ দেখুন)। এতে ইংরেজিতে কথাবলা লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১ মিলিয়ন

বিশ্বের মানুষের সংখ্যানুপাতে বিশ্বের পাঁচটি প্রধান পশ্চিমা ভাষায় (ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ) কথাবলা লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। যেখানে ওই ৫টি ভাষায় কথা বলত ১৯৫৮ সালে শতকরা ২৪.১ ভাগ, সেখানে ১৯৯২ সালে

হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২০.৮ ভাগে। ১৯৯২ সালে শতকরা ১৫.২ ভাগ মান্দারিন (উচ্চপদস্থ চীনা ভাষা) ভাষায় কথা বলত, শতকরা ৩.৬ ভাগ মানুষ বিভিন্ন প্রকারের চৈনিক ভাষায় কথা বলত (দেখুন টেবিল নং ৩.২)। এক অর্থে বলা যায়, যে-ভাষা পৃথিবীর ৯২ ভাগ মানুষের অজানা সেটি বিশ্ব-ভাষার পর্যায়ে পড়ে না। অন্যভাবে বলা চলে : ইংরেজিকে বিশ্ব-যোগাযোগের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যেত যদি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণ এটিকে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করত; এটি যদি পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগের একমাত্র ভাষা হত, বা ভাষাতত্ত্বের পরিভাষায় এটি যদি বিশ্বে ব্যাপক যোগাযোগের (Language of wider communication, LWC) প্রধান ভাষা হত।[১১] মানুষ যখন অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, তখন তারা একটা-না-একটা উপায় খুঁজে নেয়। এক্ষেত্রে দোভাষীর শরণাপন্ন হতে হয়, যাঁরা ভাষার অনুবাদকের কাজ করে থাকেন। এ-ধরনের ব্যবস্থা অর্থ এবং সময় দুই নষ্ট করে। সর্বোপরি এটি বিব্রতকর। আর এ কারণে ইতিহাসের প্রায় সকল পর্যায়ে 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' (Lingua Franca)-র আবির্ভাব ঘটেছে। লাটিন ভাষা প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ স্থান দখল করেছিল; ফরাসিভাষার আধিপত্য ছিল সোহালি এবং আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এবং ইংরেজি প্রায় সমগ্র বিশ্বে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। একে অপরের সাথে দক্ষ ও সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্য কূটনৈতিক, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, পর্যটক সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিমানচালক, বিমানচালনা নিয়ন্ত্রণকারীগণ-এর একটি ভাষা প্রয়োজন, যা অত্যন্ত কার্যকরভাবে সবাই ব্যবহার করতে পারে এবং বলাবাহুল্য, ইংরেজিভাষা সেই স্থান দখল করে নিয়েছে।

টেবিল নং ৩.১

প্রধান প্রধান ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা

(বিশ্ব জনসংখ্যার দৃষ্টিতে আনুপাতিক হার)

ভাষা	বৎসর			
	১৯৫৮	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯২
আরবি	২.৭	২.৯	৩.৩	৩.৫
বাংলা	২.৭	২.৯	৩.২	৩.২
ইংরেজি	৯.৮	৯.১	৮.৭	৭.৬
হিন্দি	৫.২	৫.৩	৫.৩	৬.৪
মান্দারিন (উচ্চপদস্থ চীনাভাষা)	১৫.৬	১৬.৬	১৫.৮	১৫.২
রুশ	৫.৫	৫.৬	৬.০	৪.৯
স্প্যানিশ	৫.০	৫.২	৫.৫	৬.১

* Total number of people speaking languages spoken by 1 million or more people

Source : Percentages calculated from data compiled by Professor Sidney S. Culbert, Department of Psychology, University of Washington, Seattle, on the number of people speaking languages spoken by 1 million people or more and reported annually in the *World Almanac and Book of Facts*. His estimates include both "mother-tongue" and "nonmother tongue" speakers and are derived from national censuses, sample surveys of the population, surveys of Radio and Television broadcasts, population growth data, secondary studies, and other sources.

টেবিল নং ৩.২

প্রধান চীনা ভাষাভাষির সংখ্যা এবং পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ

ভাষা	১৯৫৮		১৯৯২	
	ভাষাভাষির সংখ্যা (মিলিয়ন)	শতকরা হিসাব (বিশ্ব)	ভাষাভাষির সংখ্যা (মিলিয়নে)	শতকরা হিসাব (বিশ্ব)
উচ্চপদস্থ চীনা ভাষা (মান্দারিন)	৪৪৪	১৫.৬	৯০৭	১৫.২
কনটোনেসি (Contonese)	৪৩	১.৫	৬৫	১.১
উই (Wu)	৩৯	১.৪	৬৪	১.১
মিন (Min)	৩৬	১.৩	৫০	০.৮
হাক্কা (Hakka)	১৯	০.৭	৩৩	০.৬
চীনা ভাষা	৫৮১	২০.৫	১১১৯	১৮.৮
ইংরেজি	২৭৮	৯.৮	৪৫৬	৭.৬
স্প্যানিশ	১৪২	৫.০	৩৬২	৬.১
পর্তুগিজ	৭৪	২.৬	১৭৭	৩.০
জার্মান	১২০	৪.২	১১৯	২.০
ফরাসি	৭০	২.৫	১২৩	২.১
পাশ্চাত্যভাষাসমূহ	৬৮৪	২৪.১	১২৩৭	২০.৮
বিশ্ব (সমগ্র)	২৮৪৫	৪৪.৫	৫৯৭৯	৩৯.৪

Source : Percentage calculaled from language data compilled by Professor Sidney S. Culbert, Dept. of Psychology, University of Washington. Seattle, and reported in the *World Almanac* and *Book of Facts for* 1959 and 1993.

এই অর্থে ইংরেজি হল বিশ্বব্যাপী আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যেমন খ্রিস্টীয় দীনপঞ্জিতে সারা পৃথিবীতে সময়/তারিখ নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; যেমন আরবি সংখ্যা গণনাপদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়; আর মেট্রিক পদ্ধতি পরিমাপক মান হিসেবে বিশ্বে সর্বত্র ব্যবহৃত। একইভাবে ইংরেজিভাষা আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম: এটি বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির অস্তিত্বকেই স্বীকার করে। এভাবে ভাষাতত্ত্বে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা'র মাধ্যমে ভাষাতত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক প্রভেদ নিশ্চিহ্ন করে না বরং

সাংস্কৃতিক প্রভেদের কারণে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে একটি সহযোগী ভাষা হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নেয়। ভাষা আসলে যোগাযোগের একটি মাধ্যম, তাই এটি কোনো সম্প্রদায়ের পরিচয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, একজন জাপানি ব্যাংকার ইন্দোনেশিয়ার ব্যাংকারের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজিভাষায়। এটি পেশাগতভাবে করতেই হবে। এর অর্থ কোনোভাবেই তেমন নয় যে, তারা উভয়ই ইংরেজ-মনোভাবাপন্ন বা পাশ্চাত্যপন্থী।

এই কথাটি একইভাবে জার্মান এবং ফরাসি ভাষাভাষি সুইজারল্যান্ডের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কেননা তারা সাধারণত পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিভাষায় ভাববিনিময় করে থাকেন, যদিও ইংরেজিভাষা তাদের জাতীয় ভাষা নয়। তেমনিভাবে ভারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ইংরেজিভাষা সেখানে একটি সহযোগী জাতীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এটি হয়েছে, কারণ ভারত একটি বহুভাষিক দেশ।

একজন প্রথিতযশা ভাষাতত্ত্ববিদ জসুয়া ফিসম্যান বলেন, একটি ভাষা তখনই 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' অথবা LWC পর্যায়ে আসে যখন তা বিশেষ কোনো নৃগোষ্ঠী, ধর্ম, অথবা মতাদর্শের সীমানায় থাকে না। অতীতে ইংরেজির সংকীর্ণ পরিচয় থাকলেও বর্তমানে ইংরেজি নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়কে উতরিয়ে গিয়েছে, অথবা খুবই স্বল্প পরিমাণে ওইসব সংকীর্ণতার বেড়জালে আবদ্ধ রয়েছে। যেমন, অতীতে আক্কাডিয়ান (Akkadian), আরামাইক (Aramaic), গ্রিক (Greek) এবং লাটিন ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরিত্র রক্ষায় সাহায্য করছে। তারা ইংরেজিভাষা ব্যবহার করছে অন্য ভাষাভাষির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। তবে সেসঙ্গে তারা তাদের নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতাও আন্তরিকভাবে রক্ষা করতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যারা ইংরেজিভাষায় কথা বলে থাকেন, তারা কিন্তু ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ, তাদের ইংরেজি ব্রিটিশ বা আমেরিকান ইংরেজির বাইরে আঞ্চলিক আমেজ মিশ্রিত ইংরেজি। তবে, এতে করে ইংরেজি তার 'আভিজাত্য' হারাচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে অ-বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে। চীনা ভাষার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়। আফ্রিকার পিডজিন (Pidgin) ইংরেজি (এটি আসলে আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষায় সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক বিচিত্র ধরনের ইংরেজি), ভারতীয় ইংরেজি, এবং অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত ইংরেজি ওই দেশের সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ইতালীয়, ফরাসি এবং স্প্যানিশের মতো না হয়ে ইংরেজিভাষা থেকে আগত ভাষা বিশেষ সমাজে গুটিকতক মানুষের দ্বারা কথিত হয়, নতুবা তা একটি বিশেষ ভাষাভাষি মানুষের পরস্পরের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিষয়গুলো ভারতের ক্ষেত্রে একটি গবেষণাকাজের ভেতর দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। উক্ত কাজের সারমর্ম হচ্ছে : ১৯৮৩ সালে ভারতের ৭৩৩ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মানুষ ছিল ইংরেজিভাষাভাষি, আর ১৯৯১ সালে ৯৬৭ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে ইংরেজিভাষাভাষি ছিল ২০ মিলিয়ন। তাই দেখা যায়, ভারতে ইংরেজিভাষাভাষি মানুষের সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে স্থির ছিল, যা মাত্র ২ থেকে ৪ ভাগের

ব্যবধানে রয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ইংরেজি-এর অধ্যাপক তাদের *The ground reality* শীর্ষক গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন যে, 'কেউ যখন কাশ্মীর থেকে দক্ষিণের কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করে থাকে; সে তখন তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি নয় বরং হিন্দিভাষাকেই ব্যবহার করে থাকে।' উপরন্তু, ভারতের ইংরেজি তার নিজস্ব স্বভাব অর্জন করেছে। বলা যায়, এখানে ইংরেজির ভারতীয়করণ হয়েছে পুরোমাত্রায়।[১৪] ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজি আত্তীকৃত হয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে সংস্কৃত ও ফারসিভাষা সেখানে আত্তীকৃত হয়েছিল।

বিশ্ব-ইতিহাসব্যাপী ভাষার বণ্টন আসলে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার বণ্টন। ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা, যেমন ইংরেজি, মান্দারিন, স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রুশ—এ সবই ছিল সাম্রাজ্যের ভাষা, যে ভাষা দিয়ে তারা রাজ্য জয় করেছে এবং বিজিত স্থানে নিজস্ব (শাসকের) ভাষা মাধ্যমে ক্ষমতা চর্চা করেছে এবং ওই ভাষা তাদের বিজিতদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ভাষা বণ্টনের হেরফের থেকে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও হেরফের এসেছে। প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ, মার্কিন কলোনি, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান এবং আর্থিক ক্ষমতা প্রকারান্তরে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্র, যেমন শিক্ষা, সরকারব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য এবং প্রযুক্তিকেও একটি বৈধ এবং শক্তিশালী অবস্থানে আনতে পেরেছে।'[১৫]

স্বাধীনতা অর্জন করে প্রাক্তন কলোনির প্রায় সবগুলো সমাজই সাম্রাজ্যবাদী নীতি বদলাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ভাষার ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব ভাষা প্রতিস্থাপনে সফলকাম হয়ে ওঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বর্ণযুগে রুশভাষা ছিল হ্যানয় এবং প্রাগে 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা'। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্থানে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে রুশভাষারও ব্যবহার হ্রাস পেতে থাকে। বার্লিন দেয়াল পতনের তাৎক্ষণিক পরে এমন একটি তেজি ভাব লক্ষ করা যায়, যেন সেখানে একটি দৃশ্যমান প্রবণতা এসেছিল, যাতে যুক্তজার্মানি আন্তর্জাতিক ফোরামে ইংরেজির বদলে জার্মানভাষায় কথা বলবে। জাপানের অর্থনৈতিক শক্তি মূলত অ-জাপানিদের জাপানিভাষা শিক্ষার দিকে টেনে নেয়। এইভাবে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অ-চীনাদের ক্ষেত্রে চীনাভাষা শিখতে উৎসাহিত করছে। চীনারা অতিদ্রুত হংকং-এ ইংরেজি হটিয়ে চীনাভাষা ব্যবহারের দিকে মনোযোগ দেয়।[১৬] চীনাভাষা দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। কেননা, ওই সকল অঞ্চলের সঙ্গে চীনের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বিশ্বে পশ্চিমাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, সেহেতু এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের বা এক-ভাষাভাষি লোকের সঙ্গে অন্য-ভাষাভাষি লোকের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিভাষার ব্যবহারও হ্রাস পেতে শুরু করছে। যদি দূরবর্তী ভবিষ্যতে চীনবিশ্বে প্রভাবশালী পশ্চিমা সভ্যতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়, তবে ইংরেজিভাষাও বিদায় হবে এবং তার স্থলে মান্দারিন ভাষা হবে বিশ্বে 'লাংগুয়া ফ্রাঙ্কা'।

প্রাক্তন কলোনিগুলো স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে তারা সম্রাজ্যবাদী শক্তির নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে

জাতীয়তাবাদী এলিটগোষ্ঠী কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এভাবে নিজস্ব পরিচয় ব্যক্ত করতে থাকেন। তবে স্বাধীনতা অর্জনের পর এই জাতীয়তাবাদী এলিটগণ জনগণ থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও উচ্চমার্গের বলে ভাবতে শুরু করেন এবং ইংরেজি, ফরাসি অথবা অন্যান্য পশ্চিমা প্রধান প্রধান ভাষার ওপর তাদের দক্ষতাকে এক্ষেত্রে তারা কাজে লাগাতে থাকেন।

অপাশ্চাত্য সমাজে দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। একদিকে, ইংরেজিভাষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে; কেননা, আন্তর্জাতিক চাহিদার করণে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ইংরেজি লাগবে। আবার অন্যদিকে, নিজস্ব ভাষাকে এগিয়ে নেবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ রয়েছে প্রবল। যেমন, উত্তর আফ্রিকায় আরবি ফরাসিভাষার স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছে, উর্দুভাষা পাকিস্তানে ইংরেজিভাষার বিপরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে, ভারতেও দেশজ ভাষা ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এ-ধরনের ঘটনা ঘটার বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৪৮ সালেই আঁচ করতে পেরেছিল; যখন তারা যুক্তি দেখান যে, 'ইংরেজির ব্যবহার জাতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করছে : যারা ক্ষুদ্র কিন্তু শাসক; আবার যারা সংখ্যাধিক্য কিন্তু শাসিত। কেউ কেউ অন্যদের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নয় এবং উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগে অক্ষম।' কিন্তু চল্লিশ বৎসর ইংরেজি এলিটভাষা হিসেবে অটল থাকে এবং সেখানে এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেখানে ধরে নেয়া যায় একটি কৃত্রিম অবস্থা, যেখানে গণতন্ত্রের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর রাখতে হয়। কিন্তু ইংরেজিভাষাভাষি ভারতীয় আর রাজনৈতিকভাবে সচেতন ভারতের মধ্যে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় 'অধিক থেকে অধিকতর ভাবে' এবং এ অবস্থা কার্যত সমাজের মধ্যে একধরনের অস্থিরতাকে উস্‌কে দিচ্ছে, যার একদিকে থাকছে গুটিকতক পদস্থ ইংরেজি-জানা মানুষ এবং অন্যদিকে রয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন ভোটার যারা তা জানে না।'[১৭] তবে যেভাবেই হোক না কেন, অপাশ্চাত্য দেশে সরকারি কাজকর্ম আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব ভাষায় করা হচ্ছে, এর ফলে পাশ্চাত্য ভাষাগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাচ্ছে।

সোভিয়েট সাম্রাজ্য এবং শীতল যুদ্ধাবসানের পর সোভিয়েট যুগে যেসব ভাষা দমিয়ে রাখা হয়েছিল কিংবা বিস্মৃত হওয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল সেসব ভাষা নতুন উদ্যমের সঙ্গে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। প্রায় সকল প্রাক্তন সোভিয়েট রিপাবলিকে তাদের ঐতিহ্যবাহী ভাষাগুলো পুনঃজাগরিত হতে থাকে। ইস্টোনীয়, লাটভীয়, ইউক্রেনীয়, জর্জীয় এবং আরমেনীয় ভাষা সেখানকার জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বাধীন দেশে মর্যাদার উচ্চাসন লাভ করেছে। মুসলমান-অধ্যুষিত রিপাবলিকগুলোতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। আজারবাইজান, কুরজিস্তান, টার্কিমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান তাদের রুশ শাসকদের প্রবর্তিত সাইরেলিক (Cyrillic) হস্তলিপি পরিত্যাগ করে প্রাক্তন তুর্কি ধারায় পাশ্চাত্য হস্তলিপিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। অন্যদিকে, ফারসিভাষা-অধ্যুষিত তাজিকিস্তান ফারসির

স্থলে আরবি হস্তলিপি প্রবর্তন করেছে। সার্বীয়রা আজকাল তাদের ভাষাকে সার্বীয় ভাষা বলে অভিহিত করতে গর্ববোধ করে থাকেন এবং তারা এটি করতে গিয়ে সার্বীয়-ক্রোয়াট থেকে সরে এসেছে। একইভাবে ক্রোয়াটেরা আজকাল তাদের ভাষাকে ক্রোয়েসি ভাষা বলে অভিহিত করে থাকে এবং তাদের ভাষায় তুর্কিভাষার ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার শব্দগুলোকে পরিশোধিত করছে। 'তুর্কি এবং আরবি থেকে আগত ভাষার স্তর বা কণাগুলো যা অটোম্যান সাম্রাজ্যের ৪৫০ বৎসরের শাসনের ফলে এসে জমেছিল, তা আবার বসনিয়ায় ফিরে আসতে শুরু করেছে।'[১৮] ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং পরিচয়-সংক্রান্ত অন্যান্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হওয়া সভ্যতার আর এক দিক। সুতরাং, ক্ষমতা ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ।

ধর্ম : ভাষার চেয়ে ধর্ম অপেক্ষাকৃতভাবে বিশ্বজনীন চেতনায়নে যেন একটু এগিয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনরুত্থানের একটি প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এ-ধরনের পুনরুত্থানকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : এক. ধর্মীয় চেতনার বিকাশ এবং তার ফলাফল; দুই. ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান। এই পুনরুত্থান অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ভিন্নতাবোধকেও উস্‌কে দিয়েছে। অবশ্য ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়ে এক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ধর্মের প্রতি অনুগত থাকা বা মনেপ্রাণে লেগে থাকার উপাত্ত ভাষার বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ এবং উত্তমভাবে পাওয়া গিয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রে উপাত্তসমূহ কিন্তু তত নির্ভরশীল বলে মনে হয় না। টেবিল ৩.৩-এ ধর্মের প্রতি অনুগত থাকার উপাত্ত উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ৩.৩

প্রধান প্রধান ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বের জনসংখ্যা বিভাজন (শতকরা হিসাব)

ধর্ম	বৎসর				
	১৯০০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৮৫ (প্রাক্কলিত)	২০০০ (প্রাক্কলিত)
পাশ্চাত্য খ্রিস্টান	২৬.৯	৩০.৬	৩০.০	২৯.৭	২৯.৯
অর্থোডক্স খ্রিস্টান	৭.৫	৩.১	২.৮	২.৭	২.৪
মুসলমান	১২.৪	১৫.৩	১৬.৫	১৭.১	১৯.২
ধর্মে অবিশ্বাসী	০.২	১৫.০	১৬.৪	১৬.৯	১৭.১
হিন্দু	১২.৫	১২.৮	১৩.৩	১৩.৫	১৩.৭
বৌদ্ধ	৭.৮	৬.৪	৬.৩	৬.২	৫.৭
চীনা লৌকিকত্ব	২৩.৫	৫.৯	৪.৫	৩.৯	২.৫
ট্রাইভাল	৬.৬	২.৪	২.১	১.৯	১.৬
নাস্তিক	০.০	৪.৬	৪.৫	৪.৪	৪.২

Source : David B. Barrett, ed. *World Christian Encyclopedia : A comparative study of churches and religions in the modern world* A.D. *1900-2000* (Oxford : Oxford University Press, 1982).

এই উপাত্তের উৎস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই উপাত্ত ও অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় যে, ধর্মীয় চেতনার আপেক্ষিক শক্তি বিশ্বে পূর্বের তুলনায় তেমন একটা নাটকীয় হেরফের ঘটেনি। যে-বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, পরিবর্তন ঘটেছে একটি ক্ষেত্রে : ১৯০০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'ধর্মীয় বিষয়ে বিশ্বাসী নন' এবং 'নিরীশ্বরবাদীর' সংখ্যা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০০ সালে যেখানে এ সংখ্যা ছিল শতকরা ০.২, সেখানে ১৯৮০ সালে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২০.৯ ভাগে। এ থেকে বলা যায়, একটি বিরাটসংখ্যক মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসীদের সংখ্যা শতকরা ২০.৭ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে চৈনিক লোকজ (ফোক) ধর্মীয় ধ্যানধারণা থেকে সরে আসার একটি যোগসূত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে হ্রাসের পর ১৯০০ সালে এ সংখ্যা ছিল শতকরা ১৯.৫ ভাগ, আর ১৯৮০ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৪.৫ ভাগ। এই হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে কম্যুনিজমের একটি প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে। অর্থাৎ, চীনে ফোকধর্ম থেকে অতিসহজে একটি বিরাট অংশ কম্যুনিজমের প্রভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বজনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ধর্মান্তরগ্রাহী দুটি বড় ধর্ম ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিগত ৮০ বৎসর কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে। পাশ্চাত্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বির সংখ্যা ছিল ১৯০০ সালে শতকরা ২৬.৯ ভাগ, ১৯৮০ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩০ ভাগে। ১৯০০ সালে মুসলমানের সংখ্যা যেখানে ছিল শতকরা ১২.৪ ভাগ, সেখানে ১৯৮০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬.৫ ভাগে। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এ দুটো ধর্ম আফ্রিকা, দক্ষিণকোরিয়াতে বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি। সমাজের আধুনিকায়ন হয়েছে দ্রুতগতিতে, সেইসঙ্গে ধর্মদুটো তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে। তবে, ওইসব সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার দিকে পরিবর্তনের ধারক ও বাহক হিসেবে নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ অথবা গণতন্ত্রের জন্য জীবন বলি দেবার মতো এলিটগণ, কিংবা বহুজাতিক কর্পোরেশনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী অবদান কিন্তু খ্রিস্টীয় মিশনারিদের। অ্যাডাম স্মিথ কিংবা টমাস জেফারসন কেউই মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক চাহিদা; বিশেষ করে শহুরে জনগণ যারা প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের শহুরে হয়েছে, তাদের উপর্যুক্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেননি। যিশুখ্রিস্ট সম্ভবত পারেননি, তবে এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ধারণা করা যায় সুদূর ভবিষ্যতে 'মোহাম্মদ' জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবেন। খ্রিস্টধর্ম প্রাথমিকভাবে ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, আর ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল ধর্মান্তরকরণ ও পুনর্জন্মের মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্বে ১৯৮০ সালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, কিন্তু বর্তমানে তা হ্রাস পাচ্ছে এবং মোটামুটি প্রবণতা যাচাইপূর্বক অনুমান করা যায়, ২০২৫ সালে এ ভাগ হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৫-এ এসে দাঁড়াবে। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অত্যন্ত উচ্চ জন্মহারে ভবিষ্যতে বিশ্বে মুসলমান জনসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানে তা শতকরা ২০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ভবিষ্যতে তা খ্রিস্টান জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়। এইভাবে বলা যায়, ২০২৫ সালে মুসলমানদের সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগে গিয়ে ঠেকবে।[১৯]

সর্বজনীন সভ্যতা : উৎস

সর্বজনীন সভ্যতার ধারণাটি স্বতন্ত্রভাবে পশ্চিমা সভ্যতাজাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ধারণা 'সাদা মানুষদের দায়িত্ব' থেকে পশ্চিমাবিশ্বে জন্মনেয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আদর্শগুলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া এবং সেভাবে বিশ্বের অন্যান্য সমাজের ওপর তাদের কর্তৃত্ব করার বোধ সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে এসে সর্বজনীন সভ্যতার নামে পশ্চিমাবিশ্বে লালিত-পালিত সংস্কৃতির দ্বারা অবশিষ্ট বিশ্বকে সাংস্কৃতিকভাবে পদানত করার কাজটি সম্পন্ন হতে থাকে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট সমাজে পশ্চিমাবিশ্বে উদ্ভাবিত সর্বজনীনতা, মূল্যবোধ, আদর্শ ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি চাপিয়ে দেবার প্রবণতা গতি পেতে থাকে। সত্যি কথা হল 'সর্বজনীনতা' এমন একটি মতাদর্শ যা পশ্চিমাবিশ্বের 'সম্পত্তি' এবং যা অবশিষ্ট বিশ্বের সভ্যতার সঙ্গে 'সংঘাতপূর্ণ'। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে অভিবাসী হয়ে পশ্চিমাবিশ্বে আগত কিছু বুদ্ধিজীবী, যেমন নাইপল এবং ফুয়াদ আজিমি বিশ্বব্যাপী একটি সর্বজনীন বা 'একক' সভ্যতার পক্ষে ওকালতি করে গিয়েছেন। তবে, এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন দেখা দেয়, 'কে আমি?' 'সাদা চামড়ার মানুষের অনুসারী নিগ্রো, একজন আরবদেশীয় বুদ্ধিজীবী অবস্থাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন, যা অভিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য।'[২০] তাই দেখা যায়, 'সর্বজনীন সভ্যতার' ধারণা বিশ্বের অপাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা খুব কমই সমর্থিত হচ্ছে। অপাশ্চাত্যরা এটিকে 'পাশ্চাত্য' হিসেবেই দেখছেন, আর পাশ্চাত্যরা দেখছেন 'সর্বজনীন' হিসেবে। পশ্চিমারা রাজদূতের মতো কাজ করে যাচ্ছে, তারা বৈশ্বিক সমন্বয় বা সংহতির চেষ্টা করছে, বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি করছে, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অপাশ্চাত্য সমাজ পশ্চিমাবিশ্বের এসব কার্যকলাপকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখছে। একক বিশ্ব হিসেবে দেখার প্রচেষ্টাকে অপাশ্চাত্য সমাজ তাদের জন্য একটি বিপদজ্জনক হুমকি হিসেবে গণ্য করছে। সর্বজনীন সভ্যতার আগমন ঘটেছে; এমন একটি ধারণার পক্ষে তিনটি যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে, যথা :

প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর (১ম অধ্যায়ে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে) বিশ্বব্যাপী উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এবং বলা হয় যে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিশ্ব-ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে এ যুক্তির সারবত্তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, এবং এটি মিথ্যা ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। শীতলযুদ্ধের সময় মনে করা হত যে, কম্যুনিজমের বিকল্প হচ্ছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র—এটি কম্যুনিজম পতনের প্রথম ফসল—তাহলে বলা যায় 'সর্বজনীনতা' একটি অপেক্ষাকৃত কম-গুরুত্বপূর্ণ ফসল। অবশ্য বলতে হয়, নানারকমের কর্তৃত্বমূলক শাসনব্যবস্থা রয়েছে; রয়েছে জাতীয়তাবাদ, সংস্থাবাদ, বাজারভিত্তিক কম্যুনিজমও (চীন তার উদাহরণ) এবং বলা বাহুল্য, এসবই বর্তমান বিশ্বে চালু রয়েছে বহাল তবিয়তে। আরও রয়েছে সকল ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শ এবং এর বিপরীতে আছে লোকায়ত (সেক্যুলার) আদর্শ। সম্ভবত বর্তমান বিশ্বে ধর্ম এবং ধর্মই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বা কেন্দ্রীয় শক্তি, যা মানুষকে বিশেষ লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও জড়ো করে চলেছে। এটি ভাবা নির্ভেজাল প্রগল্‌ভতা যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের

পর বিশ্ব এখন পশ্চিমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে সকল সময়ের জন্য এসেছে; আর মুসলমানগণ, চীনারা, ভারতীয়রা এখন পশ্চিমা উদারনীতিবাদকে তাদের একমাত্র বিকল্প হিসেবে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করবে। শীতলযুদ্ধ সময়ের বিভেদ বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু আরও সাংঘাতিক ও মৌলিক মানবতাবিরোধী বিভেদ রয়েছে যা নৃগোষ্ঠী, ধর্ম ও সভ্যতাসংক্রান্ত এবং বলতেই হয়, এ বিভেদ আরও বেশি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপ্রবণ। তাই নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যে আসবে তা জলজ্যান্ত ও নিশ্চিত।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মধ্যে বিভিন্নধরনের পরস্পরক্রিয়া ও সহযোগিতার গতি পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে চলেছে। যেমন ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, ভ্রমণ, মিডিয়া, বিদ্যুৎনির্ভর যোগাযোগ মাধ্যম ইত্যাদির ফলে বিশ্বব্যাপী একটি অভিন্ন কৃষ্টির উদ্ভব হচ্ছে। যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ ও যাতায়াত সহজ এবং সস্তা হয়ে এসেছে। তাছাড়া অতিসহজে টাকাপয়সা, পণ্যসামগ্রী, মানুষজন, জ্ঞানবিজ্ঞান, ধ্যানধারণা ইত্যাদি একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায়। উল্লিখিত বিষয়ে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, আন্তর্জাতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসব তৎপরতার ফলে কী হচ্ছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এসব কর্মকাণ্ড কি মানুষকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও জীবনমুখী করছে, নাকি তার বিরুদ্ধ শক্তি তথা দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়তে সহায়তা করছে, এটি একটি বড় জিজ্ঞাসা। একটি ধারণা রয়েছে যে, এ-ধরনের তৎপরতা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ঝুঁকি হ্রাস করছে, যদিও এরকম বক্তব্য প্রমাণিত নয়, তবে এ সম্পর্কে কিছু নজির বিশ্বে বর্তমানে রয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং এটি শীতলযুদ্ধাবসান পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯১৩ সালে অবশ্য বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। তার পরের কয়েক বৎসর জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ এবং নরহত্যার কারণে এ গতি থমকে গিয়েছিল।[২১]

যদি সত্যি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুদ্ধ-প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তবে কখন এবং কীভাবে তা ঘটে? অতীতের নজির মোটেই এ বক্তব্য সমর্থন করে না যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশ্বে শান্তি, সৌহার্দ্যের পরিবেশ বৃদ্ধি করতে পারে। ১৯৯০-এর দশকে পরিচালিত গবেষণা উল্লিখিত বিষয়টিকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। একটি গবেষণা এভাবে মন্তব্য করেছে যে, 'বাণিজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটি বিবাদসৃষ্টিকারী শক্তি... এবং আন্ত র্জাতিক রাজনীতির জন্য এটি আরও প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আন্তর্জাতিক টানাপড়েন বাড়ায়, তাই তা আন্তর্জাতিক সুস্থিরতা ও শান্তি বৃদ্ধি করতে পারে না।'[২২] আরও একটি গবেষণাগোষ্ঠী এভাবে মন্তব্য করেছেন যে, উচ্চমার্গের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পরস্পরনির্ভরতা প্রকৃতপক্ষে, 'কখনও শান্তিপ্রবণ বা যুদ্ধপ্রবণ কোনোটিই নয়...।' অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরতা কেবল তখনই শান্তির জন্য আশীর্বাদ হতে পারে, 'যখন রাষ্ট্র উচ্চমার্গের বাণিজ্যসম্পর্ক বজায় রাখতে ভবিষ্যতের জন্য বদ্ধভাবে পরিকর থাকে।' রাষ্ট্র যদি উচ্চমার্গের পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আন্তরিক না থাকে, তবে সেখানে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যেতে পারে।[২৩]

বাণিজ্য এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বে নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাধারণ শান্তিবোধ উন্মেষের ব্যর্থতা সমাজবিজ্ঞানে একটি শ্বাসবায়ুরোধক ব্যঞ্জনা বৈ কিছু নয়। সামাজিক মনস্তত্ত্বে দেখা যায়, মানুষ অন্যদের চেয়ে নিজেদেরকে কিছু বিষয়ে সবসময়ই পৃথক ভেবে তৃপ্তিলাভ করে থাকে। যে-কেউ নিজেকে অন্যদের চেয়ে চারিত্রিকভাবে পৃথক ভেবে গর্বিত হয়।

নারীজাতির ক্ষেত্রে এ মনস্তত্ত্বটি আরও সত্য বলে গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়।[২৪] মানুষ তাদের পরিচয় এভাবে পৃথক করে দেখে যে 'তারা কী-নয়।' বাণিজ্য, যোগাযোগ, ভ্রমণ ইত্যাদি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এতে করে মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছে। দুইজন ইউরোপীয়— একজন জার্মান, অন্যজন ফরাসি— যখন একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক ও পরস্পর ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন কিন্তু তারা একজন জার্মান এবং অন্যজন ফরাসি হিসেবেই তা করে থাকে।

দুইজন ইউরোপীয়— একজন জার্মান এবং একজন ফরাসি, যখন দুইজন আরবীয়– যাদের একজন সৌদি এবং অন্যজন মিশরীয়—পরস্পর কাজে অংশ নেয়, তখন কিন্তু তারা প্রথম দুজন ইউরোপীয় এবং শেষোক্ত দুজন আরবীয় হিসেবে অংশ নেয়। সাধারণত উত্তরআফ্রিকার ফরাসিদেশে অভিবাসী হিসেবে উক্ত অভিবাসী ফরাসিদের বিরাগভাজন হয়ে থাকেন। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা যায়, সেখানে ইউরোপীয় ক্যাথলিক থেকে অভিবাসন জোরদার হচ্ছে। মার্কিনিরা কানাডা এবং ইউরোপীয় দেশের বিনিয়োগে বিরাগভাজন হয় না, কিন্তু তাদের দেশের জাপানি বিনিয়োগ সহ্য করতে তাদের কষ্ট হয়। ডোনাল্ড হরোউইজ (Donald Horowitz) বলেন : 'একজন নাইরেজীয়ও লাগোসে একজন আইবো (Ibo) অথবা ওনিটচ্ছা আইবো (Onitsha Ibo); লন্ডনে সে একজন নাইজেরীয়; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে একজন আফ্রিকান।'[২৫] সমাজবিজ্ঞানে বৈশ্বিকরণের তত্ত্বে প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত দিতে চাওয়া হয়েছে। তারা বলতে চান, ক্রমান্বয়ে বৈশ্বিকরণ বিশ্বে ঐতিহাসিকভাবে একটি মাত্রা পর্যন্ত সভ্যতা-সংক্রান্ত এবং সামাজিক ও অন্যান্য পরস্পরনির্ভরতার কর্মপদ্ধতি, তরতর করে বেড়ে ওঠা সচেতনতা আসলে সভ্যতা, সামাজিকতা এবং নৃতাত্ত্বিক নিজস্ব অনুভূতিকে বিরক্তিকর অবনতির দিকে ধাবিত করছে। পৃথিবীব্যাপী ধর্মভিত্তিক পরস্পর শত্রুতার মধ্যে, 'ঐশ্বরিক অবস্থার ভেতরে প্রত্যাবর্তন' আসলে একটি একক 'বিশ্বের প্রতি' জনগণের চেতনার ও ইচ্ছার প্রকাশ বিশেষ।'[২৬]

পশ্চিমাবিশ্ব এবং আধুনিকীকরণ

একটি একক বা সর্বজনীন সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে—এ বক্তব্যের পক্ষে আরও যে যুক্তি দেখানো হয় তা হল, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিশ্বে আধুনিকীকরণের একটি বড় ধরনের কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া চলে আসে যা কার্যত সর্বজনীন সভ্যতার বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি, সামাজিক কাজে সমবেত হওয়ার প্রবণতা এবং

পেশার বিভিন্নকরণ ও সমাজের ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আধুনিকায়নের মানদণ্ড বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত স্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে মানুষের পক্ষে তা ব্যবহার করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রাকে সহজ ও সুলভ করার ফলে আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা গতি পেয়েছে।

আধুনিকায়ন একটি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া, যার ভেতর দিয়ে সমাজ আদিম অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে সভ্যসমাজে রূপ নেয়। অর্থাৎ, সভ্যতার আবির্ভাবের যাত্রা শুরু হয়েছিল টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস উপত্যকার, নীলনদীর তীরে এবং ইন্ডাস এলাকায় খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে।[২৭] মনোভাব, মূল্যবোধ, জ্ঞান ও মেধা এবং কৃষ্টি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটি আধুনিক সমাজ থেকে গতানুগতিক সমাজ প্রায় রাতদিনের মতো তফাৎ। একথা সত্য, সভ্য পশ্চিমাবিশ্বই প্রথম সমাজকে আধুনিকায়নের দিকে ধাবিত করেছিল। অবশিষ্ট সমাজ পাশ্চাত্যের ন্যায় যখন শিক্ষা, কাজকর্ম, সম্পদ, শ্রেণীবিন্যাস, যুক্তিনির্ভরতা প্রভৃতি আধুনিক সংস্কৃতি অর্জন করে তখন ওই সমাজকে আধুনিক সমাজ বলা যায় এবং প্রকারান্তরে যা বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি।

গতানুগতিক ও আধুনিক সমাজের ভেতর এই তফাতের বিষয়টি মোটামুটিভাবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিশ্বে খুবই স্পষ্টভাবে কিছু সমাজ রয়েছে যে সমাজগুলো খুবই আধুনিক; আবার এখনও অনেক সমাজ রয়েছে যে সমাজগুলো গতানুগতিক। সুতরাং, এ প্রশ্নে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমাজগুলোর মধ্যে কোনোপ্রকার একক মাত্রা নেই। কিন্তু যখন সকল সমাজ গতানুগতিক থাকে, তখন বিষয়টি কেমন দাঁড়ায়? এই বিশ্ব মাত্র কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। তাহলে কি বলা যায়, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে একটি একক বা সর্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে? এ প্রশ্নের উত্তর হবে সম্ভবত 'না'। ব্রাডেউল যুক্তি দেখান যে, 'মিং-এর চীন... মোটামুটিভাবে ভ্যালোইস (Valois) ফ্রান্সের বেশি নিকটে ছিল... যতটা ৫ম রিপাবলিকের সময় মাউ সেতুং-এর চীন ফ্রান্সের নিকটে ছিল।'[২৮] আধুনিক সমাজগুলো মোটামুটি দুটো কারণে গতানুগতিক সমাজের চেয়ে একে অপরের সঙ্গে সহজে মিলে যেতে পারে :

প্রথমত, আধুনিক সমাজে এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের পরস্পরক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন হয়তো একক বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন সভ্যতার উদ্ভব না ঘটলেও বলা যায় এর ফলে এমন একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে অতিসহজে প্রযুক্তি, আবিষ্কার, উদ্যোগ, বাস্তব অভিজ্ঞতা, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অদলবদল করা সম্ভব হয়, যা কি-না গতানুগতিক সমাজে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, গতানুগতিক সমাজ মূলত কৃষিনির্ভর সমাজ। অন্যদিকে, আধুনিক সমাজ শিল্পভিত্তিক সমাজ, যেখানে হস্তশিল্প থেকে ধ্রুপদী বৃহৎ শিল্প, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্প থাকে। কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা রাখতে হয়, অন্যদিকে শিল্পভিত্তিক সমাজে প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা তেমন নেই বললেই চলে।

কৃষিব্যবস্থার ভিন্নতা নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ, আবহাওয়াগত পার্থক্য, ভূমিবন্টন ব্যবস্থা ও এর মালিকানা এবং সরকারের নীতির ওপর। উইত্ফজল-এর 'জলশক্তি' বিজ্ঞানের

ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সভ্যতা তত্ত্বের মতে প্রচুর পরিমাণ জলসেচের ওপর কৃষির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং এজন্য তা প্রকারান্তরে কেন্দ্রীভূত সরকার ও আমলাতন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ে। কেননা, এসব কাজের ব্যয় মেটাতে সবসময় আমলাতন্ত্রকে এগিয়ে আসতে হয়। এর ব্যতিক্রম খুব কমই ঘটে থাকে। তাছাড়া নানাবিধ কারণে কৃষি পরিবেশ এবং অঞ্চলনির্ভর। অন্যদিকে, শিল্প কিন্তু তেমন নয়। শিল্পের সম্পর্ক সমাজকাঠামোর ভিন্নতার ওপর যতটা বর্তায়, ভূগোলের ওপর ততটা বর্তায় না। তাই শিল্পের মাধ্যমে সমাজ একীভূত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। শিল্পের অগ্রগতি 'একক বিশ্বসভ্যতা' সৃষ্টির পক্ষে বলে অনেকে ভেবে থাকেন। তাহলে দেখা যায়, গতানুগতিক সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজের অনেককিছুই সকলের জন্য সাধারণ (Common)। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, সমাজ আগামীতে একে অন্যের সঙ্গে মিলে যাবে, বা সকল সমাজ একরূপ ধারণ করবে?

তারা যা বলতে চান তা হল, এইরকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে যে আধুনিক সমাজ একটি 'একক' সমাজ। এ ধারণাটি হল পাশ্চাত্যের ধরন, আর আধুনিক সভ্যতা হল পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা হল শুধুই পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা হল আধুনিক সভ্যতা। এটি অবশ্য একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার উদয় হয়েছে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তা শরীরে পুষ্টি পেয়েছে। পাশ্চাত্য আসলে আধুনিক পাশ্চাত্য হওয়ার অনেক পূর্বেই পাশ্চাত্য ছিল। পাশ্চাত্যের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য যা তাকে অবশিষ্ট সভ্যতা থেকে পৃথক করে, তা হল, এটি পাশ্চাত্যকে অনেক পূর্বেই আধুনিক করে ফেলেছিল। তা হলে বলা কি যায় যে, পাশ্চাত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে পাশ্চাত্য আধুনিক হওয়ার শতবর্ষ পূর্বেই পাশ্চাত্য হয়ে গিয়েছিল? অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন বিজ্ঞজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।[২৯]

ধ্রুপদী উত্তরাধিকারত্ব

সভ্যতা সম্পর্কিত তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে পাশ্চাত্য পূর্বের সভ্যতাসমূহ থেকে অনেককিছুই অর্জন করেছে, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ধ্রুপদী সভ্যতার উত্তরাধিকারত্ব। ধ্রুপদী সভ্যতা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেককিছুই পেয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গ্রিক দর্শন ও তার যুক্তিবাদ, রোমান আইন, লাটিন ভাষা এবং খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য। ইসলামিক ও অর্থোডক্স সভ্যতাও ধ্রুপদী সভ্যতার উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু পেয়েছে। তবে পশ্চিমা সভ্যতা যতটুকু পেয়েছে ততটুকু তারা পেতে পারেনি।

ক্যাথলিকতন্ত্র এবং প্রটেস্ট্যান্টতন্ত্র

পাশ্চাত্য খ্রিস্টানতন্ত্র প্রথমে ক্যাথলিকতন্ত্র এবং পরবর্তীতে ক্যাথলিকতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যান্টতন্ত্র হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর এককভাবে প্রভাববিস্তারকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেকটি সহস্রাব্দে এখন যাকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে ডেকে থাকি, বাস্তবিকপক্ষে

তা আসলে পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় জগৎ বৈ কিছু নয়। খ্রিস্টের অনুসারীদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্রধর্মী সমাজ ও মানবতাবোধ ছিল, যা তাদেরকে টার্ক, মুরস্, বাইজানটাইন এবং অন্যান্যদের থেকে পৃথক মর্যাদায় সমাসীন করেছিল এবং সত্যি হল এই যে, ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যরা অবশিষ্ট বিশ্বে গিয়েছিল মূলত ঈশ্বর ও সোনার জন্য (God and Gold)। ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার-আন্দোলন ও সংস্কারবিরোধী আন্দোলন এবং খ্রিস্টানজগতে বিভেদ আসলে উত্তরে 'প্রোটেস্ট্যান্টতন্ত্র' ও দক্ষিণে 'ক্যাথলিকতন্ত্র' দানা বাঁধে। এটি ছিল পশ্চিমা ইতিহাসের একটি অনন্য দিক, যা ছিল অর্থোডক্সদের মধ্যে অনুপস্থিত এবং লাটিন আমেরিকার ক্ষেত্রে বিতাড়িত।

ইউরোপীয় ভাষাসমূহ

ধর্মের পরই ভাষা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে একগোষ্ঠী থেকে অন্যগোষ্ঠীকে পৃথক করে থাকে। পশ্চিমাবিশ্ব অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে তার ভাষার ভিন্নতার দৃষ্টিতে পৃথক। জাপানি, হিন্দি, মান্দারিন, রুশ এবং এমনকি আরবিকে তাদের নিজ নিজ সভ্যতার জন্য 'কোর' ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পশ্চিমাবিশ্ব উত্তরাধিকারসূত্রে ল্যাটিন পেয়েছিল। জাতিরাষ্ট্রের আবির্ভাব বিভিন্ন জাতীয় ভাষাকে জাগিয়ে তোলে, কিন্তু তার পরও অন্যান্য ভাষাসমূহ ছিল বৃহত্তরভাবে রোমান এবং জার্মানভাষার গোষ্ঠীভুক্ত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ওইসব ভাষাসমূহ সাধারণত বর্তমান অবস্থায় চলে আসে।

আত্মিক এবং পার্থিব জগতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা

পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেখানে দীর্ঘদিন গির্জা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। ঈশ্বর এবং গির্জা, গির্জা ও রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ ও পার্থিব কর্তৃপক্ষ— দ্বৈত সত্তা হিসেবে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বজায় ছিল। শুধুমাত্র হিন্দুসভ্যতায় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। ইসলামে 'ঈশ্বর' ও 'সিজার' একই, চীন এবং জাপানে সিজারই ঈশ্বর', অর্থোডক্স-এ ঈশ্বর হল 'সিজারের কনিষ্ঠ অংশীদার'। গির্জা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং এসংক্রান্ত রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সভ্যতাকে একটি বিশেষ ধারায় নিয়ে গিয়েছে, যা অন্য সভ্যতার ক্ষেত্রে বিরল। পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র এবং গির্জার কর্তৃত্বসংক্রান্ত বিভেদ প্রকারান্তরে সীমাহীনভাবে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতাবোধ জাগরণে ভূমিকা রাখে।

আইনের শাসন

সভ্যতার জন্য আইনকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করার ঐতিহ্য রোমান সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত। মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদগণ প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে রাজা শাসনকাজ পরিচালনা করবেন। সাধারণ আইনের (Common Low) ধারণা ইংল্যান্ডে জাগ্রত হয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বৈরতন্ত্রের অধীনস্থ থাকার সময় আইনের শাসনের ব্যত্যয় ঘটেছিল। আইনের শাসনের ঐতিহ্যই পরবর্তীতে

সংবিধানতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং বলাবাহুল্য এর সঙ্গে মানবাধিকার, সম্পত্তির ওপর অধিকারবোধ, অত্যাচারী শাসন রুখবার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। তবে, পাশ্চাত্য ব্যতীত অন্যান্য সভ্যতার বেলায় আইনের শাসনের ধারণাটি তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি, যার দ্বারা কি-না মানুষের চিন্তা ও আচরণকে সুপথে নেয়া যায়।

সামাজিক বহুত্ববাদ

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমা সমাজ ব্যাপকভাবে বহুত্ববাদী। ডিউটস্ (Deutsch) বলেন, পাশ্চাত্যের পার্থক্যজনিত দিক হচ্ছে, 'বিভিন্ন স্বয়ংচালিত ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব; যে গোষ্ঠীগুলোর ভিত্তি আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি।'[৩০] ৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে এই গোষ্ঠীগুলো প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় আশ্রম, নিষ্ঠুর নির্দেশ, গিল্ডসমূহের ওপর ভিত্তি করে; তা পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদির ওপর তার শেকড় গেড়ে বসে।[৩১] সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীগুলো শ্রেণীভিত্তিক বহুত্বের দ্বারা আরও সমৃদ্ধ হয়। ওই সময়ে ইউরোপের সমাজে আপেক্ষিকভাবে শক্তিশালী স্বয়ম্ভর অভিজাততান্ত্রিক একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষকসমাজ ছিল; ক্ষুদ্র হলেও ছিল প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়। সামন্ততন্ত্রভিত্তিক অভিজাতব্যবস্থা কিন্তু ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে দেখা যায়, ওই একই সময়ে ইউরোপীয় বহুত্ববাদের বিপরীত চিত্র ছিল রাশিয়া, চীন, অটোম্যান সাম্রাজ্যসহ অবশিষ্ট অপাশ্চাত্য বিশ্বে, যেখানে গণদারিদ্র্যকবলিত সিভিল সমাজ, দুর্বল অভিজাততন্ত্র, কেন্দ্রীভূত এবং ক্ষমতাশালী আমলাতন্ত্রের দাপট ছিল অহরহ।

প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহ

বহুত্বমতবাদভিত্তিক সমাজ পরবর্তীতে ভূ-সম্পত্তি, আইনসভাসমূহসহ অভিজাত সম্প্রদায়, যাজকমণ্ডলী, বণিক সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ রক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। এই সংগঠনসমূহ প্রতিনিধিত্বের প্রথা চালু করে, যা পরবর্তী প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। চরম স্বৈরতন্ত্রের সময় উক্ত প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও কার্যাবলি যথেষ্টভাবে খর্ব করা হয়েছিল। এমনটি ঘটার সময় জনগণ জাগরিত হয়ে ওঠে তাদের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের দাবি আদায়ের জন্য। ফ্রান্সে এমন ঘটনা ঘটেছে। পাশ্চাত্য ব্যতীত অন্যান্য সভ্যতার বেলায় এরূপ অবস্থা ও ঘটনা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটতে দেখা যায় না।

আঞ্চলিক পর্যায়ে ইতালির নগরগুলোতে স্বশাসনের দাবি জানানো হয়। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বের দাবি সেসময় কিছুটা মেনে নেয়া হয়েছিল। এসব ঘটনা পাশ্চাত্য ব্যতীত অবশিষ্ট সভ্যতার ক্ষেত্রে তেমন ঘটার কোনো ঐতিহ্য নেই বললেই চলে।

ব্যক্তিবাদ/ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধারাগুলো কার্যকর থাকার ফলে পশ্চিমাজগতে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তির প্রাপ্ত অধিকার, স্বাধীনতা, ইত্যাদি জাগ্রত হতে শুরু করে। ব্যক্তিবাদ আসলে ইউরোপে ১৪ এবং ১৫ শতকে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দের দিকটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ডিউট্‌স এ অবস্থাকে 'রোমিও জুলিয়েট বিপ্লব' (The Romeo and Juliet revolution) বলে অভিহিত করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ শতকে কার্যকর ছিল। এমনকি সকলের জন্য সমঅধিকারের দাবি— 'ধনীর ন্যায় হতদরিদ্রেরও ইংল্যান্ডে বসবাস ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে'— এরূপ বক্তব্য উঠে আসতে শুরু করে, যদিও তা সর্বজনীন গ্রাহ্যতা পায়নি। পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাদের সভ্যতার জ্যোতি হয়ে ওঠে। দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ৫০টি দেশের ওপর চালিত একটি গবেষণার ওপরে ২০টি দেশ ছিল পাশ্চাত্যের দেশ, যেখানে পর্তুগাল ও ইসরায়েল ব্যতীত ইউরোপের প্রতিটি দেশই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে উৎরে যায়।[৩৩] তাই বলা যায়, সভ্যতার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্যে বলিষ্ঠভাবে মেনে চলা হলেও অবশিষ্ট বা অপাশ্চাত্যে তা অবজ্ঞার পর্যায়েই রয়েছে। অতএব, বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্বকে অবশিষ্ট থেকে যৌক্তিকভাবে পৃথক করে থাকে।[৩৪] পশ্চিমাবিশ্বে সময়-সময় অত্যাচারী স্বৈরশাসকের উদ্ভব হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে আইনের শাসন, মানবাধিকার, ব্যক্তিবাদ অমান্য করেছে এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেয়নি। আবার এটিও সত্য, পাশ্চাত্যে অবশিষ্ট সভ্যতাসমূহে এসব ধারা আরও কঠোর ছিল। যেমন, কোরান ও সুন্না হচ্ছে ইসলামি সমাজের সংবিধান ও আইনের মূল উৎস। জাপানে এবং ভারতে শ্রেণীব্যবস্থা অনেকটা পশ্চিমা দুনিয়ার মতো তাই অপাশ্চাত্য এই দুটি দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। পশ্চিমাবিশ্বে একক দেশে কোনো ধারা বহাল নেই বা ছিল না। বিভিন্ন দেশের আদর্শগুলো সম্মিলিতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার পার্থক্যসূচিত বৈশিষ্ট্যে উদ্দীপ্ত করেছে। এ সবকিছুই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একটি 'কোর' পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এ সবকিছুই পাশ্চাত্যকে তাদের নিজেদের ও অবশিষ্ট বিশ্বব্যাপী আধুনিকায়নের শক্তি জুগিয়েছে।

আধুনিকীকরণ : পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া

পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণ; আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া ও পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া;— এ দুটি বিষয় অপাশ্চাত্যের সমাজকে এগিয়ে নিয়েছে। অপাশ্চাত্য সমাজের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় তাদের সমাজের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলাফল যেভাবে দেখতেন তা তিনভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যথা : আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করো; এ দুটোকে আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করো; প্রথমটিকে গ্রহণ করো এবং দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাখ্যান করো।[৩৫]

বাতিলকরণ মতবাদ

জাপান ১৫৪২ সালে প্রথমে পাশ্চাত্য প্রত্যাখ্যান-পর্ব শুরু করেছিল, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বহাল ছিল। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণকে গ্রাহ্য করা হয়েছিল, যেমন : সীমিত সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ থেকে ক্রয় করা; সীমিতভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করা। তবে খ্রিস্টীয় মতাদর্শের বিষয়ে দারুণ নিষেধাজ্ঞা ছিল। জাপান থেকে পশ্চিমাদের সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যানকরণ প্রক্রিয়া ১৮৫৪ সালে অবসান হয় কমোডর পেরির তৎপরতা এবং ১৮৬৮ সালে মেজি শাসকদের পুনরুত্থানের ভেতর দিয়ে। চীনও জাপানের মতো দীর্ঘদিন তার সমাজে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। খ্রিস্টীয় দূতেরা অবশ্য সেখানে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল ১৬০১ সালে, কিন্তু ১৭২২ সালে তাদের বর্জন করা হয়। চীনে জাপানের মতো নয়; কিন্তু তাদের পাশ্চাত্য বর্জন নীতি ছিল চীনের সংস্কৃতির শেকড়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে তারা মনে করত চীনের সংস্কৃতি অন্যান্যদের চেয়ে বেশি উন্নত। জাপানের মতো চীনেও পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাবের অবসান ঘটে পাশ্চাত্য আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের ভেতর দিয়ে, যখন ব্রিটিশদের দ্বারা আফিম যুদ্ধের (১৮২৯-১৮৪২) কারণে এমনটি করা হয়েছিল। এ দুটো ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমাশক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার বা বাতিল করে অপাশ্চাত্য বিশ্বের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া বাস্তবসম্মত ছিল না। এ কারণে, তারা তাদের পাশ্চাত্য বর্জন নীতিতে অবিচল থাকতে ব্যর্থ হয়। বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বিশ্বব্যাপী পরস্পরনির্ভরতার মাত্রা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ-বিষয়ে ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। একমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু গ্রাম ব্যতীত সামগ্রিকভাবে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ থেকে দূরে থাকা বর্তমান বিশ্বে খুবই কষ্টকর। ডানিয়েল পাইপস (Daniel Pipes) বলেন যে, "কেবলমাত্র গুটিকতক চরম মৌলবাদী (ইসলামি) আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারা টেলিভিশন নদীর পানিতে নিক্ষেপ করে থাকে, হাতঘড়ি পরে না, তারা অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনও বর্জন করে থাকে। তাদের অবিবেচক ও বাস্তববিবর্জিত কার্যকলাপের জন্য আনোয়ার সাদাতকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তারা মক্কায় মসজিদ আক্রমণ করেছে ...।"[৩৫]

কেমালপন্থী (Kemalism)

পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি আর-একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত হতে পারে, যাকে টয়েনবি 'হেরোডিয়ানিজম' (Herodianisom) বলেছেন, আর তা হল, আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই স্বাগত জানানো। এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল যুক্তি হল উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আধুনিকায়ন অতীব প্রয়োজনীয় ও উপযোগী। অপাশ্চাত্য সমাজের নিজস্ব সভ্যতা যদি আধুনিকীকরণ ধারণ করতে না পারে, তাহলে ওই দেশজ সংস্কৃতি বর্জন অথবা বাতিল করতে হবে এবং সমাজকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পুরোপুরি ও সার্থকভাবে পাশ্চাত্যকরণ করতে হবে। আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ একে অপরকে বলিষ্ঠ করে এবং দুটি বিষয় একত্রে সম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই ধরনের অভিগমন

চৈনিক ও জাপানি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যখন উভয় দেশ তাদের সমাজকে আধুনিক করতে গিয়ে তাদের ঐতিহাসিক ভাষাকে পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে ইংরেজিভাষাকে তাদের জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব করেছিল। এই মনোভাবটি অপাশ্চাত্যের চেয়ে পাশ্চাত্যের এলিটগণের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। এর মূল কথা হল, 'যদি তোমরা সফলকাম হতে চাও, তবে 'আমাদের মতো' হও; উন্নয়নের জন্য আমাদের পথই একমাত্র সঠিক পথ।' আরও যুক্তি দেখানো হয় যে, অপাশ্চাত্য দেশের ধর্মীয় মনোভাব, মূল্যবোধ, নৈতিক ধারণাসমূহ সবই পরদেশী এবং কখনও কখনও উন্নয়নবিরোধী। উন্নয়ন হল সেই ধারা, যে ধারা দেশ ও সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে চায়, শিল্পায়ন ঘটাতে চায়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হল একটি বৈপ্লবিক এবং সম্ভাব্য স্থানে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম, যার ভেতর দিয়ে জনগণের জন্য একটি উন্নয়নকামী সমাজ গঠিত হয়ে আসবে।[৩৭] ডানিয়েল পাইপাস্ এই যুক্তিটি কেমাল আতাতুর্ককে উদ্ধৃত করে ইসলামধর্ম বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

> ... মুসলমানদের একটি উপায় আছে, আধুনিকীকরণের জন্য পাশ্চাত্যকরণের প্রয়োজন রয়েছে... ইসলাম আধুনিকীকরণের অন্য উপায় অনুমোদন করে না ... ধর্মনিরপেক্ষতাকে এক্ষেত্রে বাদ দেয়া সম্ভব নয় ... আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিচিন্তা ও মননজগতের গ্রহণযোগ্যতা দাবি করে থাকে ... এবং এজন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক, প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন। ... পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কেননা তা করা না হলে সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কীভাবে পাওয়া যাবে, এটি একটি প্রশ্ন। পাশ্চাত্যের ভাষাসমূহ ও পাশ্চাত্যের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, কেননা সেগুলো মুক্তচিন্তা ও সহজ জীবনযাপন সম্পর্কে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়। মুসলমানেরা যখন মুক্তমনে পাশ্চাত্যের সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারবে, কেবল তখনই তারা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হতে সক্ষম হতে পারবে।[৩৮]

৬০ বৎসর পূর্বে মোস্তফা কেমাল আতাতুর্ক এই কথাগুলো লিখেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে একটি আধুনিক তুরস্ক গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং এজন্য তিনি পাশ্চাত্যকরণ এবং সেসঙ্গে আধুনিকীকরণের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি গতানুগতিক ইসলামি অতীত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। আতাতুর্ক চেয়েছিলেন তুরস্ক হবে একটি আধুনিক রাষ্ট্র, যেদেশের সমাজ মুসলমান-অধ্যুষিত ইসলামি ঐতিহ্যসমৃদ্ধ প্রথাসমূহও ইসলামি ধারায় বহাল রয়েছে। তার পরও শাসক এলিটরা দেশটিকে একটি আধুনিক ও পাশ্চত্য ধাঁচের দেশে পরিণত করতে আগ্রহী। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কেমালপন্থীরা তুরস্কের মতো একটি অপাশ্চাত্য দেশে পশ্চিমা সভ্যতার বিকল্প সভ্যতার দেশে পরিণত করতে চেয়েছিল। অধ্যায়-৬-এ তাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সংস্কার কার্যক্রম

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিরিখে অপাশ্চাত্য দেশে আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণ বর্জন করার ফলে একটি আশাহত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সমাজকে আধুনিক বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। 'কেমালিজমের' মাধ্যমে আসলে একটি দুঃসাহসী কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে

দিয়ে শত শত বছরের চলে আসা সভ্যতাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ একটি আমদানিকৃত নতুন সভ্যতা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছিল। আরও একটি তৃতীয় পথ থাকতে পারে; তা হল আধুনিকায়নের সঙ্গে প্রচলিত দেশজ ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, কাজকর্ম ইত্যাদিকে একেবারে ত্যাগ না করে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের সঙ্গে তাকে মানিয়ে নেয়া। এ পথটি প্রকৃতপক্ষে অপাশ্চাত্যের এলিটদের মধ্যে খুবই গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় পথ। চীনে চিং-রাজত্বের শেষের দিকে স্লোগান ছিল 'Ti-Yong', যার অর্থ হল : 'চীন থেকে মৌলিক বিষয়গুলো গ্রহণ করো, আর পাশ্চাত্য থেকে বাস্তব কার্য সম্পাদনের ধারা নাও।' জাপানে এটি ছিল 'Wakon yosei', এর অর্থ হল, 'জাপানি চেতনা আর পাশ্চাত্যের কায়দাকৌশল'। মিশরে ১৮৩০ সালে মোহাম্মদ আলী যে কার্যক্রম শুরু করেছিল, তার সারকথা ছিল 'কলাকৌশলগত দিক থেকে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করো, তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পাশ্চাত্যকরণে সতর্ক থাকো।' এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা একপর্যায়ে ব্রিটিশরা তাঁকে তাঁর যাবতীয় আধুনিকরণ কার্যক্রম থেকে সরে আসতে নির্দেশ দেয়। ফলে, যেমনটি আলি মাজরুই (Ali Mozrui) বলেন 'মিশরীয় রাজত্ব জাপানের মতো ছিল না, যেখানে কৌশল এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্যকরণ বাদ দিয়েই, তাছাড়া কেমাল আতাতুর্কের তুরস্কের মতোও ছিল না; যেখানে ছিল প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন এবং সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্যকরণ।'[৩৯]

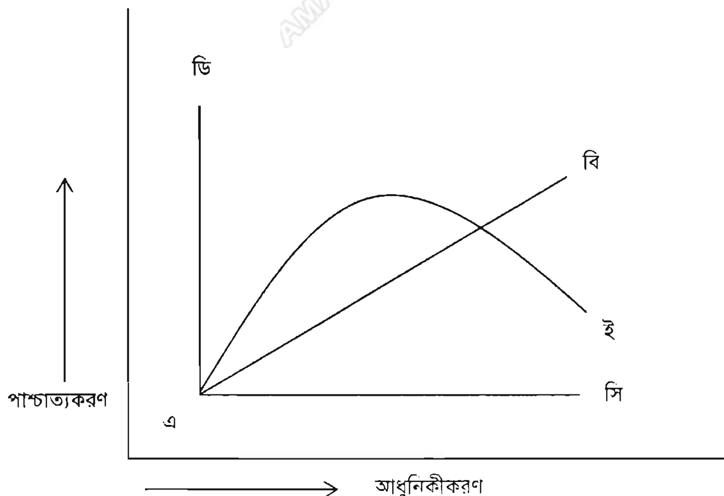
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জামাল আল্‌দিন আল্‌ আফগানি, মোহাম্মদ আবদু এবং অন্যান্য সংস্কারবাদী ইসলামের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'ইসলামের শক্তি, আধুনিক বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যের উত্তম দিকগুলো এক করে ফেলো এবং এভাবে ইসলাম কর্তৃক আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্য করে তোলো এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ঘটানো যাতে 'সাংবিধানিকতা' এবং 'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার' প্রতিষ্ঠা পায়।[৪০] এটি ছিল একটি বৃহত্তর সংস্কারবাদী প্রচেষ্টা, যেখানে কেমালের ধারণাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে আধুনিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান গ্রহণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯২০ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সংস্কারের এই ধারা অবশ্যই পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি অনুগত ছিল এবং মুসলমান এলিটদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জগুলো ইসলামি মৌলবাদের ধারায় আবির্ভূত হয়।

বাতিলকরণ মতবাদ, কেমালিজম এবং সংস্কারবাদিতা বিভিন্ন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার ভিত্তি ছিল কিছুটা কাঙ্ক্ষিত, আবার কিছুটা সম্ভবপর। বাতিলকরণ মতবাদে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করা হয় এবং সেজন্য তা বর্জন করা হয়েছিল। কেমালিজমে আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ উভয়কেই কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করা হত এবং সেসঙ্গে বলা হত : পাশ্চাত্যকরণ ব্যতীত আধুনিকীকরণ সম্ভব নয়; সংস্কারবাদীদের মতে আধুনিকীকরণ সম্ভব এবং কাঙ্ক্ষিতও বটে, তবে এজন্য পাশ্চাত্যকরণের প্রয়োজন নেই। অতএব, বাতিলকরণ মতবাদের সঙ্গে কেমালিজমের সংঘাত সুস্পষ্ট। অন্যদিকে, কেমালিজমের সঙ্গে সংস্কারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যও দৃশ্যমান, যেখানে বলা হয় : পাশ্চাত্যকরণ ব্যতীতই আধুনিকীকরণ সম্ভব।

ফিগার ৩.১ ডায়াগ্রাম থেকে এই বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। বাতিলকরণ মতবাদকে 'এ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, কেমালপন্থীদের তীর্যকভাবে দেখানো হয়েছে, আর সংস্কারবাদীদের অনুভূমিকভাবে 'সি' হিসেবে দেখানো হয়েছে। একটি সমাজ কীভাবে এগিয়ে যায়? সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, অপাশ্চাত্য একটি সমাজ তার নিজস্ব গতিতে সামনে এগিয়ে যায় উল্লিখিত তিনটি পথ ধরে, আর একে অপর থেকে পৃথক হয়ে চলে। মাজরুই যদিও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মিশরে এবং আফ্রিকায় আরও একটি স্বতন্ত্র পথ চলে যা 'ডি' হিসেবে দেখানো হয়েছে। একটি বেদনাদায়ক সংস্কৃতি যা হল, পাশ্চাত্যকরণ কিন্তু প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ বিবর্জিত। তবে, আধুনিকীকরণ এবং পাশ্চাত্যকরণ ঘটে থাকে পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি অপাশ্চাত্য দেশের সাড়া দেবার ওপর। প্রাথমিকভাবে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ দুটোই খুবই নিকটে এবং পরস্পরে সংযুক্ত থাকে। অপাশ্চাত্য সমাজ পশ্চিমাসমাজ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে চায় এবং এতে অগ্রগতি হয় খুবই ধীরগতিতে।

আধুনিকীকরণের মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, পাশ্চাত্যকরণের পরিমাণ তত হ্রাস পায় এবং সেইসঙ্গে দেশজ সংস্কৃতি পুনঃজাগরিত হতে শুরু করে। অন্যভাবে বলা যায়, আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সভ্যতাসমূহের 'ভারসাম্যের' ধারা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে বদলিয়ে দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে অপাশ্চাত্যে 'দেশজ সংস্কৃতি' চাঙা হয়ে উঠেছে।

ফিগার ৩.১
পাশ্চাত্যের প্রভাবের বিকল্পসমূহ



পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যকরণ এভাবেই আধুনিকীকরণকে সহায়তা দিয়েছিল। পরবর্তীতে কিন্তু আধুনিকীকরণ অপাশ্চাত্যকরণকে উৎসাহিত করল। আর দেশজ সংস্কৃতি উপরে উঠে আসতে শুরু করল। সামাজিক পর্যায়ে আধুনিকীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হল এবং ওই বিষয়গুলো সমাজের মানুষকে নিজস্ব বা দেশজ সংস্কৃতির দিকে মুখ ফেরাতে উৎসাহিত করল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেখা যায় যে, আধুনিকীকরণ ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করল এবং একধরনের শূন্যতা জাগ্রত হল। যেহেতু ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্ক জটিল হয়ে গেল, সেহেতু ব্যক্তি তার 'পরিচয় সংকটে' নিপতিত হল, আর ধর্মের মধ্যে এসব পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের উপায় খুঁজতে শুরু করল। এই কার্যকারণ ৩.২ ফিগারে দেখানো হল।

ফিগার ৩.২
আধুনিকীকরণ এবং আংস্কৃতিক পুনরুত্থান



প্রাগ-অনুমান-নির্ভর এই সাধারণ মডেলটি সমাজ-বিবর্তনের তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টির সঙ্গে মিল রেখেই করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রায় সকল অপাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় হাজার বৎসর বা তারও অধিককাল টিকে আছে। তারা কখনও কখনও অন্যান্য সভ্যতা থেকে কিছু ধার করছে একথাও সত্য, তবে তা করা হয়েছে টিকে থাকার স্বার্থে। চীনারা ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও পণ্ডিতজনেরা একমত যে, চীনে 'ভারতীয়করণ' ঘটেনি। চীনারা বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিল তাদের স্বার্থে এবং উদ্দেশ্যে। চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তারপরও 'চীনা' হিসেবেই থেকে গেল।

'অপাশ্চাত্য সমাজসমূহ পশ্চিম-কে অনুকরণ করলেই তাদের আধুনিকায়ন আরম্ভ হবে।' তবে মধ্যম রাস্তা গ্রহণেচ্ছু কেমালপন্থীদের এ যুক্তি এখনও প্রমাণিত হয়নি। কেমাল আতার্তুক-এর চরম অনুসারীদের অপাশ্চাত্যসমাজের পাশ্চাত্যকরণের পথ পাড়ি

দিয়েই আধুনিকায়নের যে এগিয়ে যেতে হবে তাও সর্বজনীন হিসেবে গৃহীত হয়নি। তা হলে প্রশ্ন আসে : এমন কি কোনো অপাশ্চাত্য সমাজ রয়েছে, যার আধুনিকায়নের জন্য তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বাধা হিসেবে দাঁড়ায় এবং আধুনিকায়নের জন্য মৌলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে আধুনিকায়ন শুরু হবে? তত্ত্বগতভাবে এটি নিখুঁত সংস্কৃতির বদলে 'নিমিত্তস্বরূপ বা উপায়ভিত্তিক সংস্কৃতি'র সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিমিত্তস্বরূপ বা উপায়ভিত্তিক সংস্কৃতি হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে মধ্যমমাত্রার লক্ষ্য অর্জনে আত্মশক্তি নিয়োগ করা। এ অবস্থায় সমাজ পরিবর্তনের জন্য ওই সমাজের মৌল প্রতিষ্ঠানগুলোর গায়ে তেমন আঁচড় লাগাবার প্রয়োজন পড়ে না বরং তা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বহুকাল ধরে চলতে পারে। অন্যদিকে 'নিখুঁতপন্থা', 'বলা চলে তাকে যা নিমিত্তকরণপন্থার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীনভাবে স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জন এবং চূড়ান্তভাবে স্থিরকৃত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে... সমাজ, রাষ্ট্র, কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি অব্যাহত রেখে বজ্রকঠিনভাবে সংস্কৃতি রক্ষা করা যেখানে ধর্মপথপ্রদর্শনার ক্ষেত্রে একটি পরিব্যাপক ভূমিকায় থাকতে পারে। তবে এ-ধরনের ব্যবস্থা নবচেতনা বিকাশের ও আবিষ্কারের পরিপন্থী ও বিরোধী।'[৪৫] ডেভিড এ্যাপটার এই সূত্রটি আফ্রিকার গোত্রগুলোর পরিবর্তনধারা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন। আইজেনড্যাট এশীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য বিশ্লেষণে এ পথ গ্রহণপূর্বক প্রায় একইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন। কোনো সমাজের অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের জন্য, 'প্রয়োজন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতা।'[৪৬] এই কারণে দেখা যায়, কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজের চাইতে হিন্দু ও 'নিমিত্তবাদী' জাপানি সমাজ দ্রুত এবং আগেই সহজে আধুনিকায়নের পথের যাত্রী হতে পেরেছে। তারা অতি সহজে এবং বিনা প্রতিবন্ধকতায় চলমান সংস্কৃতি পরিবর্তনের নিমিত্তে নতুন নতুন প্রযুক্তি সহজে আমদানি করতে সক্ষম হয়েছে। এর দ্বারা কি এই বুঝায় যে, কনফুসীয় এবং ইসলামি সমাজ হয় আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ পরিত্যাগ করবে বা তাকে আলিঙ্গন করবে? এ বিষয়ে পথ বাছাই অত সীমিত নয়। জাপান, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানের বাইরেও সৌদি আরব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রিক হলেও ইরান কিন্তু 'পাশ্চাত্যকরণ' ব্যতিরেকেই তাদের সমাজকে আধুনিক করতে সচেষ্ট হয়েছে। ইরানের শাহ কট্টর কেমালপন্থী হলেও তার প্রতিক্রিয়ায় ইরানিরা পশ্চিমাবিরোধী হয়ে উঠলেও 'আধুনিকতার' বিরোধী হয়ে ওঠেনি। চীন নিজেও কিন্তু সংস্কারের পথে শুভযাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

ইসলামি সমাজের আধুনিক হওয়ার পথে অনেক কাঁটা ছড়ানো ছিল। পাইপস্ তাঁর যুক্তিতে অটল থাকতে চান যে, উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যকরণ একটি পূর্বশর্ত। আর ইসলামের সঙ্গে আধুনিকায়নেরও রয়েছে দ্বন্দ্বপূর্ণ সম্পর্ক। যেমন অর্থনীতিক দৃষ্টিতে সুদ, রোজা, উত্তরাধিকার আইন, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি প্রশ্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। তারপরও তিনি ম্যাক্সিন রোডিনসনকে উদ্ধৃত করে বলতে চান যে, এমন কোনো জোরালো অবস্থা মুসলিম সমাজে নেই যার দ্বারা তারা ধনতন্ত্রে উত্তরণের রাস্তা বন্ধ করতে পারে। কেননা, বিষয়টির অর্থনৈতিক গুরুত্বই সর্বাগ্রে :

ইসলামের সঙ্গে আধুনিকতার কোনোপ্রকার সংঘাত নেই। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিজ্ঞানচর্চা করতে পারেন, দক্ষতার সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে পারেন, অত্যাধুনিক অস্ত্র চালনা করতে পারেন। আধুনিকতার সঙ্গে কারও রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধারণকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ধারার কোনো সম্পর্ক তেমন নেই; নির্বাচন, জাতীয় সীমানা, পৌর সমাবেশ বা অন্যান্য পাশ্চাত্যের ধারা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অত্যাবশকীয় শর্ত নয়। মুসলমানেরা কৃষির উন্নতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারেন। কোনো কোম্পানিকে আধুনিক করতে বা পরিবর্তন করার বিষয়ে শরিয়ার কোনো বক্তব্য নেই। তেমনি কেউ কৃষি থেকে শিল্পে বিনিয়োগ করতে চাইলেও কোনো বাধা নেই। কেউ গ্রাম থেকে শহরে আসুক তাতে বাধা নেই। গণশিক্ষার বেলায়, যাতায়াত যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক কার্যাবলির ক্ষেত্রেও ইসলামে বাধানিষেধ নেই।[৪৭]

অনুরূপভাবে চরম পাশ্চাত্যবিদ্বেষী এবং কট্টর স্বদেশমুখী সংস্কৃতিবানরাও আধুনিক ই-মেইল, ক্যাসেট, টেলিভিশনের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য জাহির করে যাচ্ছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিকীকরণের অর্থ কিন্তু পাশ্চাত্যকরণ নয়। অপাশ্চাত্য সমাজ তাদের 'নিজত্ব' রক্ষা করেই বা নিয়েই তাদের সমাজকে আধুনিক করতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পশ্চিমা মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং তার বাস্তবায়নের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তবে এটি তখনই বিরোধাত্মক বা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে যখন আধুনিকীকরণের চাইতে পশ্চিমাকরণের প্রতিবেশী তোড়জোড় ও হাঁকডাক দেয়া হয়ে থাকে। এ অবস্থাকে ব্রুডেল বলেছেন প্রায় সর্বতোভাবে বালকসুলভ ভাবনা যে, একটি 'একক সভ্যতা' বা 'একক আধুনিকীকরণ' প্রক্রিয়া ইতিহাসকে বিবেচনায় না নিয়ে এক্ষেত্রে বিভিন্নতা বা বহুমাত্রিকতাকে উতরিয়ে পার পেয়ে যাবে।[৪৮] আধুনিকীকরণ এক অর্থে বরং সেইসব সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়, যেসব সংস্কৃতি প্রকারান্তরে একপর্যায়ে পাশ্চাত্যকে শক্তিহীন করে তোলে। মৌল ধারণায় বলা যায় : বিশ্ব ক্রমেই যত আধুনিক হচ্ছে, তা যেন ততই কম পাশ্চাত্য হয়ে পড়ছে।

(খ)

সভ্যতার ভারসাম্যের বদল

অধ্যায় - ৪

বিবর্ণ পাশ্চাত্য : ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং স্বদেশীয়করণ/দেশিককরণ

পাশ্চাত্যশক্তি : আধিপত্য এবং তার ক্ষয়

পাশ্চাত্যের সভ্যতা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি চিত্র বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হল সর্বত্র পশ্চিমাদের বিজয়োল্লাস; যেন বিশ্বে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমের জন্য একমাত্র ভীতি এবং চ্যালেঞ্জস্বরূপ শক্তির বিলুপ্তির ফলে বিশ্ব নতুন ধরন পাবে, যার লক্ষ্য অগ্রাধিকারসমূহ এবং পাশ্চাত্যবিশ্বের প্রধান প্রধান স্বার্থগুলো সম্ভবত জাপানের সহায়তায় এগিয়ে নিতে হবে। যেহেতু একটিমাত্র বৃহৎ শক্তি বজায় থাকল, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে কৌশলগত এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো জাপান এবং জার্মানির সহায়তায় গ্রহণ করে থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা হল একমাত্র সভ্যতা যার স্বার্থ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা ও অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এবং সে কারণে সকল অঞ্চল ও সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তাসহ অন্যান্য ইস্যুগুলোর ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। অন্যান্য সভ্যতার অন্তর্গত সমাজগুলো তাদের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের সাহায্য-সহযোগিতা চায়; বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য অর্জন ও স্বার্থ রক্ষার জন্য।

পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে একজন পণ্ডিত বলেন :

- আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মালিকানা অর্জন ও তা পরিচালনা করে থাকে;
- আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিশালী মুদ্রাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;
- আন্তর্জাতিক পণ্যের প্রধান ভোক্তা ও ক্রেতা;
- বিশ্বের প্রস্তুতকৃত প্রধান প্রধান পণ্যের সর্বোচ্চ সরবরাহকারী;
- আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;
- অন্যান্য সভ্যতাভুক্ত সমাজগুলোর ওপর নৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে;

- সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে;
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণকারী;
- অগ্রগামী ও অগ্রবর্তী গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ব্রতী হয়ে থাকে;
- বিশ্বে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণকারী;
- মহাশূন্যের নিয়ন্ত্রক;
- উড়োজাহাজ নির্মাণশিল্প নিয়ন্ত্রণকারী;
- আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে;
- উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী।[১]

দ্বিতীয় চিত্রটি হল এই যে, পশ্চিমাবিশ্ব খুবই আলাদা। এই সভ্যতাটি এখন অবক্ষয়ের পথের অবশ্যম্ভাবী পথযাত্রী। বিশ্ব রাজনৈতিক, অর্থনীতিক এবং সামরিক ক্ষমতার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব আপেক্ষিকভাবে অন্য সভ্যতাসমূহের তুলনায় ক্রমহ্রাসমান। শীতলযুদ্ধ পাশ্চাত্যের বিজয় এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তার চেয়েও কঠিন সত্য হল, যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্য আজ খুবই পরিশ্রান্ত। পাশ্চাত্যবিশ্ব আজ তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে আসছে, জনসংখ্যা নিশ্চল হয়ে আছে, বেড়েছে বেকারত্ব, সরকারের বাজেট ঘাটতি প্রচুর, শ্রমনীতি উপেক্ষিত হচ্ছে বারবার। নিম্নহারের সঞ্চয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের অনেক দেশের আজ সামাজিক পরিস্থিতি খণ্ডবিখণ্ডিত, নেশা এবং অপরাধ আজ নিত্যসঙ্গী। অর্থনেতিক শক্তি দ্রুত পূর্বগোলার্ধের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে এবং সেমতো রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিও পাশ্চাত্যে হ্রাস পেয়ে পূর্বদিকেই যেন বাড়ছে। ভারত অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রবর্তী পর্যায়ে চলে যাবার পথে। আর ইসলামি বিশ্ব ক্রমাগতই যেন পশ্চিমাবিদ্বেষী হয়ে উঠছে। পশ্চিমাদের উপদেশ, আদেশ আজ আর কেউ কর্ণপাত করতে চাইছে না; এতে করে পাশ্চাত্য নিজেও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে বিশ্বের ওপর মার্কিন প্রভাব হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়টি নানারূপ বিতর্কের পর্যায়ে চলে যায়। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যপ্রান্তে বিশ্বশক্তিসমূহের ভারসাম্যের অবস্থা নিম্নরূপভাবে বিশ্লেষিত হয় যা উপরের বক্তব্যেরই সমর্থক :

> বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপেক্ষিক ক্ষমতা দিনদিন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাবে। তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা, 'বিশেষ করে জাপান এবং চীনের তুলনায় আরও খারাপ এবং অবনতিশীল অবস্থার দিকে যাবে। সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক শক্তিসমূহ (সম্ভবত ইরান, ভারত এবং চীন) তরতর করে বেড়ে উঠছে এবং শক্তির ভারসাম্যে তাদের পাল্লা ভারী করছে, এ যেন 'কেন্দ্র' দুর্বল হয়ে 'অঞ্চল' শক্তিশালী হওয়ার মতো ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কাঠামোগত শক্তিও অন্য জাতির হস্তগত হচ্ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রহীন সংগঠন তথা আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোও ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে।[২]

উপরের দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী ছবির মধ্যে পাশ্চাত্যবিশ্ব কোন্ স্থানে এখন রয়েছে এবং তার বাস্তব চিত্র কী ইঙ্গিত বহন করছে? উত্তর হবে এমন যে, অবশ্যই দুটোই একত্রে কাজ করছে। পশ্চিমাবিশ্ব বিশ্বে আধিপত্য বজায় রাখছে এবং সম্ভবত তারা তাদের এ আধিপত্য একবিংশ শতাব্দীতেও দাপটের সঙ্গে বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তবে, একথাও সত্য যে, বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির ও সভ্যতার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিমাশক্তি দিনদিন তাদের ক্ষমতা হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এশীয় সভ্যতাসমূহ ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। চীন প্রায় এমন পর্যায়ে এসে গিয়েছে, যেখান থেকে সে বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

বিশ্বক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি বা ক্ষমতার স্থানান্তরের ফলে প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, অপাশ্চাত্য সভ্যতা ও শক্তিগুলো দিনদিন বলিষ্ঠ হয়ে উঠছে এবং তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি বর্জনের ডাক দিচ্ছে।

পশ্চিমাশক্তির অবক্ষয়কে মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্যে ভাগ করে দেখা যেতে পারে :

প্রথমত, এটি একটি ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া। পশ্চিমাশক্তির উত্থানে সময় লেগেছিল প্রায় চারশত বৎসর। তাই পাশ্চাত্যশক্তির পশ্চাদপসরণেরও প্রায় অনুরূপ সময় লাগার কথা। ১৯৮০-এর দশকে একজন জাঁদরেল ব্রিটিশ পণ্ডিত হেডলি বুল (Hedley Bull) যুক্তি দেখান যে, 'বিশ্বের অবশিষ্টাংশে প্রভাববলয় বিস্তারের শীর্ষশাখায় ইউরোপ অথবা পাশ্চাত্য ১৯০০ সালে আরোহণ করেছিল।'[৩]

স্পেংলারের বই *Decline of West*-এর প্রথম সংখ্যা আসে ১৯১৮ সালে এবং ওই বইটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসচিন্তার একটি কেন্দ্রীয় খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রক্রিয়াটি সমগ্র শতাব্দীব্যাপী প্রলম্বিত হয়েছিল। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্যান্য উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের সামর্থ্যের ওপর, যা এস্ (S) বক্রতার ওপর প্রায়শই নির্ভরশীল; অর্থাৎ শুরুটা হবে ধীরগতিসম্পন্ন এবং তারপর তা দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে যা ব্যাপক বিস্তৃতিকে কমিয়ে দেবে এবং তারপর মসৃণভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। একটি দেশের অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা আবার এস্ (S) বক্রতার উল্টোযাত্রার ওপর নির্ভর করে ঘটে থাকে, যা সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। প্রথমে ছিল মধ্যমগতিসম্পন্ন, তারপর তা দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়; কিন্তু তলায় ছিল না শক্ত ভিত্তি। পাশ্চাত্যের পাশ্চাৎপদতা সেরকমই হবে, অর্থাৎ প্রথমে ধীর, তারপর হয়তো খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে চূড়ান্ত পতনের অবস্থাটি।

দ্বিতীয়ত, পশ্চাৎপ্রবণতা সোজা পথে ও সহজ রেখায় এগিয়ে যাবে না। এটি সবসময়ই অনিয়মিত, বিরতিপ্রবণ, পুনঃপ্রবর্তনরত এবং পুনরুত্থানের শামিল, যা পাশ্চাত্যশক্তির অবক্ষয়ের ও দুর্বলতার প্রর্দশনী বারবার ঘটাতে থাকবে। মুক্ত, উদার ও গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থা পাশ্চাত্যকে সেই ক্ষমতা প্রদান করেছে যে ক্ষমতাবলে পাশ্চাত্য ভুলভ্রান্তিগুলো ঝেড়ে ফেলে তার অনুসৃত নীতির সহজ নবায়ন করতে পারে। অন্যান্য সভ্যতার যা নেই, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার থাকে, যেমন ক্ষমতার প্রধান দুটি কেন্দ্র। এই অবক্ষয়কে বুল (Bull) দেখেছেন এভাবে যে, এটি ১৯০০ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং যা আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইউরোপীয় উপাদানসমূহের অবক্ষয়। ১৯১০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপ ছিল নিজের বিরুদ্ধে নিজেই বিভেদায়িত। এর অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল সমস্যায় ভরপুর। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমাশক্তির আধিপত্যের নতুন মাত্রা যুক্ত হয় এবং ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বকে আপন কর্তৃত্বের মধ্যে নিয়ে আসে। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কলোনিবিমুখ প্রক্রিয়া পুনরায় ইউরোপের ক্ষমতা পূর্বতন কলোনিসহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে দারুণভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসময় নতুন অবস্থান্তরকালীন এবং সাম্রাজ্যবাদী একটি বিকল্প ধারা তৈরি করে ফেলে। শীতলযুদ্ধকালে অবশ্য বলা যায়, আমেরিকার সামরিক ক্ষমতা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমকক্ষ ছিল এবং আমেরিকার অর্থনীতি জাপানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তারপরও সময়ে সময়ে তার সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৯১ সালে অন্য একজন জাঁদরেল ব্রিটিশ পণ্ডিত বেরি বুজান (Barry Buzan) যুক্তি দেখান যে, "গভীরতম বাস্তবতা হল এই যে, 'কেন্দ্র' (Centre) এখনও অধিকতর প্রভাবশালী এবং 'অঞ্চল' (Periphery) এখনও অধিকতরভাবে অধীনস্থ পর্যায়ে রয়েছে, যা যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল, এমনকি কলোনিকালীন সময়ে এমনটি ঘটেনি।"[৪]

তৃতীয়ত, ক্ষমতা ব্যবহার করে একজন মানুষ বা একটি গোষ্ঠী, অন্য মানুষ অথবা অন্য গোষ্ঠীর আচরণ বদলিয়ে দিতে পারে। আচরণ পাল্টাতে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেও এটি সম্ভব। আবার শক্তি প্রয়োগ করেও তা করা যায়। অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রাতিষ্ঠানিক, জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সামাজিক অথবা অন্যান্য বিষয়াদি ব্যবহার করে তা করা হয়ে থাকে। অতএব, একটি রাষ্ট্রের অথবা একটি গোষ্ঠীর ক্ষমতা সাধারণত তার সম্পদের নিরিখে পরিমাপ করা যায়, অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী তার জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে; আবার অন্য রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী তার ওপর খবরদারি করতে চাইলে সম্পদ ব্যবহার করেই সে প্রক্রিয়া দমন করা সম্ভব। পাশ্চাত্যবিশ্বের সে-ক্ষমতা থাকলেও সবটুকু আছে এমন বলা যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা-সম্পদ পশ্চিমাবিশ্বের নিকট বিংশ শতাব্দীর শুরু হতে দিনদিন ক্ষয় হতে আরম্ভ করে এবং আপেক্ষিকভাবে পাশ্চাত্যবিরোধী অবশিষ্ট সভ্যতার হাত শক্ত হতে থাকে।

ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা

১৪৯০ সালে পশ্চিমাসমাজ ইউরোপের প্রায় সমগ্র উপদ্বীপ (বলকান এলাকা বহির্ভূত) অথবা সম্ভবত পৃথিবীর ৫২.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল ভূমির (অ্যানটারটিকা ব্যতীত) নিজেরা প্রায় ১.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল এলাকা করতলগত করে নিয়েছিল। ১৯২০ সালে পশ্চিমাবিশ্ব তার ভূমি সম্প্রসারণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২৫.৫ মিলিয়ন স্কয়ার মাইল এলাকা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছিল, যা ছিল প্রায় পৃথিবীর অর্ধেক এলাকা। ১৯৯৩ সালে এই ভূমির প্রায় অর্ধেক বেদখল হয়ে যায় এবং পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২.৭ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য পুনরায় তার, অর্থাৎ ইউরোপ তার আদি বা মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত হয় এবং সেসঙ্গে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে যুক্ত করে ফেলে। ইসলামি ও স্বাধীন সমাজের সংখ্যা বিপরীতভাবে বেড়ে যায় এবং তা ১৯২০ সালে ১.৮ স্কয়ার মিলিয়ন মাইল থেকে ১৯৯৩ সালে ১১ মিলিয়ন স্কয়ার মাইলে গিয়ে পৌঁছে। জনসংখ্যার বেলাতেও অনুরূপ চিত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ১৯০০ সালে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ ইউরোপে ছিল এবং ইউরোপীয়রা বিশ্বের শতকরা ৪৫ ভাগ মানুষের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করত। আর ১৯২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। ১৯৯৩ সালে হংকং ব্যতীত পাশ্চাত্যরা পাশ্চাত্য জনগণ ভিন্ন অন্য আর কাউকে শাসন করত না। জনসংখ্যার দিক থেকে ১৯৯৩ সালে পাশ্চাত্যবিশ্ব বিশ্বে ৪র্থ স্থানে ছিল। তার উপরে ছিল সিনিক, ইসলামিক এবং হিন্দুসভ্যতার অধীনের মানুষজন।

সুতরাং, স্পষ্টতই বলা যায়, সংখ্যাগত বিচারে পাশ্চাত্যরা জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে একটুখানি পিছিয়ে যেতে থাকে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হতে শুরু করে। সংখ্যাগত দিক থেকে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য সভ্যতার মানুষের মধ্যে (তুলনামূলক) ভারসাম্য বিচার করলে দেখা যায়, তাও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তা পাশ্চাত্যের পাল্লার চেয়ে অন্যান্য সভ্যতার পাল্লা ভারী করছে। অপাশ্চাত্যের মানুষজন পূর্বের তুলনায় এখন অনেক স্বাস্থ্যবান, শহুরে, শিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যু হার লাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণএশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে যা ৩০ বৎসর পূর্বেও ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। গড় আয়ু এসব এলাকায় দৃষ্টান্তমূলকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আফ্রিকায় আগের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ১১ বৎসর এবং ২৩ বৎসর বেড়েছে পূর্বএশিয়ায়। ১৯৬০ সালের দিকে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। ১৯৯০ সালের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে (আফ্রিকা ব্যতীত) দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগে। ভারতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ, আর চীনে শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ লিখতে ও পড়তে পারে।

টেবিল ৪.১

রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত সভ্যতাসমূহের ভূখণ্ড (১৯০০-১৯৯৩)

এক হাজার বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত সভ্যতাসমূহের সমষ্টিভুক্ত ভূখণ্ড

বৎসর	পাশ্চাত্য	আফ্রিকা	সিনিক	হিন্দু	ইসলামিক	জাপানি	লাটিন আমেরিকা	অর্থোডক্স	অন্যান্য
১৯০০	২০,২৯০	১৬৪	৪,৩১৭	৫৪	৩,৫৯২	১৬১	৭,৭২১	৮,৭৩৩	৭,৪৬৮
১৯২০	২৫,৪৪৭	৪০০	৩,৯১৩	৫৪	১,৮১১	২৬১	৮,০৯৮	১০,২৫৮	২,২৫৮
১৯৭১	১২,৮০৬	৪,৬৩৬	৩,৯৩৬	১,৩১৬	৯,১৮৩	১৪২	৭,৮৩৩	১০,৩৪৬	২,৩০২
১৯৩৩	১২,৭১১	৫,৬৮২	৩,৯২৩	১,২৭৯	১১,০৫৪	১৪৫	৭,৮১৯	৭,১৬৯	২,৭১৮

*বিশ্বের ভূখণ্ড শতকরা হিসেবে**

১৯০০	৩৮.৭	০.৩	৮.২	০.১	৬.৮	০.৩	১৪.৭	১৬.৬	১৪.৩
১৯২০	৪৮.৫	০.৮	৭.৫	০.১	৩.৫	০.৫	১৫.৪	১৯.৭	৪.৩
১৯৭১	২৪.৪	৮.৮	৭.৫	২.৫	১৭.৫	০.৩	১৪.৯	১৯.৭	৪.৪
১৯৯৩	২৪.২	১০.৮	৭.৫	২.৪	২১.১	০.৩	১৪.৯	১৩.৭	৫.২

Note : Relative world territorial shares based on prevailing state borders as of indicated year.

* অ্যান্টারটিকা বাদ দিয়ে বিশ্ব ভূখণ্ড ৫২.৫ ধরা হয়েছে।

Source: *statesman's year Book* (New York st. Martin's Press. 1901-1927) : *World Book Atlas* (Chicago : Field Enterprises Educational Corp. 1970) : *Britannica Book of the year* (Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc. 1992-1994).

টেবিল ৪.২

বিশ্বের প্রধান প্রধান সভ্যতার অধীনে জনসংখ্যার বন্টন ১৯৯৩ (হাজারে)

সিনিক	১৩,৪০,৯০০	লাটিন আমেরিকা	৫০৭,৫০০
ইসলামি	৯২৭,৬০০	আফ্রিকা	৩৯২,১০০
হিন্দু	৯১৫,৮০০	অর্থোডক্স	২৬১,৩০০
পাশ্চাত্য	৮০৫,৪০০	জাপানি	১২৪,৭০০

Source : Calculated from figures in *Encyclopedia Britannica. 1994 Book* of the Year (Chicago : *Encyclopedia Britannica*, 1994) pp 764-69.

দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের হার ১৯৭০ সালে ছিল গড়ে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্তু ১৯৯২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭১ ভাগে। আফ্রিকা ব্যতীত অন্যান্য দেশে ১৯৯০ সালের দিকে দৃশ্যত শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ (বয়স নির্বিশেষে) প্রাথমিক শিক্ষায় নাম লেখাতে শুরু করে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে এশিয়া, লাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের এবং আফ্রিকায় সক্ষম জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মানুষ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করতে আসত। কিন্তু ১৯৯০ সালের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৫০ ভাগে (আফ্রিকা বাদে)। ১৯৬০ সালে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল গড়ে এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু ১৯৯২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৯ থেকে ৭৩ ভাগ লাটিন আমেরিকায়, শতকরা ৩৪ থেকে ৫৫ ভাগ আরবের দেশসমূহে, ১৪ থেকে ২৯ ভাগ আফ্রিকায়, ১৮ থেকে ২৭ ভাগ চীনে, ১৯ থেকে ২৬ ভাগ ভারতে বৃদ্ধি পায়।[৬]

অক্ষরজ্ঞান, শিক্ষা এবং নগরায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে মানুষ জড়ো হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে, যা একদিকে অগ্রগতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসে; অন্যদিকে, কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে নিরক্ষর কৃষকদের বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় তাকেও হয়তো হতাশ হতে হয়, কেননা শিক্ষা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়। সামাজিকভাবে জড়ো হওয়ার ক্ষমতা সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি অত্যন্ত বড় মাপের বিষয়। ১৯৫৩ সালে শতকরা ১৫ ভাগ ইরানি ছিল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, আর শহরে বাস করত মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ মানুষ, এমতাবস্থায় কারমিট রোজভেল্ট (Kermit Rosevelt) সহ সিআই-এর (CIA) অন্যান্য কর্মকর্তারা খুব সহজেই একটি অগ্রগামী কর্মকাণ্ড দমিয়ে ফেলে এবং শাহ্ শাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৯ সালে যখন শতকরা ৫০ ভাগ ইরানি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয় এবং শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪৭ ভাগ, তখন কিন্তু মার্কিনশক্তি আর শাহ্-শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও উষ্মাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক এখনো পাশ্চাত্যদেশ থেকে চীনা, ভারতীয়, জাপানি, আরবীয়, আফ্রিকান, রুশদেশে পরিদৃষ্ট হয়। একথা সত্য, এই তফাতের মাত্রা দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে অন্যদিকে আবার অন্য একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে। পাশ্চাত্যদেশসহ জাপান এবং রাশিয়ার জনগোষ্ঠীর গড় বয়স মোটামুটি স্থির রয়েছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর আর বিরাটসংখ্যক বৃদ্ধমানুষকে কাজের বোঝা টানতে হয় না। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতার ক্ষেত্রে এ চিত্র ভিন্নতর। সেখানে বিরাটসংখ্যক শিশু রয়েছে যারা ওই সভ্যতার জন্য বোঝাস্বরূপ। অথচ, এরাই হল ভবিষ্যতের শ্রমশক্তি ও যুদ্ধের সৈনিক।

টেবিল ৪.৩

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকা বিশ্বের সভ্যতাসমূহের জনসংখ্যা বন্টন ১৯০০-২০২৫ (শতকরা হিসেবে)

বৎসর	বিশ্বসমগ্র*	পাশ্চাত্য	আফ্রিকা	সিনিক	হিন্দু	ইসলামিক	জাপানি	লাটিন আমেরিকা	অর্থোডক্স	অন্যান্য
১৯০০	১.৬	৪৪.৩	০.৪	১৯.৩	০.৩	৪.২	৩.৫	৩.২	৮.৫	১৬.৩
১৯২০	১.৯	৪৮.১	০.৭	১৭.৩	০.৩	২.৪	৪.১	৪.৬	১৩.৯	৮.৬
১৯৭১	৩.৭	১৪.৪	৫.৬	২২.৮	১৫.২	১৩.০	২.৮	৮.৪	১০.০	৫.৫
১৯৯০	৫.৩	১৪.৭	৮.২	২৪.৩	১৬.৩	১৩.৪	২.৩	৯.২	৬.৫	৫.১
১৯৯৫	৫.৮	১৩.১	৯.৫	২৪.০	১৬.৪	১৫.৯**	২.২	৯.৩	৬.১***	৩.৫
২০১০	৭.২	১১.৫	১১.৭	২২.৩	১৭.১	১৭.৯**	১.৮	১০.৩	৫.৪***	২.০
২০২৫	৮.৫	১০.১	১৪.৪	২১.০	১৬.৯	১৯.২**	১.৫	৯.২	৪.৯***	২.৮

Notes : Relative world population estimates based on prevailing state borders as of indicated year. Population estimates for 1995 to 2025 assume 1994 borders.

* World population estimate in billions.

** Estimates do not include members of the commonwealth of independent states of Bosnia

*** Estimate include the commonwealth of independent states, Gorgia and the former Yugoslavia.

Source : United Nations, Population Division, Dept. for Economic and Social Information and Policy Analysis. *World Population Prospects*, the 1992 Revision (New York : United Nations 1993) : *Statesman's year Book* (New york : st. Martin's press, 1901-1927) World Almanac and Book of Facts (New York : Press Pub. Co. 1970-1993).

উৎপাদিত অর্থনৈতিক সামগ্রী

১৯২০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ এবং তাতে পাশ্চাত্যের অংশ ছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়। তবে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উৎপাদনে পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে ১৭৫০ সালে চীনের অংশ ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, ভারতের অংশ ছিল এক-চতুর্থাংশ আর পাশ্চাত্যের অংশ ছিল এক-পঞ্চমাংশেরও কম। ১৮৩০ সালের মধ্যে পাশ্চাত্য চীনের চাইতে একটু এগিয়ে আসে। পল বাইরোচি (Paul Bairoch) যেমন বলেছেন পাশ্চাত্যের শিল্পায়ন অবশিষ্ট বিশ্বের শিল্পায়নকে নিরুৎসাহিত করেছে। ১৯১৩ সালে

অপাশ্চাত্য দেশের বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে অংশ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ; এরূপ হার তাদের বেলায় ১৮০০ সালেও একইভাবে ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শুরুতে বিশ্বব্যাপী উৎপাদনব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের অংশীদারিত্ব নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৮.২ শতাংশে। তবে তারপর আবার খ্রিস্ট-অংশীদারিত্ব হ্রাস পায় এবং এর অগ্রগতির মাত্রা কমবেশি ধীরগতিতে চলতে থাকে। অন্যদিকে স্বল্প-শিল্পায়িত দেশগুলোর উৎপাদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিম-অংশ বিশ্বব্যাপী সমগ্র উৎপাদনের ৫৭.৪ শতাংশে এসে দাঁড়ায়; এ পরিমাণ উৎপাদন ১৮৬০ সালে অর্থাৎ ১২০ বৎসর পূর্বের মতো ছিল।[৭]

টেবিল ৪.৪

বিশ্বের অর্থনেতিক সামগ্রী উৎপাদনে সভ্যতা বা দেশভিত্তিক বন্টন (অংশীদারিত্ব) ১৭৫০-১৯৮০ শতকরা হিসেবে, বিশ্ব=১০০%

দেশ	১৭৫০	১৮০০	১৮৩০	১৮৬০	১৮৮০	১৯০০	১৯১৩	১৯২৮	১৯৩৮	১৯৫৩	১৯৬৩	১৯৭৩	১৯৮০
পাশ্চাত্য	১৮.২	২৩.৩	৩১.১	৫৩.৭	৬৮.৮	৭৭.৪	৮১.৬	৮৪.২	৭৮.৬	৭৪.৬	৬৫.৪	৬১.২	৫৭.৮
চীন	৩২.৮	৩৩.৩	২৯.৮	১৯.৭	১২.৫	৬.২	৩.৬	৩.৪	৩.১	২.৩	৩.৫	৩.৯	৫.০
জাপান	৩.৮	৩.৫	২.৮	২.৬	২.৪	২.৪	২.৭	৩.৩	৫.২	২.৯	৫.১	৮.৮	৯.১
ইন্ডিয়া/পাকিস্তান	২৪.৫	১৯.৭	১৭.৬	৮.৬	২.৮	১.৭	১.৪	১.৯	২.৪	১.৭	১.৮	২.১	২.৩
রাশিয়া ইউ.এস.এস.আর*	৫.০	৫.৬	৫.৬	৭.০	৭.৬	৮.৮	৮.২	৫.৩	৯.০	১৬.০	২০.৯	২০.১	২১.১
ব্রাজিল এবং মেক্সিকো	-	-	-	০.৮	০.৬	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮	০.৯	১.২	১.৬	২.২
অন্যান্য	১৫.৭	১৪.৬	১৯.১	৭.৬	৫.৩	২.৮	১.৭	১.১	০.৯	১.৬	২.১	২.৩	২.৫

* Includes Warsaw pact countries during the cold war years.

Source : Paul Bairoch, "International Industrialization Levels from 1750 to 1980" *Journal of European Economic History.* 11 (Fall 1982) 269-334

অর্থনীতিক উৎপাদন সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব নির্ভরশীল উপাত্তের অভাব রয়েছে। ১৯৫০ সালে, পশ্চিমাবিশ্ব মোটামুটি শতকরা ৬৪ ভাগ পণ্য উৎপাদন করেছে; ১৯৮০-এর দশকে এই উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশে (টেবিল ৪.৫)। ২০১৩ সাল নাগাদ, আগাম হিসেব অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের পাশ্চাত্যের অংশ গিয়ে দাঁড়াবে ৩০%। ১৯৯১ সালে, অন্য একটি হিসাব মতে বিশ্বের সাতটি বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে চারটিরই মালিক হল অপাশ্চাত্য সভ্যতা : জাপান (২য় স্থান), চীন (৩য় স্থান), রাশিয়া (৬ষ্ঠ স্থান) এবং ভারত (৭ম স্থান)। ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি এবং সর্বোচ্চ ১০টি দেশের মধ্যে পাঁচটি ছিল পাশ্চাত্যদেশের, বাকিগুলো অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। যেমন : চীন, জাপান,

ভারত, রাশিয়া এবং ব্রাজিল। ২০২০ সালের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী দেখানো হয় যে, বিশ্বের প্রথম পাঁচটি অর্থনীতি হবে ৫টি বিভিন্ন সভ্যতার অন্তর্গত এবং প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০টি অর্থনীতির মধ্যে পাশ্চাত্য বিশ্বের ভাগে থাকবে মাত্র ৩টি। পাশ্চাত্যের এহেন আপেক্ষিক অধঃপতন মূলত বৃহত্তরভাবে যে ইঙ্গিত দেয় তা হল, পূর্বাঞ্চলে (পূর্বএশিয়ায়) দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।[৮]

টেবিল ৪.৫

বিশ্বব্যাপী উৎপাদনে সভ্যতাভিত্তিক অংশগ্রহণ, ১৯৫০-১৯৯২ (শতকরা হিসাবে)।

বৎসর	পাশ্চাত্য	আফ্রিকা	সিনিক	হিন্দু	ইসলামিক	জাপানি	লাটিন আমেরিকা	অর্থোডক্স*	অন্যান্য**
১৯৫০	৬৪.১	০.২	৩.৩	৩.৮	২.৯	৩.১	৫.৬	১৬.০	১.০
১৯৭০	৫৩.৪	১.৭	৪.৮	৩.০	৪.৬	৭.৮	৬.২	১৭.৪	১.১
১৯৮০	৪৮.৬	২.০	৬.৪	২.৭	৬.৩	৮.৫	৭.৭	১৬.৪	১.৪
১৯৯২	৪৮.৯	২.১	১০.০	৩.৫	১১.০	৮.০	৮.৩	৬.২	২.০

* Orthodox estimate for 1992 includes the former USSR and the former Yugoslavia.

** "other" includes other civilizations and rounding error.

Sources : 1950, 1970, 1980 Percentages calculated from constant dollar data by Herbert Block. *The Planetary Product in 1980. A creative pause*? (Washington, D.C. Bureau of public Affaris, U.S. Dept. of state 1981) pp 30-45, 1992 percentages are calculated from World Bank purchasing. power parity estimates in table 30 of *World Development Report 1994* (New York : Oxford Uniessty press, 1994).

মোটামুটি অর্থনৈতিক উৎপাদন–অংশও অস্পষ্টভাবে পশ্চিমাবিশ্বের গুণগত সুবিধা এনে দেয়। পশ্চিমাবিশ্ব এবং জাপান প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রগামী প্রযুক্তি এবং শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। প্রযুক্তিসমূহ সাধারণত বিতরণযোগ্য, কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের আধিপত্য রক্ষার নিমিত্তে যতটুকু বিতরণ করলে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকবে ততটুকুই মাত্র বিতরণ করতে আগ্রহী থাকে। তবে বাস্তব সত্য হল এই যে, পশ্চিমাবিশ্ব যে প্রযুক্তিই তৈরি করে থাকে, তা যে-কোনোভাবে ধীরে হলেও অন্য সভ্যতার নিকট পৌঁছে যায়।

এটা উপলব্ধি সাপেক্ষ যে, বিশ্বে একদা চীন ছিল সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে প্রযুক্তি স্থানান্তর ও অর্থনৈতিক বিকাশ অপাশ্চাত্য বিশ্বকে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখার অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। অন্যান্য সভ্যতা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে; আর পাশ্চাত্যবিশ্ব আপেক্ষিকভাবে পেছনে চলে যাচ্ছে। বিগত দুইশত বৎসরের বিশ্বঅর্থনীতির ওপর পাশ্চাত্য আধিপত্যের দিন এখন সমাপ্ত হওয়ার পথে।

সামরিক সামর্থ্য

সামরিক শক্তির চারটি দিক রয়েছে, যেমন : গুণগত—সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, সম্পদাদি; প্রযুক্তিগত শক্তি—অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা ও উন্নত মান; সাংগঠনিক সক্ষমতা—প্রাঞ্জলতা, নিয়মানুবর্তিতা, প্রশিক্ষণ, সৈন্যদের মনোবল, হুকুম প্রদান ও হুকুম পালনের পরিস্থিতি; এবং সামাজিকতা— অর্থাৎ সামরিক বাহিনী লালন পালন এবং তাকে প্রয়োজনমাফিক দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের সামাজিক মনোবৃত্তি। ১৯২০-এর দশকে পশ্চিমাবিশ্ব সামরিক ক্ষেত্রে উল্লিখিত গুণাবলির বহু যোজন অগ্রভাগে ছিল। তারপর থেকে পশ্চিমাদের সামরিক শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে; বিশেষ করে অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে আপেক্ষিক শক্তির তুলনায়। এই ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি পশ্চিমাদের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার সামরিক শক্তির ভারসাম্যের ওপর প্রভাব রাখে এবং বলতে বাধা নেই : ভারসাম্যের পাল্লা অবশিষ্ট বিশ্বের সভ্যতার দিকে কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়ে।

আধুনিকীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সম্পদ এবং উন্নয়নের ইচ্ছা উভয়ই বাড়ে যা সামরিক ক্ষেত্রের জন্যও প্রযোজ্য, আর কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র এ-বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯৩০-এর দশকে জাপান এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিল, যা তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে প্রদর্শিত করতে পেরেছে। শীতলযুদ্ধকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের দখলে ছিল বিশ্বের দুটি মহাশক্তিধর সামরিক শক্তির একটি। অধুনা পশ্চিমাশক্তি প্রচলিত সামরিক শক্তিতে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুস্থানে রয়েছে। তবে পশ্চিমাশক্তির এ উচ্চাবস্থান কতদিন বহাল থাকবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং বলাবাহুল্য, অনিশ্চিতও বটে। যদিও দৃশ্যত মনে হয়, পশ্চিমাদের এ শক্তি এগিয়ে যাবে, কিন্তু সেইসঙ্গে এটিও লক্ষণীয় যে, অপাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে উল্লেখযোগ্য হারে সামরিক শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে।

টেবিল ৪.৬

বিশ্বের সামগ্রিক সামরিক শক্তির সভ্যতাভিত্তিক বণ্টন (শতকরা হিসেবে)

বৎসর (বিশ্ব সমগ্র)	পাশ্চাত্য	আফ্রিকা	সিনিক	হিন্দু	ইসলাম	জার্মানি	ল্যাটিন	অর্থোডক্স	অন্যান্য
১৯০০[১০,০৮৬]	৪৩.৭	১.৬	১০.০	০.৪	১৬.৭	১.৮	৯.৪	১৬.৬	০.১
১৯২০ [৮,৬৪৫]	৪৮.৫	৩.৮	১৭.৪	০.৪	৩.৬	২.৯	১০.২	১২.৮*	০.৫
১৯৭০ [২৩,৯৯১]	২৬.৮	২.১	২৪.৭	৬.৬	১০.৪	০.৩	৪.০	২৫.১	২.৩
১৯৯১ [২৫,৭৯৭]	২১.১	৩.৪	২৫.৭	৪.৮	২০.০	১.০	৬.৩	১৪.৩	৩.৫

Notes : Estimates based on prevailing state borders as of the year indicated. Word total (active duty) armed forces estimate for each selected year displayed in thousands.

* USSR component of figure is an estimate for the year 1924 by J. M. Mackintosh in B.H. Liddell-Hart, *the Red Army : the Red Army – 1918 to 1945. The Soviet Army – 1946 to present* (New York : Harcourt. Brace. 1956).

Sources : U.S. Arms Control and Disarmament Agency *World Military Expenditures and Arms transfers* (Washington, D.C: the Agency 1971-1994); *Statesman's Year Book* (New York : St. Martin's Press, 1901-1927).

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শীতযুদ্ধোত্তর বিশ্বে মোটামুটি ৫টি প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করা যায়, যার দ্বারা বিশ্ব সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা সম্ভব।

প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন বেঁচে থাকা অবধি বহাল ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সামরিক শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে শুধুমাত্র ইউক্রেন পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক শক্তি ও তার সামর্থ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। রাশিয়ার সামরিক শক্তির পরিমাণ হ্রাস পায়, তারা মধ্য ইউরোপ এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। 'ওয়ার্শ' চুক্তি আর রইল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে পরাস্ত করার পরিকল্পনা বাদ দিতে হল। সামরিক সাজসরঞ্জামগুলো হয় ফেলে দেয়া হল, নতুবা তা অকার্যকর করে রাখা হল। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেট বরাদ্দ দারুণভাবে হ্রাস করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া রাশিয়া তাদের সামরিক দর্শনেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। এখন থেকে তারা মনে করতে থাকল রাশিয়াকে রক্ষা করা এবং 'অতি নিকটের প্রতিবেশী দেশগুলোর' সঙ্গে বিবাদ মীমাংসা করা।

দ্বিতীয়ত, সামরিক খাতে রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য মনোযোগ ও বাজেট হ্রাসের ফলাফল পশ্চিমাবিশ্বের ওপরও কিছুটা বর্তায়। কেননা, মনে হচ্ছে এর জের হিসেবে পশ্চিমাজগৎ তাদের সামরিক ব্যয়বরাদ্দ, শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম মনোযোগ দিচ্ছে এবং কার্যত তাদের বেলাতেও সামরিক শক্তি হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বুশ এবং ক্লিনটনের পরিকল্পনা মোতাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় শতকরা ৩৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে (১৯৯০ সালে) ৩৪২.৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৮ সালে ২২২.৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যসংখ্যাও শীতলযুদ্ধ সময়ের তুলনায় হ্রাস পায়। সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সমগ্রসংখ্যা ২.১ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১.৪ মিলিয়নে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক (অস্ত্রশস্ত্র) পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সামরিক বাহিনীর জন্য ক্রয় হ্রাস পেয়ে ২৯ থেকে ৬ জাহাজ এবং ৯৪৩ থেকে ১২৭টি যুদ্ধবিমান, এবং ৭২০টি থেকে শূন্য ট্যাংক, ৪৮ থেকে ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয় করা বা সংগ্রহ করা হয়।

১৯৮০-এর দশকে অনুরূপভাবে ব্রিটেন, জার্মানি এবং কিছুটা হলেও ফ্রান্স তাদের সামরিক ব্যয় ও সামরিক শক্তি হ্রাস করেছিল। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে জার্মানির সামরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৩৭০০০০ থেকে ৩৫০০০০ এবং সম্ভবত তা পরে ৩২০০০০-এ নেমে আসে। ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা ১৯৯০ সালে ২৯০০০০ থেকে হ্রাস

পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৯৭ সালে ২২৫০০০-এ। ব্রিটেনে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৮৫ সালে ৩৭৭১০০ থেকে ১৯৯৩ সালে ২৭৪৮০০-এ দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত, সামরিক বিষয়াদি পূর্বএশিয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় যা রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যবিশ্ব থেকে আলাদা। পূর্বএশিয়ার এখন সামরিক শক্তিবৃদ্ধি প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। চীন এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী দেশ। চীনের অর্থনীতির দারুণ অগ্রগতির সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে তাদের শক্তিবৃদ্ধি সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্বএশীয় অন্যান্য দেশসমূহ তাদের সামরিক শক্তির নবায়ন ও আধুনিকায়ন করছে এবং সেসঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়ও বাড়াছে। জাপান অতি উচ্চমার্গের অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর এবং ইন্দোনেশিয়াও আগের তুলনায় এখন সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করছে এবং তারা সবাই যুদ্ধের জন্য উড়োজাহাজ, ট্যাংক, জাহাজ ক্রয় করছে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির ও অন্যান্য দেশ থেকে। অন্যদিকে ন্যাটো-র (NATO) সামরিক ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে প্রায় ১০ শতাংশ। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৩ সালে ৫৩৯.৬ বিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৪৮৫.০ বিলিয়ন ডলারে (১৯৯৩ সালের ডলারের হিসেবে)। পূর্বএশিয়ার সামরিক খরচপত্র প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে যা ৮৯.৮ বিলিয়ন থেকে ১৩৪.৮ বিলিয়ন ওই একই সময়ে।[৯]

চতুর্থত, গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র আজ সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। যেসব দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ, সেসব দেশ এসব অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র তৈরি করার যোগ্যতা রাখে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ জঙ্গি উড়োজাহাজ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ সংখ্যা ১ থেকে ৮-এ উন্নীত হয়েছে।

ট্যাংক তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষমতা ১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬-এ; হেলিকপ্টার নির্মাণের বেলায় এক থেকে ৬-এ গিয়েছে এবং কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র এক থেকে বেড়ে হয়েছে ৭-এ।

তৃতীয়ত, বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে (যেমন রাশিয়া, চীন, ইসরায়েল, ভারত, পাকিস্তান এবং সম্ভবত উত্তর কোরিয়া)। অন্যদিকে এ অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যথাক্রমে ইরান, ইরাক, লিবিয়া এবং সম্ভবত আলজেরিয়া।

উপরের সকল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সামরিক শক্তির কৌশলগত দিকের আঞ্চলিকীকরণ প্রবণতা শীতলযুদ্ধোত্তর অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সামরিক শক্তির আঞ্চলিকীকরণ মূলত যুক্তির দিক থেকে সঠিক, কেননা এতে করে রাশিয়া এবং পাশ্চাত্যশক্তির অবক্ষয় এবং তার বদলে আঞ্চলিক শক্তিসমূহের (রাজ্য বা রাষ্ট্র) শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করছে। রাশিয়া বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে আর তেমন কোনো সামরিক শক্তির মালিক নয় একথা সত্য, তবে রাশিয়া নিকট-প্রতিবেশীদের ওপর কৌশলগত কারণে সামরিক আধিপত্য ধরে রাখতে চায়। চীন, দক্ষিণ এশিয়ার স্বার্থে

একদিকে যেমন আঞ্চলিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার সামরিক কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করছে, অন্যদিকে তেমনি তার নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। ইউরোপীয় দেশসমূহ একইভাবে সামরিক শক্তির আঞ্চলিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে এবং এজন্য তারা ন্যাটো (NATO) জোট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে সামরিক শক্তিসমূহ আঞ্চলিক অস্থিরতা মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের আগের রাশিয়ামুখী সামরিক কৌশল বদলিয়ে এখন বিশ্বমুখী এবং পার্শিয়ান গাল্ফও উত্তরপূর্বএশিয়ামুখী করেছে। যদিও একথা বলা যায় যে, ইরাককে পরাস্ত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পার্শিয়ান ও গাল্ফ এলাকায় তার শতকরা ৭৫ ভাগ যুদ্ধবিমান, ৪২ শতাংশ অত্যাধুনিক যুদ্ধট্যাংক, ৪৬ শতাংশ যুদ্ধবিমান বহনকারী, ৪৬ শতাংশ জাহাজ, ৩৭ শতাংশ সামরিক সদস্য এবং ৪৬ শতাংশ নৌসেনা নিয়োগ করেছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সামরিকশক্তি বন্টনের ধরন থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বৈশ্বিক দৃষ্টিতে সামরিক পরিকল্পনা করা হচ্ছে না, সেসঙ্গে তা বৃহৎ শক্তিগুলোর আঞ্চলিক স্বার্থ এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিজস্ব আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিকও হয়ে পড়ছে। এভাবে এর ভেতর দিয়ে সভ্যতা-সম্পর্কিত 'কোর-রাষ্ট্রগুলোর' স্বার্থরক্ষার তৎপরতা লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠছে। সংক্ষেপে বলা যায়, মনে হচ্ছে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকে পাশ্চাত্যবিশ্ব অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর তাদের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এসময় তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও তা আরও সময়োপযোগী করার জন্য গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিতে সম্পদ ও মেধা নিয়োগ করবে।

বিশ্বে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে তারা হয়তো আঞ্চলিক 'কোর-রাষ্ট্র' ও অপাশ্চাত্য বিশ্বের শক্তিসমূহ ছত্রভঙ্গ করতে চাইবে এবং এটি তারা সামরিক শক্তির উৎস—যেমন, সম্পদ ব্যবহার করেই করতে তৎপর হবে। ১৯২০ সালের দিকে পাশ্চাত্য উক্ত সামরিক শক্তি ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তার পর থেকে ওই শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করে, যদিও তা নিয়মিত ঘটছে বলে মনে হয় না। ২০২০ সালে, অর্থাৎ ওই সর্বোচ্চ পর্যায়ের একশত বৎসর পরে, সম্ভবত পাশ্চাত্য শতকরা ২৪ ভাগ বিশ্বভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে (সর্বোচ্চ ছিল ৪৯ ভাগ এবং তা থেকে নিম্নগামী); ১০ ভাগ বিশ্বজনসংখ্যা (পূর্বে ছিল ৪৮ শতাংশ); এবং সম্ভবত ১৫-২০ ভাগ সামাজিকভাবে কর্মউদ্দীপনাময় ও বিশেষ লক্ষ্যে জড়ো হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ৭০ ভাগের নিচে নেমে সম্ভবত মাত্র ৩০ ভাগ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উৎপাদন পাশ্চাত্যরা নিয়ন্ত্রণ করবে, সম্ভবত পূর্বের (সর্বোচ্চ) ৮৪ শতাংশ শিল্পপণ্যের পরিবর্তে পাশ্চাত্য মাত্র ২৫ ভাগ শিল্পপণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং মাত্র ১০ ভাগ সামরিক শক্তি নিজেদের হাতে রাখতে পারবে, যা পূর্বে ছিল প্রায় ৪৫ ভাগ। উড্রোউইলসন, লয়েড জর্জ এবং জর্জেস্ ক্লিমেনসিউ একত্রে ১৯১৯ সালে দৃশ্যত বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতেন। প্যারিসে বসে তাঁরা নির্ধারণ করতেন বিশ্বে কোন্ দেশ টিকে থাকবে আর কোন্ দেশ টিকে থাকবে না। তা ছাড়া নতুন দেশ সৃষ্টি, তাদের সীমানা নির্ধারণ, কে বা কারা ওই দেশের শাসক হবেন এবং মধ্যপ্রাচ্য কীভাবে এবং কাদের মধ্যে ভাগ হবে এসব নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা তাঁরা করতেন। তারা রাশিয়াকে

আক্রমণের পরিকল্পনাও করতেন এবং চীনের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের পথ খুঁজতেন। ঠিক তার একশত বৎসর পরে যদি এমন কোনো কাজ করতে হয়, তবে তা পাশ্চাত্য বিশ্বের নেতারা করতে পারবেন না বরং তা করবেন হয়তো আঞ্চলিক 'কোর'রাষ্ট্রের সদস্যরা ও তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো। তাছাড়া হয়তো পূর্বের ন্যায় মাত্র তিনটি দেশ তা না করে মূলশক্তি তখন সাত কিংবা আটটি শক্তিশালী সভ্যতার ওপর বর্তাবে। রিগান, থ্যাচার, মিতাঁরো, কোহল-এর উত্তরাধিকারের পরিবর্তে তখন হয়তো ডেং জিয়পিং, নাকাসি, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়েলৎসিন, খোমেনি এবং সুহার্তের উত্তরাধিকারগণ এসব বিষয় ঠিক করবেন।

তাই বলা যায়, অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্যের অধিপত্যের যুগের অবসান হবে। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের শক্তির দুর্বলতা এবং তৎপরিবর্তে বিশ্বে অন্যান্য শক্তির উত্থান কার্যত দৈশিককরণ প্রক্রিয়া ও অপাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্যের ধারাকে এগিয়ে নেবে।

দৈশিককরণ : অপাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরুত্থান

বিশ্বে সংস্কৃতির বন্টন আসলে ক্ষমতার বন্টন বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ, ক্ষমতা ও সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাণিজ্য সবসময় হয়তো পরিচয় বা ফ্লাগ বহন করে না, কিন্তু সংস্কৃতি সদাসর্বদাই ক্ষমতাকে অনুসরণ করে থাকে। দেখা যায়, বরাবরই ইতিহাসে কোনো সভ্যতার সম্প্রসারণ একই সঙ্গে তার সংস্কৃতিকেও টান দেয় এবং সেসঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহার করে বিজয়ীশক্তি বিজিতদের ওপর তাদের মূল্যবোধ, রুচি, অভিরুচি, কার্যপ্রণালী, প্রতিষ্ঠানাদি চাপিয়ে দিতে চায়। তাই বলা যায়, সর্বজনীন সভ্যতার জন্য চাই যাবতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নির্বিশেষে সর্বজনীন বা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য 'ক্ষমতা'। প্রাচীন বিশ্বে রোমানশক্তি প্রায় সর্বজনীন সভ্যতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যশক্তি ইউরোপীয় কলোনির আকারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার আধিপত্যবাদী মনোবৃত্তি কার্যত অবশিষ্ট বিশ্বের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকার আধিপত্যের মনোভাবও ক্ষয়িষ্ণু। এখন দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে স্বাধীনতা (পূর্বতন কলোনি)-প্রাপ্ত সভ্যতাগুলো, তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, জীবনাচার, নিজস্ব ভাষাচর্চা, ইতিহাস, ঐতিহ্যমুখী হয়ে উঠছে দিনদিন। এভাবে দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী অপাশ্চাত্য দেশের সমাজগুলো আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব কৃষ্টি ও সভ্যতা নিজস্ব হচ্ছে। অর্থাৎ, সর্বত্র তাদের কৃষ্টির পুনঃজাগরণ ঘটছে।

জোসেপ নাইয়ে (Joseph Nye) যুক্তি দেখান যে, একটি পার্থক্য রয়েছে 'শক্ত শক্তি' যা অর্থনীতিক ও সামরিক শক্তির উপর নির্দেশ-সম্বলিত, আর 'নরম শক্তি' যা আসলে অন্যরাষ্ট্র যা চায় তাকেই সমর্থন দেয়াকে বোঝায়, যেখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং মতাদর্শ-কেন্দ্রিক। নাইয়ে যেমন স্বীকার করেন যে 'শক্ত শক্তির' একটি বড় ধরনের ব্যাপ্তি ঘটেছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী, ফলে গতানুগতিক 'শক্ত শক্তির' একচেটিয়াত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। বৃহৎ শক্তিগুলো আগের মতো গতানুগতিক কৌশল প্রয়োগ করে বিশ্বে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারছে না।

নাইয়ে আরও বলেন যে, 'যদি কোনো রাষ্ট্রের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং মতাদর্শ অনুসরণীয় হয়ে থাকে, তবে আপনাআপনিই অন্যান্য দেশ তা অনুসরণ করে থাকে এবং তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং এক্ষেত্রে 'নরম ক্ষমতা' হল 'শক্ত ক্ষমতা'র মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর'।[১১] তবে কীভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় একটি কৃষ্টি এবং মতাদর্শ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে? 'নরম ক্ষমতা' তখনই ক্ষমতা হিসেবে গণ্য হয়, যখন তা 'শক্ত ক্ষমতার' মৌল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। একটি সভ্যতার বা দেশের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেলে তা প্রকারান্তরে ওই দেশের আত্মবিশ্বাসবোধ বাড়িয়ে দেয়, তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে এবং আত্মম্ভরী হয়ে অহং-এর আশ্রয় নিতে পারে। এমতাবস্থায়, তারা তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে থাকে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল হলে ওই দেশ তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও পরিচয়সংকটে ভোগে এবং এমতাবস্থায় অন্য সভ্যতা থেকে অর্থনীতি, সামরিক এবং রাজনৈতিক বিষয়াদি সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেহেতু অপাশ্চাত্য দেশের সমাজগুলো নিজেদের অর্থনীতি, সামরিক এবং রাজনৈতিক সক্ষমতা বাড়াবার জন্য উদগ্রীব থাকে, সেহেতু এর মধ্যদিয়ে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং সংস্কৃতি এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়।*

সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাফল্য আসার দরুন ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে কম্যুনিস্ট মতাদর্শ জনগণের নিকট একটা আগ্রহবোধ সৃষ্টি করেছিল। তবে, এ আগ্রহ ধরে রাখা যায়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনীতির ও সামরিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদি অন্যান্য সভ্যতার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কেননা, মানুষ ভেবেছিল তা তাদের ভাগ্যে 'সম্পদ' ও 'ক্ষমতা' এনে দিয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে চলমান ছিল—১০০০ সাল থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত। উইলিয়াম ম্যাকনিল (William McNeill) দেখান যে খ্রিস্টধর্ম, রোমান আইন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য উপাদান হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়ায় প্রয়োগ করা হয়। তবে এ গ্রহণকার্যটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতি ভয়ভীতি (সামরিক দিক থেকে) থেকেও উৎসারিত বলে মনে করার কারণ রয়েছে।[১২] যেহেতু পাশ্চাত্যের শক্তি ক্রমক্ষয়িষ্ণু, সেহেতু মানবাধিকার, উদারতাবাদ এবং গণতন্ত্রের মতো বিষয় ও ধারণাগুলো অন্য সভ্যতার ওপর ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতাও তাদের হ্রাস পাওয়ার পথে।

---

* *ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির মধ্যেকার সংযোগের বিষয়টি অগ্রাহ্য করে কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, একটি বিশ্বজনীন 'একক' সভ্যতা এগিয়ে আসছে এবং কেউ কেউ আরও যুক্তি দেখান যে, পাশ্চাত্যকরণ প্রকৃতপক্ষে আধুনিকীকরণের পূর্বশর্ত। তারা আসলে এর পেছনে পাশ্চাত্যের দ্বারা বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের থিসিসকেই সমর্থন দিচ্ছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কি তার আধিপত্য আদৌ টিকিয়ে রাখতে পারছে বা পারবে? এটি ভেবে দেখার বিষয়। কেননা, অবশিষ্ট সমাজ আজ নিজস্ব সভ্যতামুখী হচ্ছে এবং ওইসব বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে আগ্রহী। যেসব মানুষ একটি সর্বজনীন সভ্যতার সমর্থনে বক্তব্য দেন তারা কিন্তু কখনও সর্বজনীন সাম্রাজ্যের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখান না।*

অপাশ্চাত্য সমাজের অনেক মানুষই পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক উন্নতি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উচ্চতর মানবজীবনযাত্রা, সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক স্থিরতার প্রতি পরশ্রীকাতরতায় ভুগে থাকে। তারা মনে করে যে, ওইসকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং এজন্য তারা তাদের সমাজে সেগুলো প্রয়োগ করতে চায়। ধনী ও ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য তারা পাশ্চাত্যদের মতো হতে ইচ্ছুক।

এখন অবশ্য এই কেমালপন্থী মনোবৃত্তি পূর্বএশিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। পূর্বএশিয়া তাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে নাটকীয় অগ্রগতি পেয়েছে তার মূলে তারা পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত মতবাদ বা জ্ঞানকে বুঝতে চায় না বরং তারা উল্টোটিই ভাবতে ভালোবাসে। অর্থাৎ, এসব অগ্রগতির মূলে তাদের দেশজ মূল্যবোধ, কৃষ্টি, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থেকে উৎসারিত বলে ভেবে থাকে। তারা বলতে চায়, সকল বিবেচনায়ই পশ্চিমাবিশ্ব থেকে আলাদা। তারা যখন দুর্বল ছিল, সম্ভবত তখন পাশ্চাত্যের নিকট তাদের মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, উদারনীতিবাদের জন্য মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু এখন তারা আর দুর্বল নয় বরং ক্রমাগতভাবেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা এখন আর সেই সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে আক্রমণ করতে চায় না, যে মূল্যবোধগুলো তাদের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রারম্ভিক পর্যায়ে কাজে লেগেছিল। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কেননা, পাশ্চাত্য তাদের নিজস্ব মূল্যবোধগুলোকে 'সর্বজনীন' বলে সবার উপর চাপিয়ে দিতে তৎপর ছিল। কিন্তু এখন এটি প্রমাণিত যে, অপাশ্চাত্যের সভ্যতা কোনো অংশেই অনুন্নত নয়, বরং তাদের চেয়ে উন্নততর।

অপাশ্চাত্য সভ্যতার পুনরুত্থানের মনোভাবকে রোনাল্ড ডোতি বলেছেন, 'দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ সত্তা'। এ প্রক্রিয়া পূর্বতন পাশ্চাত্যের কলোনি এবং স্বাধীন দেশ, যেমন চীন এবং জাপানেও ঘটেছে। 'আধুনিকীকরণের প্রথম নায়ক' অথবা 'স্বাধীনতা পরবর্তী' প্রজন্ম সাধারণত পাশ্চাত্যের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কোনো ভাষায় পড়ালেখা সমাপ্ত করেছে। অংশত তারা কাঁচা বয়সে অবাক বিস্মিত মন নিয়ে পাশ্চাত্যে গিয়েছে, তাই তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা গলাঃধকরণ করার বিষয়টি সুগভীর এবং গুরুত্ববহ। তবে, সাধারণত দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকাংশ সদস্য তাদের দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় (যা প্রথম প্রজন্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) থেকে পড়ালেখা সমাপ্ত করে এবং নিজেদের ভাষায় পড়ালেখা চালিয়ে যায়; অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী ভাষায় নয়। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তারা অস্পষ্টভাবে বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ধারণা লাভ করে থাকে, যা মোটেও পরিপূর্ণ নয় এবং তাদের জ্ঞানসমূহ দৈশিককরণের শামিল, কিংবা বড়জোর অনূদিত পাঠসামগ্রী-কেন্দ্রিক যা সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন ও মানের দিক থেকে নিম্ন।'

এইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত স্নাতকগণ প্রভাববিস্তারকারী পূর্বের পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যের দেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্মের প্রতি রাগান্বিত হয়ে ওঠেন এবং পুনঃপুন তারা দেশজ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাকেন।'[১৩] যেহেতু পাশ্চাত্যের প্রভাব পেছনে সরে যাচ্ছে, সেহেতু তারা তাদের সম্পদ অর্জন করা ও ক্ষমতালাভের জন্য আর পাশ্চাত্যের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজনবোধ করেন না। তারা

তাদের নিজেদের সমাজের অভ্যন্তরের মালমশলা দিয়েই সম্পদশালী ও ক্ষমতাধর হতে চান। সেজন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ সমাজের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি নিয়েই এগুতে হয়। এ কারণে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

দৈশিককরণের প্রক্রিয়ার নিমিত্তে দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রজন্মের নেতা ও প্রতিনিধিরাই সে কাজ করে ফেলেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনজনকে দেখা যেতে পারে, যেমন মোহাম্মদ আলী জিন্না, হ্যারি লি এবং সালমন বন্দোরনায়েক। তাঁরা সবাই অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং লিঙ্কন ইন-এর অত্যন্ত অতি উজ্জ্বল স্নাতক। তাঁরা কেউ উপশহুরে আইনজীবী এবং সদাসর্বদা পাশ্চাত্যকরণরত এলিট-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। জিন্না ছিলেন একজন প্রতিশ্রুতিশীল ধর্মনিরপেক্ষপন্থী মানুষ। একজন ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মতে লি (Lee) ছিলেন 'সবচেয়ে উচ্চমার্গের ব্রিটিশ যিনি পূর্ব সুয়েজ থেকে এসেছিলেন'। বন্দোরনায়ক ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মানের খ্রিস্টান। তারপরও স্বাধীনতালাভের আগে এবং পরে তাঁরা দৈশিক কৃষ্টিপন্থী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদেরকে পূর্বপুরুষের কৃষ্টিতে ফিরে আসতে হয়েছিল এবং এজন্য তাঁরা তাঁদের পরিচয়, নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিশ্বাসসমূহও বদলে ফেলেছিলেন। ইংরেজপন্থী আইনজীবী মি. এম. এ. জিন্না হয়ে উঠলেন পাকিস্তানের 'কায়েদ-ই-আজম' (জাতির পিতা)। হ্যারি লি হলেন 'লি কাউয়ান ইয়েউ'। ধর্মনিরপেক্ষপন্থী জিন্না হলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলভিত্তির প্রতিক। ইসলামের একজন খেদমতকারী। ইংরেজায়িত লি-কে মান্দারিন শিখতে হল এবং তাঁকে কনফুসীয় দর্শনের একজন মুখপাত্র হতে হল। খ্রিস্টান বন্দোরনায়ক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে হয়ে উঠলেন একজন খাঁটি বৌদ্ধ এবং তিনি হলেন সিংহলী জাতীয়তাবাদী।

দৈশিককরণ প্রক্রিয়া মূলত পুরো ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে অপাশ্চাত্য বিশ্বে ছিল যুগের অনতম শ্রেষ্ঠ দাবি। ইসলামের পুনঃজাগরণ এবং পুনঃইসলামিকরণ হয়ে ওঠে ইসলামি সমাজের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রবণতা ছিল পাশ্চাত্যকে প্রত্যাখ্যান করে 'হিন্দুকরণ নীতি' গ্রহণ করা, যা রাজনীতি ও সমাজের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। পূর্বএশিয়ায়, সরকারিভাবে কনফুসীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয় এবং তথায় রাজনীতিক নেতৃত্ব এবং বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের সমাজকে 'আজিয়ানাইজেশন' করা সম্পর্কে উচ্চবাক্য করতে থাকেন। ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে জাপান মূলত 'নিশোনজিনরন' (Nishonjinron) অথবা 'জাপানিকরণ' তত্ত্বের ভেতর আবদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে একজন জাপানি বুদ্ধিজীবী যুক্তি দেন যে, ঐতিহাসিকভাবে জাপান 'অন্যান্য সভ্যতা থেকে রসদ সংগ্রহ করে শরীরে পুষ্টি জুগিয়েছে' এবং ওইসব বহিঃকৃষ্টিকে 'দৈশিককরণ' করা হয়েছে বিভিন্ন উপায়ে ও পন্থায়। শীতলযুদ্ধাবসানের পর রাশিয়া পুনরায় 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন' হওয়ার মুখে নিপতিত হয়। বিশেষত প্রাক্তন পাশ্চাত্যকৃত এবং 'স্লোভোফিলস্‌দের' মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। প্রায় একদশক ধরে প্রবণতা হল, যেন 'পূর্বতন' থেকে 'পরবর্তীতে উত্তরণ ঘটানো'। যেমন, পাশ্চাত্যপন্থী গবার্চেভ ইয়েলৎসিনের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেন, রাশিয়ার মতো করে তিনি নিজেকে মানিয়ে নেন। যদিও তিনিও ছিলেন একজন

পাশ্চাত্যপন্থী, কিন্তু সময়ের দাবি অনুযায়ী, তিনি রাশিয়ার কৃষ্টি তুলে ধরেন এবং 'অর্থোডক্স'-এর ধারায় দৈশিককরণ করতে শুরু করেন। গণতন্ত্র সম্পর্কিত স্ববিরোধী অবস্থানের কারণে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া পুনরায় আরও এগিয়ে যায়। আর তা হল, পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র কীভাবে অপাশ্চাত্য দেশে উৎসাহিত করে তা খাপখাইয়ে নেয়া হবে, যেখানে অহরহ পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব ও আন্দোলন নিত্যসঙ্গী। তদুপরি, যেখানে স্বদেশী এলিটদের জন্য ক্ষমতা সংরক্ষণ করে রাখতে হয় এবং ১৯৭০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশে পাশ্চাত্যপন্থী ও পাশ্চাত্যঘেঁষা সরকারসমূহ একের-পর-এক করে সামরিক অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের ভীতির মুখোমুখি হতে থাকে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সেখানে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। আর তা হল, উক্ত সরকারসমূহ ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হতে থাকে।

উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পাশ্চাত্য উদ্ভূত ব্যবস্থা; গণতন্ত্রের মূল্যবোধ সর্বজনীন; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রকে সবসময়ই আঞ্চলিকীকরণ এবং দেশজ সংকীর্ণ মূল্যবোধের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটাতে চাওয়া হয়। ফলে, গণতান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, পাশ্চাত্যপন্থী রাজনীতিকরা সাধারণত সেখানে নির্বাচনে জয়ী হতে ব্যর্থ হন। তাই ভোটে জিততে হলে তাদের দেশীয় 'লেবাস' ধারণ করতে হয়। ফলে গণতন্ত্রের সর্বজনীন আবেদনগুলো প্রায়শই আঞ্চলিক, নৃগোষ্ঠীগত, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় আবরণে আবৃত্ত হয়ে ওঠে এবং বলা বাহুল্য, তা প্রকারান্তরে সংকীর্ণ কৃষ্টির নিগড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

তাহলে দেখা যায়, ফলাফল হল এই যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে পাশ্চাত্যশিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যপন্থী এলিটগণ সবসময়ই গণরোষের শিকার হচ্ছেন। কোনো কোনো মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে মুসলিম মৌলবাদীরা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছেন যেমনটি ঘটেছে আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে। সেখানে অবশ্য সেনাবাহিনী ১৯৯২ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নির্বাচনের সময় সদাসর্বদা সাম্প্রদায়িক সংহিসতা ঘটে থাকে।[১৫] শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শ্রীলংকা ফ্রিডম পার্টি সেখানকার পাশ্চাত্যপন্থীদের নির্বাচনে হটিয়ে দেয়। এভাবেই সেখানকার গণতন্ত্র চলছে। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণআফ্রিকান এবং পাশ্চাত্য এলিটগণ মেনে নেয় যে, দক্ষিণআফ্রিকা একটি পাশ্চাত্যপন্থী দেশ হবে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষী সরকার ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণআফ্রিকা দ্রুত পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে, যদিও সেখানকার সাদা চামড়ার বাসিন্দারা সবসময়ই নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের মানুষ বলেই ভেবেছে। ওই এলিটগণ সমাজে তাদের স্থান করে নিতে এবং পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক ধারাগুলো এগিয়ে নিতে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু করেন, ফলে সেখানে অত্যন্ত পশ্চিমাপন্থী কালোবর্ণের এলিটগণ ক্ষমতায় আসার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে যদি দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে দৈশিককরণ প্রক্রিয়া কাজ করে, তবে তাদের উত্তরাধিকার হবে জুলু, খোঁজা প্রমুখ সম্প্রদায় আর দক্ষিণআফ্রিকা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের পরিবর্তে পরিণত ও পরিচিত হবে একটি আফ্রিকান দেশ হিসেবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাইজানটাইন, আরবীয়, চীনা, অটোম্যান, মোগল এবং রুশগণ তাদের নিজস্ব শক্তি অর্জনের ওপর পশ্চিমাদের তুলনায় বেশি আস্থাশীল ছিল। সেসময় তারা সাংস্কৃতিক দৈন্য, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, পাশ্চাত্যের অবক্ষয় ইত্যাদিকে ঘৃণা করত। পাশ্চাত্যের সাফল্য যখন আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে, তখন উল্লিখিত মনোভাব পুনর্জাগরিত হতে থাকে। জনগণ ভাবতে শেখে, 'তাদের অন্যের নিকট থেকে আর আনবার তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই।' ইরান হল একটি চরমমাত্রার দেশ, তবে, যেমন একজন মন্তব্য করেছেন, 'পাশ্চাত্য মূল্যবোধ সেখানে নানাভাবে প্রত্যক্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তা কোনোক্রমেই মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন এবং জাপানের চেয়ে বেশি ছিল না।'[১৬]

আমরা একটি বিষয় লক্ষ করছি তা হল, 'প্রগতিশীল যুগের অবসান ঘটেছে', যে যুগ ছিল পাশ্চাত্য মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত যুগ। আর বিশ্ব এখন বিভিন্ন ধারার বিভিন্নমুখী সভ্যতার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং একে অপরের সহযোগী শক্তি হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে।[১৭] বিশ্বব্যাপী এই বৈশ্বিককরণ প্রক্রিয়া মূলত ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য মুসলিম জনসংখ্যা-অধ্যুষিত বিশ্বে মুসলমানগণ অর্থনীতিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক ধারায় বিশেষ গতি সঞ্চার করেছে।

ঈশ্বরের প্রতিশোধ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক এলিটগণ সাধারণভাবে ধরে নিয়েছিলেন যে, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আধুনিকীকরণের জন্য ধর্মকে সমাজ থেকে বিমুক্ত করতে হবে, যদিও ধর্ম সামাজিক জীবনের গভীরে শেকড় গেড়ে বসে আছে। এই ধারণাটি এগিয়ে নিতে চেয়েছেন মোটামুটি দু-ধরনের গোষ্ঠী; তারা হলেন এ-ধারণার জনক এবং যারা এ-ধারণার সমর্থক। আধুনিকীকরণ ধারার সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) সমর্থকগণ বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, প্রয়োগবাদী ধ্যানধারণার আগমনকে অভিনন্দন জানাতেন। কারণ তারা মনে করতেন যে, এই ধারাসমূহ সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গালগপ্পো, কল্পকাহিনী, অযৌক্তিক চিন্তা এবং প্রথাগত অনুষ্ঠান—যেগুলো মূলত প্রচলিত ধর্মের 'কোর' বা ভিত্তি—তা সহজেই বিদূরিত করে ফেলবে। এমতাবস্থায় নবাগত সমাজ হবে সহনশীল, যৌক্তিক, প্রয়োগবাদী, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ। অন্যদিকে, সমাজের রক্ষণশীল অংশ সতর্ক করে দিতে থাকেন যে, সমাজ থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাদি বিদায় করে দিলে তার ফলাফল হবে খুবই সাংঘাতিক। কেননা, তাঁরা মনে করেন যে, ধর্ম মানুষের নৈতিক মানকে সমুন্নত করে থাকে এবং তা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়ে উন্নত সমাজ গঠনে উত্তম ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে সমাজ থেকে ধর্ম তুলে দিলে এর শেষ পরিণতি হবে নৈরাজ্য, বঞ্চনা যা নাগরিক জীবনকে অস্থির করে তুলবে। অন্যদিকে টি.এস. এলিয়ট (T.S. Eliot) বলেন, 'যদি তোমার ঈশ্বর না থাকে (এবং ঈশ্বর হল একটি হিংসুটে ঈশ্বর)' 'তুমি হিটলার এবং স্তালিনকে তোমার তরফ থেকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারো'।[১৮]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এসে উপলব্ধি করা গেল যে, ওই সকল প্রত্যাশা এবং ভীতি দুটোই ছিল ভিত্তিহীন এবং অমূলক। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আধুনিকীকরণের

বিষয়টি বিশ্বব্যাপী একটি বাস্তবতা হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণও ঘটে। এই পুনরুত্থান 'লা রিভেনচি ডি ডায়ু' (*La Revenche De Dieu*), যেমন্ গিলাম কেপেল (Gilles Kepel) বলেন, 'সমগ্র বিশ্বে তা পরিব্যাপ্তি লাভ করে এবং প্রত্যেক সমাজে ও প্রত্যেকটি সভ্যতায় দৃশ্যত প্রতিটি দেশে এরূপ ঘটতে থাকে। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি যেমন কেপেলে দেখেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষকরণ প্রবণতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভেতরে ধর্মকে আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে 'উল্টো ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে'। একটি নতুন ধর্মীয় অভিগমনের আগমন ঘটে। মূলত লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে খাপ খাইয়ে নেয়া নয় বরং সমাজের মূলভিত্তি হিসেবে ধর্মীয় বা "পবিত্র ধারাকে" এগিয়ে নেয়ার ভেতর দিয়েই সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। এই নতুন অভিগমন কার্যক্রমে মনে করা হল, ধর্মবিহীন আধুনিকতা অন্তঃসারশূন্য এবং এজন্য এর মূল লক্ষ্য; অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টার মৃত্যু ঘটেছে। এ ধারার বিষয়বস্তু আর 'এগিওর্নমেন্টো' (*'aggiornamento'*) থাকল না, তদস্থলে ইউরোপ দ্বিতীয়বার সুসমাচার বার্তায় (*evangelization*) ভরে উঠল; অন্যদিকে এর লক্ষ্য হিসেবে ইসলামকে আধুনিক করার পরিবর্তে আধুনিকীকরণকে ইসলামপন্থী করা হতে থাকল।[১৯]

ধর্মীয় পুনঃজাগরণ অংশত কতিপয় নতুন লোকের ধর্মীয় ধারার সঙ্গে সংযুক্তির কারণে যেমন ঘটেছে, তেমনি অন্য কারণ এক্ষেত্রে কাজ করেছে। ধর্মের এ পুনরুত্থানের মূলে যে-কারণটি সর্বাধিক কাজ করছে তা হল, মানুষ ধর্মমুখী হতে থাকে এজন্য যে, তারা মনে করতে থাকল ধর্মের মধ্যে এমন বলবর্ধক শক্তি রয়েছে যা সমাজ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং এজন্য গতানুগতিক ধর্মের ভেতর দিয়েই উন্নয়ন সম্ভব। খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, ইহুদিধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, অর্থোডক্সসহ প্রায় সকল ধর্মই প্রবলশক্তিতে প্রতিশ্রুতিশীল, সময়োপযোগীভাবে ক্ষণিক বিশ্বাসীদের গভীরভাবে ধর্মের ভেতরে টেনে আনতে সক্ষম হয়। এই বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতাগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সরকারি আচার-আচরণকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পুনর্নির্ধারণ ও পুনর্গঠন করতে সচেষ্ট হয় এবং এ কাজগুলো মৌলবাদী ধারায় ঘটতে থাকে; আর তা ধর্মীয় শুদ্ধি অভিযানেও রূপ নেয়। এহেন মৌলবাদী আন্দোলনগুলো ছিল নাটকীয় এবং এর রাজনৈতিক ফল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় বিষয়গুলোর বিশ্বব্যাপী নবায়নকার্যক্রম অলৌকিকভাবে উগ্রপন্থী ও মৌলবাদী আকার ধারণ করতে থাকে। এই গোষ্ঠী সমাজ থেকে সমাজে তাদের মতাদর্শ ও লক্ষ্যগুলো মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলতে সচেষ্ট হয় এবং সরকারসমূহকে তাদের বার্তা পৌঁছাতে শুরু করে। এশিয়ায় কিছুটা হলেও কনফুসীয় ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ টিকে থাকলেও বাকি বিশ্ব কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধের নিগড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। জর্জ উইগেল (George Weigel) এ প্রবণতা সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন : 'বিশ্বে অ-ধর্মনিরপেক্ষকরণ তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে এবং এটি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সামাজিক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে'।[২০] ধর্মের সর্বব্যাপিতা এবং অপরিহার্যতার বিষয়টি নাটকীয়ভাবে সাবেক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। মতাদর্শের পতনের পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, অতি দ্রুত তা

ধর্মের দ্বারা পূরণ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো ছিল, যা ভিয়েতনাম থেকে আলবেনিয়া অবধি বিস্তৃত হয়। রাশিয়ায় দেখা যায়, অর্থোডক্স মতবাদের পুনরুত্থানের কাজটি দারুণভাবে সংঘটিত হয়। ১৯৯৪ সালে শতকরা ১০ ভাগ রুশীয় অর্থোডক্স, যাদের বয়স ২৫ বৎসরের মধ্যে, তারা বলতে থাকে যে, তারা 'নাস্তিকতা' থেকে 'ঈশ্বরবিশ্বাসী' হয়েছে। মস্কো শহরে কার্যক্ষম গির্জার সংখ্যা ১৯৮৮ সালে যেখানে ছিল ৫০টি সেখানে ১৯৯৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫০টিতে। রাজনৈতিক নেতারাও সমভাবে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। ১৯৯৩ সালে একজন ধীশক্তিসম্পন্ন পর্যবেক্ষকের মতে : 'রাশিয়ার শহরগুলোর বাতাস গির্জার ঘণ্টার ধ্বনিতে ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে। গির্জাগুলো শহরের অন্যতম ব্যস্ত স্থান হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।'[২১]

একইসঙ্গে স্লাভিক রিপাবলিকগুলোতে অর্থোডক্সপন্থীদের উত্থান ঘটতে থাকে। মধ্য এশিয়ায় ইসলাম অতিদ্রুত পুনর্জাগরিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৯ সালে ১৬০টি মসজিদ কার্যকর ছিল এবং মাত্র ১টি মাদ্রাসা কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু ১৯৯৩ সালের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ মসজিদ ও ১০টি মাদ্রাসা গড়ে ওঠে ও তা কাজ করতে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠান মৌলবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ও তা সমর্থন করতে শুরু করে এবং সৌদিআরব, ইরান, পাকিস্তান তাদের সমর্থন জোগাতে থাকে। এটি অবশ্যই একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলস্রোতোধারাসম্বলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন।[২২]

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনর্জাগরণের এ জোয়ারকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো দেশের ক্ষেত্রে হয়তো স্বতন্ত্র কারণ কাজ করে থাকতে পারে। তবে একথা ঠিক যে, বিশেষ সময়ে একই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক একাধিক দেশের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া কাজ করার পেছনে নিশ্চয়ই সর্বজনগ্রহণযোগ্য সাধারণ কারণ রয়েছে। বিশ্বজনীন সত্তা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত ব্যাখ্যার। তাহলে আমাদের দেখতে হবে বিশেষ দেশের জন্য স্বতন্ত্র কী-কারণ বা কারণসমূহ কাজ করেছে; তারপর বিভিন্ন স্বতন্ত্র দেশের ক্ষেত্রে 'সাধারণ' কোন্ কোন্ বিষয় এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।

বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনঃজাগরণ ও পুনরুত্থানের পশ্চাতে সবচেয়ে সুস্পষ্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটাতে গিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটানোর যে পাঁয়তারা চলছিল তারই প্রতিক্রিয়া বিশেষ। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা পরিচয়ের সূত্রগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল এবং সে মতো কর্তৃত্বের ধরনও ধ্বংস হতে আরম্ভ করেছিল। মানুষ গ্রামত্যাগ করে শহরমুখী হচ্ছিল। এভাবে তারা তাদের শেকড়চ্যুত হচ্ছিল। তারা নতুন পেশা ও চাকুরি নিচ্ছিল বা কোনো চাকরি বা কাজ পাচ্ছিল না। এক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছিল এবং নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় ও পরস্পরক্রিয়া সাধিত হচ্ছিল। এতে করে তাদের নতুন পরিচয়টির জন্য প্রয়োজন পড়ছিল স্থায়ীভাবে শহুরে সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যাবার। নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনব্যবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হচ্ছিল। এ অবস্থায় তারা ধর্মকে নতুন চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা মৌলবাদী ধারায় নিপতিত হয়; এ বিষয়টি এশীয় প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে লি কুয়ান ইউ বুঝাতে চান :

আমরা ছিলাম কৃষিভিত্তিক সমাজের আওতাভুক্ত। একটি অথবা দুটি প্রজন্মের ব্যবধান কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পসমাজে পরিবর্তিত হয়। পাশ্চাত্যে বিগত ২০০ বৎসরে কী ঘটেছিল কিংবা এখানে বিগত ৫০ বৎসরে কী ঘটেছে তা জানতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের এ ঘটনাটি ঘটেছিল খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে, অনেকটা পাশ্চাত্যের নকলনবিশ এবং দুমড়ে মুচড়ে ঘটাবার মধ্যে দিয়ে। ফলে স্বভাবতই অনেক ক্ষেত্রেই অনেককিছু স্থানচ্যুত হয় এবং অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। যদি আমরা দ্রুত উন্নয়নপ্রাপ্ত দেশ যেমন কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের দিকে চোখ ফেরাই তবে কিছু অনন্য সত্য দেখতে পাই : 'ধর্মের উত্থান ... প্রাচীন বিধিনিষেধ ও প্রথা এবং ধর্ম, পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় আনুগত্য ইত্যাদি কোনোকিছুই সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ ছিল না। মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য, তথা কেন আমরা এই ধূলির ধরায় এসেছি এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ও উন্নততর ব্যাখ্যা লাভের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সবকিছুই কিন্তু চাপের মুখে থাকা সমাজের পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।[২৩]

মানুষ শুধুমাত্র যুক্তিনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। নিজকে জানার আগে মানুষের পক্ষে যৌক্তিকভাবে নিজস্ব স্বার্থকেন্দ্রিক কাজ করা সম্ভব নয়। স্বার্থ রাজনীতির পূর্বসূত্র, আসলে কিন্তু তা কার্যত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজ যখন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে তখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আত্মপরিচয় সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয় নতুন সূত্রে খুঁজতে হয় এবং এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন আত্মপরিচয়বোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ তখন নিজেকে প্রশ্ন করে থাকে : 'কে আমি'? 'আমি কোথায় আছি'? এসব প্রশ্নের উত্তর যুক্তিনির্ভর না হয়ে স্বভাবতই কিন্তু বিশ্বাস বা ধর্ম সম্পর্কিত হয়ে যায়। যেমন হাসান আল তুরাবী (Hasan Al Turabi) বলেন, 'মানুষের আত্মপরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে থাকে।' এই প্রক্রিয়ায় মানুষ নতুন আত্মপরিচয় আবিষ্কার করে, অথবা নতুন ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ধারণ করে থাকে। বার্নার্ড লুইস্ যুক্তি দেখান যে, 'মুসলিম জগতে দেখা যায়, জরুরি সময়ে এমন একটি প্রবণতা পুনঃপুন ঘটতে থাকে যেখানে নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে মৌল পরিচয় কার্যত ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে খুঁজতে চাওয়া হয়।' গিলস্ পেপেল একইভাবে আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রীয় মূলসুর খুঁজতে গিয়ে বলেন যে, 'শুরু থেকে পুনঃইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার প্রথমেই আত্মপরিচয় পুনঃনির্মাণের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেননা বিশ্বে (তাদের মতে) আত্মপরিচয়সংক্রান্ত বিষয়টি হারিয়ে গিয়েছে, ফলে মানুষ আত্মপরিচয়বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।'[২৫] ভারতে হিন্দুত্বের নতুন পরিচয় বিনির্মাণের পর্যায়ে রয়েছে', কেননা তথায় আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার প্রাবল্যে যে টানাপড়েন ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য 'হিন্দুত্বের' দরকার অনুভূত হচ্ছে।[২৬] রাশিয়ার বেলায় ধর্মীয় পুনঃজাগরণকে মূলত ১০০০ বৎসর পূর্বের অর্থোডক্স গির্জার প্রতি মানুষের উদগ্রভাবে যুক্ত হওয়ার বাসনারই বহিঃপ্রকাশ ও ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা, অর্থোডক্স মতবাদের সঙ্গে অজ্ঞাত কারণে জনগণের একটি অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে রয়েছে।

তবে রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ 'সেন্ট্রাল এশিয়ার' ইসলামিক রিপাবলিকসমূহেও ওই একই কারণে তথা ধর্মের প্রতি উদগ্র টানের ফলেই তথায় ইসলাম পুনর্জাগরিত হয়েছে।

কেননা, সেখানে মস্কো 'দীর্ঘদিন ধর্ম চাচা দমন করে রেখেছিল'।[২৭] সমাজকে দ্রুত আধুনিক করতে গিয়ে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা, আধুনিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ধরনের পরিবর্তন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং অর্থনেতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা যে-অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল এবং এতে আত্মপরিচয়বোধের ক্ষেত্রে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে ইসলামধর্ম তার পূর্বের স্থান দখল করতে শুরু করে। তবে, এক্ষেত্রে মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনিল (William H. McNeill) বলেন, 'এটি কোনো দৈব ঘটনা নয় যে, এই সমস্ত আন্দোলনের (মৌলবাদী ও ধর্মীয়করণমূলক) প্রায় সবই সেই সমস্ত দেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ার দরুন প্রাচীন গ্রামীণ ধারায় অধিকাংশ মানুষের বিবিধ প্রয়োজন মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিকীকরণের ফল হিসেবে শহরভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যমের সম্প্রসারণ গ্রামীণজীবনের মধ্যে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ফলে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতি ও কৃষকের জীবনধারা ব্যাহত হয়েছে।'[২৮]

বৃহত্তরভাবে বলতে হয়, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুনরুত্থান আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ, আত্মকেন্দ্রিক সন্তুষ্টি বিধানের প্রচলিত বিধানের এবং প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পুনরুত্থানের মাধ্যমে সমাজে উত্তম মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মের প্রাধান্য, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, মানবিক সেতুবন্ধন ইত্যাদি সৃষ্টি করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। সেসঙ্গে বিভিন্ন চাহিদা, যেমন চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি, হাসপাতালভিত্তিক সেবার সম্প্রসারণ, কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা, বয়োবৃদ্ধদের যত্নআত্তির সুবন্দোবস্ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণসহ বঞ্চিতদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অর্জনের জন্য লক্ষ্য স্থির করা হয়। অতএব, সিভিল সমাজের মধ্যে যে অবক্ষয় ও শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মের মাধ্যমে তা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তার ফলেই ধর্মীয় জাগরণ 'আন্দোলন' হিসেবে এসেছে। তবে, এটি আসছে যেন বারবার মৌলবাদী আকারে।[২৯]

যদি গতানুগতিক এবং চলমান, প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ধর্মসমূহ শেকড়উৎপাটিত মানুষের বা সমাজের চাহিদাপূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মীয়গোষ্ঠী সে-স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তারা তাদের সদস্যপদ সম্প্রসারণ করতে পারে এবং ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়গুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়া ঐতিহাসিকভাবে একটি ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্মী অনুসারীদের দেশ। ১৯৫০ সালে সেখানে সম্ভবত মাত্র শতকরা ১ ভাগ থেকে ৩ ভাগ লোক খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত ও সর্বত্র নগরায়ন, পেশাগত বিশেষীকরণের প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধধর্ম সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে চলে আসে। একসময় বৌদ্ধধর্ম কোরীয় সমাজকে আর কিছু দিতে না-পারার পর্যায়ে চলে আসে। অর্থাৎ, পরিবর্তিত সমাজের নানামুখী চাহিদার সঙ্গে 'নিশ্চল' বৌদ্ধধর্ম বেমানান মনে হতে থাকে এবং তা অনেকটা

'কর্মহীন' হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় খ্রিস্টধর্ম এগিয়ে আসে। খ্রিস্টধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত মুক্তি ও নিশ্চিত প্রশান্তির বার্তা নিয়ে সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও পরিবর্তনমুখী সমাজে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়।[৩০] ১৯৮০ সালের মধ্যে কোরিয়ার জনগণের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেয়।

প্রায় অনুরূপ ঘটনা লাটিন আমেরিকায় ঘটতে দেখা যায়। সেখানে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মানুষের সংখ্যা ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯০ সালে প্রায় ৭ মিলিয়ন থেকে ৫০ মিলিয়নে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হিসেবে একজন ক্যাথলিক বিশপ ১৯৮৯ সালে বলেন যে, লাটিন আমেরিকার ক্যাথরিক গির্জা 'সেখানকার নগরজীবনের প্রযুক্তিগত বিকাশের গতির সঙ্গে এগুতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের অত্যন্ত ধীরে চলো নীতির ফলে। তাছাড়া ক্যাথলিক ধর্মের কাঠামো হয়তো আধুনিক যুগের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে ততটা পারদর্শী নয়।' ব্রাজিলে ১৯৯০-এর দশকে, উদাহরণস্বরূপ, শতকরা ২০ ভাগ মানুষ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট, অন্যদিকে শতকরা ৭৩ ভাগ লোক ছিল ক্যাথলিক। কিন্তু মজার বিষয় হল, রবিবারের গির্জায় যাতায়াতের সংখ্যা এরূপ ছিল, যেখানে ২০ মিলিয়ন প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জায় যায়, সেখানে মাত্র ১২ মিলিয়ন ক্যাথলিক গির্জায় যায়। সুতরাং, ক্যাথলিক ধর্ম অনেকাংশেই 'নিষ্ক্রিয়' হয়ে পড়েছে। অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম আধুনিকীকরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এর পুনরুত্থান ঘটছে। তবে লাটিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে ক্যাথলিক অনুসারীদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্টগণ বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। আর সেজন্যই হয়তো তারা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়া এবং লাটিন আমেরিকার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক মতাদর্শ আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত জনগণের মনস্তাত্ত্বিক, আবেগজড়িত, সামাজিক চাহিদাসমূহ মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্যত্রও প্রায় একইরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ, যেখানে প্রচলিত ধর্ম যুগের দাবির সঙ্গে তালমেলাতে ব্যর্থ হয়, সেখানেই নতুনভাবে ধর্মীয় পুনরুত্থান ঘটে থাকে, অথবা, অন্য কোনো ধর্ম এসে সে-স্থান দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে কনফুসীয় মতবাদ সম্ভবত সবচেয়ে অরক্ষিত। কনফুসীয় দেশসমূহে প্রোটেস্ট্যান্ট বা ক্যাথলিক মতবাদ কিছু প্রতিশ্রুতি ও আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হয়, যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। আর মুসলমান ও হিন্দু অধ্যুষিত দেশে মৌলবাদ 'বিকল্প' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ১৯৮০-এর দশকে চীনে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পূর্ণমাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে এমন দেখা যায়, তখন আবার একই সঙ্গে তথায় খ্রিস্টধর্মও এগিয়ে যাচ্ছে (বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে)। সম্ভবত ৫০ মিলিয়ন চীনা অধিবাসী খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সরকার নানাপ্রকারে খ্রিস্টধর্মের এ অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছে। যেমন, মিশনারিদের জেল-জরিমানা করা হয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে; ইত্যাদি। ১৯৪৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যেখানে বিদেশীদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় যে, তারা কোনোপ্রকার ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিদেশ থেকে কোনোপ্রকার আর্থিক অনুদান আনা বা গ্রহণ করাও যাবে না।

সিঙ্গাপুরে চীনের মতোই প্রায় শতকরা ৫ ভাগ মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সরকারি মন্ত্রীদের 'সুসমাচার' বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়, যা কি-না তাদের ভাষায় 'দেশের স্পর্শকাতর ধর্মীয় ভারসাম্যের' প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাছাড়া ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জেল-জরিমানা করা হয় এবং বিভিন্নভাবে খ্রিস্টীয় মতাবলম্বীদের অপমান-অপদস্ত করা হয়।[৩২]

শীতলযুদ্ধাবসানের ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক জীবনে মুক্ত ও উদার হাওয়া বইবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে পাশ্চাত্য গির্জার প্রতিনিধিরা প্রাক্তন সোভিয়েটের অর্থোডক্স মতাবলম্বীদের নিকট পৌঁছার অনুমতি পেয়ে যায়, যেখানে তারা পুনরুত্থিত অর্থোডক্স গির্জার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। চীনের মতো এখানেও ধর্মান্তকরণের ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৯৩ সালে রুশ পার্লামেন্ট অর্থোডক্স চার্চের চাহিদা মোতাবেক আইন প্রণয়ন করে যে, বিদেশী ধর্মীয় সংস্থাকে অবশ্যই রাশিয়ার ধর্মীয় সংগঠনসমূহের সঙ্গে নিজেদের মান নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং তাদেরকে রাশিয়ার ধর্মীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে অধিভুক্ত হতে হবে, যদি তারা ধর্মীয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে চায়।

প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন অবশ্য ওই বিলে স্বাক্ষর করতে নারাজ হন। ফলে এটি আর আইনে পরিণত হয়নি।[৩৩] মোটের ওপর দেখা যায়, যেখানেই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া জনগণের ধর্মীয় চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটেছে, তথা দৈশিককরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিজস্ব ধর্ম বিপুল উদ্যোগে জাগরিত হয়েছে, যাতে করে মানুষের ধর্মীয় আবেগপূর্ণ দিকটি সন্তুষ্ট করা যায়।

আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আবেগজনিত দিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট দুষ্টক্ষতের বাইরেও আরও কিছু কারণ রয়েছে, যা ধর্মীয় পুনঃজাগরণের জন্য অবদান রেখেছে। এ বিষয়টিকে আমরা শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, অপাশ্চাত্য দেশসমূহ পাশ্চাত্যের নিকট থেকে মতাদর্শ 'আমদানি' করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অপাশ্চাত্য দেশের এলিটগণ পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেও পরে কিন্তু বিভিন্ন কারণে, বিশেষত দৈশিকরণের চাপের মুখে তাঁরা পাশ্চাত্যবিদ্বেষী হতে বাধ্য হন। প্রথমে তাঁরা মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী আকার ধারণ করেন। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া, এশিয়া, আরবীয়, আফ্রিকান এবং লাটিন আমেরিকার এলিটগণ সমাজতন্ত্র আমদানি এবং মার্কসবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পশ্চিমা ধনতন্ত্র ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর চীন সতর্ক হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে কিছু সংস্কার ঘটায় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যর্থতার ফলে একটি প্রবল শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্যের সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ, যেমন আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক, দ্রুত ওই শূন্যতা পূরণের জন্য নতুন মূল্যবোধ—যথা নব্য অর্থোডক্স এবং গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে সেখানে এগিয়ে যায়। তবে, শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পশ্চিমাদের এ দৌড়ঝাঁপ অপাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে টেকসই হবে কি না তা বলার সময়

এখনও আসেনি। কেননা, বিষয়টি এখনও পুরোপুরি অনিশ্চিত। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে লক্ষ করল যে, 'ধর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর' হিসেবে সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়েছে এবং এমতাবস্থায় নতুন ধরনের বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানে ফেরার চাপ না-থাকায় জনগণ দায়মুক্ত হল এবং নতুন পথের সন্ধান করতে লাগল। আর ধর্ম সেই পথের প্রধান মতাদর্শিক কাণ্ডারী হয়ে হাজির হল, ফলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করল।[৩৪]

ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ নীতিবিরোধী, সর্বজনীন ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং শুধুমাত্র খ্রিস্টধর্মের অংশ বাদ দিলে পশ্চিমাবিরোধী। তারা আপেক্ষিকতাবাদ, অহংবাদ, ভোগবাদ তথা ব্রুস. বি. লরেন্স (Bruce B. Lawrence)-এর ভাষায় 'আধুনিকতাবাদ' অস্বীকার করে থাকে। তবে মোটের ওপর তারা নগরায়ন, শিল্পায়ন, উন্নয়ন, ধনতন্ত্র, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত বিকাশ সমাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং, পাশ্চাত্যকরণবিবর্জিত আধুনিকতার তারা বিরোধী নন।

তারা আধুনিকীকরণকে গ্রহণ করছেন। লি কুয়ান ইউ (Lee Kuan Yew) বলেন, 'তারা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে জীবনযাত্রা পরিবর্তন করার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তারা পশ্চাত্যকরণের ধারণা সঙ্গে একমত নন এবং তা গ্রহণেও রাজি নন।' আল তুরাবি (Al-Turabi) যেমনটি বলেন, 'জাতীয়তাবাদ বা সমাজতন্ত্র ইসলামি বিশ্বের উন্নয়ন ঘটাতে পারে না' বলে তারা মনে করেন। 'ধর্মই হচ্ছে উন্নয়নের মূল শক্তি', এবং তারা আরও মনে করে 'পরিশুদ্ধ ইসলামই' একমাত্র সাম্প্রতিককালের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। যেমন একসময় পাশ্চাত্যে প্রটেস্টট্যান্ট গোষ্ঠী অগ্রগতির জন্য উপযোগী ছিল। সুতরাং, সাম্প্রতিক রাষ্ট্রে ধর্ম অযোগ্য বা উন্নয়নবিরোধী কোনো উপাদান নয়।[৩৫]

ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এমনকি দৃশ্যত ধর্মনিরপেক্ষ ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রে—যেমন আলজেরিয়া, ইরান, মিশর, লেবানন, এবং তিউনেশিয়ায়।[৩৬] ইসলামি মৌলবাদীরা অত্যাধুনিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে এবং আধুনিক সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করছে। আর এভাবে তারা তাদের বার্তা চারদিক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ধর্মীয় পুনরুত্থানকর্মীরা সমাজের প্রায় সকল স্তর থেকে এলেও তাদের বেশিরভাগ এসেছে দুটি দিক থেকে। যেমন, শহর ও ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী থেকে। সম্প্রতি গ্রাম থেকে শহুরে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পড়ে সামাজিক, আবেগগত দিকসহ, বস্তুগত প্রাপ্তি এবং পথনির্দেশনার; যা কি-না ধর্মীয় গোষ্ঠী অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে ও সুষ্ঠু পন্থায় তাদের জন্য জোগাতে সচেষ্ট থাকে। অন্যকোনো গোষ্ঠী তাদের মতো এত সমর্থন জোগাতে পারে না। রিগস্ ডেব্রয় (Rigis Debray) যেমন বলেন, 'তাদের নিকট ধর্ম আফিমের মতো: তবে তা যাদের উপর বর্তায় তারা কিন্তু দুর্বল।'[৩৭] ধর্মীয় পুনরুত্থানকর্মীদের অন্য একটি গোষ্ঠী আসে নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে। ডোরি (Dore's) তাদের আখ্যায়িত করেছেন 'দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ প্রক্রিয়ার সত্তা' হিসেবে। কেপেল (Kepel) যেভাবে দেখিয়েছেন হয়তো তা সত্য নয়। কেপেল

বলেন, 'ইসলামি মৌলবাদীরা এসেছে মূলত সমাজের রক্ষণশীল অংশ থেকে, অথবা তারা নিরক্ষর চাষাভূষা মানুষ।'

অন্যান্যদের মতো ইসলামি পুনঃজাগরণ কর্মীরাও শহুরে মানুষ এবং তারা যাদের নিকট আর্জি পেশ করে থাকে তারা আধুনিকতামুখী সুশিক্ষিত এবং সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজকর্ম পেতে চায়।[৩৮] মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুবক সন্তানসন্ততি ধার্মিক, কিন্তু তার পিতামাতা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় একইরূপ, সেখানে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের নেতারা দৈশিককরণপন্থী। তারা সাধারণত দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে এসেছেন এবং প্রায়শই সফল ব্যবসায়ী এবং দক্ষ প্রশাসক। ১৯৯০-এর দশকে তাদের সমর্থককুল ক্রমবর্ধমানভাবে ভারতের নিখাদ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে এসেছেন, যাদের প্রায় সবাই বেনিয়া, হিসাবরক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, এমনকি উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক।[৩৯] দক্ষিণ কোরিয়ার বেলাতেও প্রায় অনুরূপ মানুষই ক্রমবর্ধমানভাবে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল।

'ধর্ম' দেশজ হোক কিংবা আমদানিকৃত হোক, তা কিন্তু আধুনিকাভিমুখী সমাজের উঠতি এলিটদের নিকট অর্থ ও দিকনির্দেশনা পৌঁছে দেয়। রোনাল্ড ডোরি, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয়বোধের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, 'তারা অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক পদদলিত থাকায় বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং নিজ দেশে ওইসব নেতার বিরুদ্ধাচরণ করে; যারা বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' উইলিয়াম ম্যাকনেইল (William McNeill) উল্লেখ করেন, 'ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে ইউরোপীয় ও আমেরিকার আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কেননা তা আঞ্চলিক সমাজ, রাজনীতি এবং নৈতিকতা বিধ্বংসী।'[৪০] এ অর্থে বলা যায়, অপাশ্চাত্য ধর্মসমূহের পুনঃঅভ্যুত্থান মূলত পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জাগরণ। ধর্মের এই পুনরুত্থান কিন্তু আধুনিকতাকে অস্বীকার করা নয়, বরং আসলে এটি হল পাশ্চাত্যকে বাতিল করার প্রচেষ্টা বিশেষ এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদ, আপেক্ষিকতাবাদকে অস্বীকার করা; যা পাশ্চাত্যের সমাজকে কলুষিত করেছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাই এটি পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করা এবং এভাবে পাশ্চাত্যের প্রভাবের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার একটি ঘোষণা বিশেষ, যে ঘোষণা অবশ্যই একটি গর্বিত ঘোষণা, 'আমরা আধুনিক হব, কিন্তু তোমার মতো (পাশ্চাত্যের মতো) হব না।'

অধ্যায় - ৫

অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব এবং চ্যালেঞ্জার সভ্যতাসমূহ

দৈশিককরণ ও ধর্মীয় পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিষয়াদি একটি বৈশ্বিক প্রত্যয়। এ দুটি বিষয় মূলত এশিয়া এবং ইসলামের তরফ থেকে প্রত্যাগত পশ্চিমের প্রতি সাংস্কৃতিক চাপ হিসেবে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এটি বিংশ শতাব্দীর শেষদিকের গতিময় সভ্যতাসমূহের কর্মতৎপরতার অংশবিশেষ। এসময় মুসলমানসমাজে ইসলামের পুনঃজাগরণ ঘটে এবং তারা উপর্যুপরিভাবে পাশ্চাত্য মূল্যবোধসমূহকে পরিত্যাগ করতে থাকে। এশিয়ার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য যে চ্যালেঞ্জসমূহ পায়, তা আসতে থাকে পূর্বএশীয় সভ্যতাসমূহ থেকে; যেমন সিনিক, জাপানি, বৌদ্ধ এবং বিশ্বের মুসলমানদের নিকট থেকে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকে। একই সাথে তাদের মধ্যে সভ্যতার পারস্পরিক মিলসমূহ সম্পর্কে তারা সচেতন হতে শুরু করে। এশীয় সভ্যতাগুলো ও মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের চেয়ে তাদের সভ্যতার উন্নত অবস্থার কথা উচ্চারণ করতে থাকে। বিপরীতভাবে অন্যান্য অপাশ্চাত্য সভ্যতা, যেমন হিন্দু, অর্থোডক্স এবং লাটিন আমেরিকার অধিবাসী ও আফ্রিকার জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমাবিশ্বকে জানিয়ে দিতে থাকে। তবে, ১৯৯০-এর দশকে এসে তারা তাদের সভ্যতা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে উন্নততর; একথা বলতে দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, এক্ষেত্রে এশীয় ও মুসলমানগণ এককভাবে দাঁড়িয়ে যায় তারা একত্রে তাদের সংস্কৃতির ওপর গভীর আস্থা ব্যক্ত করতে থাকে, যা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে চলে যায়।

পাশ্চাত্যের প্রতি এসব চ্যালেঞ্জের পেছনে এর সঙ্গে সংযুক্ত আরও কারণ রয়েছে। এশিয়ার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত এই চ্যালেঞ্জের পশ্চাতে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিজনিত ঘটনা। অন্যদিকে মুসলমানদের ভেতর থেকে আসা প্রতিরোধের পশ্চাতে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের দলবদ্ধতা। যে যাই হোক, পাশ্চাত্যের প্রতি এ দুটো চ্যালেঞ্জ চলমান থাকবে বলে মনে হয়, এবং একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতিকে তা অস্থির করে তুলবে; একথাও বলা চলে। এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি হয়তো সর্বত্র একই রূপ হবে না। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে অন্যান্য এশীয় সমাজের সরকারগুলো ও জনগণ প্রণোদনাপ্রাপ্ত হবে, সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নে অন্যান্য দেশের প্রতি তারা আরও চাহিদামুখী হয়ে উঠবে। মুসলমান সমাজে দ্রুত জনসংখ্যা

বৃদ্ধির প্রবণতা এবং বিশেষ করে ১৫ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের মানুষের সংখ্যার সম্প্রসারণ মৌলবাদীদের সুযোগ এনে দেবে। তাদের দল এভাবে ভারী হয়ে উঠবে। ফলে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় চেতনার পুনরুত্থান এবং অভিবাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক উন্নতি এশীয় সরকারসমূহের হাত আরও শক্ত করবে, অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা মুসলমান ও অমুসলমান সরকারসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি করবে।

এশীয় দৃঢ়োক্তি

পূর্বএশিয়ার আর্থিক উন্নয়ন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রক্রিয়াটি ১৯৫০-এর দশকে জাপানে শুরু হয়েছিল। এসময় থেকে জাপান অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে এবং অর্জন করে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারা 'এশীয় ব্যাঘ্র'-খ্যাত আর চারটি দেশে সম্প্রসারিত হয়। দেশগুলো হল : হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর। তারপর চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া এবং আরও পরে ফিলিপাইন, ভারত ও ভিয়েতনাম এশীয় উন্নয়ন ধারায় যুক্ত হয়। তারাও দ্রুত উন্নতি সাধন করতে শুরু করে। এসব দেশ উর্পযুপরিভাবে এক দশকের বেশি সময় ধরে তাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮-১০ ভাগ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। নাটকীয়ভাবে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরও প্রসার ঘটতে থাকে। প্রথমে এটি ঘটে এশিয়া ও বিশ্বের মধ্যে এবং পরবর্তীতে তাদের নিজেদের মধ্যে। অথচ, একই সময়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ছিল খুবই কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-প্রশ্নে স্থবিরতাও লক্ষ্য করার মতো ছিল।

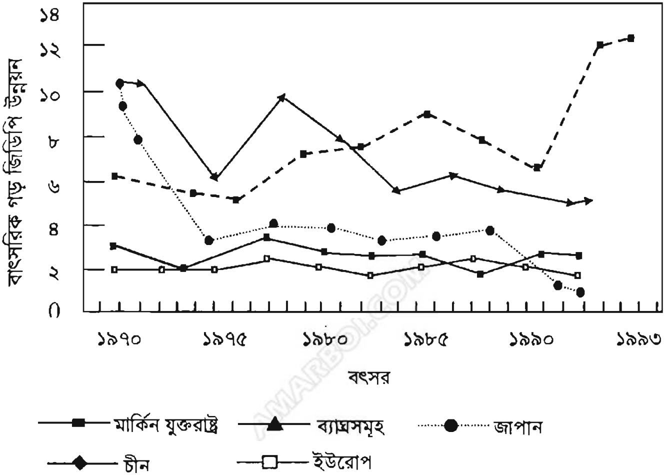
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়ায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু জাপানই ব্যতিক্রম ছিল না, বরং সত্য হল, সমগ্র এশিয়াই উন্নত হচ্ছিল। তাই পূর্বের মতো অপাশ্চাত্য বা অনুন্নত সভ্যতা মানেই দারিদ্র্যপীড়িত, আর পাশ্চাত্য মানেই উন্নত এ ধারণা বিংশ শতাব্দীতে আর টিকল না। এশীয় দেশের দিনবদলের গতি ছিল অত্যন্ত জোরালো। কিশোরী মাহবুবানী যেমন বলেন, 'যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লেগেছিল ৫৮ বৎসর, আর ব্রিটেনের জন্য লেগেছিল ৪৭ বৎসর (মাথাপিছু গড় আয় দ্বিগুণ করতে)' অথচ জাপান তা মাত্র ৩৩ বৎসরে সম্পন্ন করে ফেলে, ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষেত্রে লাগে ১৭ বৎসর, দক্ষিণ কোরিয়ার লাগে ১১ বৎসর এবং চীনের লাগে মাত্র ১০ বৎসর।

১৯৮০-এর দশকে চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮ ভাগ এবং ১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার বাঘগুলো তার অতিনিকটবর্তী ছিল (ফিগার ৫.১)। ১৯৯৩ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায়, চীনের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানির পরেই স্থান করে নেয় (৪র্থ স্থান)। বিভিন্ন জরিপ থেকে মনে করা হচ্ছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে চীনের অর্থনীতি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি; তাছাড়া ১৯৯০-এর দশকে ৩য় বৃহৎ অর্থনীতি ছিল এশিয়ার। ধরে নেয়া হয়, ২০২০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এশিয়ার ১০টিতে দাঁড়াবে। তখন থেকে এশীয় দেশগুলো পৃথিবীর সর্বমোট শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন নিশ্চিত করবে। প্রতিযোগিতামুখর অর্থনীতির মালিকানাও এশীয় দেশগুলোর মধ্যেই থাকবে।[১]

পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে এশিয়া এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন বার্তা নিয়ে এসেছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র ক্ষমতাহ্রাসের প্রবল প্রভাব এশিয়ায় পড়বে। তাদের ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক সাফল্য ও আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা বৃদ্ধি করবে।

ফিগার- ৫.১

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ : এশিয়া ও পাশ্চাত্য



Source : World Bank, World tables 1995.
(Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1995, 1991); Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, R.O.C, *Statistical Abstract of National Income, Taiwan Area, Republic of China* 1951-1995 (1995).
Note : Data representations are Chain weighted three-year averages.

সম্পদ ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। সম্পদ সদ্গুণের মানান্তর এভাবে যে, তা প্রকারান্তরে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রবণতা বৃদ্ধি করে থাকে। পূর্বএশিয়া অর্থনৈতিকভাবে সক্ষমতার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির উচ্চমানবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং বলাবাহুল্য, তা তারা প্রদর্শন করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, তাদের সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধগুলো যে-কোনো বিচারে পশ্চিমা মূল্যবোধের চেয়ে উচ্চমার্গের। এশীয় দেশগুলো ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা পূরণে অমনোযোগিতার পরিচয় দিতে থাকে এবং মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের চাপের প্রতি নতি স্বীকার না-করার মনোভাবও তারা সুদৃঢ় করতে থাকে।

এ পরিস্থিতিকে 'একটি সাংস্কৃতিক রেনেসাঁ' হিসেবে রাষ্ট্রদূত টসি কোহ্ ১৯৯৩ সালে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এ-ধরনের তৎপরতা সমগ্র 'এশিয়াব্যাপী ঘটে চলেছে।' এর ফলে এশীয়দের মধ্যে 'আত্মবিশ্বাসের' ভিত্তি সুদৃঢ় হচ্ছে, এর মানে হচ্ছে, 'এশীয়রা আর কোনোকিছুর জন্য আমেরিকা অথবা পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নয়।'[২] এই সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর দুটি দিক রয়েছে। একদিকে হল প্রতিটি এশীয় দেশ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হচ্ছে; অন্যদিক হল : এশিয়ার দেশসমূহ তাদের মধ্যে মিল রয়েছে এমন অনুভূতির মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পশ্চিমাবিশ্ব থেকে এশীয় সংস্কৃতির ভিন্নতা উপলব্ধি করছে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পশ্চিমারা কেমালপন্থী সংস্কারের জন্য চীন এবং জাপানের ওপর চাপ দেয়, তখন তথাকার এলিটগণ সংস্কারবাদী কৌশল গ্রহণের পক্ষে মত দেয়। মেজি পুনর্জাগরণের ফলে একটি সংস্কারবাদী গোষ্ঠী জাপানে ক্ষমতায় আসে। তারা পশ্চিমা সভ্যতা অধ্যয়ন করে, পশ্চিমা কলাকৌশল ও তা বাস্তবায়নসূত্র, প্রতিষ্ঠানাদি, ইত্যাদি জাপানের আধুনিকীকরণের স্বার্থে প্রয়োগ করতে থাকে। তবে, জাপানিরা জাপানের গতানুগতিক সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো সংরক্ষণ করতে মোটেও পিছপা হয়নি। কারণ, তারা ভাবতে থাকেন যে, আধুনিকীকরণের জন্য জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদান উপযোগী হতে পারে। এজন্য দেখা যায়, ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যকে পর্যন্ত যৌক্তিক বলে রায় প্রদান করছে।

অন্যদিকে, চীনে ধ্বংসোন্মুখ চু-ইং রাজত্ব সফলতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ফলাফল প্রয়োগ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। চীন ছিল পরাজিত, শোষিত এবং জাপান ও ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক চরমভাবে অপমানিত।'[৮৩] ১৯১০ সালে চু-ইং রাজত্বের পতনের ফলে চীনে দেখা দিল বিভেদ ও 'সিভিল ওয়ার'। এমতাবস্থায় সান ইয়েট সিন (Sun Yat Sen's)-এর তিনটি সূত্র—তথা 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং জনগণের জীবনধারা সংরক্ষণ', লিয়াং চি-ই-চেওসের (Liang Chi-ch', Cao's) এ উদারনীতিবাদ, মাউসেতুং-এর মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ইত্যাদি নিয়ে চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৪০-এর পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আমদানিকৃত মতাদর্শের প্রভাবে পশ্চিমা জাতীয়তাবাদ, উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্র, খ্রিস্টীয় মতাদর্শ পরাজিত হয়ে যায় এবং চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের সামগ্রিক পরাজয়ের ফলে জাপানের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোপুরি হতাশার কালো মেঘ নেমে আসে। ১৯৯৪ সালে একজন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী সেসময়ের জাপানের অবস্থা বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, 'এখন সত্যিই খুবই দুঃসময়, কেননা আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মানসিক অবস্থা বজায় রাখা কঠিন এবং এসবই ঘটেছে যুদ্ধের ফলে। যুদ্ধে পরাজয় ছিল জাপানের জন্য মস্তবড় একটি আঘাত। তাদের নিকট সমস্ত বিষয়টি ছিল অকর্মণ্য ও পতনের শামিল।'[৩] এমতাবস্থায়, জাপান বিজয়ী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তদুপরি, জাপান এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবার সংকল্প পোষণ করতে থাকে। যেমন, সোভিয়েট ইউনিয়নকে ছাড়িয়ে গিয়েছে চীন।

১৯৭০-এর দশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে কম্যুনিজমের ব্যর্থতা এবং উপর্যুপরি ধনতন্ত্রের মাধ্যমে জাপানের সফলতা, কার্যত অন্যান্য এশীয় দেশসমূহে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এর ফলে সোভিয়েট-বলয় থেকে চ্যুত হয়ে চীন নতুন করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পন্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এর এক দশক পরে সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর পুনরায় চীনের নিকট চিন্তার খোরাক হিসেবে আমদানিকৃত সোভিয়েট মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। চীনের নিকট প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তারা কি পশ্চিমাপথ অনুসরণ করবে নাকি প্রচলিত পথেই হাঁটবে? কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী এমতাবস্থায় পুরোপরি পশ্চিমাপথ অনুসরণ করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রবণতাটি চীনের সংস্কৃতিক পর্যায়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান নেয়। টেলিভিশন সিরিজ *River Elegy* এবং তিয়ানআনমেনস্কয়ার-এর ঘটনা তাদের এ চিন্তাকে আরও সামনে উস্‌কে দেয়। তবে সত্যকথা হল, এই পশ্চিমা মতবাদ চীনের কয়েকশত এলিট বা ৮০০ মিলিয়ন গ্রামীণ কৃষক, কারও চিন্তাচেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই দেখা যায়, পুরোপুরিভাবে পশ্চিমাকরণ মতবাদ কোনো সমর্থন পায়নি। এ অবস্থায় চীনারা নতুন পথের সন্ধানে মেতে ওঠে, যাকে টি ওয়ং (Ti-Yong)-এর বর্ণনায় বলা যায় : একদিকে গণতন্ত্র এবং অন্যান্য বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা, অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের সাথে চীনের গতানুগতিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা।

মার্কসবাদ, লেনিনবাদের আমলে বিপ্লবী বৈধতার বদলে চীনা কর্তৃপক্ষ 'কর্ম কৃতিত্ব'ভিত্তিক বৈধতার সূত্রটি সামনে এগিয়ে আনে এবং সেভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টির নিরিখে চীনের সংস্কৃতিস্পর্শী বৈধতার বিষয়টির ওপর জোর দেয়। একজন বিশেষজ্ঞের মতে তিয়ানআনমেনস্কয়ার-ঘটনা-পরবর্তী সরকার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে চীনা জাতীয়তাবাদকে একটি বৈধতার নতুন মাত্রা হিসেবে সংযুক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং এভাবে মার্কিনবিরোধী মনোভাব চাঙা করে ক্ষমতায় নিজেদের থাকার প্রয়োজনীয়তাকে বোধগম্য করতে থাকে।[৪] এভাবে চীনে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৯৪ সালে একজন বিশেষজ্ঞের বর্ণনায় বিষয়টি প্রতীক হিসেবে ফুটে উঠেছে। বলা হয়, 'আমরা চীনারা জাতীয় চেতনা অনুভব করছি, পূর্বে এমনভাবে যা অনুভব করিনি। আমরা যে চীনা, এটি ভাবতে আমরা গর্ববোধ করে থাকি।' ১৯৯০ সালের শুরুতে চীন নিজেই, 'যেখানে ফিরে যেতে চায় সেখান থেকে চীনাত্ববোধ প্রামাণ্যভাবে জাগ্রত হয়, যা মূলত দেশপ্রেম, স্বজাতপ্রেম এবং কর্তৃত্বমূলক।' চীনা-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পুনরুত্থানে গণতন্ত্রকে (যেমনটি লেনিনবাদে মনে করা হয়, তেমনি) একধরনের বিদেশী মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, 'আমাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পাশ্চাত্য তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়।'[৫]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীনের বুদ্ধিজীবীমহল ম্যাক্স ওয়েবারের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে থাকেন যে, কনফুসীয় মতবাদ হল চীনের পশ্চাৎপদতার কারণ। বিংশ শতাব্দীর

শেষার্ধে চীনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঠিক উল্টোকথা বলতে থাকেন। তারা চীন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের মূল্যায়ন গ্রহণ করে বলতে থাকেন যে, কনফুসীয় মতবাদ চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। ১৯৮০-এর দশকে চীনা সরকার কনফুসীয় মতবাদকে এগিয়ে নেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পার্টির ফোরামে কনফুসীয় মতবাদকে 'চীনের সভ্যতার মূলস্রোত' হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়।[৬] সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইয়ে, সিঙ্গাপুরের উন্নয়নের মূলেও কনফুসীয় মতবাদকে চিহ্নিত করেন এবং বিশ্বব্যাপী এ মতবাদ প্রসারের জন্য মিশন ঠিক করেন।

১৯৯০-এর দশকে তাইওয়ান সরকার তাইওয়ানের অগ্রগতির জন্য চীনের ঐতিহ্যপূর্ণ সভ্যতার অভ্যন্তর থেকে মালমশলা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য তারা বলেন যে, 'আমরা কনফুসীয় মতবাদের উত্তরাধিকার'। প্রেসিডেন্ট লি টেংহুই তাইওয়ানের গণতন্ত্রের মূল শেকড় হিসেবে খ্রিস্টের জন্মের একবিংশ শতাব্দীর কাও ইয়াও (Kao Yao), কনফুসিয়াস (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে)-এর মেনসিয়াস (Mencius, খ্রিস্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে) দর্শনে অবগাহন করার পরামর্শ প্রদান করেন।[৭] চীনের নেতৃত্ব গণতন্ত্র বা কর্তৃত্বমূলক শাসন যেটিই গ্রহণ করুন না কেন, তারা এজন্য নিজস্ব ঐতিহ্য ও সভ্যতার ভেতর থেকেই এর উৎস অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হন; পশ্চিমাবিশ্ব বা পশ্চিমা সভ্যতা থেকে নয়।

'হান জাতীয়তাবাদ' (Han Nationalism), উক্ত সরকার কর্তৃক এগিয়ে নিতে চাওয়া হয়। এ জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে ভাষাগত, অঞ্চলগত এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে শতকরা ৯০ ভাগ চীনাদের চাহিদা অবদমন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, এ জাতীয়তাবাদের দ্বারা অ-চীনা নৃগোষ্ঠীকে অধস্তন করা হয়; যারা চীনের জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ নিয়ে গঠিত। কিন্তু তারা চীনের ভূখণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ তাদের দখলে রেখেছিল। এ জাতীয়তাবাদী ধারার মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম, খ্রিস্টীয় সংগঠনসমূহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওইসব সংগঠন ও ধর্ম, মাওবাদী ও লেনিনবাদী মতাদর্শের ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট মতাদর্শিক শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছিল।

১৯৮০-এর দশকে জাপানে অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। অপরদিকে পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ওই সময়কালে স্থবির হয়ে পড়েছিল। জাপানের এ সাফল্যের মূলে জাপানিরা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে, পশ্চিমা লেজুড়বৃত্তিকে নয়। জাপানি সংস্কৃতি সামরিক ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরাজয় ও দুর্যোগ বয়ে নিয়ে এসেছিল। আর সেই অবস্থান থেকে নিজেদের রক্ষা করার নিমিত্তে তারা কাজ করতে থাকে এবং সামরিক সংস্কৃতি বর্জন করে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির সংস্কৃতি গ্রহণ করে, আর ১৯৮৫ সালের মধ্যে তার ব্যাপক সাফল্যও তারা দেখতে পায়। জাপানে মেজি সরকারের পুনঃক্ষমতায়নের ফলে যে-নীতি গ্রহণ করেছিল তা হল, 'আমেরিকা থেকে দূরে থাকো, আর এশিয়ার সঙ্গে মিলে যাও।'[৮] এ নীতির দুটি ফলাফল চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, এর ফলে জাপান নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, যদিও কিছুটা সমস্যাসংকুল, তবুও এশিয়াকরণ নীতির ফলে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতির সীমানা রক্ষা করে অন্যান্য এশীয় সভ্যতার সঙ্গে 'সাধারণ' (Common) বা

মিল রয়েছে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করতে প্রয়াসী হল। এর ফলে, সামগ্রিকভাবে এশীয় সংস্কৃতি চিহ্নিতকরণ ও তা এগিয়ে নেবার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান অবশ্য সংকট থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য পশ্চিমাবিশ্বের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিল, ফলে নানা কারণ থাকার পরও সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যায়নি জাপান। এক্ষেত্রে চীনের নীতির সঙ্গে জাপানের নীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে জাপানি সভ্যতার স্বতন্ত্র দিকই হয়তো জাপানি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অন্যান্য দেশের স্মৃতি এবং অন্যান্য এশীয় দেশের প্রতি চীনের কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি জাপানকে পাশ্চাত্য থেকে দূরে রাখে এবং এশীয় দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।[৯] এভাবে জাপান তার নীতির দ্বারা একদিকে যেমন নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হয়েছিল, তেমনি পাশ্চাত্য ও অন্যান্য এশীয় সংস্কৃতি থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল।

চীন এবং জাপান উভয় দেশই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে আত্মপরিচয় খুঁজে পায়, সেসঙ্গে তারা পাশ্চাত্য নয় বরং অন্যান্য এশীয় সভ্যতার সঙ্গে তাদের সভ্যতার মিল রয়েছে এমন ধারাগুলো চিহ্নিত করে একটি 'সাধারণ' এশীয় সংস্কৃতি বির্নিমাণে নিয়োজিত হয়। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে 'এশীয় দৃঢ়োক্তি' অনন্য ভূমিকা রাখে।

এই জটিল বিষয়টি চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে রয়েছে :

প্রথমত, এশীয়রা বিশ্বাস করে যে, পূর্বএশিয়া তার অর্থনৈতিক সাফল্য ধরে রাখতে পারবে এবং শীঘ্রই তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা পাশ্চাত্যবিশ্বকে দলিত করতে পারবে এবং এভাবে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে এশীয়রা পশ্চিমের তুলনায় আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূমিকা রাখতে পারবে। একথা স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক সাফল্য এশীয় সমাজের মধ্যে 'ক্ষমতাধর হয়েছি' এরূপ একটি মনোভাব দৃঢ়মূল করেছে এবং পশ্চিমের বিরুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নে তাদের দৃঢ়োক্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। একজন মালয়েশীয় কর্মকর্তা একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন; তিনি বলেন, 'যখন আমেরিকার গায়ে তীব্র জ্বর, সে জ্বর এশিয়ায় তখন কোনো হাঁচি বা কাশি সৃষ্টি করতে পারছে না।' মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, 'এশীয়রা দ্রুত উন্নতির শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে', এর ফলে এশীয়রা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতো করে বিকল্প প্রস্তাব আনার সক্ষমতা অর্জন করছে, সেসঙ্গে বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতেও এশীয়দের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১০] আরও বলা হয় যে, পাশ্চাত্য দ্রুত এশীয়দের ওপর মানবাধিকারের তত্ত্ব ও অন্যান্য মূল্যবোধ চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে।

দ্বিতীয়ত, এশীয়রা বিশ্বাস করে যে, তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি, যে সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি থেকে উন্নততর এবং যা সামাজিকভাবেও অনেক সমৃদ্ধশালী। ১৯৮০-এর দশকে জাপানের অর্থনীতি যখন

অতিদ্রুত অগ্রগতির শিখরে আরোহণ করছিল, তাদের রপ্তানি, বাণিজ্য ভারসাম্য, বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার—এসবই অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল; যখন পশ্চিমাবিশ্বের অর্থনীতি নিম্নগামী হচ্ছিল; তখন জাপানিরা প্রমাণ করতে চাইল যে, পশ্চিমাবিশ্বের সাংস্কৃতিক অবস্থার তুলনায় তাদের সাংস্কৃতির উচ্চমানই অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে তুলছে। সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রেও প্রায় একইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে, একথা পূর্বএশিয়ার উঠতি দেশগুলো ভাবতে থাকে যে, এশিয়ার অগ্রগতির জন্য এশীয় মূল্যবোধ, নির্দেশসমূহ, পারিবারিক দায়িত্বশীলতা, পরিশ্রমের মনন, যৌথভাবে কাজ করার মনমানসিকতা প্রভৃতি কনফুসীয় ধারাগুলো প্রবলভাবে কাজ করেছে। অন্যদিকে আত্মকেন্দ্রিকতা, সংকীর্ণতা, ব্যক্তিপূজা, অপরাধ, নিম্নমানের শিক্ষা, কর্তৃপক্ষের প্রতি অমান্যতার মনোভাব 'প্রগতিবিমুখ মানসিকতা'ই আসলে পশ্চিমাদের অবনতির মূল কারণ। এমতাবস্থায় পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্বএশিয়ার সংস্কৃতি থেকে শিক্ষণীয় অনেককিছু গ্রহণ করতে হবে।[১১]

তাহলে একথা বলা সমীচীন হবে যে, পূর্বএশিয়ার মূলমন্ত্র কিন্তু তাদের সংস্কৃতির শেকড়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে; বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে যৌথ সামাজিক চরিত্রের আদর্শ এখানে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। লি কাউন যথার্থই বলেন যে, এশীয় সংস্কৃতির যৌথচরিত্র তথা সমাজের সকলকে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় জাপানি, কোরীয়, তাইওয়ানি, হংকংবাসীর এবং সিঙ্গাপুরের মানুষের চরিত্রের বিশেষ ইতিবাচক দিক—এ বিষয়টি ওই সকল দেশের উপরে ওঠার মূলে কাজ করে চলেছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী যুক্তি দেখান যে, জাপান, কোরিয়ার উচ্চহারে সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূলে তাদের নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি মূলশক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কর্মের এই মূল্যবোধ এমন একটি দার্শনিক মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে, যাতে মনে করা হয়, ব্যক্তির চেয়ে দেশ এবং জনগণ অনেক বড় বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ।'[১২]

তৃতীয়ত, এশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পূর্বএশীয়রা যুক্তি দেখান যে, এখানে জনগণের জন্য চিন্তা করার একটি সংস্কৃতি খুবই সক্রিয় রয়েছে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন ভিন্নমতাবলম্বী চৈনিক মত প্রকাশ করেছেন যে, এক্ষেত্রে কনফুসীয় মতবাদ এবং নিয়মানুবর্তিতা ম্যাজিকের মতো কাজ করে থাকে। একইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দর্শন অস্বীকার করা, একধরনের 'নমনীয়' কর্তৃত্ববাদিতা, অথবা অত্যন্ত সীমিত গণতন্ত্রও কিন্তু উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এশীয়রা মনে করে যে, দেশভিত্তিক স্বতন্ত্রসংস্কৃতি ও সভ্যতা থাকলেও এশীয় অঞ্চলের কিছু 'সাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি' রয়েছে যা নির্বিশেষে সকল এশীয় দেশের জন্য 'সাধারণ' এবং বলাবাহুল্য, পাশ্চাত্য থেকে এশিয়াকে তা সহজেই পৃথক করে দেয়। এমতাবস্থায়, ওই সংস্কৃতি চর্চা করে পারস্পরিক সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করার নিমিত্তে তারা কাজ করে যাচ্ছে। পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তারা বিভিন্ন আঞ্চলিক

ফোরাম গড়ে তুলেছে; যেমন আসিয়ান। এশীয় দেশগুলোর নিকটবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে, তাদের উৎপাদিত পণ্য পাশ্চাত্য বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া, আর দূরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার হস্ত আরও সম্প্রসারিত করে এশীয় দেশগুলোর বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়িক স্বার্থ সমুন্নত করা।[১৩] বিশেষভাবে এশীয়দের উন্নয়নের নেতৃত্বদানকারী জাপানের জন্য অত্যন্ত জরুরি হল অ-এশীয়করণ ও পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া থেকে দ্রুত সরে এসে তার উল্টোটি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ যা করতে হবে তা হল আরও 'এশীয়করণ'।[১৪]

চতুর্থত, যুক্তি দেখানো হয় যে, এশীয় উন্নয়নের মূল যেহেতু এশীয় মূল্যবোধ, তাই এটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে অন্যান্য অপাশ্চাত্য সমাজ সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এমনকি পশ্চিমাবিশ্ব এশীয় মূল্যবোধ নিজেদের জন্য কার্যকর করে তাদের সংকট থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারে। অ্যাংলো স্যাকসন (Anglo Saxon) উন্নয়ন মডেল যা বিগত ৪ দশক উন্নয়নশীল জগতের নিকট আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং পবিত্র মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে, যা কি-না একটি শক্ত রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম বলে মনে করা হত, তা আজ অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছে—এটি পূর্বএশিয়ায় আর কাজ করছিল না বিধায় পূর্বএশিয়ার মডেল তার স্থলে কাজ করছে। মেক্সিকো, চিলি, ইরান, তুরস্ক, পূর্বতন সোভিয়েট রিপাবলিকগুলো এখন এশীয় উন্নয়নের সাফল্যের অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়; যেমন, তাদের পূর্বসুরীরা পশ্চিমা সাফল্যের মডেল গ্রহণকারী ছিল। এশিয়াকে অবশ্যই তার মূল্যবোধগুলো বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বিলিয়ে দিতে হবে এবং তা প্রকারান্তরে বিশ্বজনীন মূল্যবোধে পরিণত হবে। এভাবে এশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে এশীয় সমাজ, বিশেষ করে পূর্বএশিয়ার চেতনা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। জাপানসহ অন্যান্য এশীয় দেশের এখন প্রয়োজন হল 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া' চালু করা এবং মনে করা যায়, এভাবে বিশ্বজনীনভাবে উন্নয়নের একটি মডেল বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ক্ষমতাধর সমাজগুলো বিশ্বজনীন মূল্যবোধ সম্পৃক্ত, অন্যদিকে দুর্বল সমাজগুলো সংকীর্ণ মূল্যবোধ সম্পৃক্ত। পূর্বএশিয়ার পর্বতপ্রমাণ আত্মবিশ্বাস আসলে পাশ্চাত্যের তুলনায় একটি এশীয় সর্বজনীনতা এনে দিয়েছে। 'এশীয় মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন মূল্যবোধ, ইউরোপীয় মূল্যবোধ হল ইউরোপীয় মূলবোধ', এমন দাবি করেছেন ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদ।[১৬] এর সঙ্গে চলে এসেছে 'এশীয় পাশ্চাত্য তত্ত্ব' কিছুটা হলেও নেতিবাচকভাবে যেমন করে একসময় বলা হত—পাশ্চাত্যের প্রাচ্য। পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার নৈতিক উৎকর্ষকেই প্রমাণ করে থাকে। যদি কখনও পূর্বএশিয়ার অগ্রগতিকে ভারত 'উচ্ছেদ করে' নিজেরা সে-স্থান দখল করে নেয়; তবে ভারতের হিন্দুসংস্কৃতির উচ্চমান নিয়ে জয়গান গাইবার জন্য বিশ্বকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন, তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ঐতিহ্যবাহী জাতিভেদ প্রথার অবদান এবং কীভাবে ভারত পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের 'লিগ্যাসির' উৎপাটন করে নিজস্ব ধারায় ফিরে এল এবং সর্বোপরি ভারত কীভাবে সভ্যতার উচ্চস্তরে গিয়েছে, ইত্যাদি নিয়ে

ভাবতে হবে। সাংস্কৃতিক দৃঢ়োক্তি কার্যত চূড়ান্তভাবে বস্তুগত সাফল্য এনে দেয়, আর 'শক্ত শক্তি' প্রকারান্তরে 'নরম শক্তি' উপহার দেয়।

ইসলামের পুনঃজাগরণ

যখন এশীয়রা তাদের অর্থনীতির বিপুল বিকাশের ফলে ক্রমান্বয়ে আরও দৃঢ়োক্তিসম্পন্ন হচ্ছে, মুসলমানেরা একই সঙ্গে তখন ইসলামের ভেতর ফিরে যাচ্ছে; যা তারা মনে করে তাদের পরিচয়, জীবনের অর্থ, স্থায়িত্ব, স্থিরতা, বৈধতা, উন্নয়ন, ক্ষমতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সূতিকাগার। তারা এক্ষেত্রে একটি স্লোগান দ্বারা সবকিছু বুঝাতে চায়, আর তা হল, 'ইসলামই হল সমাধান'। ইসলামের এই পুনঃজাগরণ* বিষয়টি সুগভীরভাবে সর্বশেষ পর্যায়ে ইসলামি সভ্যতার সঙ্গে সমন্বিত করে এবং পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় যে, দুনিয়া বা জগৎ-সংসারের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পাশ্চাত্যের মতাদর্শের দ্বারা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ইসলামের দ্বারাই তা সম্ভব। এটি আধুনিকীকরণকে মেনে নেয়; কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং চূড়ান্তভাবে ইসলামের মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে ফেরে। সুতরাং, তাদের মতে ইসলামই অধুনা বিশ্বের একমাত্র পথ। যেমন ১৯৯৪ সালে একজন উচ্চপর্যায়ের সৌদি কর্মকর্তা ব্যাখ্যা দেন যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যসামগ্রী উত্তম, কেননা তা 'দীপ্তিময়' এবং উচ্চতর প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুতকৃত 'সামগ্রী'। ... কিন্তু প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, ইরানের শাহ্ বলেছিলেন যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মই নয়, তা সমগ্র জীবনব্যবস্থাও বটে। সৌদিরা আধুনিকায়ন চায়, তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা পাশ্চাত্যকরণ পছন্দ করে বা পাশ্চাত্যের মতো হতে চায়।[১৭]

ইসলামি পুনঃজাগরণ এমন একটি আজ্ঞা যার মাধ্যমে মুসলমানেরা উল্লিখিত সকল কিছু অর্জন করতে চায়। এটি বৃহত্তরভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন যা সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া হয়। মুসলমান 'মৌলবাদী' বলতে সাধারণভাবে বুঝায় রাজনৈতিক ইসলামের কথা: যা কি-না ইসলামের একটিমাত্র উপাদান নিয়ে কথা বলে থাকে, যেখানে ইসলামি ধ্যানধারণা, এবং অলংকারাদি ইত্যাদি যা মুসলমানগণ বুঝাতে চান। ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আসলে একটি প্রধানধারা, তবে তা চরমপন্থী নয়, আর তা বিস্তৃত, কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো নয়।

পুনঃজাগরণের বিষয়টি প্রায় সকল মুসলিম দেশ এবং প্রায় জীবনের সকল ক্ষেত্র, যেমন সমাজ ও রাজনীতিকে স্পর্শ করেছে। জন এল ইস্পোজিট যেমন লিখেছেন :

---

* কোনো পাঠক আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারেন কেন 'পুনঃজাগরণ' শব্দটি ইসলামি পুনঃজাগরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ হল এই যে, এর দ্বারা বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ অথবা তারও বেশি মানবতার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কথা বলা হয়, যা আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব অথবা রুশ বিপ্লবের মতো ঘটনা, যেমন 'আর' 'এস' ('r' 's')-এর সুবিধা গ্রহণ করা হয়: এবং বলতে হয় যে এটি পাশ্চাত্যের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারের মতো 'r'-কে প্রায় একইভাবে সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছিল।

অনেকেই দেখতে চান ধর্মীয় কাজকর্মে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের মাত্রা (মসজিদে উপস্থিতি, প্রার্থনা, রোজা রাখা), ইসলাম সম্পর্কিত পুস্তক প্রকাশের সংখ্যা ও তার বিস্তৃতি, ইসলামি পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রবণতা ও সংখ্যা, সুফিবাদের নবজাগরণ ইত্যাদি।

এর সঙ্গে বৃহত্তরভাবে দৈনন্দিন সবকটি কাজে ইসলামের দৃঢ়োক্তি সংযুক্ত কি-না তা জানা; অর্থাৎ সরকার ইসলামের অনুসারী কি-না, সংগঠন সেমতো গঠিত কি-না; আইন, ব্যাংক, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাদি ইসলামপন্থী কি-না দেখবার বিষয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষ উভয়ই ইসলামকে এগিয়ে নিতে চায়, কেননা এভাবে তারা গণমানুষের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করতে চায়। অধিকাংশ সরকার ও শাসক, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার, যেমন তুরস্ক, তিউনেশিয়াতেও ইসলামের শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে সবাই সজাগ রয়েছে। স্পর্শকাতর ইস্যু হিসেবে ইসলামের ধারা সম্পর্কে তাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

প্রায় একইভাবে অন্য একজন খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ, আলী ই হিলাল দেশোকি বলেন যে, পুনঃজাগরণ বলতে বুঝায় পাশ্চাত্যের আইনের স্থলে ইসলামি আইনের পুনঃস্থাপন, ধর্মীয় প্রতীকসমূহের ও ধর্মীয় ভাষার বহুলব্যবহার, ইসলামিশিক্ষার সম্প্রসারণ (ইসলামসম্মত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণে শিক্ষা), ইসলামসম্মতভাবে সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। এর অর্থ হল : মেয়েরা বোরখা পরবে, ইত্যাদি; ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর ওপর ইসলামপন্থীদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করা, মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি করা।[১৭] ঈশ্বরের প্রতিশোধতত্ত্ব একটি বিশ্বব্যাপী বিষয়। কিন্তু ঈশ্বর অথবা আল্লাহ্ তার প্রতিশোধ নেয় উম্মার সংখ্যা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।

ইসলামি পুনরুত্থানের রাজনৈতিক প্রকাশসমূহ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে তা কিছুটা বৈরী মনোভাব পোষণ করে থাকে। তাদের লিখিত পুস্তক থেকে জানা যায় যে, তারা একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে আগ্রহী, সেইসঙ্গে তারা সমাজের আমূল পরিবর্তনেচ্ছু। জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিত্তি অপছন্দ করে এবং গতানুগতিক সংস্কার এবং সহিংসতার মাধ্যমে পরিবর্তনের মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ তারা অনুসরণ করতে আগ্রহী। এর সঙ্গে অবশ্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদীদের ও সংস্কারবাদীদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ই প্রচলিত ধারার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানাদির দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং স্থবিরতা উতরিয়ে গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থেকেছে; উভয়ই ধর্মের নিখাদ প্রত্যাবর্তন চেয়েছে। নিয়মানুবর্তিতা, আদেশ, নির্দেশ প্রতিষ্ঠাকরণসহ মধ্যবিত্তের মধ্যে গতিশীলতা আনতে চেয়েছে। উভয় আন্দোলনই জটিল ধরনের আন্দোলন, যা থেকে বিভিন্নমুখী লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে চাওয়া হয়। কিন্তু তবুও দুটি প্রধান ধারা, যেমন 'লুথারিজম' (Lutherism) এবং 'ক্যালভিনিজম' (Calvinism), তেমনি মুসলিমদের ক্ষেত্রে 'শিয়াইট' (Shiaite) এবং 'সুন্নি' (Sunni) মৌলবাদীর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তাছাড়া জন ক্যালভিন এবং আয়াতুল্লাহ্ খোমেনির মধ্যে চিন্তা ও মননে সমরূপতা পরিলক্ষিত হয়। উভয়ই সন্ন্যাসবাদী নিয়মানুবর্তিতা সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। সংস্কারবাদিতা ও পুনরুত্থানবাদ উভয়ক্ষেত্রেই মূল স্পৃহা হল মৌলবাদী সংস্কার। সংস্কারকে অবশ্যই হতে হবে বিশ্বজনীন। একজন পিউরিটান মন্ত্রী ঘোষণা দেন

যে, '... সংস্কার হবে সকল স্থানে, সকল মানুষের মনে, বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিম্নমানের বিচারক অপসারণে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংস্কার আনতে হবে, নগরে বন্দরে সংস্কার আনতে হবে, গ্রামাঞ্চলে সংস্কার লাগবে, নিম্নমানের স্কুলে শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সংস্কার ঘটাতে হবে, ... রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশের মধ্যে সংস্কার লাগবে, 'বিধাতার' প্রতি প্রার্থনা ও বন্দনায় সংস্কার করতে হবে।'

অনুরূপ ভাষায় আলতুরাবি বলেন যে, 'এই আত্মোপলব্ধির ব্যাপ্তি অনেকদূর। এটি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিষয় নয়, এটি শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, বা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়; এটি আসলে সবকিছুরই সমন্বয়ে গঠিত বড়কিছু, যা সমাজের আগাগোড়ায় সর্বত্র সংস্কার আনে।'[১৯] বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ব-গোলার্ধের রাজনীতিতে ইসলামি দৃঢ়োক্তিসুলভ পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেমন করে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় রাজনীতিতে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনকেও তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছিল।

তবে ইসলামি পুনঃজাগরণ সংস্কার-আন্দোলন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে স্বতন্ত্র বা পৃথক। সংস্কার-আন্দোলনের প্রভাব শুধু আধুনিক ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের মধ্যে সীমিত ছিল। এটি স্পেন, ইতালি, পূর্ব-ইউরোপে তেমন কোনো অগ্রগতির চিহ্ন রাখতে পারেনি। বিপরীতভাবে ধর্মীয় পুনঃজাগরণ কিন্তু প্রায় সমগ্র মুসলিমবিশ্বকে স্পর্শ করেছে। ১৯৭০-এর দশকের প্রারম্ভে ইসলামি প্রতীক, বিশ্বাসসমূহ, আমলসমূহ, প্রতিষ্ঠানাদি, রাজনীতি এবং সাংগঠনিক তৎপরতা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের দৃঢ়তা, আজ্ঞা এবং সমর্থন লাভ করে; যার পরিমাণ হবে বিলিয়ন মুসলমান, যার ব্যাপ্তি মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া এবং নাইজেরিয়া থেকে কাজাকিস্তান অবধি। ইসলামিকরণ আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে, কিন্তু পরে তা সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে। বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ, এ আন্দোলন পছন্দ করুক বা নাই করুক, তারা আন্দোলনের সারবত্তা অবহেলা করতে পারেনি বরং নিজেরা তা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন মাত্রায়। দৃঢ়, ভিত্তিহীন সাধারণীকরণ সবসময়ই ভুলের সম্ভাবনা ডেকে আনে। ১৯৯৫ সালে ইরান বাদে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিটি মুসলমান জনসংখ্যা-অধ্যুষিত সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে ১৫ বৎসরের ব্যবধানে পূর্বের চেয়ে অধিকতর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইসলাম ও ইসলামি মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছে। এমনটি কিন্তু প্রায় সকল দেশে দেখা যায়। ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামিকরণের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হল ইসলামি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা এবং পূর্বের সকল সংগঠন দখল করা। ইসলামপন্থীরা বিশেষভাবে ইসলামি স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ নজর দেয়, কেননা তার মাধ্যমে তারা ইসলামি আদর্শ প্রচার করে সমাজে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক। এজন্য তারা ইসলামি আদলে সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত ও তা কার্যকর করে থাকে। উক্ত সোসাইটি প্রকারান্তরে উদারনীতিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে মোকাবিলা করার জন্যই গঠিত হয়ে থাকে। আর তারা এভাবেই তাদের লক্ষ্যসমূহ ও তা অর্জনের জন্য কর্মপন্থা স্থির করে থাকে।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে মিশরে ইসলামি সংগঠনগুলো একটি বিস্তৃত যোগাযোগজাল তৈরি করেছিল যা মূলত সরকারের স্বাস্থ্যসেবা, সমাজকল্যাণ,

শিক্ষামূলকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গরিব মিশরীয়দের সাহায্য ও সেবা প্রদান করে। এভাবে তারা সরকারি কাজের শূন্যতা ও ব্যর্থতাকে পুঁজি করে এগিয়ে যায়। কায়রোয় ১৯৯২ সালের ভূমিকম্পের পর এইসব সংগঠন ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনা করে, খাদ্য ও চিকিৎসাসহ উদ্ধারকাজে হাত দেয়। কেননা সেখানে সরকারি তৎপরতা পর্যাপ্ত ছিল না। জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুড অত্যন্ত সচেতনভাবেই ইসলামি রিপাবলিক গঠনের লক্ষ্যে অবকাঠামো তৈরিতে হাত লাগায় এবং ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র দেশের ৪ মিলিয়ন মানুষের জন্য বড় আকারের হাসপাতাল, ২০টি ক্লিনিক, ৪০টি ইসলামি স্কুল এবং ১২০টি কোরআন শিক্ষার নিমিত্তে মক্তব প্রতিষ্ঠা করে। গাজার পশ্চিমতীরের প্রতিবেশীদের এলাকায় ইসলামি সংগঠন গড়ে তোলা হয় এবং ছাত্রসংগঠন, যুবসংগঠন এবং ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক শিক্ষার ধাঁচে কিন্ডারগার্টেন এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে এতিমখানা, ক্লিনিক, অবসর জীবনযাপনের জন্য বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া গড়ে ওঠে মোহাম্মাদিজা (Muhhammadijah) যার ছিল মিলিয়ন সদস্য, যারা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি ধর্মীয়ভিত্তিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এজন্য দেশের সর্বত্র শিক্ষাসম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যপরিচর্যার জন্য অনেক ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। স্থাপন করে এমনকি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। এ সমস্ত দেশে এবং অন্যান্য সমাজে মুসলিম সোসাইটির ইসলামি সংগঠনগুলোর ওপর রাজনৈতিক তৎপরতা চালাবার অধিকার না থাকলেও তারা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের আদলে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যায়, যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘটেছিল।[২৯]

ইসলামি পুনর্জাগরণের রাজনৈতিক প্রচারণা এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচারণার তুলনায় তত বিস্তৃত নয়, তবুও এর রাজনৈতিক দিক অগ্রাহ্য করার মতো নয়, এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তিকে এর রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে ইসলামি পুনর্জাগরণে রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা সকল ক্ষেত্রে একরূপ নয়। দেশভেদে তা পার্থক্য সূচিত করে। তারপরও এর কিছু বৃহদায়তনিক ও সর্বজনীন দিক রয়েছে। কমবেশি ওইসব সরকারগুলো গ্রামীণসমাজের এলিট, কৃষক এবং বৃদ্ধদের তত একটা সমর্থন পায় না। অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদীদের মতো ইসলামপন্থীরাও কিন্তু আধুনিকীকরণের একটি ফসল। তারা অস্থায়ী এবং আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন যুবকদের নিজ নিজ দলে পেতে চায় (যা মোটামুটিভাবে তিনটি গোষ্ঠী থেকে আগত)।

একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে স্বভাবতই 'কোর'-গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীগণ সবসময়ই আগের কাতারে চলে আসেন। প্রায় সকল দেশেই মুসলিম মৌলবাদীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নসমূহ করতলগত করে ফেলেছে এবং এসব সংগঠন ইসলামের রাজনীতিকরণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে। এ-ধরনের ঘটনা ১৯৭০-এ মিশর, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং তারপর অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামি আবেদন খুবই কার্যকর হয়. বিশেষ করে প্রকৌশল এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত ফ্যাকাল্টিগুলোতে। ১৯৯০-এর দশকে সৌদি আরব, আলজেরিয়া এবং অন্যত্র 'দ্বিতীয় প্রজন্মের দৈশিককরণ' প্রক্রিয়ার প্রচার দেখা যায়. ক্রমাগত আনুপাতিক

হারে দেশীয় ভাষায় লেখাপড়া করা ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এসব ছাত্র ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।[২২]

সবচেয়ে মজার বিষয় হল, ইসলামি গ্রুপগুলো প্রায়শই মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তুরস্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি পরিষ্কার চিত্র। সেখানে প্রথম প্রজন্মের অধিকাংশ মা-বাবাই ধর্মনিরপেক্ষ অথচ তাদের সন্তানেরা (দ্বিতীয় প্রজন্ম) ইসলামপন্থী।[২৩]

মিশরের উগ্রপন্থী ইসলামিগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, তাদের ৫টি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ-ধরনের উগ্রপন্থীদের বেলায় পরিদৃষ্ট হয়। তারা সাধারণত যুবসমাজ থেকে আগত, যার অধিকাংশেরই বয়স ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে। আর শতকরা ৮০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা স্নাতক। প্রায় অর্ধেক উচ্চমানসম্পন্ন কলেজ থেকে পাস করা, অথবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুবই চাহিদা রয়েছে, যেমন প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ বিষয়, যথা চিকিৎসা এবং প্রকৌশল শাখা থেকে আগত। শতকরা ৭০ ভাগ এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী হতে। তারা 'বিনয়ী, তবে গরিব ঘরের সন্তান নয়'। তারাই তাদের পরিবারের প্রথম শিক্ষিত প্রজন্ম। তারা তাদের বাল্যকাল ছোট্ট শহর অথবা গ্রামে কাটিয়েছে, কিন্তু এখন তারা বড় শহরের বাসিন্দা।[২৪]

যেহেতু ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিতভাবে ইসলামি উগ্রপন্থী 'ক্যাডার' গঠন করেছে, সেহেতু বলা যায়, ওই উগ্রপন্থী দলের অধিকাংশই হচ্ছে শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ। কোনো পর্যায়ে বলা যায়, তাদের কেউ কেউ প্রায়শই শহরের 'গতানুগতিক' মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত। যেমন বেনিয়া, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (বাজারি) ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীটি ইরানের বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং আলজেরিয়া, তুরস্ক এবং ইন্দোনেশিয়ায় মৌলবাদীদের শক্তিশালী ও কার্যকর সমর্থন প্রদান করেছিল। বৃহত্তরভাবে বলা যায়, মৌলবাদীরা সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণীর 'আধুনিক' অংশের সদস্য।

ইসলামিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের বেলায় তৃতীয় যে-কথাটি বলা যায়, তা হল, এদের অনেকেই সদ্য গ্রাম থেকে শহরের আসা মানুষজন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ইসলামি বিশ্বে নাটকীয়ভাবে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এদের অনেককেই শহরে গিজগিজ করে এমন অস্বাস্থ্যকর বস্তির বাসিন্দা হতে হয়। এসব দুর্গত মানুষের নিকট ইসলামি সংগঠনগুলো নানাপ্রকার সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদি ও সেবা নিয়ে হাজির হয় এবং তাদের মন জয় করার চেষ্টা চালায়। এ সম্পর্কে আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner) দেখান যে, 'ইসলাম একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়ের সন্ধান দেয় তাদের জন্য, যারা কেবলমাত্র শেকড় ছিন্ন করে শহরে এসেছে।' ইস্তাম্বুল এবং আঙ্কারা, কায়রো, আলজিয়ার্স, গাজা প্রভৃতি শহরে ইসলামি দলগুলো অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে হতদরিদ্র ও সাহায্যপ্রার্থীদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে।

১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশে ইসলামপন্থীরা সরকার গঠনে সক্ষম হয়; যথা ইরান এবং সুদান। ইসলামি দেশগুলোর একটি ক্ষুদ্র অংশ হল তুরস্ক এবং পাকিস্তান, যেখানে সরকারকে কিছুটা হলেও গণতান্ত্রিকভাবে বৈধতা অর্জন করতে হয়। এ ছাড়া প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারই অগণতান্ত্রিক ধরনের সরকার দ্বারা শাসিত: তার মধ্যে

কোনো কোনো দেশে রয়েছে রাজতন্ত্র। কোথাও আবার একদলীয় শাসন, কোথাও হয়তো সামরিক সরকার, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিক স্বৈরাচারী শাসন রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, কোথাও দুই বা ততোধিক ধরনের সরকারব্যবস্থার সংমিশ্রণ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সরকার ব্যক্তি, পরিবার, উপজাতি, সম্প্রদায় দ্বারা বেশিভাবে প্রভাবিত। কোনো কোনো দেশের সরকার অধিক মাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। মরোক্কো এবং সৌদি আরব তাদের ব্যবসায় একধরনের ইসলামিক বৈধতা নিশ্চিত করতে চেয়েছে। আর অন্যসকল দেশ তাদের শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের শাসন কি ইসলামিক, নাকি গণতান্ত্রিক বা তা জাতীয়তাবাদী কি-না, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ক্লিমেন্ট হেনরি মুরের প্রবচন অনুযায়ী এ-ধরনের সরকার হল 'বাংকার সরকার' যে সরকার অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত, সমাজের মানুষের চাহিদা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝতে অক্ষম। এ রূপ সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। আর তা যে ব্যর্থ হবেই এমন কথা বলা যায় না, তবে আধুনিক বিশ্বে এ-ধরনের সরকারের পরিবর্তন বা পতনের সম্ভাবনা খুবই উচ্চ। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে উক্ত সরকারের বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায়। প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : কে এবং কী হবে উক্ত সরকারের উত্তরাধিকার? লক্ষ করলে দেখা যায়, ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে উক্ত সরকারের বিকল্প হিসেবে এসেছে ইসলামি সরকার।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সারা বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের একটি জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এ জোয়ারে প্রায় কয়েক ডজন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর সূচনা হলেও ইসলামি সমাজে এ-ধরনের কোনো তৎপরতার তেমন প্রভাব দেখা যায় না। যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসার জন্য প্রক্রিয়া দক্ষিণ ইউরোপ, লাটিন আমেরিকা, পূর্বএশীয় এলাকা, ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে শক্তিশালী হচ্ছিল, তখন একই সঙ্গে মুসলিম সমাজে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনও জোরদার হচ্ছিল। যেখানে খ্রিস্টীয় একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়, সেসব দেশে ইসলামিতন্ত্রকে কার্যকরী বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়। যে-সমস্ত সমাজের সামগ্রিক কাজের জন্য সমাজের মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির সংকট রয়েছে, যেখানে কর্তৃত্বমূলক শাসনের ফলে সরকারের বৈধ্যতার সংকট সুস্পষ্ট সেসঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অবস্থা থেকে রেহাই পেতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামি শাসনকে মুক্তির উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টীয় সমাজে ধর্মীয় নেতারা, যেমন যাজক সম্প্রদায়, মন্ত্রীগণ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী কর্তৃত্বমূলক শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। অন্যদিকে, মুসলিম সমাজে এ দায়িত্ব পালন করছেন উলেমা (Ulema), মসজিদভিত্তিক সংগঠনসমূহ, প্রমুখ। পোল্যান্ডে কম্যুনিজমের দিন শেষ করতে পোপ একটি স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর ইরানে শাহের স্বৈরশাসনাবসান অবসানে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনি।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে ইসলামি আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব প্রায়শই একচেটিয়াভাবে সরকারবিরোধীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এতে

মনে করা যায় যে, সমাজের অন্যান্য শক্তির তুলনায় ইসলামপন্থীদের আপেক্ষিক শক্তি ওইসব দেশে বেশি। অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতি সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর আর তেমন শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন নানা কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পরেনি। কেননা গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেবার জন্য যে বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি প্রয়োজন তা অপাশ্চাত্য দেশে খুবই সীমিত মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই এটি একটি পাশ্চাত্যমুখী এলিটভিত্তিক আন্দোলন, যার গণভিত্তি নেই বললেই চলে। তাছাড়া উদারনীতিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি খুব কম মুসলিমবিশ্বে সমর্থন পায়। কেননা মুসলিমপন্থীরা গণতন্ত্রকে ইসলামের বিধানের 'পরিপন্থী' বলে গণ্য করে থাকে, এবং সমাজেও সেভাবে প্রচারণা চালায়। ওই একই কারণে ধর্মীয় উদারনৈতিকতাবাদের অনুসারীরাও সুবিধা করতে পারে না। মুসলিমসমাজে ভিত্তি গড়ে তুলতে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা, বিগত ১৮০০ সাল থেকে মুসলিমবিশ্বে অনবরত ঘটে আসছে। এজন্য হয়তো মুসলিমসমাজের অসৌজন্যমূলক মনোভাব অনেকটা দায়ী।

সরকারবিরোধী আন্দোলনে ইসলামি শক্তিসমূহের উপর্যুপরি আধিপত্যের জন্য কিছুটা হলেও সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের শাসকগোষ্ঠীর নীতিকেও চিহ্নিত করা যায়।

শীতলযুদ্ধকালে আলজেরিয়া, তুরস্ক, জর্ডান, মিশর এবং ইসরায়েলসহ বহু দেশ কম্যুনিজম ও তাদের শাসনের বিরুদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঠেকাবার জন্য একাধিকবার ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিল।

গাল্ফ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত সৌদি আরব এবং অন্যান্য গাল্ফদেশসমূহ 'মুসলিম ব্রাদারহুড' নামক ইসলামপন্থী গোষ্ঠীকে বিভিন্ন দেশে কাজ করার জন্য ব্যাপকভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। এই গোষ্ঠীটি বিভিন্ন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে দমন করতে ওইসব দেশের বিরোধীশক্তিকে কব্জা করে ফেলে এবং সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করায়। এই মৌলবাদী শক্তি বিপরীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি এবং গণতান্ত্রিক ধারার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তবে এই মৌলবাদী শক্তি মরোক্কো এবং তুরস্কে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ওইসব দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনো-না-কোনোভাবে চালু রাখা সম্ভব হয়, যেখানে অন্যান্য দেশে ব্যাপক হারে বিরোধী দমনকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে।[২৮] আর ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতি আস্থা খুবই আশঙ্কাজনক, কেননা ওই শক্তির ওপর ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় রীতিমতো নিপীড়ন চালানো হয়ে থাকে।

ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো মসজিদ, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আড়ালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে থাকে। ফলে তাদের অনেক সময় চিহ্নিত করা বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধাঁচের গোষ্ঠী, দল বা মতবাদের জন্য অনুরূপ কোনো আবরণ নেই বিধায় সেখানে সরকারের দমননীতি পরিচালনা করা খুব সহজ এবং বলাবাহুল্য, এমনটি অহরহ ঘটে চলেছে।

ইসলামিশক্তি বৃদ্ধির প্রবণতার অগ্রাধিকার রক্ষার জন্য দেখা যায়, সরকারগুলো দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায়শই ইসলামপন্থী শিক্ষকদের প্রাধান্য ও প্রভাব বজায় থাকে। তারা

উক্ত প্রতিষ্ঠানকে একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তারা বহু শিক্ষার্থী ও মানুষকে ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে আনার চেষ্টা করে থাকে। আর উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন উগ্রপন্থী ইসলামি সংগঠনের হয়ে কাজ করে।

ধর্মীয় পুনরুত্থানের শক্তিটি বিভিন্নভাবে ইসলামি আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ইসলামি প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সরকারকে ইসলামি প্রতীক ব্যবহার করতে দাবিদাওয়া দিয়ে থাকেন এবং সরকার প্রায়শই তা গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যকলাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারও ইসলামের প্রতি দুর্বল এবং সম্ভবত তারাও দেশকে ইসলামি ধারায় নিয়ে যেতে আগ্রহী। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে রাজনীতিবিদরা ইসলামের সঙ্গে সরকারকে জুড়ে দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। জর্ডানের বাদশা হুসেন মেনে নেন যে, আরববিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার ভবিষ্যৎ ভালো নয়। তিনি 'ইসলামি গণতন্ত্র' নিয়ে এবং 'ইসলামের আধুনিকীকরণ' নিয়ে কথা বলেন। মরোক্কোর বাদশা হাসান 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' স্বীকার করে নেন এবং 'নবীকে বিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক' হিসেবে চিহ্নিত করেন। ব্রুনাই-এর সুলতান যদিও সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামি বিধানাবলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলেননি তবুও তার সরকারকে তিনি 'মালয় মুসলিম রাজতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিউনেশিয়ার বিন আলি সর্বদাই তাঁর ভাষণে আল্লাহ্‌র ওপর আস্থার কথা উচ্চারণ করেন। এটি তিনি করতেন ক্রমবর্ধিত ইসলামি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।[২৯]

১৯৯০ সালের শুরুতে সুহার্তো সুস্পষ্টভাবে 'অধিকতর মুসলমান' হওয়ার ঘোষণা দেন। ১৯৮০-এর মাঝামাঝি পর্যায়ে বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নীতি সংবিধান থেকে বাদ দেয়া হয়। ১৯৯০-এর শুরুতে তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় প্রথমবারের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।[৩০] নিজেকে ধার্মিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওজাল, সুহার্তু, করিম দ্রুত তাদের হজব্রত পালন করে ফেলেন। ইসলামি আইন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সঙ্গে তা সংযুক্ত করা হয়। মালয়েশিয়া দেশের অমুসলিম এবং মুসলিম জনগণের জন্য দুই ধরনের আইন তৈরি করেছে যার একটি ইসলামিক, অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ।[৩১] জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে পাকিস্তানে আইন ও অর্থনীতিকে ইসলামিক ধারায় নিয়ে আসা হয়। ইসলামি আইন ভঙ্গের শাস্তির বিধান সেখানে রাখা হয়, শরিয়া আদালত গঠন করা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে, দেশের শরিয়া আইনই হবে সর্বোচ্চ আইন।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের পুনরুত্থানের মতো ইসলামি শক্তির পুনরুত্থানের বেলাতেও দেখা যায়, আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফলে তা বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এর গূঢ় কারণ সম্ভবত দৈশিককরণের প্রস্তাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নগরায়ণ, সামাজিক কাজে মানুষের একত্রিত হওয়া, শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উচ্চহার, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত অগ্রগতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া ও সংমিশ্রণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এই অগ্রগতি সমাজের ঐতিহ্যগত

গ্রামীণ জীবনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে এবং গতানুগতিকের বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, ফলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে তা 'পরিচয় সংকটে' নিপতিত হয়। ইসলামি প্রতীক, প্রত্যয়সমূহ, বিশ্বাস, ইত্যাদি এই সমস্ত সংকটের 'ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়। মানুষ ইসলামের ভেতর দিয়ে তাদের সংকটের সমাধান রয়েছে বলে মনে করতে থাকেন। এমতাবস্থায়, হতাশা এবং দুর্দশাগ্রস্ত তথা আত্মিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন সমাজকল্যাণের বাণী ও সামগ্রিক ইসলামি সংস্কৃতি নিয়ে হাজির হয়। মুসলমানেরা ইসলামিক চিন্তাভাবনা ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে সমাধান খুঁজে নিতে আগ্রহী হয় এবং এভাবে আধুনিকীকরণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চায়।[৩২]

ইসলামি পুনঃজাগরণকে 'পশ্চিমা শক্তির ক্রমহ্রাসের' সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, এই পুনঃজাগরণ আসলে ১৯৭০ সালের 'তেল বিপ্লবের' দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়েছে। তেলের মূল্য হঠাৎ করে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা পশ্চিমের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস সঞ্চার করে। জন বি কেলি (As John B. Kelly) বলেন যে 'সৌদিদের জন্য নিঃসন্দেহে দ্বিগুণ সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, তারা পশ্চিমের দ্বারা বিগত দিনগুলোতে অপমানিত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখে; এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের পূর্বশত্রুতাও চলে আসে।' তেলসমৃদ্ধ মুসলমান দেশগুলো খ্রিস্টীয় মতাদর্শসম্পন্ন পশ্চিমাদেশের বিরুদ্ধে সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। সৌদি আরব, লিবিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলো মুসলিম-জাগরণের জন্য মুসলমানদের সংগঠনগুলোকে আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিতে শুরু করে। এমতাবস্থায় বলা যুক্তিসঙ্গত যে, পূর্বে যেমন পাশ্চাত্যের সম্পদই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অন্যান্য দেশের চেয়ে উচ্চতর অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি তেলসম্পদকে 'ইসলামের শক্তি' বলে বিবেচনা করা হয়।

১৯৮০-এর দশকে তেলের মূল্য হ্রাস পেলেও মধ্যপ্রাচ্যর মুসলিমবিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আগের মতোই ব্যাপক হারে রয়ে গেল, যা ইসলামি পুনর্জাগরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বলে বিবেচনা করা হয়। পূর্বএশিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন তাদের বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি জুগিয়েছে, তেমনি ইসলামি পুনর্জাগরণের শক্তি আসবে তাদের ব্যাপক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভেতর থেকে। মুসলিম দেশসমূহে জনসংখ্যার বিস্তৃতি ও বৃদ্ধির হার, বিশেষ করে বলকান এলাকায় অব্যাহত থাকবে। উত্তর আফ্রিকায় এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় এই বৃদ্ধি প্রতিবেশী অমুসলিম দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৬৫ এবং ১৯৯০ সালে বিশ্বে সমগ্র জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩.৩ বিলিয়ন ও ৫.৩ বিলিয়ন, বাৎসরিক জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১.৮৫ ভাগ। আর মুসলমানসমাজে এর হার ছিল প্রায় শতকরা ২.০ ভাগ। প্রায়শই এ হার বেড়ে দাঁড়াল শতকরা ২.৫ ভাগে। আবার সময়ের আবর্তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩.০ ভাগে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি, মাগরেব (Maghreb)-এর জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২.৫ ভাগে। আলজেরিয়ার বেড়েছে

বাৎসরিক শতকরা ৩.০ ভাগ। একই বৎসরগুলোতে মিশরে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ২.৩ হারে বেড়ে দাঁড়ায় ২৯.৪ মিলিয়ন থেকে ৫২.৪ মিলিয়নে। সেন্ট্রাল এশিয়ায় ১৯৭০ এবং ১৯৯৩ সালের মধ্যে তাজাকিস্তানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল শতকরা ২.৯ ভাগ, ২.৬ ভাগ ছিল উজবেকিস্তানে, ২.৫ ভাগ ছিল তুর্কেজেনিস্তানে, ১.৯ ভাগ ছিল কিরগিস্তান (Kyrgyzstan), কিন্তু ১.১ ভাগ ছিল কাজাকস্তানে (Kazakhstan) যার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল রুশ। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ২.৫ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় এ হার হল ২.০ ভাগের উপরে। মোটের ওপর আলোচিত মুসলিম দেশগুলোতে ১৯৮০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ বসবাস করেছে। ২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে, আর ২০২৫ সালে প্রাক্কলিত এ সংখ্যা বেড়ে শতকরা ৩০ ভাগে দাঁড়াবে বলে গবেষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৩৪]

মাগরেব (Maghreb) এবং অন্যান্য কিছু এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী হলেও সার্বিকভাবে মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি খুব বেশি এবং তা একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেয়া যৌক্তিক হবে। অনাগত দিনগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যাতত্ত্বে দেখা যাবে যে, সেখানে অসামঞ্জস্যভাবে যুবক-যুবতীর সংখ্যাধিক্য থাকবে (ফিগার ৫.২)। উপরন্তু এই জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ শহরে বসবাসরত হবে এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের হবে। জনসংখ্যার এই বণ্টনের চিত্র সামাজিক কর্মে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাব রাখবে।

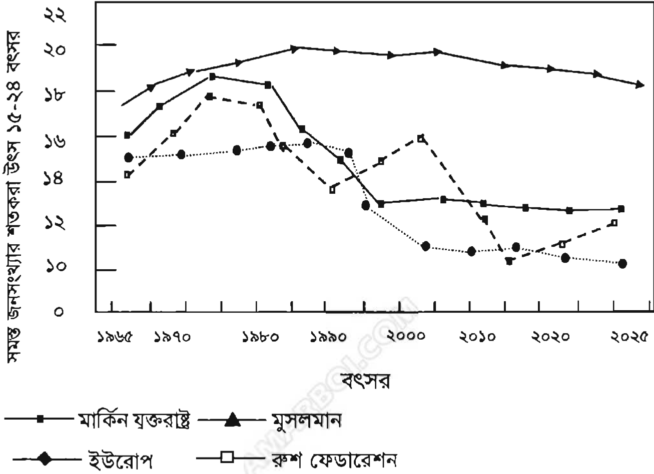
যুবসমাজ সবসময়ই প্রতিবাদী, অস্থির, সংস্কারপন্থী এবং বিপ্লবী। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন আন্দোলনে দলগতভাবে যুবকদের অংশগ্রহণের মাত্রা বেশি থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'প্রোটেস্ট্যান্ট বিপ্লব' ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একটি সর্বব্যাপী বিখ্যাত 'যুব আন্দোলন'। জ্যাক গোল্ডস্টোন এ প্রসঙ্গে বলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় পর্যন্ত ইউরেশিয়ায় দুটি দৃষ্টিতে বিপ্লবের তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল।[৩৫]

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই বিপ্লবের সঙ্গে সেখানকার যুবসমাজের অংশ বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সফলভাবে শিল্পবিপ্লব ঘটা এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ইউরোপে যুবসমাজের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। তবে ১৯২০-এর দশকে পুনরায় যুব বয়সের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যার কারণে ফ্যাসিস্ট ও অন্যান্যদের পক্ষে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছিল।[৩৬] ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে মুসলমান যুবসমাজের ভূমিকা অনন্য। ১৯৭০-এর দশকে এই পুনর্জাগরণের প্রারম্ভে, এবং ১৯৮০ সালে এর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সময়ে এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুবসমাজের অংশ (১৫ বৎসর থেকে ২৪ বৎসরের মধ্যে বয়স) প্রধান প্রধান মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় বিপুলভাবে বেড়ে যায়, আর তা প্রায় সমগ্র

জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অনেক মুসলমানসমাজে এই যুব অংশকে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। অনুমান করা যায়, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তা আরও বেড়ে যাবে (টেবিল- ৫.১)।

ফিগার- ৫.২

জনসংখ্যা বিষয়ক চ্যালেঞ্জ : ইসলাম, রুশ এবং পাশ্চাত্য



Source : United Nations, Population Division. Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. World Population Prospects, *The 1994 Revision* (New York. United Nations, 1995).United Nations, Population Division, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis. *Sex and Age Distribution of the World Populations. The 1994 Revision* (New York, United Nations. 1994);

যুবসমাজের প্রকৃত বা অনুমিত সংখ্যা, কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল মুসলমানদেশে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। সৌদিআরবের অনুমিত যুবসমাজ যারা পুনঃজাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সংখ্যা একবিংশ শতাব্দীতে এসে কিঞ্চিৎ হ্রাস পেতে পারে। এই যুবসমাজ বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। সম্ভবত এ ঘটনাটি কাকতালীয়। কেননা, ইরানে ১৯৭০-এর দশকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির শতকরা হারে হঠাৎ করেই নাটকীয়ভাবে যুবসমাজের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে শতকরা প্রায় ২০ ভাগে উন্নীত হয়। আর ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। সম্ভবত এ বিপ্লবের ঢেউ লাগে অন্যান্য দেশের গায়ে। আলজেরিয়ায় ১৯৯০-এর দশকের আগে বিভিন্ন নির্বাচনে ইসলামিগোষ্ঠীগুলো অভাবনীয়ভাবে ভালো করে। অবশ্য, যুবসমাজের

সক্রিয় অংশগ্রহণ সর্বত্র একইরূপ ছিল না (ফিগার ৫.৩)। এ বিষয়ে উপাত্তগুলো সাবধানের সঙ্গে বিচার করতে হবে। ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় যে, বসনিয়া এবং আলবেনিয়ায় যুবসমাজের সংখ্যা হ্রাসমান এবং শতাব্দী অবসানান্তেও তা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে, যুবসংখ্যা গাল্ফদেশসমূহে অব্যাহতভাবে উচ্চহারে বৃদ্ধি পাবে। ১৯৮৮ সালে সৌদিআরবের বাদশা আবদুল্লাহ বলেন যে, 'মূলভীতির কারণ হচ্ছে এই যে, এইসব দেশে যুবসমাজের মধ্যে মৌলবাদ ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে।'[৩৭] একটি প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, এই ভীতি একবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে।

অধিকাংশ আরবদেশসমূহে (আলজেরিয়া, মিশর, মরোক্কো, সিরিয়া, তিউনেসিয়া) চাকুরিপ্রার্থী যুবসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির হার একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অব্যাহত থাকবে, আর ২০১০ সাল পর্যন্ত যে এটি অব্যাহত থাকবে, নিশ্চিতভাবেই তা বলা যায়। ১৯৯০ সালের তুলনায় চাকুরিপ্রার্থী প্রতিযোগীর শতকরা হিসাবে তিউনেশিয়ায় বৃদ্ধি পাবে ৩০ ভাগ; আলজেরিয়ায়, মিশর ও মরোক্কোতে বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৫০ ভাগ। অন্যদিকে, সিরিয়ায় এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে শতকরা ১০০ ভাগ। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা আরবরাষ্ট্রসমূহে দ্রুত বাড়ার ফলে বয়স্কদের সঙ্গে যুবকদের প্রজন্মগত পার্থক্য আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এ বিষয়টি জ্ঞান এবং শক্তির দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আর তা কোনোভাবেই সুস্থ রাজনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়।'[৩৮]

টেবিল ৫.১
মুসলমান দেশসমূহে যুবস্ফীতি

১৯৭০ এর দশক	১৯৮০ এর দশক	১৯৯০ এর দশক	২০০০ এর দশক	২০১০ এর দশক
বসনিয়া	সিরিয়া	আলজেরিয়া	তাজিকিস্তান	কিরগিস্তান
বাহরাইন	আলবেনিয়া	ইরাক	তুর্কেমেনিস্তান	মালয়েশিয়া
ইউএই	ইয়েমেন	জর্ডান	মিশর	পাকিস্তান
ইরান	তুরস্ক	মরোক্কো	ইরান	সিরিয়া
মিশর	তিউনেশিয়া	বাংলাদেশ	সৌদিআরব	ইয়েমেন
কাজাকিস্তান	পাকিস্তান	ইন্দোনেশিয়া	কুয়েত	জর্ডান
	মালয়েশিয়া		সুদান	ইরাক
	কিরগিস্তান			ওমান
	তাজিকিস্তান			লিবিয়া
	তুর্কেমেনিস্তান			আফগানিস্তান
	আজারবাইজান			

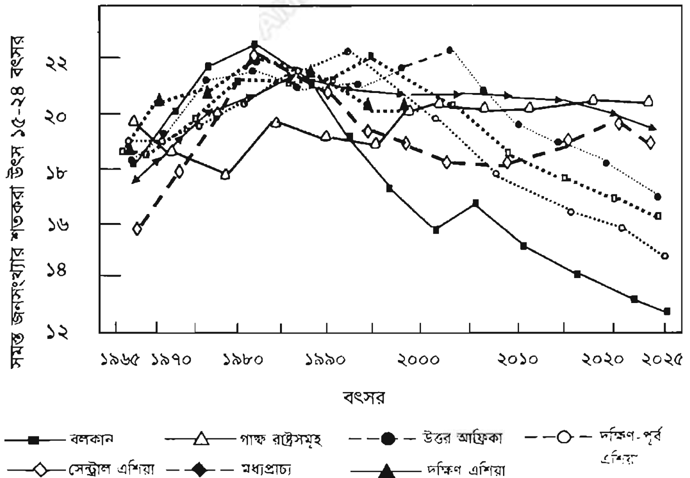
Decades in which 15-24 year olds have peaked or are expected to peak as proportion of total population (almost always greater than 20%) in some countries this proportion peaks twice.
Source : see figure 5.2

বিপুল সংখ্যক মানুষ জন্ম নিলে তাদের জন্য সম্পদ প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মানুষ কিংবা অধিক হারে জন্মগ্রহণকারী স্থানের মানুষ সম্প্রসারণের জন্য চারদিকে গুঁতিয়ে বেড়ায়, তারা ভূমি দখল করে থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা হল তারা অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর জনগোষ্ঠীর ওপর নানাপ্রকার চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার এভাবে মুসলমানসমাজের সঙ্গে সীমানা রয়েছে এমন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে না, মুসলিমদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তখন মুসলিমদেশ থেকে অর্থনৈতিক উদ্বাস্তু হিসেবে জনসংখ্যার একটি অংশ পাশ্চাত্যবিশ্বে এবং অন্যান্য অমুসলিম দেশে অভিবাসন গ্রহণ করে থাকে। এভাবে দেখা যায়, একটি সভ্যতা যেখানে দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ে, আবার অন্য একটি সভ্যতা যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় না বা বৃদ্ধির হার স্থবির হয়ে থাকে, সে অবস্থায় উভয় সভ্যতার মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বোঝাপড়ার প্রশ্নে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৭০-এর দশকে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে এক বড়ধরনের পার্থক্য সূচিত হয়। সেখানকার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল শতকরা ২৪ ভাগ, অন্যদিকে রুশদের মধ্যে এ হার ছিল মাত্র ৬.৫ ভাগ, আর এটি কম্যুনিস্ট নেতাদের জন্য বড়ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৭] তেমনি আলবেনীয়দের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতিদ্রুত হার সার্বীয়, গ্রিক এবং ইটালীয়দের মধ্যেকার সম্পর্ক ভারসাম্যহীন করে দেয়। ইসরায়িলীয়রা প্যালেস্টাইনীয়দের দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে চিন্তিত। স্পেনে যেখানে খুবই নিম্নহারে জনসংখ্যা বাড়ে, সেখানে তাদের প্রতিবেশী মুসলিম মাগরেবদের মধ্যে উচ্চজন্মহার স্পেনের ওপর চাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ফিগার- ৫.৩
মুসলমান দেশে যুবস্ফীতি



Source : United Nations, Population Division, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, World Population Prospects, *The 1994 Revision* (New York United Nations, 1995); United Nations, Population Division, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, *Sex and Age Ditribtion of the World Populations, the 1994 Revision* (New York; United Nations, 1994).

চ্যালেঞ্জসমূহের পরিবর্তন

কোনো সমাজই জোড়-সংখ্যক (double digit) অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধরে রাখতে সক্ষম হয় নাই। এশীয় অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ঝাপ্টা তাই হয়তো একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে থমকে যেতে পারে। ১৯৭০-এর দশকে জাপানের প্রবৃদ্ধির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে নেমে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় এমন উচ্চতর অবস্থায় যায়নি, যা কি-না যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তেমনিভাবে কোনো ধর্মীয় পুনঃজাগরণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক চেতনা অনির্দিষ্টকালের জন্য দুর্বার গতিতে চলতে পারে না, একপর্যায়ে এসে হয়তো ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলন ইতিহাসে ফিকে বা বর্ণহীন হয়ে যাবে। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে এমন হতে পারে, যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির আবেগ কমে যাবে। এমতাবস্থায় উগ্রপন্থী লড়াকু এবং অভিবাসীর সংখ্যা কমতে থাকবে এবং মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ আর মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্যদের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক হ্রাস পেতে পারে (অধ্যায় ১০ দেখুন)। পশ্চিমাদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যাবে এবং আগের তুলনায় বিশ্ব কম-সংঘাতপূর্ণ হবে। তারপরও কিন্তু প্রায় যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকবে (অধ্যায় ৯ দ্রষ্টব্য)।

এশিয়ার অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ধারা আর তত অব্যাহত থাকবে না, তাদের অর্থনীতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। তাদের অর্থনীতির ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে আন্তর্জাতিক সংস্রব বৃদ্ধি পাবে। বাড়বে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অর্থনেতিকভাবে সমৃদ্ধশালী মধ্যমশ্রেণী। এভাবে সেখানে রাজনীতিতে আরও উদারবাদী এবং গণতান্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সমাজ বহুত্ববাদিতার দিকে আরও এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা যায়। এ থেকে মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এশীয় সমাজ পাশ্চাত্যমুখী হয়ে উঠবে। এশীয়রা আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে; এতে করে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোর পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেবে। ইসলামি পুনঃজাগরণ ও সংস্কার কর্মসূচি কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেগুলো তাদের উত্তরাধিকারিত্বের কিছু খোয়াবে। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদে একা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাদের মধ্যে একাত্মবোধ ও সমপরিচয়বোধ, জাগ্রতভাব আরও সুতীব্র হয়ে উঠবে। একই সময়ে তারা অমুসলমানদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে চাইবে। নতুন প্রজন্ম, যারা যুবস্ফীতির দ্বারা কবলিত, তারা যে মৌলবাদী হয়ে উঠবে তা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, তারা হয়তো আরও ইসলামমুখী হয়ে উঠবে। দৈশিককরণ প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে। ধর্মীয় পুনঃজাগরণবাদীরা দেখাতে চাইবে যে,

ইসলামই হল নৈতিকতা, পরিচয়, অর্থবহতা, বিশ্বাস ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তারা আরও মনে করবে যে, এর ভেতর দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক নিপীড়ন দমন করা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা দূর করা এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা যাবে না। ব্যর্থতার কারণে হয়তো একপর্যায়ে 'রাজনৈতিক ইসলামের' প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব জাগ্রত হবে। ফলে, তারা এর বিকল্প সমাধান খুঁজতে থাকবে বলে মনে হয়। সেসঙ্গে এমনও হতে পারে যে, পূর্বের চেয়ে কোথাও কোথাও আরও অধিক মাত্রায় পশ্চিমাবিদ্বেষী জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে ইসলামের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমাবিশ্বকে দায়ী করা হতে পারে। যদি মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা হয়তো একটি 'ইসলামিক উন্নয়ন মডেল' হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে, এ মডেলটি তখন হয়তো পাশ্চাত্য মডেলের বিকল্প মডেল বলে বিবেচিত হবে।

একটি সম্ভাবনার কথা বলা যায়, তা হল, হয়তো আগামী দশকগুলোতে এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত আন্তর্জাতিক নির্দেশ এশীয় উন্নয়নের ধারার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। চীন যদি তার উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে পারে তাহলে হয়তো, সভ্যতাসমূহের ভারসাম্যের অদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অন্যদিকে, ভারতের অর্থনীতি খুবই শক্তিশালী হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাদের নিজেদের এবং অমুসলিম প্রতিবেশীদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে। একটি বৃহৎসংখ্যক যুবসমাজ মুসলমানদের পুনর্জাগরণের সাথে সংযুক্ত হয়ে মুসলমানদের উগ্রতা, যুদ্ধক্ষমতা এবং অভিবাসন বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের দিনগুলো অপাশ্চাত্য দেশগুলোর শক্তিবৃদ্ধি, পুনঃজাগরণ, দৈশিককরণ এবং কার্যক্ষমতা, পশ্চিমাদের সঙ্গে তাদের সংঘাত বৃদ্ধি করবে, আর অপাশ্চাত্য শক্তিগুলো নিজেদের মধ্যেও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার হতে পারে।

(গ)

সভ্যতার প্রকাশমান বিন্যাস

অধ্যায়-৬

বৈশ্বিক রাজনীতির সাংস্কৃতিক অবস্থান

অনির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধতা : পরিচায়নের রাজনীতি

আধুনিকায়নের তাড়নায় বিশ্বরাজনীতির সাংস্কৃতিক অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রে সমরূপ সংস্কৃতি নিয়ে একত্রিত হচ্ছে। আবার জনগণ এবং সেইসব দেশ যাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক একাত্মবোধ নেই তারা একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মতাদর্শ ও বৃহৎশক্তিকেন্দ্রিক চেতনা ও তার ভিত্তিতে একমত হওয়ার দিনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং এখন মানুষ সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়েই কেবল একত্রিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক পরিসীমা ক্রমাগতভাবে নৃগোষ্ঠীক, ধর্মীয় এবং সভ্যতা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ধাঁচে পুনঃনির্ধারিত হচ্ছে। শীতলযুদ্ধের অচলায়তন সাংস্কৃতিক চেতনার দ্বারা ছিন্ন হয়ে ম[illegible]ং বৈশ্বিক রাজনী[illegible]ংস্কৃতিক চেতনার দ্বার[illegible]রেখার নিরিখে নিরূপিত হয়ে তা সংঘাতের কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান নিচ্ছে।

শীতলযুদ্ধ চলাকালীন একটি দেশ জোটনিরপেক্ষ থাকতে পারত। এমন অবস্থানে বেশকিছু দেশ ছিল কিংবা একটি দেশ তার জোটগত অবস্থানের বদল ঘটাতে পারত, এসব ঘটনা বহুবার ঘটেছে। ওইসব দেশের নেতারা তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে, কিংবা তাদের ভারসাম্যগত সমীকরণে অথবা তাদের আদর্শগত বিবেচনায় এমন জোটগত অবস্থানের অদলবদল ঘটাতেন। শীতলযুদ্ধবিহীন নতুন বিশ্বে সাংস্কৃতিক পরিচয়ই সকল কিছুর নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে— এ দৃষ্টিতে শত্রু এবং মিত্র নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। একটি দেশ শীতলযুদ্ধ-সম্বলিত জোট এড়িয়ে চলতে পারলেও তার পক্ষে পরিচয়বিহীন থাকা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল : 'আপনি কোন্ পক্ষের?' এই প্রশ্নটি আরও বেশি মৌলিক প্রশ্ন, যেমন 'আপনি কে?' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেক দেশেরই এ প্রশ্নের উত্তর আছে। উত্তরটি কী হবে? উত্তর হল এই যে, যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয়ই সেই দেশের শত্রু-মিত্র ঠিক করে দেয় এবং বিশ্বরাজনীতিতে তার অবস্থানও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মাধ্যমেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

১৯৯০-এর দশক ছিল মূলত বিশ্বব্যাপী পরিচয়সংকটের ভয়াবহ দশক। প্রায় সর্বত্রই মানুষ প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করতেন. 'আমরা কে?' 'আমরা কোথায়

অবস্থান করছি!' 'আমাদের সঙ্গে কে বা কারা আছে বা নেই।' এই প্রশ্ন আসলে নানা কারণে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, কেননা মানুষ নতুন জাতিরাষ্ট্র গড়তে চায়, কিন্তু তা করতে চায় অনেক ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে। যেমন প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় তেমনটি করতে চাওয়া হয়েছিল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে তা সাধারণভাবেও ঘটে থাকে।

১৯৯০-এর দশকে কোনো কোনো দেশে জাতীয় পরিচয়ের প্রসঙ্গটি একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিল, যেমন : আলজেরিয়া, কানাডা, চীন, জার্মানি, ব্রিটেন, ভারত, ইরান, জাপান, মেক্সিকো, মরোক্কো, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিরিয়া, তুরস্ক, তিউনেশিয়া, ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ। জাতীয় পরিচয়ের ইস্যু সেইসকল দেশের জন্য ভয়াবহ, যে সকল দেশে জাতীয়তার প্রশ্নে রয়েছে নানাপ্রকার ফাটল, কার্যত বিভিন্ন সভ্যতা থেকে আগত মানুষজনের কারণে।

পরিচয়ের প্রশ্নে যে-বিষয়গুলো মানুষের নিকট মুখ্য বলে বিবেচিত হয়, তা হল : রক্তের সম্পর্ক ও বিশ্বাসাবলি, পারিবারিক চেতনা ও ধর্মীয় বিধানাবলি, ইত্যাদি। মানুষ তাদেরই আপন মনে করে যাদের সঙ্গে তাঁর নিজের পূর্বপুরুষ, ধর্ম, ভাষা, মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানাদির মিল খুঁজে পায়। অন্যদিকে, যাদের সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়গুলোর তফাৎ লক্ষ করে থাকে, সেখানে সে নিজেকে বা তার বিরুদ্ধ অথবা বিপরীতগোষ্ঠীকে পৃথক মনে করে থাকে।

অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চিমাবিশ্বের অংশ, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, তারা পশ্চিমাবিশ্ব থেকে পৃথক ছিল এবং শীতলযুদ্ধের সময় নিশ্চুপ বা নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিল। তারা এখন আবার তাদের সাংস্কৃতিক কুটুম্ব তথা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন ওয়ার্শো-চুক্তির অধীনস্থ দেশসমূহের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে এবং ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। তাদের পেছনের কাতারে রয়েছে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের দেশগুলো। ইউরোপীয় শক্তি একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চায় যে, তাদের নিকট কোনো মুসলমানদেশ প্রত্যাশিত নয়। অতএব তুরস্ক, বসনিয়াকে ইউনিয়নভুক্ত করতে তারা রাজি নয়। উত্তরের প্রান্তে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবস্থান কার্যত বাল্টিক রিপাবলিকসমূহকে নিয়ে। সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড নতুন উদ্দীপনায় নতুন জোট গঠনের আগমনী বার্তার জন্য প্রস্তুত হয়। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী বারংবার বলতে থাকেন যে, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ সুইডেনের অংশবিশেষ এবং রাশিয়াকে সাবধান করে বলা হয় যে, রাশিয়া যদি উক্ত এলাকায় আগ্রাসন পরিচালনা করে তবে সুইডেন নিশ্চুপ থাকবে না। প্রায় অনুরূপ সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণের কাজটি বলকান এলাকায় সংঘটিত হয়। শীতলযুদ্ধকালীন গ্রিস এবং তুরস্ক ছিল ন্যাটো-জোটের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া ছিল ওয়ার্শো-জোটের আওতাধীন অবস্থানে, আর আলবেনিয়া কখনও ছিল বিচ্ছিন্ন আবার কখনও কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে তাল মিলাত। এই ধরনের জটিল জোটগত অবস্থানে, অর্থাৎ শীতলযুদ্ধাবস্থায় জোটসমূহ ইসলাম এবং অর্থোডক্স সভ্যতার মতো সত্তাদুটি আমলে নেয়নি। বলকান এলাকায় নেতৃত্বে গ্রিস, সার্ব এবং বুলগেরীয়দের মধ্যে অর্থোডক্স জোটকে স্বচ্ছ করতে উদ্‌গ্রীব

ছিল। 'বলকানযুদ্ধ' সম্পর্কে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, '...উপরিভাবে এসেছিল অর্থোডক্স সম্পর্কের শেষ আশ্রয় হিসেবে এটি ছিল একটি অঙ্গীকার বিশেষ। এটি ছিল নিষ্ক্রিয়, তবে বলকান এলাকার জাগরণের নিকট তা হয়ে ওঠে একটি আসল বিষয়বস্তু।'

একটি অতিচঞ্চল বা অস্থির বিশ্বে, মানুষ প্রতিনিয়ত আত্মপরিচয় ও নিরাপত্তা চায়। মানুষ চায় তার আদি বা মূলধারা কী তা জানতে। এই ধারণারই প্রতিধ্বনি আমরা সার্বিয়ার বিরোধীদলের নেতৃত্বের কণ্ঠে শুনতে পাই, যখন তারা বলেন : '...দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দিকে দেখলে দেখা যায়, তারা শীঘ্রই অর্থোডক্স বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলকান এলাকার জোট প্রত্যক্ষ করতে চায়। আর এরা হল সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং গ্রিস। তারা তা করতে চায় ইসলামকে প্রতিরোধ করার অভিপ্রায়ে।'

অর্থোডক্স সার্বিয়া ও রুমানিয়া একত্রে তাদের উভয়ের জন্য সমরূপ এমন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে ও ক্যাথলিক হাঙ্গেরির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে জোটবদ্ধ হয়। সোভিয়েটের পক্ষ থেকে হুমকি না-থাকার প্রেক্ষাপটে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যেকার 'কৃত্রিম' চুক্তি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা আজিয়ান সাগর, সাইপ্রাস, তাদের মধ্যে সামরিক শক্তির ভারসাম্য, ন্যাটো-জোটের ভূমিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কার কী ভূমিকা হবে তা নিয়ে উক্ত দেশের মধ্যে সংঘাত ও সংকট মোটামুটি অনড় অবস্থানেই রয়েছে। তুরস্ক সবসময়ই বলকান এলাকার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর এবং বসনিয়াকে তারা সদাসর্বদা সমর্থন জুগিয়েছে। প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় রাশিয়া অর্থোডক্স সার্বিয়ার পক্ষে ছিল। জার্মানি ক্যাথলিক ক্রোয়েটদের রক্ষা করতে চেয়েছে, মুসলমানদেশগুলো বসনিয়ার সরকারকে সমর্থন দেয়। সার্বরা ক্রোয়েটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তাছাড়া তারা বসনিয়া ও আলবেনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। মোটের ওপর, বলকান এলাকা পুনরায় 'বলকানাইজড' হয়ে যায়, আর তা হয় কার্যত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। দেখা যায়, এখানে 'দুটো ক্ষুরধার অস্ত্র পরস্পর মুখোমুখি হয়ে যায়। একদিকে থাকে বেলগ্রেড/এথেন্স 'ক্ষুর', অন্যদিকে থাকে আলবেনিয়া/তুরস্ক জোটের 'ক্ষুর'।

ইতোমধ্যে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বেলারুশ, মালদোভা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে আরমেনিয়া ও এজারিশ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। রাশিয়া এবং তুরস্ক নিজ নিজ জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে, এভাবে সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বজায় রয়েছে। রাশিয়ার সেনাবাহিনী কাজাকিস্তান ও চেচনিয়ার মুসলমান মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান প্রজাতন্ত্রসমূহ নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে চলছে এবং তাদের প্রতিবেশী মুসলমানরাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তুরস্ক, ইরান এবং সৌদিআরব নতুন মুসলিম রিপাবলিকসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়া ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে কাশ্মীর-ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে

অনবরত সংঘাত ঘটে যাচ্ছে। তারা একে অপরের সঙ্গে সামরিক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখছে, আর ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান এবং হিন্দু-উত্থান আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পূর্বএশিয়ার ৬টি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত বিরোধও তুঙ্গে উঠেছে। চীন, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর এবং বিদেশে বসবাসরত চীনারা ক্রমাগত 'নিজত্বের' প্রতি ঝুঁকে পড়ছে, আর সেইসঙ্গে আপন শেকড় তথা নিজ ভূমির প্রতি দুর্বল হচ্ছে। দুই কোরিয়া দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংকোচের সঙ্গে হলেও দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে ঐকতানের দিকে এগুচ্ছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একদিকে মুসলমান জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে চীনা এবং খ্রিস্টের অনুসারীদের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং হয়তো কোনো সময়ে তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিয়ার অর্থনৈতিক জোট মার্কোজার, আন্দ্রেয়ান চুক্তি, ত্রিপক্ষীয় চুক্তি (মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা) মধ্য-আমেরিকান সাধারণ বাজারে একটি নতুন জীবনধারা প্রবাহিত করে চলেছে। এভাবে দেখা যায়, সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে সাংস্কৃতিক মিলের বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে একটি ঐক্যপ্রক্রিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রায় একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা মেক্সিকোকে আত্তীভূত করার জন্য উত্তর আমেরিকায় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য এর সাফল্য নির্ভর করবে মেক্সিকোর ওপর, কেননা সেক্ষেত্রে মেক্সিকোকে লাটিন আমেরিকার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে উত্তরআমেরিকার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হবে।

শীতলযুদ্ধাবসানের পর্যায়ে সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন সম্পর্ক স্থাপন এবং নতুন জোট গঠনের কাজে ব্যাপৃত আছে। তারা অনির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হতে গিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে মিল রয়েছে এমন দেশকেই বাছাই করে নিচ্ছে। রাজনীতিবিদরাও পিছিয়ে নেই, তারা জনগণকে বৃহত্তর জাতীয় পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করতে নানারূপ কৌশলে এগিয়ে যাচ্ছে। 'বৃহত্তর সার্বিয়া', 'বৃহত্তর চীন', 'বৃহত্তর তুরস্ক', 'বৃহত্তর হাঙ্গেরি', 'বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়া', 'বৃহত্তর আজারবাইজান', 'বৃহত্তর রাশিয়া', 'বৃহত্তর আলবেনিয়া', 'বৃহত্তর ইরান' এবং 'বৃহত্তর উজবেকিস্তান' স্লোগান আজ অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে।

প্রশ্ন আসে যে, সবসময়ই রাজনৈতিক ও অর্থনীতি সম্পর্কিত ইস্যুতে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীবাদের পশ্চাতে কি সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়টি কাজ করে থাকে? অবশ্যই তেমন নয়। শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে ইতিহাসে দেখা যায়, দেশগুলো বিভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বলিত সত্তার সঙ্গে চুক্তি বা গোষ্ঠী গঠন করেছে। যেমন ফ্রান্সিস আই. হেপার্সবার্গের বিরুদ্ধে অটোম্যানদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে সংকট থেকে উত্তরণের নিমিত্তে গঠিত জোট সময়-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন অবস্থায় নতুন করে জোট ও মিত্র

খোঁজার দরকারের মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব বলে কিছু নেই। গ্রিস এবং তুরস্ক নিঃসন্দেহে ন্যাটোর সদস্যভুক্ত থাকবে, কিন্তু ন্যাটোভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নরম-গরম দু-ধরনের থেকে যাবে। একইভাবে জাপান এবং কোরিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী, ইসরাইলের সঙ্গে তার অপ্রাতিষ্ঠানিক সখ্য, পাকিস্তানের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক সুসম্পর্ক—এ সবই উদাহরণ হিসেবে আনা যায়।

বিভিন্নধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন আসিয়ান, ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে ক্রমাগতভাবে হিমশিম খাচ্ছে। পাকিস্তান এবং ভারত শীতলযুদ্ধযুগে বিভিন্ন বৃহৎশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। কিন্তু এখন সংস্কৃতিনির্ভর রাজনীতির চাপে তারা উভয়েই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন মিত্র ও গোষ্ঠীর সন্ধানে রয়েছে, এবং পুরাতন জোটসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন করে চলেছে। আফ্রিকার দেশসমূহ যদিও মূলত শীতলযুদ্ধযুগে সোভিয়েটের বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই ছিল, কিন্তু শীতলযুদ্ধাবসানের পরবর্তী পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা সংস্কৃতির বাস্তবতার আলোকে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণ করে চলেছে।

কোনো কোনো সংস্কৃতিক মিল বা সমরূপতাসম্পন্ন জাতি ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে ঐক্য তৈরি করে বা বিপরীতভাবে অমিলের কারণে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

প্রথমত, কারও কারও বহুশাখাবিশিষ্ট আত্মপরিচয় থাকতে পারে, যা আত্মীয়তা, পেশা, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক, শিক্ষা সম্পর্কিত, দলগত, মতাদর্শিক এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে। পরিচয়ের একটি উপাদানের সঙ্গে অন্য একটি উপাদান সংঘাতের পর্যায়ে আসতে পারে এবং এর একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে জার্মানির এক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯১৪ সালে জার্মানিতে শ্রমিকগণ তাদের শ্রেণীপরিচয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আন্তর্জাতিক সর্বহারা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেও তাদের জাতীয় পরিচয় কিন্তু জার্মানির জনগণ এবং সরকারের সঙ্গে থেকেই যায়। অধুনা বিশ্বে নাটকীয়ভাবে আত্মপরিচয় প্রশ্নে অন্যান্য উদাহরণের তুলনায় সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রাধান্যের শীর্ষে উঠে এসেছে।

একটি একক উপাদান তাৎক্ষণিকভাবে মুখোমুখি পর্যায়ে অর্থবহ হতে পারে। পরিচয়ের সংকীর্ণ উপাদানগুলো সাধারণত বৃহত্তর উপাদানের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় না। একজন সামরিক কর্মকর্তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার কোম্পানির রেজিমেন্ট, বিভাগ এবং চাকুরির ধরনের দ্বারা পরিচিত হতে পারেন। তেমনি একজন ব্যক্তি সাংস্কৃতিকভাবে তার পূর্বপুরুষের উদ্ভব, নৃ-ভৌগোলিক, জাতীয়তা, ধর্ম এবং সভ্যতার পরিচয়ে পরিচিত হন। নিম্নপর্যায়ে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নীরবতা প্রকারান্তরে উচ্চপর্যায়েও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নীরবতাকে উৎসাহিত করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমানভাবে মানুষ যেখানে সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে বিভেদায়িত হচ্ছে, সেখানে বিনাদ্বিধায় বলা যায়, সংস্কৃতিগত পার্থক্য সংঘাতপ্রবণতার

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সভ্যতা আসলে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সত্তা বৈ কিছু নয়। সুতরাং, বলা চলে, বিশ্বরাজনীতিতে বিভিন্ন সভ্যতার গোষ্ঠীভিত্তিক সংঘাত একটি আলোচিত ও কেন্দ্রীয় বিষয়।

তৃতীয়ত, যে-কোনো পর্যায়ে পরিচয়ের বিষয়টি, তা সে ব্যক্তিগত, উপজাতি সংক্রান্ত, বর্ণ সংক্রান্ত, সভ্যতা সংক্রান্ত হোক না কেন, সদাসর্বদা তা 'অন্যদের' হিসেবে বিচার করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি, অন্য উপজাতি, অন্য বর্ণ, অথবা ভিন্নতর সভ্যতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। অন্যদের 'পর' মনে করা হয়, যেমন বিপরীতভাবে স্বগোত্রীয় হলে 'আপন' বা 'আমাদের' ভাবা হয়ে থাকে। অবশ্য, একই সভ্যতার ভেতরেও ভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিন্যাস থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তারপরও ওই রাষ্ট্রগুলো অন্য সভ্যতার রাষ্ট্রসমূহ থেকে পৃথক সত্তা হিসেবেই বিচার্য হয়ে থাকে। মানুষের বা প্রতিষ্ঠানের আচরণেও এক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সমগোত্রীয় হলে বলা হয়, 'আমাদের মতো'; সমগোত্রীয় না হলে 'আমাদের মতো নয়' বিধায় 'বঞ্চনা' অনিবার্য। তাই দেখা যায়, সভ্যতা নির্বিশেষে আচরণ একরূপসম্পন্ন নয়।

খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন প্রয়োগ ও সুবিধাদি বন্টনের বেলায় খ্রিস্টানরা অগ্রাধিকার পেতেন এবং বিপরীতভাবে তুর্কিরা বঞ্চনার শিকার হতেন। মুসলমানেরাও 'দারুল ইসলাম' এবং 'দারুল হার্ব'-এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। চীনারাও চীনদেশীয়দের সঙ্গে সুখকর আচরণ করলেও চীনে বিদেশীরা তেমন সমান তালের সুখকর আচরণ পায় না। সভ্যতার পরিমাপে 'আমাদের' এবং সভ্যতাবহির্ভূত 'তাদের'-এর মনোভাবসম্পন্ন আচরণগত ভিন্নতা ইতিহাসে চলচ্ছক্তিহীন এক ধ্রুবসত্য হয়ে রয়েছে। এই ধরনের 'সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ' এবং 'সভ্যতার বহির্ভূত' (নিজ নিজ দৃষ্টিতে) সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে, যথা :

১. নিজ সভ্যতা বহির্ভূত মানুষজনের প্রতি মনে করা হয় তারা নিম্নমানের অথবা উচ্চমানের, অর্থাৎ যে-কোনো বিচারেই সমমানের নয়;
২. অন্য সভ্যতাভুক্ত মানুষের বিষয়ে আস্থাহীনতা ও তাদের বিশ্বাস না করা;
৩. ভাষাগত এবং 'সিভিল' আচরণগত পার্থক্য থাকার দরুন অন্য সভ্যতাভুক্ত মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ সমস্যার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি;
৪. অন্যসভ্যতার মানুষের আচার-আচরণ, জীবনধারা, মনন, চিন্তাচেতনা, সামাজিক রীতি সম্পর্কে অজানা থাকার দরুন সংকোচ, ইত্যাদি।

অধুনা বিশ্বে যোগাযোগ ও যাতায়াতব্যবস্থার প্রভুত উন্নতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার মানুষের ভেতর ঘনঘন মেলামেশা, ভাবের অদানপ্রদান ঘটে চলেছে। এ কারণে, তাদের সভ্যতা সম্পর্কিত পরিচয়টি ততটা কার্যকর নয়। ফরাসি, জার্মান, বেলজীয় এবং ডাচগণ নিজেদেরকে ইউরোপীয় ভাবতে ভালোবাসে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানেরা নিজেদেরকে বসনিয়া ও চেচেনদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে। পূর্বএশিয়ায় বসবাসরত চীনারা পরস্পরের মধ্যে সখ্য গড়ে তোলে মূল ভূখণ্ডের মতোই। রুশরা সার্বিয়া ও

অন্যান্য অর্থোডক্সদের সঙ্গে নিজেদের একরূপভাবে এবং তাদের স্বার্থরক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। এ-ধরনের মনোভাবের দুটো দিক রয়েছে; যথা, এর ফলে বৃহত্তর আঙ্গিকে সভ্যতার পরিচয় আরও সুগভীর হয় এবং 'আমাদের' ও 'তাদের' বিষয়টি সংরক্ষিত হয়।

চতুর্থত, বিভিন্ন সভ্যতার আওতাধীন রাষ্ট্র এবং গোত্রের মধ্যে সংঘাতের বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন—মানুষকে নিয়ন্ত্রণের মনোভাব, ভূখণ্ড দখল বা দখলমুক্তকরণ, সম্পদের মালিকানা, সুযোগসুবিধার দখলদার হওয়া, আপেক্ষিকভাবে ক্ষমতাশালী হওয়ার কামনা বা মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে অন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নিজস্বধারায় কাজকর্ম করার ক্ষমতা অর্জন করা ও তা বাস্তবায়ন করতে চাওয়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব আসলে একটি সাংস্কৃতিক ইস্যু বৈ কিছু নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ সম্পর্কে মার্কসীয়-লেনিনীয় এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য বিতর্কযোগ্য, (যদি তার অবসান না ঘটে।) বস্তুগত স্বার্থের বিবাদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রায়শই সমাধানযোগ্য হলেও সাংস্কৃতিক ইস্যুগুলোর মধ্যে সৃষ্ট পার্থক্য ওই পথে সমাধান সম্ভব নয়। ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে অযোধ্যায় একইস্থানে মসজিদ বা মন্দির স্থাপন কিংবা মসজিদ ভেঙে মন্দির স্থাপনার ইস্যুটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করা বা দুটি পথ এক্ষেত্রে একত্রে স্থাপন করা মোটেও সম্ভব নয়। একইভাবে কসোভো সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান দেয়া সহজ নয়। ইহুদি ও আরবীয়দের জেরুজালেম সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানও দুঃসাধ্য। কেননা ওইসব সমস্যা ঐতিহাসিকভাবে সংস্কৃতি ও সংশ্লিষ্ট মানুষের আবেগ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। তেমনিভাবে ফরাসি কর্তৃপক্ষ আর মুসলমান অভিভাবকেরা মুসলমান মেয়ে-শিক্ষার্থীদের মাথায় হিজাফ পড়ার বিষয়টি পরস্পরের যুক্তিকে একত্রিত করে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বের করা অসম্ভব। সুতরাং, সাংস্কৃতিক ইস্যুর ক্ষেত্রে পছন্দ-অপছন্দ 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কিংবা 'শূন্য-সংখ্যা'-এর নিগড়ে আবদ্ধ। এর মধ্যবর্তী কোনো রাস্তা খোলা নেই।

পঞ্চমত, বলা যায় সাংস্কৃতিক সংঘাত সর্বব্যাপী। মানুষ এটিকে ঘৃণা করুক। নিজস্ব বিবেকে মানুষ শত্রু চিহ্নিত করে থাকে, যেমন—ব্যবসায় প্রতিযোগী, প্রাপ্তির বেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী, ইত্যাদি। স্পষ্টতই এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব থাকে। থাকে অবিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি হুমকি। কেননা তারা একে অপর থেকে পৃথক এবং মনে করে একজন অন্যজনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর সমাধান, অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন অবস্থার শূন্যতা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির ক্ষেত্রে নতুন প্রতিপক্ষের জন্ম দিয়ে থাকে। 'আমাদের' এবং বিপরীত 'তাদের' ধারায় চিন্তার প্রবণতাকে আলি মাজরুই বলেন, এটি আদতে রাজনৈতিক অঙ্গনে চিরন্তন বা সর্বজনীন বিষয়।

বর্তমান সময়ে 'তাদের' অনুজ্ঞাটি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে ভিন্ন সভ্যতার সদস্যদের চিহ্নিত করতেই ব্যবহৃত হচ্ছে। শীতলযুদ্ধ বা আচরণের মোহে সংস্কৃতি ও সভ্যতাসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটেনি বরং এ-বিষয়গুলো নতুন করে জাগ্রত হয়েছে এবং নতুন মাত্রা ও গতি লাভ করেছে। অন্যদিকে, একথাও সত্য যে, বিভিন্নপ্রকার আঞ্চলিক জোটের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সাংস্কৃতিক সমরূপতা এবং সেইমতো 'সাধারণ' বিষয়গুলোর একত্রিতকরণ ও সাধারণ (কিছুটা সর্বজনীন) ও একাত্মবোধের অগ্রগতিও হচ্ছে। তবে, একথাটি এখনও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ইস্যুগুলির মধ্যেই সীমিত থাকছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে এর উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি।

সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা

১৯৯০-এর দশকে আঞ্চলিকীকরণ এবং বৈশ্বিক রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণের বিষয়ে উচ্চবাক্য শোনা যেত। বৈশ্বিক নিরাপত্তার এজেন্ডায় আঞ্চলিক বিরোধসমূহ বৈশ্বিক বিরোধের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ওঠেছে। বৃহৎ শক্তিসমূহ, যেমন রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সেসঙ্গে দ্বিতীয় বৃহৎশক্তিসমূহ, যেমন সুইডেন, তুরস্ক প্রমুখ দেশগুলো তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আঞ্চলিক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য, আঞ্চলিক বাণিজ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এটি দ্রুত ক্রমবর্ধিষ্ণু পর্যায়ে আছে। এতদ্ব্যতীত, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক পারস্পরিক সহযোগিতার জোট, যেমন ইউরোপীয়, উত্তর আমেরিকা, পূর্বএশিয়াতে এবং আরও অনেক এলাকায় 'ব্লক' গড়ে উঠতে শুরু হয়েছে।

'আঞ্চলিকত্ব' শব্দটির দ্বারা যা ঘটে চলেছে তার প্রকৃত বিবরণ লাভ করা যায় না। আঞ্চলিক শব্দটি ভৌগোলিক, কিন্তু রাজনৈতিক বা সংস্কৃতি বিষয়ক নয়। বলকান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে আন্তঃসভ্যতাসমূহ এবং সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ সংঘাতে তারা লিপ্ত রয়েছে। 'অঞ্চল' কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি ভিত্তিস্বরূপ। এখানে ভূগোল ও সংস্কৃতি মিলেমিশে গিয়েছে। সামরিক জোট এবং অর্থনৈতিক ও সহযোগিতার নিমিত্তে গঠিত সংস্থার জন্য চাই বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতার মনোভাব। আর সহযোগিতার জন্য চাই বিশ্বাসযোগ্যতা। সমরূপ মূল্যবোধ এবং সভ্যতার গর্ভেই জন্ম নেয় বিশ্বাস। মোটের ওপর দেখা যায়, 'একক' বা 'সমরূপ' সভ্যতা নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক জোট অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে—এক্ষেত্রে বহুসভ্যতাসম্বলিত সংগঠন ততটা কার্যকর হতে পারে না। একথাটি সকল সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জোটের ক্ষেত্রেই সত্য।

ন্যাটো-জোটের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের দার্শনিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে মিল এবং প্রায়সমরূপ মূল্যবোধ থাকার কারণে ইউরোপের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার বিবেচনায় অংশত সাফল্য এসেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছে কার্যত 'সাধারণ' সংস্কৃতির উপস্থিতির কারণে। ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার নিরিখে গঠিত সংগঠন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ ও স্বার্থ থাকার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

কেননা তার ফলে একটি একক পরিচয় গড়ে তুলে কার্যোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠানো সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

একক সভ্যতাসম্বলিত প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনিভুক্ত ১০টি ক্যারিবীয় রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (CARICOM) অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তারিত ও বিভিন্নমুখী সহযোগিতার দিগন্ত সম্প্রসারিত করতে পেরেছে। অন্যদিকে, বৃহত্তর ক্যারিবীয় সংগঠন যা অ্যাংলো হিস্পানিকদের মধ্যে বিভেদ ঘুচাবার জন্য বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদরেখা দূর করতে উপর্যুপরিভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

১৯৮৫ সালে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের সমন্বয়ে অনুরূপভাবে 'সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কো-অপারেশন (সার্ক)' প্রায় সর্বতোভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এমনকি তারা একত্রে বসে মিটিং পর্যন্ত করতে বাধাগ্রস্ত হয়।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতির ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক প্রশ্নটি অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে যায়। এ সম্পর্কে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্য :

১. মুক্ত বাণিজ্য এলাকা;
২. শুল্ক ইউনিয়ন;
৩. সাধারণ বাজার;
৪. অর্থনৈতিক ইউনিয়ন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমন্বয় ঘটাবার অভিপ্রায়ে কার্যত সাধারণ বাজার ও অর্থনৈতিক সমন্বয় স্থাপনের লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে কাজ করে চলেছে। আপেক্ষিকভাবে সমজাতীয় 'মারকোসার' (Marcosur) এবং 'এনডিয়েন' (Andean) চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো শুল্ক ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যায়। এশিয়ার বহুসভ্যতাবিশিষ্ট 'আসিয়ান' (ASEAN) ১৯৯২ সালে মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যান্য বহুসভ্যতাভিত্তিক অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো পেছনে পড়ে থাকে। তবে ১৯৯৫ সালে এর ন্যূনতম ব্যতিক্রম 'নাফটার' (NAFTA) ক্ষেত্রে; এ-ধরনের কোনো সংগঠনের পক্ষেই মুক্তবাণিজ্য এলাকা গড়া সম্ভব নয়, যদি-না তারা ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সংহতির বিষয়টি গুরুত্ব না দেয়।

পশ্চিম ইউরোপীয় এবং লাটিন আমেরিকার সমরূপ সভ্যতার উপাদানগুলো তাদের আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয়ে গড়ে তোলার বিষয়টি এগিয়ে নিয়েছে। পশ্চিম ইউরোপীয় এবং লাটিন আমেরিকানরা জানে যে, তাদের অনেককিছুই এক এবং অভিন্ন। পাঁচটি সভ্যতা (দৃঢ় হত যদি রাশিয়াকে ধরা হয়) পূর্বএশিয়ায় রয়েছে। পূর্বএশিয়া একটি পরীক্ষামূলক সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার দ্বারা গঠিত সংস্থাসমূহ কার্যকরভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ন্যাটোর তুলনায় পূর্বএশিয়ায় কোনো নিরাপত্তামূলক সংগঠন বা সামরিক জোট ছিল না। আসিয়ানের মতো বহুসভ্যতাভিত্তিক সংগঠন, যার ১৯৬৭ সালে জন্ম হয়েছিল, তাতে ছিল একটি 'সিনিক', একটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, একটি খ্রিস্টানধর্মাবলম্বী, এবং দুটি মুসলমান সদস্যরাষ্ট্র। এরা সবাই কিন্তু কম্যুনিজমের

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে, বিশেষ করে উত্তর ভিয়েতনাম এবং চীনের ভয়ে ভীত হয়েই জোটবদ্ধ হয়েছিল।

বহুধাবিভক্ত সভ্যতার সমন্বয়ে গঠিত আসিয়ানকে একটি সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। এটি অবশ্য (সেসঙ্গে) ওই ধরনের সংগঠন সীমাবদ্ধতারও একটি উদাহরণ। আসিয়ান কোনোপ্রকার সামরিক জোট নয়, যদিও এর সদস্যগণ কখনও কখনও দ্বিপাক্ষিকভাবে সামরিক বিষয়ে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে। তারা প্রায় সকলেই সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট বৃদ্ধি করছে এবং সামরিক স্থাপনা শক্তিশালী করছে, যেখানে পশ্চিম ইউরোপ ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলো সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে ব্রতী হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আসিয়ান শুরু থেকেই যে লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে গিয়েছে তা হল, 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা, কিন্তু অর্থনৈতিক সংহতি বিধান নয়'। এর ফলে আঞ্চলিকতার মতো বিষয়টি 'নিরহঙ্কার পদক্ষেপে' এগিয়ে গিয়েছে, এমনকি মুক্তবাণিজ্য এলাকা সেখানে একবিংশ শতাব্দীর আগে অবলোকন করতে চাওয়া হয়নি।'[৪] ১৯৭৮ সালে আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের বিদেশবিষয়ক মন্ত্রীগণ কনফারেন্স-পরবর্তী (Post Ministerial Conference—(PMC) পিএমসি তাদের উন্নয়নবিষয়ক বক্তৃতামালার সহযোগী শক্তি, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সভা-সমাবেশ করে।

'এই পি.এস.সি. মূলত প্রাথমিকভাবে দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ আলাপ-আলোচনার জন্য একটি ফোরাম, যা কোনোভাবেই কোনোপ্রকার নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে কাজ করতে অপারগ।'[৫] ১৯৯৩ সালে আসিয়ান-এর কার্যপরিধি বৃদ্ধি পায় এবং তা তাদের আলাপ আলোচনার অংশীদার হিসেবে আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, লাওস এবং পাপুয়া নিউগিনিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সংগঠনটি যৌথ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের নীতি গ্রহণ করে। সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে প্রথম সভায় মিলিত হয়, 'তখন তারা আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করেন,' তবে বিতর্কিত ইস্যুগুলো বাদ দিতে হয়, কেননা যেমন একজন কর্মকর্তা বলেন, 'বিতর্কিত ইস্যু গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে যেতে পারে এবং একে অন্যকে আক্রমণ করতেও পারে।'[৬] প্রকৃতপক্ষে আসিয়ান-এর এসব সংকট কিন্তু বহুধাবিভক্ত সভ্যতার দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক জোটের সাধারণ সীমাবদ্ধতা ব্যতীত কিছু নয়।

অর্থবহ পূর্বএশীয় আঞ্চলিক সংগঠনের আবির্ভাব হবে তখন, যখন ওই অঞ্চলে সাংস্কৃতিকভাবে সাযুজ্য আসবে, যা তাদেরকে স্থায়িত্ব দেবে। পূর্বএশীয় সংগঠনগুলোর সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্যই কিছু সাধারণ মিল রয়েছে যা তাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে থাকে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ, যুক্তি দেখান যে, এই 'সাধারণত্বই' হল তাদের সংস্থার 'শ্বাসবায়ু' যা তাদেরকে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। মায়ানমার, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অতিগুরুত্বপূর্ণ হল চীন ও জাপানকে আসিয়ানভুক্ত করে নেয়া। মাহাথির আরও যুক্তি দেখান যে, ইস্ট-

এশিয়ান ইকোনোমিক ককাস—ইয়েক (East Asian Economic Caucus—EAEC)-এর শেকড় একই ধরনের সংস্কৃতি বা সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে গ্রথিত রয়েছে। ভাবতে হবে যে, 'এটি কেবলমাত্র কোনো ভূগোলভিত্তিক সংগঠন নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনও বটে। যদিও পূর্বএশীয় বা জাপানি, কোরীয় অথবা ইন্দোনেশীয় নয়, তথাপি সাংস্কৃতিকভাবে তাদের মধ্যে বহু মিল রয়েছে ইউরোপীয়দের 'দল' রয়েছে, আমেরিকানদের 'দল' আছে, সুতরাং আমাদের অর্থাৎ পূর্বএশীয়দেরও 'দল' থাকতে হবে।' এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর একজন সহযোগী বলেন যে, 'এ সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ আঞ্চলিক বাণিজ্যিকে এগিয়ে নেবে, আর এর ভিত্তি হবে তাদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক সাযুজ্য।' ইয়েক (EAEC)-এর গূঢ় রহস্য হচ্ছে এই যে, অর্থনীতি কার্যত সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এ সংস্থা থেকে বাদ দিতে হয়েছে, কারণ সাংস্কৃতিকভাবে তারা এশীয় নয়। ইয়েক (EAEC)-এর সাফল্য তাই সর্বতোভাবে জাপান এবং চীনের অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। মাহাথির জাপানিদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান এবং বলেন যে, জাপানই হল এশিয়া। জাপান হল পূর্বএশিয়া, একথা তিনি জাপানি শ্রোতাদর্শকের সম্মুখেই বলেছেন। তিনি তাদের আরও বলেন যে, 'আপনারা এই ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। কেননা আপনারা এর মধ্যে বিলীন হয়ে রয়েছেন।'[৮] জাপানি সরকার অবশ্য ইয়েক (EAEC)-এ অংশ নিতে আগ্রহী ছিল না। এর দুটো কারণ ছিল। প্রথমত, তারা আমেরিকাকে চটাতে চায়নি। দ্বিতীয়ত, পুরোপুরিভাবে এশীয় হতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। যদি জাপান ইয়েক (EAEC)-এ যোগদান করে, তবে সংস্থাটি তাদের পদানত হবে এবং সেক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে তাদের বৈরী অবস্থা সৃষ্টি হবে। বহু বৎসর যাবৎ জাপান একটি 'ইয়েন ব্লক' সৃষ্টির চেষ্টায় বিভোর রয়েছে, যার দ্বারা তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং নাফটার (NAFTA) সঙ্গে 'ভারসাম্য' বজায় রাখতে পারবে। তবে, জাপান হল একটি 'একাকিত্বসম্পন্ন দেশ' যার সঙ্গে প্রতিবেশীদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ এবং সম্ভবত এ-কারণেই ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সেখানে কোনোপ্রকার 'ইয়েন ব্লকের' স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।

আসিয়ান খুব ধীরগতিতে সামনে এগুচ্ছে, কিন্তু 'ইয়েন ব্লক' এখনও স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে। জাপানের দোদুল্যমানতা এবং ইয়েক (EAEC)-এর শক্ত ভিত্তি না-পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক তৎপরতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অগ্রগতির মূলে রয়েছে পূর্বএশিয়ার চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থাপিত সাংস্কৃতিক বন্ধন। তাহলে দেখা যায়, পূর্বএশিয়ার অন্যান্য এলাকার মতো সাংস্কৃতিক সাধারণত্বই হল সকল অর্থনৈতিক সংহতি ও অগ্রগতির মূলমন্ত্র।

শীতলযুদ্ধের অবসান, মূলত বিশ্বে নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সংগঠন গড়তে ও পুরাতন সংগঠনগুলো পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছে। তবে, এসব সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করছে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সাংস্কৃতিক মিল বা সাযুজ্যের ওপর। সিমন পেরেস (Shimon Peres) ১৯৯৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যে একটি 'কমন মার্কেট'-এর কথা

বলেছিলেন, যাকে তিনি 'মরুভূমির মিরেজ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। একজন আরবীয় কর্মকর্তা বলেছেন যে, 'আরবীয় জগৎ' ইসরাইলকে তাদের প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায় না।[১০] ১৯৯৪ সালে গঠিত ক্যারিবীয় রাষ্ট্রসংঘ 'কারিকম', হেইতি ও স্প্যানিশ ভাষাভাষি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেও বিভিন্ন সভ্যতা দ্বারা গঠিত সংস্থার অভ্যন্তরস্থ ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যসহ প্রাক্তন ব্রিটিশ কলোনির অধুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নমনীয় মনোভাব দূর করতে খুব একটি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারছে না।[১১]

অন্যদিকে সাংস্কৃতিকভাবে মিল রয়েছে, এমন সংস্থাসমূহ দ্রুত অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে যদিও উপসভ্যতায় বিভক্ত পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ক ১৯৮৫ সালে 'রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট' পুনর্গঠিত করে, যা ১৯৭৭ সালে গঠিত হয়েছিল। অবশ্য, এটির পুনঃনামকরণ হয় 'ইকোনোমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' (ECO) হিসেবে। তারা পরবর্তীতে বিভিন্ন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণের ব্যবস্থা নেয়। তাছাড়া, ১৯৯২ সালে ইকো (ECO) সদস্যসংখ্যা বর্ধিত করা হয়। ফলে আফগানিস্তান এবং প্রাক্তন সোভিয়েট রিপাবলিকের ৬টি মুসলমান প্রজাতন্ত্র এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতোমধ্যে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের ৫টি মুসলমান-অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্র নীতিগতভাবে একটি 'সাধারণ বাজার' গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৪ সালে দুটি বৃহৎ প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান এবং কাজাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বলা হয়, 'উভয়ের মধ্যে মুক্তভাবে পণ্য, সেবা এবং পুঁজির প্রবাহ চলবে।' সেইসঙ্গে তারা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উভয়ের মধ্যে আর্থিক, মুদ্রাসংক্রান্ত এবং ট্যারিফ নীতি ইত্যাদি পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে চলবে। ১৯৯১ সালে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং প্যারাগুয়ে একত্রে মারকুসার (Marcosur)-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়ে কিছু সাধারণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্রতী হয়। এভাবে তাদের মধ্যে তারা অর্থনৈতিক সংহতি লাভ করতে চায়। সুতরাং, এরই ফল হিসেবে ১৯৯৫ সালে আংশিকভাবে হলেও একটি শুল্ক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে স্থবির হয়ে থাকা পূর্বে গঠিত 'সেন্ট্রাল আমেরিকান কমন মার্কেট' (Central American Common Market)-এর মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠন করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে অকেজো হয়ে থাকা 'এনডেন গোষ্ঠী' সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি শুল্ক ইউনিয়ন গঠন করে। ১৯৯২ সালে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া একত্রিত হয়ে 'সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া' গঠন করে এবং ১৯৯৪ সালে তারা দ্রুত কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১২]

বাণিজ্য সম্প্রসারণের দ্বারা অর্থনৈতিক সংহতি অর্জিত হয়ে থাকে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে আঞ্চলিক দেশস্থ বাণিজ্য আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের আপেক্ষিক পরিমাণের চেয়েও অধিক হয়ে দেখা যায়। ১৯৮০ সালে ইউরোপীয় কমিউনিটির অভ্যন্তরস্থ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল শতকরা হিসেবে প্রায় ৫০.৬ ভাগ, অথচ ১৯৮৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫৮.৯ ভাগে। উত্তর আমেরিকায় এবং পূর্বএশিয়ার ক্ষেত্রেও বাণিজ্যের এই অবস্থানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ল্যাটিন আমেরিকার

মার্কোসার এবং এনডেন চুক্তির পুনর্জাগরণের ফলে লাটিন আমেরিকার সবগুলো দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য গতি পায়। ফলে দেখা যায়, ১৯৯০-এর দশকে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মধ্যে বাণিজ্য তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩-এর মধ্যে কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে বাণিজ্য উল্লেখ করার মতো মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৯৪ সালে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার বাণিজ্যের অংশীদার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হটিয়ে প্রথম স্থানে চলে আসতে সক্ষম হয়।

নাফটা (NAFTA) গঠনের ভেতর দিয়ে মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য বহুগুণ বড়ে যায়। পূর্বএশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য এশিয়া-বহির্ভূত দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে যেতে থাকে। তবে, এই সম্প্রসারণ বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জাপানের নীতির কারণে। কেননা জাপান তার বাজার সীমিত ও সংকুচিত করে রাখার পক্ষপাতী। চীনের সংস্কৃতির আওতাধীন (আসিয়ান) তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ১৯৭০ সালের শতকরা ২০ ভাগের স্থানে ১৯৯২ সালে শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, এক্ষেত্রে জাপানের বাণিজ্য এশিয়া এলাকায় উল্লিখিত সময়ে শতকরা ২৩ ভাগ থেকে শতকরা ১৩ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯২ সালে চীনাদের দ্বারা অন্যান্য এলাকায় রপ্তানির পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপীয় কমিউনিটির তুলনায় ছাড়িয়ে যায়।[১৩]

ভিন্নধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে জাপান পূর্বএশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত, ওই একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সঙ্গে জাপানের সৃষ্ট অর্থনৈতিক পার্থক্য দূরীকরণও সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। অন্যদিকে, জাপানের ইচ্ছা থাকলেও অন্যান্য পূর্বএশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে তারা বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ শক্তিশালী করতে পারছে না। এর কারণ সম্ভবত সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। চীন ও অন্যান্য পূর্বএশীয় দেশসমূহের সঙ্গে জাপানের সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন অথবা নাফটা'র (NAFTA)-এর মতো পূর্বএশিয়ায় জাপানের নেতৃত্বে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগঠন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে জাপানের সাংস্কৃতিক পার্থক্য পশ্চিম, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে জাপানের ভুল-বোঝাবুঝি এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যদি অর্থনৈতিক সংহতি কার্যতই সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে বলা যায়, জাপানের সাংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য তাকে সাংস্কৃতিকভাবে একটি বিচ্ছিন্ন ও 'একাকিত্বের' নিগড়ে নিক্ষেপ করেছে এবং তারই সূত্র ধরে আরও বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবেও জাপান ভবিষ্যতে অন্যান্য সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও একাকিত্ব এবং একঘরে হয়ে পড়তে পারে।

অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরন অনেকাংশেই আন্তর্জাতিক জোটনির্ভর। আর যে-বিশ্ব এখন আবির্ভূত হচ্ছে, সে-বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিনদিন সংস্কৃতিনির্ভর হয়ে পড়ছে। সংস্কৃতির ধরন মূলত বাণিজ্যের ধরন ও প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। ব্যাবসায়ীগণ সেই আদলে মানুষের

সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করবে, যাদের তারা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারবে। রাষ্ট্রসমূহ তাদের সার্বভৌমত্ব নিজ নিজ পছন্দের ও সমমনা সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য সম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, জোট বা গোষ্ঠীর ওপর অর্পণ করবে যাদের তারা সাংস্কৃতিকভাবে নিকটের এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস ও আস্থায় রাখতে পারবে। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতার শেকড় সাংস্কৃতিক সাযুজ্যবোধের গভীরে গেঁথে রয়েছে।

সভ্যতার অপরিহার্য অংশসমূহ/কাঠামো

শীতলযুদ্ধকালীন দুটি বৃত্তের শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ, 'গোষ্ঠী ও জোটভুক্ত', 'উপগ্রহসম', 'ক্লায়েন্ট', 'নিরপেক্ষ' এবং 'জোটনিরপেক্ষ' অবস্থানে ছিল। শীতলযুদ্ধাবসানের মতো বিশ্বে ওই ধারার পরিবর্তন এসেছে এবং এখন তা সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার্য হচ্ছে, যেখানে বলা হয়ে থাকে, 'সদস্য রাষ্ট্রসমূহ', 'কোররাষ্ট্র', 'একাকিত্ব রাষ্ট্র', 'চিড় বা ফাটলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র' এবং 'ছেঁড়া বা বিক্ষত রাষ্ট্র' ইত্যাদি। উপজাতি এবং জাতির ন্যায় সভ্যতারও রাজনৈতিক কাঠামো রয়েছে। 'সদস্যরাষ্ট্র' বলতে তেমন রাষ্ট্রকে বুঝায়, যে রাষ্ট্র সাংস্কৃতিকভাবে একটি সভ্যতার ধারক ও বাহক বা অংশীদার। যেমন মিশর, আরবীয় মুসলমান সভ্যতার একটি অংশ। ইটালি হল ইউরোপীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সদস্যভুক্ত। একটি সভ্যতা সেইসব মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, যার অন্তরস্থ সব মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বা মিল রয়েছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, তারা ভিন্ন সভ্যতার মানুষদের দ্বারা শাসিত বা অধীনস্থ রাষ্ট্রের সদস্য হয়ে রয়েছে।

একটি সভ্যতা সাধারণত এক বা একাধিক স্থানে অবস্থান করতে পারে, যেখানে তার সদস্যগণ একইরূপ সংস্কৃতির ধারা বহন করে থাকে। তবে উৎস থাকে মাত্র একটি স্থানের মধ্যে সীমিত। এই উৎস-সম্বলিত রাষ্ট্রকেই 'কোররাষ্ট্র' বা 'সভ্যতার উৎস রাষ্ট্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাই স্বভাবতই 'কোররাষ্ট্র' শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় অবস্থানে অবস্থানকারী দেশ বিশেষ।

সদস্যরাষ্ট্র এবং 'কোররাষ্ট্রের' ভূমিকা সভ্যতা ও সময়ভেদে ভিন্নরূপ হয়ে থাকতে পারে। জাপানি সভ্যতাকে দৃশ্যত একটি একক 'কোররাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সিনিক, অর্থোডক্স এবং হিন্দুসভ্যতার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে এক-একটি প্রভাবশালী 'কোররাষ্ট্র' বলে বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য সব হল সদস্যরাষ্ট্রে, যা অন্য সভ্যতা দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র (যেমন সমূদ্রপারের চীন, নিকটের বিদেশ হিসেবে বিবেচিত রাশিয়া), শ্রীলঙ্কার তামিলগণ ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকভাবে পশ্চিমাবিশ্বে সঙ্গত কারণেই একাধিক 'কোররাষ্ট্র' ছিল; তবে বর্তমানে সেখানে মাত্র দুটি 'কোররাষ্ট্র' রয়েছে, যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে ফ্রাঙ্কো-জার্মান 'কোররাষ্ট্র' ব্রিটেনসহ অন্যান্য আশপাশের রাষ্ট্রগুলো ওই দুটি কোরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। ইসলাম, লাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায় কোনো 'কোররাষ্ট্র' নেই। এর কারণ হল, দেশগুলো বহুদিন ধরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে 'সৃষ্টি' হয়েছে পারস্পরিক বিভেদ।

একটি ইসলামি 'কোররাষ্ট্র' না-থাকার দরুন মুসলমান এবং অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের জন্যই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (বিষয়টি অধ্যায়-৭-এ আলোচিত হবে)। লাটিন আমেরিকার জন্য স্পেনীয় ভাষাভাষিসমৃদ্ধ দেশগুলোর জন্য স্পেন একটি 'কোররাষ্ট্র' হতে পারত, স্পেন যদি ইউরোপে নিজেকে সে-পর্যায়ে নিতে পারত। ভৌগোলিক পরিসীমা, সম্পদ, জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি, অর্থনীতি, দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনায় ব্রাজিল লাতিন আমেরিকায় 'কোররাষ্ট্র' হবে বলে ধারণা করা যায়। লাটিন আমেরিকার জন্য ব্রাজিলের অবস্থান তেমন, যেমন ইসলামের প্রশ্নে ইরানের অবস্থান। অন্য যে-কোনোভাবে 'কোররাষ্ট্রের' মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপসভ্যতার পার্থক্য থাকার কারণে (ইরানের ক্ষেত্রে ধর্ম আর ব্রাজিলের ক্ষেত্রে ভাষা) তারা উভয়ে কোররাষ্ট্রের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র, যেমন ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা এবং আর্জেন্টিনা প্রমুখ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার দ্বার প্রশস্ত করছে। তবে, লাটিন আমেরিকার বিষয়টি জটিল হয়েছে এ কারণে যে, মেক্সিকো উত্তরআমেরিকার পরিচয় ধারণ করতে চায়, আর চিলি এবং আরও কিছু দেশ তাকে অনুসরণ করতে আগ্রহী। এমতাবস্থায়, লাটিন আমেরিকায় একক সভ্যতার ধারণা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

সাহারা–আফ্রিকার যে-কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে 'কোররাষ্ট্রে' উপনীত হয়ে আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেয়ার বিষয়টি সীমাবদ্ধতার জালে আটকে গিয়েছে মূলত একটি কারণে, তা হল, ফরাসিভাষাভাষি ও ইংরেজিভাষাভাষি আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ। কিছু সময়ের জন্য আইভরি কোস্ট 'কোররাষ্ট্রের' মর্যাদা পেয়েছিল। তবে তা কেবলমাত্র ফরাসিভাষাভাষি আফ্রিকার মধ্যে সীমিত ছিল। যাহোক, আফ্রিকার ফরাসিভাষাভাষি 'কোররাষ্ট্র' স্বাধীনতা-উত্তরকালেও ফরাসিদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আফ্রিকায় মূলত দুটি রাষ্ট্র 'কোররাষ্ট্র' হওয়ার সকলপ্রকার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু তারা দুটিই ইংরেজিভাষাভাষি আফ্রিকার দেশ। ভৌগোলিক সীমানা, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র, অবস্থান, ইত্যাদি নাইজেরিয়াকে একটি শক্তিশালী 'কোর'রাষ্ট্রের মর্যাদায় নিয়ে যেতে পারলেও আন্তঃসভ্যতাসংক্রান্ত অনৈক্য, ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার সংকট, অর্থনৈতিক সমস্যা ও টানাপড়েন নাইজেরিয়াকে উক্ত পদের ভূমিকা পালন করতে দিচ্ছে না; যদিও মাঝেমধ্যে দেশটি তদ্রূপ কিছু কাজকর্ম করে থাকে। দক্ষিণআফ্রিকায় শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্ণবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি, শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও এর শক্তি, আফ্রিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চ অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক শক্তি ও সামর্থ এবং সেখানকার খুবই উপযুক্ত সাদা এবং কালো নেতৃত্ব তাকে পরিষ্কারভাবে আফ্রিকার নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ-অংশের আফ্রিকা ও ইংরেজভাষাভাষি আফ্রিকার অংশের জন্য তা প্রযোজ্য হতে পারে।

একটি 'একাকিত্বসুলভ' দেশ সাংস্কৃতিকভাবে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে মিল খুঁজে পায় না। উদাহরণ হিসেবে ইথিওপিয়ার নাম উল্লেখ করা যায়। এদেশটি সাংস্কৃতিকভাবে পৃথক, তাদের ভাষা এমহারিক ইথিওপীয় অক্ষরে লিখিত; এর প্রধান ধর্ম হল কোপটিক অর্থোডক্স; এর শাসনের ইতিহাস এর ধর্মীয় পার্থক্যসূচক দিক যা প্রায় মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশ। অন্যদিকে, হেইতির এলিটবৃন্দ ঐতিহ্যগতভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হেইতির ক্রেওলি ভাষা, ভোডো ধর্ম, বৈপ্লবিক উৎসসমূহের দাসত্বের চরিত্র এবং নৃশংস ইতিহাস ঐতিহাসিকভাবে এদের একাকিত্ব চরিত্রের রাষ্ট্রে পরিণত করে রেখেছে। সিডনি মিনতাজ বলেছেন যে, 'প্রত্যেক জাতির চরিত্রই স্বতন্ত্র, কিন্তু হেইতি তার ভেতরেও একাই একটি শ্রেণী।' ফলে ১৯৯৪ সালে হেইতির দুর্দিনে লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো হেইতির সমস্যাকে লাতিন আমেরিকার সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেনি। এ-কারণে তারা হেইতির উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে চায়নি, যদিও তারা কিউবার উদ্বাস্তুদের গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়নি। লাটিন আমেরিকার পানামার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বলেন, 'হেইতিকে আমরা লাটিন আমেরিকার দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিই না। হেইতীয়রা ভিন্নভাষায় কথা বলে থাকে। তাদের নৃগোষ্ঠীর উৎসও ভিন্ন, তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন। সকল বিচারে তারা সর্বতোভাবে ভিন্নতর।' হেইতি একইভাবে ক্যারিবীয় এলাকায় ইংরেজিভাষাভাষিদের থেকেও পৃথক। হেইতীয়দের সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেন যে, 'তারা গ্রানাডা বা জ্যামাইকার মতো আগন্তুক, 'যেমনটি আইয়া অথবা মন্তানার মানুষের ক্ষেত্রে মনে করা হয়ে থাকে।' হেইতিকে প্রতিবেশী হিসেবে কেউই কামনা করে না। সুতরাং এটি একটি আত্মীয়-পরিজন পরিত্যাজ্য দেশ।

জাপান হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'একাকিত্ব'সম্পন্ন দেশ। কোনো দেশের সঙ্গেই জাপানের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মিল নেই। জাপানের অভিবাসীগণ অন্যদেশে সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিংবা তারা অভিবাসিত দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেও পারে না। জাপানের 'একাকিত্বের' আরও একটি বড় কারণ হল জাপানের সংস্কৃতি খুবই বিশেষায়িত এবং জাপান সর্বজনীন কোনো ধর্ম (যেমন খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম) অথবা মতাদর্শের (উদারতাবাদ, সাম্যবাদ) দ্বারা তেমন প্রভাবিত হয়নি।

প্রায় সকল রাষ্ট্রই কিন্তু বহুধাবিভক্ত সংস্কৃতির প্রতিভূ। প্রায় সকল দেশেই দুই বা ততোধিক নৃগোষ্ঠী, বর্ণ এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবস্থান থাকে। অনেক দেশেই অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত ভিন্নতা ওইসব দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এবং সংহতির সংকট হয়ে ওঠে প্রধান। তবে সময়ের আবর্তে এসব ভিন্নতার নিরিখে সংঘাতের আকার-প্রকারও বদলায়। গভীর ধরনের বিভেদ একটি দেশের মধ্যে গুরুতর সহিংসতা ডেকে আনতে পারে। এমনকি দেশটির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে। যদি ভৌগোলিকভাবে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে এরূপ সংঘাতের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। যদি সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান একত্রিত না হয়, তবে সেখানে হয় গণহত্যা কিংবা জোরপূর্বক অভিবাসন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিকভাবে ফাটলযুক্ত দেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও গভীর বিভেদ আসতে

পারে। কেননা সেক্ষেত্রে একটি দেশের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা বিরাজ করে থাকে। এসব অবস্থায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন, যখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ভিন্নসভ্যতার হওয়ায় তারা দেশটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নিজেদের দৃষ্টিতে পরিচালিত করতে চায়। ফলে, অন্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার মানুষজন বঞ্চনার শিকার হলে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষা, ধর্ম, প্রতীকসমূহ হুমকির মধ্যে পড়ে যায়; যেমন হিন্দু, সিংহলী এবং মুসলমান এ-ধরনের কার্যকলাপ ভারত, শ্রীলংকা এবং মালয়েশিয়ায় করছে।

ফাটলযুক্ত দেশ, যার ভূখণ্ড বিভিন্ন সভ্যতার ফাটলরেখাকে উতরিয়ে যেতে চায় তারা ঐক্য বজায় রাখতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। সুদানের গৃহযুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে উত্তরের মুসলমান এবং দক্ষিণের খ্রিস্টানদের মধ্যে চলছে। একইভাবে এবং প্রায় একই সময় ধরে একই সভ্যতার অন্তর্গত সংঘাত নাইজেরিয়ায় ঘটে চলেছে। এটি যুদ্ধ ও অভ্যুত্থানপ্রবণ জাতিগত দাঙ্গা এবং সেইসঙ্গে অন্য সকলপ্রকারের সহিংসতা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে। তানজানিয়াতেও এমন সমস্যা অহরহ পরিদৃষ্ট হচ্ছে।[১৬] কেনিয়াতে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিভেদ সংঘাতময় হয়ে রয়েছে। আফ্রিকার একদিকের চাকুর ফলায় ইথিওপিয়ার খ্রিস্টান এবং ব্যাপক সংখ্যক ইরিত্রীয় মুসলমানগণদের মধ্যে সংঘাতের পরিণতিতে ১৯৯৩ সালে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভারতেও সভ্যতা-সংক্রান্ত ফাটলরেখা সক্রিয় রয়েছে যা হিন্দু ও মুসলমান বিরোধ হিসেবে স্পষ্ট। শ্রীলংকায় সিংহলী বৌদ্ধ এবং তামিল হিন্দুদের মধ্যে সংঘাত সজীব রয়েছে। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে চীনা ও মালয়া মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত অহরহ দেখা যায়, চীনে 'হান', চীনা তিব্বতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়, চীনে বসবাসরত তুর্কীয় বংশউদ্ভূত মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। ফিলিপাইনে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে রূপ নিয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছে মুসলমান এবং তিমুরের খ্রিস্টানদের মধ্যে সংঘাত।

সভ্যতার ফাটলরেখা বিভেদিত ফলাফল শীতলযুদ্ধাবস্থায় মার্কসীয় লেনিনীয় মতাদর্শের নিরিখে বৈধকৃত কর্তৃত্ববাদী কম্যুনিস্ট শাসনের ফলে সৃষ্ট চিড় থেকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। কম্যুনিজমের পতনের ফলে সংস্কৃতি মতাদর্শের স্থলাভিষিক্ত হয়। এর ফলে বিশেষ করে যুগোস্লাভিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সভ্যতার ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রাক্তন সোভিয়েটের বাল্টিক (প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক), অর্থোডক্স, এবং মুসলমান-অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্রসমূহে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্যাথলিক স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া, অংশত মুসলমান-অধ্যুষিত বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং অর্থোডক্স সার্বিয়া-মান্টিনিগ্রো এবং মেসিডোনিয়া প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার উল্লিখিত এলাকাসমূহ সভ্যতার ধারায় নিজস্ব গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা সার্বিয়া যুদ্ধের ফলে মুসলমান এবং ক্রোয়েশীয় অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। ক্রোয়েশিয়ায় সার্বিয় ও ক্রোয়াটরা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধরত হয়ে পড়ে। স্লাভিক অর্থোডক্স সার্বিয়ায় এবং আলবেনিয়ার মুসলমানগণ কসোভোতে কতটুকু

টিকে থাকবে তা একটি অনিশ্চিত বিষয়। আর্থোডক্স সার্বিয়ার টিকে থাকাটা খুবই অনিশ্চিত। তথায় আলবেনীয় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং শ্লাভিক অর্থোডক্স মেসিডোনীয়দের মধ্যে উত্তেজনা লেগে রয়েছে। প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অনেক অংশই ফাটলরেখাজনিত বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে। কারণ, তৎকালীন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কর্তৃত্বমূলকভাবে সীমানা চিহ্নিত করেছিল, ফলে প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রুশ ক্রিমিয়ার ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, আর্মেনীয় নাগারনো-কারাবাগ সংঘাত রয়েছে আজারবাইজানের সঙ্গে। রাশিয়ায় বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র হলেও মুসলমান জনগোষ্ঠী (সংখ্যালঘিষ্ঠ) ছিল, যাদের বেশিরভাগেরই অবস্থান ছিল উত্তর ককেশীয় এবং ভল্‌গা অঞ্চলে। ইস্টোনিয়া, লাটভিয়া, কাজাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণে সংখ্যালগিষ্ঠ রুশ বসবাস করত। ইউক্রেন আবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—জাতীয় ভাষাভাষি ইউক্রেন-পশ্চিমাঞ্চল, যারা ইউক্রেনীয় ভাষায় কথা বলত, আবার পূর্বাঞ্চলে থাকত অর্থোডক্স রুশ-ভাষাভাষি ইউক্রেনীয়।

সভ্যতার ফাটলরেখা সম্বলিত রাষ্ট্রের প্রভাবশালী দুটি বা ততোধিক গোষ্ঠী রয়েছে। 'আমরা ভিন্ন ভিন্ন মানুষ এবং ভিন্ন অবস্থান থেকে এসেছি।' একটি ছিন্নরাষ্ট্র একটি একক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তবে তার নেতৃত্বে থাকা এলিটগণ অন্য সভ্যতার প্রতি অনুরক্ত থাকেন এবং দেশকে সে-পথে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তারা বলেন, 'আমরা এক জাতীয় মানুষ, একই স্থানে থাকছি, কিন্তু আমরা সেই স্থান বদলাতে ইচ্ছুক।' সভ্যতার ফাটলসংশ্লিষ্ট দেশের মতো না হয়ে ছিন্নরাষ্ট্রের জনগণ সাধারণত একমত হন। কিন্তু ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হন যে, তাদের জন্য কী-ধরনের সভ্যতা মানানসই। গতানুগতিকভাবে দেখা যায় যে, তাদের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ কেমালপন্থী কৌশল গ্রহণে উদ্‌গ্রীব থাকেন এবং সিদ্ধান্ত দেন যে, তাদের দেশ অপাশ্চাত্য সভ্যতার পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্যমুখী হয়ে উঠুক, পাশ্চাত্যের ধাঁচে প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠুক এবং আধুনিকীকরণসহ পাশ্চাত্যকরণ সম্পন্ন হোক। পিটার দি গ্রেট-এর সময়ে রাশিয়া ছিল একটি ছিন্নরাষ্ট্র। এসময় তারা পাশ্চাত্যকরণ প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেননা প্রশ্ন দেখা দেয়, তারা কি পাশ্চাত্যমুখী হবে নাকি ইউরেশিয়ান অর্থোডক্স হিসেবে ভিন্নতা বজায় রেখেই সামনে এগুবে। মোস্তফা কেমালের দেশ তুরস্ক অবশ্যই ছিল একটি ধ্রুপদী ধরনের ছিন্নরাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রটি ১৯২০ সাল থেকে আধুনিকাভিমুখী হয়েছিল। হয়েছিল পশ্চিমামুখীও এবং বলাবাহুল্য, তা পাশ্চাত্যের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

প্রায় দুইদশক কাল অবধি মেক্সিকো লাটিন আমেরিকার দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অস্বীকার করে এসেছিল। কিন্তু এর নেতৃত্ব ১৯৮০-এর দশকে তাদের রাষ্ট্রকে একটি ছিন্নরাষ্ট্রে পরিণত করে, যখন তারা নিজেদেরকে উত্তরআমেরিকার অন্তর্গত ভাবতে শুরু করে। বিপরীতভাবে দেখা যায়, ১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়া তাদের দেশকে পশ্চিমা সভ্যতার অংশ হিসেবে বিবেচনা না করে এশীয় হিসেবে দেখতে শুরু করে। এর ফলে এদেশটিকে তারা একটি ছিন্নদেশ হিসেবে ফিরিয়ে নেয়। ছিন্নরাষ্ট্রকে

মোটামুটি দুভাবে চিহ্নিত করা যায় : তাদের নেতারা নিজেদেরকে দুটি সভ্যতার 'মিলন সেতু' হিসেবে গণ্য করে থাকেন। রাশিয়া পশ্চিম এবং পূর্বপানে তাকিয়ে থাকে। তুরস্ক পূর্ব, পশ্চিমের মধ্যে যেটি উত্তম তাকেই চায়। অস্ট্রেলিয়া জাতীয়তাবাদী ধারায় বিভক্ত আনুগত্যের নিগড়ে আবদ্ধ ...।[১৭]

ছিন্নরাষ্ট্রসমূহ : সভ্যতা স্থানান্তকরণের ব্যর্থতা

একটি ছিন্নরাষ্ট্রকে কৃতকার্যতার সঙ্গে তার সভ্যতা-সংক্রান্ত পরিচয় পুনঃনির্ধারণের জন্য কমপক্ষে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এলিটগণের সমর্থন লাগবে। দ্বিতীয়ত, জনগণের দ্বারা সভ্যতার ও পরিচয় পুনঃনির্ধারণ কার্যক্রম সমর্থিত হতে হবে। তৃতীয়ত, প্রভাববিস্তারকারী সভ্যতাকে (সাধারণত পাশ্চাত্য বিশ্বে) অবশ্যই পরিচয় পুনঃনির্ধারণে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। পরিচয় পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে বেদনাদায়ক ও শ্রমসাধ্য। তারপরও এর ব্যর্থতাই সত্য হয়ে ওঠে।

রাশিয়া

১৯৯০-এর দশকে মেক্সিকো বহু বৎসর যাবৎ ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে ছিল, আর তুরস্ক ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে ছিল কয়েক দশক। বিপরীতভাবে রাশিয়া একটি ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে ছিল কয়েক শতাব্দী। রাশিয়ার আরও একটি পার্থক্য রয়েছে মেক্সিকো ও তুরস্কের সঙ্গে, আর তা হল, রাশিয়া প্রধান সভ্যতাসমূহের জন্য একটি 'কোররাষ্ট্র' হিসেবে কাজ করছে। যদি মেক্সিকো ও তুরস্ক সফলতার সঙ্গে নিজেদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতাভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় পুনঃনির্ধারণ করতে পারে, তাহলে ইসলাম অথবা লাটিন আমেরিকার সভ্যতা গুরুত্বহীন বা নরমপন্থী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, রাশিয়া যদি পাশ্চাত্যদেশের মতো হয়ে যায়, তবে তার অর্থোডক্স ধর্ম বিলীন হয়ে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পর রুশদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয় এ নিয়ে যে, তারা কি রুশ হয়ে থাকবে, নাকি পাশ্চাত্য পরিচয়ে পরিচিত হবে?

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক চারটি স্তরে কার্যকর থাকতে দেখা যায়। প্রথম পর্যায় ১৬৮৯-১৭২৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ, এটি পিটার দি গ্রেট-এর পদত্যাগ পর্যন্ত বিস্তিৃত। কাইভানরাশ পৃথকভাবে থাকতে চেয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খুবই ক্ষীণ। বাইজানটাইন সভ্যতার একটি উপসৃষ্টি হিসেবে রুশীয় সভ্যতার উন্নয়ন ঘটতে থাকে। তারপর প্রায় ২০০ বৎসর, অর্থাৎ ১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত রাশিয়া মঙ্গলদের অধীনে চলে যায়। তাই রাশিয়ার ঐতিহ্য মোটেও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। রোমান ক্যাথলিকত্ব, সামন্তবাদ, রেনেসাঁ, ধর্মীয় পুনঃজাগরণ, সুদূর বিদেশে কলোনি বিস্তার, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষর যুগ, এবং জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব—এর কোনোকিছুই রাশিয়াকে তেমন আন্দোলিত করেনি। পূর্বনির্ধারিত পাশ্চাত্যসভ্যতার ৭ অথবা ৮টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য,

যেমন—ধর্ম, ভাষাসমূহ, ধর্ম থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ, আইনের শাসন, সামাজিক বহুত্ববাদিতা, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি রুশদের নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটিমাত্র বিষয় সেখানে ছিল, আর তা হল, ধ্রুপদী 'লিগাসি' যা বাইজানটাইনের মাধ্যমে রুশদের নিকট পৌঁছেছিল। রোম থেকে পাশ্চাত্যে যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে এসেছিল রাশিয়ায় তা সেভাবে আসেনি। তাই এর খাঁটিত্ব নিয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। রাশিয়ার সভ্যতার শেকড় তার নিজস্ব ঐতিহ্য তথা কাইভান-রাশ এবং মস্কোভির মধ্যে গ্রথিত রয়েছে। সেসঙ্গে মিশেছে বাইজানটাইন ধারা এবং দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গোলীয় শাসনের ফলাফল। এ-ধরনের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া তেমন ছিল না।

সতেরো শতকের শেষের দিকে রাশিয়া কেবলমাত্র পাশ্চাত্য থেকে পৃথকই ছিল না বরং তা ইউরোপের তুলনায় ছিল পশ্চাৎপদ। ১৬৯৭-১৬৯৮ সালে ইউরোপ ভ্রমণের সময় পিটার দি গ্রেট বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর দেশ হিসেবে রাশিয়াকে আধুনিক ও পাশ্চাত্যমুখী করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর দেশের মানুষকে যাতে করে ইউরোপীয়দের মতো দেখায় সেজন্য পিটার মস্কোতে ফিরে এসেই তাঁর পারিষদবর্গ ও অভিজাতদের দাড়ি কামিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে তাদের লম্বা গাউন পরা ও লম্বা টুপি পরা নিষিদ্ধ করেন। যদিও পিটার 'সাইরিলিক অক্ষর' বাতিল করেননি তবুও রুশভাষায় পাশ্চাত্য শব্দাবলি ও প্রবচন সংযোজন করেন। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য মনোযোগ দেন। তিনি নৌবাহিনী সৃষ্টি করেন। সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করার বিধান জারি করেন। সামরিক শিল্প স্থাপন করা হয়। প্রযুক্তিশিক্ষা প্রসারের জন্য টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি তাঁর দেশের শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করেন। পাশ্চাত্যদেশ থেকে তিনি সর্বাধুনিক সামরিক ও প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুস্তকাদি আমদানির ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাহাজনির্মাণ, নোঙরবিদ্যা, আমলাতন্ত্র ও জনপ্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীর জন্য প্রয়োজন আছে এমন জ্ঞানভাণ্ডার। তিনি উদ্ভাবনীশক্তিকে উৎসাহিত করতে থাকেন। কর ও সরকারব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনেন। তিনি রাশিয়াকে ইউরোপের একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এজন্য মস্কোকেন্দ্রিক চিন্তা ও কর্ম বর্জন করেন। তাই মস্কো থেকে রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে স্থানান্তর করেন। তিনি সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এটি প্রমাণ করার জন্য যে, বাল্টিক এলাকায় রাশিয়াই শ্রেষ্ঠ এবং তার শক্তিই প্রধান এবং এভাবে ইউরোপে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করতে তিনি প্রয়াসী হন।

পিটার তাঁর দেশ রাশিয়াকে আধুনিক ও পাশ্চাত্যমুখী করতে রাশিয়ার এশীয় চরিত্রের ওপর হস্তক্ষেপ করেন। তিনি রাশিয়ার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে সংস্কার আনতে চেষ্টা করেন। রাশিয়ার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মানুষজন জ্ঞানের দিক থেকে কখনও শক্তিশালী ছিল না। পিটার তাঁদের ক্ষমতা আরও হ্রাস করেন। শুধু বংশমর্যাদা নয়, পদপ্রাপ্তির বেলায়ও তিনি জ্ঞান ও মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেন. তাই গতানুগতিক

ধারার জন্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে পদপ্রাপ্তির প্রচলনে ছেদ পড়ল। রাশিয়ার কৃষকদের ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হল।

অর্থোডক্স চার্চকে তিনি রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার জন্য কিছু কাঠামোগত সংস্কার করেন। পিটারের অনুসৃত পথ পরবর্তীতে রাশিয়াকে আধুনিক ও পাশ্চাত্য ধাঁচের করতে অর্থাৎ 'পেট্রোন মডেল' পরবর্তীতে লেনিন, স্টালিন এবং অল্প করে হলেও ক্যাথরিন এবং আলেকজান্ডার-২ অনুসরণ করতে চেয়েছেন। এর ফলে রাশিয়া মূলত পাশ্চাত্যকরণকৃত রাশিয়া এবং শক্তিশালী স্বৈরশাসনসম্পন্ন রাশিয়ায় পরিণত হতে থাকে।

১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত দেখা যায়, যারা রাশিয়ায় গণতন্ত্র চেয়েছেন তারা এর পাশ্চাত্যকরণও চেয়েছেন। অন্যদিকে যারা পাশ্চাত্যকরণ চেয়েছেন তারা গণতন্ত্র তেমন চাননি। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সেখানে শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পূর্বশর্ত মনে করা হয়। ১৯৮০-এর দশকে গর্বাচেভের সহযোগীরা তাদের ব্যর্থতাকে 'গ্লাসনোস্ত'-এর দর্শনের দিক থেকে অর্থনৈতিক উদারতাবাদের মধ্যে দেখতে চান।

পিটার রাশিয়াকে ইউরোপের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চাইতে বরং ইউরোপকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে বেশি সফলকাম ছিলেন। অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো না হয়ে রুশ-সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপের একটি বৈধ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া ইউরোপীয় ভাবমূর্তির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। রাশিয়ার অভ্যন্তরে পিটার সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিছু সংস্কার হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও রাশিয়া একটি মিশ্রসমাজ হিসেবেই থেকে যায়, যা পুরোপুরিভাবে রুশ বা ইউরোপীয় কোনোটিই ছিল না। কেননা তারপরেও রাশিয়ার ক্ষুদ্র এলিট সম্প্রদায় এশীয় ও বাইজান্টাইন জীবনধারা ও প্রতিষ্ঠানাদি, বিশ্বাসমূহ ইত্যাদি হিসেবে থেকে গিয়েছিল।

ডি. মিইস্ট্রি বলেন, 'কেউ ভাবে তারা আঁচড় খাওয়া রুশ' 'এবং অন্যরা তাতার'। পিটার রাশিয়াকে একটি ছিন্নরাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্লাভোফিলস্ এবং পাশ্চাত্যপন্থীরা যুক্তভাবে শোকাতুর হয়ে পড়ে। কেননা তারা রাশিয়ার এ অবস্থাকে অসুখী মনে করতে থাকেন। তারা মনে করতে থাকেন, রাশিয়া এখন 'না ঘরকা না ঘাটকা'—অর্থাৎ পশ্চিমাবিশ্বের মতো নয়, আবার পুরোপুরি রুশও নয়। তাই তারা পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া দূর করে আবার 'রুশ আত্মার' ভেতরে ফিরে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন।

চাদায়েভের মতো পাশ্চাত্যপন্থীরা যুক্তি দেখান যে, 'সূর্য হল পশ্চিমের অধীন', এবং রাশিয়াকে অবশ্যই ওই সূর্যের আলো ব্যবহার করে তার কালিমাযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অভ্যাসাদি বদলাতে হবে। ডানিলেভস্‌কি-এর মতো স্লাভোফিল বলেন যে, রাশিয়ার ইউরোপীয়করণ আসলে 'বিকৃতকরণ এবং রাশিয়ার মানুষকে ও তাদের জীবনকে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার নামান্তর', 'বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ায় আমদানিপূর্বক তা রাশিয়ার মাটিতে রোপণ করার মনমানসিকতা মোটেও সুস্থ নয়... ।'[১১] রাশিয়ার পরবর্তী

ইতিহাসে দেখা যায় যে, পিটার পশ্চিমাপন্থীদের নায়কে পরিণত হন এবং বিরোধীদের নিকট 'শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত হন। ১৯২০ সালে কিছু উগ্রপন্থী পিটারকে 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বিপরীতে পশ্চিমাদের ঘৃণাকারী হিসেবে বলশেভিকদের প্রশংসা করতে থাকে। এমতাবস্থায় তারা ইউরোপের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং রাজধানী আবার মস্কোতে ফিরিয়ে আনেন।

বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়, যা ছিল দুই শতাব্দী ধরে বিরাজমান সম্পর্কের বিপরীত একটি ধারা। এই বিপ্লব একটি মতাদর্শের নামে এমন একটি রাজনীতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে যার তাত্ত্বিক ভিত্তির উৎস পশ্চিমাবিশ্ব হলেও পশ্চিমে ওই মতাদর্শের তেমন মূল্য ছিল না। স্লাভোফিলস্ এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের ভেতর বিতর্কের সূচনা হয় এ নিয়ে যে, রাশিয়া কি পাশ্চাত্যের তুলনায় পশ্চাৎপদ না হয়েও পশ্চিমাবিশ্ব থেকে ভিন্ন হয়ে থাকবে? কম্যুনিজম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এ বিতর্কের অবসান ঘটায়। এতে বলা হয়, রাশিয়া মৌলিক অর্থে পশ্চিমাজগৎকে অস্বীকার করে এজন্য যে, মনে করা হত, এই ব্যবস্থাটি পশ্চিমাবিশ্বের চলমান ব্যবস্থা থেকে অনেক অগ্রসর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটি সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সূচিত হয় এবং পরবর্তীতে বিশ্বের নানা স্থানে তা ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ায় যে শুধু এশীয়সুলভ পশ্চাৎপদতার পটভূমি ছিল তাই নয়; সেইসঙ্গে ছিল সামনে এগিয়ে যাবার অমিত সম্ভাবনা। কার্যত রাশিয়া পাশ্চাত্যকে ল্যাং মেরে এগিয়ে যেতে থাকে, 'পাশ্চাত্য আমাদের থেকে পৃথক, আমরাও তোমাদের মতো নই', (এ যুক্তিটি স্লোভোফিলসদের দেয়া) কেননা 'আমরা পৃথক এবং প্রত্যাশা করা যায়, তোমরাও ভবিষ্যতে আমাদের পথের পথিক হবে'। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের বাণীও কিন্তু প্রায় অনুরূপ।

একই সময়ে কম্যুনিজম সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বকে পাশ্চাত্য থেকে নিজেদের পৃথক ভাবতে সক্ষম করে দেয়। তবে একথাও সত্য, তারা পাশ্চাত্যের সঙ্গে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ-বন্ধনও তৈরি করে ফেলে। মার্কস এবং এঙ্গেলস ছিলেন জার্মান জাত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাদের অনুসারীদের মূল প্রধানবর্গের অধিকাংশেই ছিলেন পশ্চিম ইউরোপীয়। ১৯১০ সালের ভেতর অনেক শ্রমিক ইউনিয়ন এবং 'সোশ্যাল ডিমোক্রাটস্' এবং পশ্চিমা শ্রমিকদলসমূহ কম্যুনিজমের মতাদর্শ দ্বারা শাণিত হয়ে ওঠে এবং পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে তাদের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে ফেলে। বলশেভিক বিপ্লবের পর বামঘেঁষা দলগুলো 'কম্যুনিস্ট' এবং 'সোশ্যালিস্ট' এই দুধারায় বিভক্ত হয়ে পড়লেও তারা পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে উভয়েই ক্ষমতাধর হয়ে ওঠে। প্রায় সমগ্র পশ্চিমাবিশ্বব্যাপী মার্কসীয় মতবাদ বজায় থাকে। কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্রকে ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে এবং ব্যাপকভাবে তা যে-কোনোভাবে রাজনৈতিক এলিট ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। রাশিয়ার স্লোভোফিলস্ এবং পশ্চিমাপন্থীদের মধ্যে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্কের ন্যায় পশ্চিমাবিশ্বেও বাম ও ডান ধারার মধ্যে বিতর্ক তেতে ওঠে এবং এরকম আশঙ্কা করা হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভবিষ্যতের জন্য 'প্রতীক' হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন তার অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয় এবং কম্যুনিজমের আবেদন ইউরোপসহ অন্যত্র আরও বৃদ্ধি পায়। তবে অপাশ্চাত্য সমাজে এর ব্যাপ্তি ঘটে বেশি; যারা কি-না মনস্তাত্ত্বিকভাবে পশ্চিমাবিদ্বেষী। পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক প্রভাবিত অপাশ্চাত্য দেশের এলিটরা পশ্চিমাবিশ্বের গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে প্রলুব্ধ হয়; অন্যদিকে আবার বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নামতে চায়।

রাশিয়া পাশ্চাত্য মতাদর্শ প্রয়োগপূর্বক নিজেকে শক্তিশালী করে পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে যে কৌশল অবলম্বন করে তা ইতিহাসে পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অনেক নিকটবর্তী করে। যদিও উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং কম্যুনিস্ট মতাদর্শ আকাশ-পাতাল তফাৎ, তবুও উভয়পক্ষই প্রায় একই ভাষায় কথা বলে থাকে। আর বলাই বাহুল্য, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের মধ্যদিয়ে এহেন রাজনৈতিক-মতাদর্শিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটে।

পাশ্চাত্যবিশ্ব প্রত্যাশা ও বিশ্বাস করে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের ভেতর দিয়ে সমগ্র প্রাক্তন সোভিয়েট সাম্রাজ্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জয়গান ছড়িয়ে পড়বে। তবে তা পূর্ববিহিত ছিল না। কেননা দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে রাশিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অর্থোডক্স প্রজাতন্ত্রসমূহে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু দেখা দেয় আর এক সংকট, তা হল, সোভিয়েট ব্যবস্থার পতনের পর রুশরা আর মার্কসবাদের দিকে ফিরে তাকাল না সত্য, কিন্তু তারা রুশঐতিহ্য অনুযায়ী কাজকর্ম করতে থাকায় পাশ্চাত্যবিশ্বের সঙ্গে তাদের তফাৎ আরও বাড়তে থাকে। মার্কস ও লেনিনবাদের সঙ্গে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব ও পার্থক্য থাকলেও উভয় মতাদর্শই কিন্তু আধুনিক ও লোকায়ত এবং উভয়ই চূড়ান্তভাবে মানুষের স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং বস্তুগত উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। একজন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী সোভিয়েটের মার্কসবাদের সঙ্গে বিতর্কে ঝড় তুলতে পারেন, কিন্তু রাশিয়ার অর্থোডক্স জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার কোনো উচ্চবাচ্য করার নেই।

সোভিয়েত যুগে স্লোভাফিলস্ এবং পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব স্থগিত হয়ে যায় যখন সোলজেনিৎসিনস্ এবং শাখারভ উভয়ই কম্যুনিস্ট সংশ্লেষণকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। উক্ত সংশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে গড়া সমাজের পতনের পর রাশিয়ার পরিচয় সম্পর্কিত বিতর্ক চাঙা হয়ে ওঠে। রাশিয়া কি পাশ্চাত্য মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি প্রয়োগবাদিতা ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক পাশ্চাত্যের অংশ হবে? অথবা রাশিয়া কি তার নিজস্ব স্বতন্ত্র অর্থোডক্স এবং ইউরোপীয় সভ্যতা এগিয়ে নেবে যা কি-না সকল ক্ষেত্রেই পশ্চিমাবিশ্ব ও প্রাচ্য থেকে পৃথক? বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক এলিট এবং সাধারণ গণমানুষ এই বিশেষ ইস্যুতে গুরুতরভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

একদিকে পাশ্চাত্যপন্থীরা 'কসমোপলিটান' অথবা 'আটলান্টিসিস্ট' এবং অন্যদিকে স্লোভোফিলস্রের উত্তরাধিকারদের 'জাতীয়তাবাদ', 'ইউরোএশিয়ানিস্ট' অথবা 'derzhavniki' (রাষ্ট্রের শক্ত সমর্থক)।[২৩] উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর ভেতর মূল পার্থক্য ছিল মূলত বৈদেশিক নীতি, অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম ও রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত মতপার্থক্য এবং প্রায়শই তা ছিল বিপরীতমুখী। একপ্রান্তের গোষ্ঠী বলতেন, 'নব

চেতনা ও চিন্তার ফসল, যার গোড়ায় ছিলেন গর্বাচেভ, তাদের লক্ষ্য ছিল একটি 'সাধারণ' ইউরোপীয় আবাসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া', আর ইয়েলৎসিন-এর উচ্চতর পরামর্শকরা চাইতেন রাশিয়া একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রের পথে চলুক এবং ৮-সদস্য-বিশিষ্ট জি-৭-এর সদস্য হয়ে রাশিয়া অগ্রগামী, শিল্পসমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে একাত্ম হোক।

মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদের চিন্তা ছিল ভিন্ন। যেমন সেরগেই স্টেনকিভিচ (Sergei Stankevich) যুক্তি দেখান যে, রাশিয়ার উচিত হবে 'আটলান্টিসিস্টদেরকে বাদ দিয়ে রাশিয়ার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী' যেমন তুর্কি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলা এবং একটি গ্রহণযোগ্য বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে রাশিয়ার সম্পদাদি বিলি করা, বিভিন্ন বিকল্প খুঁজে দেখা, বিভিন্নপ্রকার সংযোগস্থাপনের ওপর জোর দেয়া, এশীয় স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং পূর্বদিকে নজর ফেরানো।'[২১] এ-ধরনের মতাবলম্বীরা ইয়েলৎসিনের কার্যকলাপের সমালোচনা করে যে, তিনি রাশিয়াকে পশ্চিমের অধঃস্তন করেছেন, তিনি রুশ সেনাবহিনী সংকুচিত করেছেন, তিনি রাশিয়ার পুরাতন মিত্র, যেমন সার্বিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সর্বোপরি তিনি এমন একধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন, যা রাশিয়ার জনগণকে ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-ধরনের চিন্তাচেতনা পিটার স্যাটেস্কিকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলে, যিনি ১৯২০-এর দশকে যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, 'রাশিয়ায় আছে একটি স্বতন্ত্র ইউরেশিয়ান সভ্যতা'।

রাশিয়ায় চরম জাতীয়তাবাদীরা কিছু কৌশলগত প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েন। রুশ জাতীয়তাবাদী সোলজেনিৎসিন (Solzhennitsyn) যুক্তি দেখান যে, রুশসহ অন্যান্য স্লাভিক অর্থোডক্স, বেলারুশীয়, ইউক্রেনীয় ব্যতীত অন্য কাউকে না নিয়ে রাশিয়া গঠন করতে হবে। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যপন্থী জাতীয়তাবাদী ভ্লাদিমির জিরিনভস্কি চান যে, রাশিয়া পুনরায় সোভিয়েট-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক এবং এর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হোক। এই গোষ্ঠীর সমর্থকেরা একদা ছিলেন সেমিটিক বিরোধী এবং সেইসঙ্গে ছিলেন, পাশ্চাত্যবিরোধী। আর তারা চাইতেন রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি হোক পূর্ব ও দক্ষিণ ঘেঁষা, যাতে মুসলমান-অধ্যুষিত দক্ষিণকে পদানত করা যায় (যেমন জিরিনভস্কি বলেছেন), কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারা যায়। চীনের সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কেননা চীনও পাশ্চাত্যবিরোধী শক্তি। এই গোষ্ঠী মুসলমানদের সঙ্গে সৃষ্ট যুদ্ধে সার্বীয়দের সমর্থন দিতে ইচ্ছা পোষণ করে। দেখা যাচ্ছে 'কসমোপোলিটান' এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয় ছিল দুটি : বৈদেশিক সম্পর্ক ও সামরিক বাহিনী।

রাশিয়ার সাধারণ মানুষও তথাকার এলিটদের মতো বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে একটি জনমত যাচাইয়ের নমুনায় দেখা যায়, ২০৬৯ জন ইউরোপীয় রুশদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ বলে যে, 'পশ্চিমকে আসতে দাও'। শতকরা ১৬ ভাগ জানায় যে, 'পশ্চিমের নিকটবর্তী হও'। শতকরা ২৪ ভাগ কোনোপ্রকার সিদ্ধান্ত দেয়নি। তারা ছিলেন সিদ্ধান্তহীন।

১৯৯৩ সালের সংসদীয় নির্বাচনে সংস্কারবাদি পার্টিগুলো পায় শতকরা ৩৪.২ ভাগ ভোট। সংস্কারবিরোধীরা লাভ করে শতকরা ১৩.৭ ভাগ ভোট।[২২] অনুরূপভাবে ১৯৯৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রুশরা পুনরায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, কমবেশি শতকরা ৪৩ ভাগ মানুষ পশ্চিমাসমর্থক প্রার্থীকে ভোট দেয়, এদের মধ্যে ইয়েলৎসিন এবং অন্যান্য সংস্কারবাদীরাও ছিল। শতকরা ৫২ ভাগ ভোট পায় জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিস্ট প্রার্থীরা। এতে ধরে নেয়া যায় যে, কেন্দ্রীয় সমস্যার বিচারে ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়া ছিল একটি 'ছিন্নরাষ্ট্র'।[২৩]

তুরস্ক

১৯২০-এর দশকে সুবিবেচিত সংস্কারমালা গ্রহণের পর ১৯৩০-এর দশকে মোস্তফা কেমাল আতাতুর্ক তুরস্কের জনগণকে তাদের অটোম্যান এবং ইসলামি অতীত থেকে সরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। 'কেমালিজমের' মূল স্তম্ভ (৬টি তীর) যথাক্রমে : বহুত্ববাদিতা, প্রজাতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সংস্কারবাদিতা। বহুজাতিক সাম্রাজ্যের ধারণাকে বাদ দিয়ে মোস্তাফা কেমাল সমজাতিক মানুষের সমন্বয়ে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রতি নজর দেন। এরই ধারাবাহিকতায় সেখানে আরমেনীয় ও গ্রিকদের বহিষ্কার ও হত্যা করা হয়েছিল। এরপর তিনি সুলতানকে পদচ্যুত করেন এবং বহুজাতিক ব্যবস্থার ক্ষমতাকেন্দ্রে পাশ্চাত্য ধরনের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। খিলাফত ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের কেন্দ্রীয় সংগঠন; মোস্তফা কেমাল খেলাফত বাতিল করেন। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা তিনি বাতিল করেন এবং সেইসঙ্গে ধর্মমন্ত্রণালয় বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। তিনি বিলুপ্ত করেন পৃথক ধর্মীয় স্কুলসমূহ এবং তার স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সকলের জন্য এগিয়ে নেন। তিনি বিচারালয় থেকে ধর্মীয় 'সেল' বাতিল করেন এবং তার বদলে নতুন পাশ্চাত্য ধারা 'সুইস সিভিল কোড' চালু করেন। গতানুগতিক পঞ্জিকা বাতিল করে তদস্থলে তিনি জর্জীয় পঞ্জিকা চালু করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তুরস্কের রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বাদ দেন। পিটার দি গ্রেটকে ছাড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে তিনি তুরস্কে বিশেষ টুপি ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, কেননা ওই টুপি ছিল ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। তার বদলে মানুষকে 'হ্যাট' মাথায় দিতে উৎসাহিত করেন। তিনি তুর্কিভাষার জন্য আরবি বর্ণমালা ব্যবহারের বদলে রোমান হরফ চালু করেন। এই ধরনের সাংস্কার অবশ্য মৌলিক ও সাহসী। তবে এতে করে নতুন প্রজন্মকে গতানুগতিক পুস্তকগুলো থেকে জ্ঞান আহরণ করতে বাধাগ্রস্ত করে তোলা হয়। এছাড়া বিপরীতভাবে এ পদক্ষেপের ফলে শিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং এর ফলে ভাষা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়।[২৪] জাতীয়, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তুর্কিদের পরিচয় পুনঃনির্ধারণ করতে বলা হয় এবং মোস্তফা কেমাল ১৯৩০-এর দশকে তুরস্কের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার ফলে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সেখানে হাতে হাত ধরে এগুতে থাকে।

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধে তুরস্ক নিজেকে নিরপেক্ষ অবস্থানে রেখেছিল। তবে যুদ্ধশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক নিজেকে পুনরায় পশ্চিমাবিশ্বের সাথে একাত্ম করে তোলে। পাশ্চাত্যধাঁচের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে একদলীয় শাসন থেকে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা চালু করা হয়। ন্যাটোর সদস্যপদ অর্জন করতে তুরস্ক ধর্না দিতে শুরু করে এবং ১৯৫২ সালে তা অর্জন করে, এভাবে মুক্তবিশ্বের সদস্যপদ নিশ্চিত করা হয়। তুরস্ক পাশ্চাত্যবিশ্ব থেকে বিলিয়ন ডলার অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা দিয়ে তুরস্ক অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো সুনিশ্চিত করে। তুরস্কের সামরিক বাহিনীকে পাশ্চাত্য সাজে সজ্জিত করা হয় এবং তারা পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। ন্যাটোর মাধ্যমে সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণের কাজ করা হয়। তুরস্কে আমেরিকার সেনাবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। তুরস্ককে ঘাঁটি করে পাশ্চাত্যজগৎ উত্তরদিক থেকে সম্ভাব্য ভূমধ্যসাগরের দিকে সোভিয়েট আগ্রাসন রোধ করা, মধ্যপ্রাচ্য বলয়াবদ্ধ করা এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বজায় রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়। এসব কারণে ১৯৫৫ সালে বেনভাগ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে পাশ্চাত্যের সঙ্গে দহরম মহরমের অভিযোগে তুরস্ককে অভিযুক্ত করা হয় এবং মুসলমান রাষ্ট্র কর্তৃক তুরস্ককে ব্লাসফেমির অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হয়।[২৫]

শীতলযুদ্ধাবসানোত্তর সময়ে তুরস্কের এলিটগণ সর্বতোভাবে তুরস্কের পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয়করণের পক্ষে সমর্থন জোগায়। তুরস্কের জন্য ন্যাটোর সদস্যপদ বহাল রাখা খুবই জরুরি। কারণ, এর ভেতর দিয়ে তুরস্ক পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এবং প্রতিবেশী গ্রিসের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব করে থাকে। তুরস্ক এখন আর উপরের (সোভিয়েট) সম্ভাব্য ভীতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য পাশ্চাত্যের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ দেশ নয়। তবুও যেহেতু উপসাগরীয় (গাল্ফ) যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু পশ্চিমাবিশ্বের জন্য তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা প্রকারান্তরে দক্ষিণদিকের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত থাকার শামিল। এইসব যুদ্ধে তুরস্ক সবসময়ই সাদ্দামবিরোধী জোটের সঙ্গে একাত্ম থাকে এবং বাস্তবেও সাদ্দামবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তুরস্ক তার ভূমি দিয়ে ইরাকের গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয়, যে পাইপলাইন দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দরে ইরাকি তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া তুরস্ক ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মার্কিন যুদ্ধবিমানকে তার আকাশ দিয়ে চলতে অনুমতি দেয় এবং ঘাঁটিও ব্যবহার করার অনুমতি তাদের রয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধে পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করার বিরুদ্ধে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ওজালের ওপর তুর্কিরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর এবং তাঁর বিদেশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া হয়। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল স্টাফ অফিসারের পদত্যাগ চাওয়া হয়। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নমনীয় মনোভাবের জন্য ওজালের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এসব কারণে তুর্কি প্রেসিডেন্ট ডেমিরেল এবং প্রধানমন্ত্রী সিলার ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহারের আবেদন জানায়. সে কারণে তুরস্কের অর্থনৈতিক ক্ষতি দৃশ্যমান ছিল।

দক্ষিণের আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সঙ্গে কাজ করা তুরস্কের জন্য ততটা নিশ্চিত ছিল না, যতটা নিশ্চিত ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের (উত্তরের) নিকট থেকে আসা ভয়ভীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার। গাল্ফযুদ্ধের সময়ও দেখা গিয়েছে তুরস্ক দক্ষিণের আক্রমণের ভয়ে ততটা কাহিল ছিল না। শীতলযুদ্ধকালীন তুরস্কের সভ্যতার পরিচয় নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন না-আসলেও শীতলযুদ্ধপরবর্তী সময়ে তুরস্কের সভ্যতার পরিচয় যেন আরববিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চাওয়া হয়।

১৯৮০-এর দশকের তুরস্কের পশ্চিমাপন্থী এলিটদের প্রাথমিক মূল লক্ষ্য ছিল বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তুরস্কের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করা। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে তুরস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য আবেদন জানায়। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তুরস্ককে জানানো হয় যে, তার আবেদনপত্রটি ১৯৯৩ সালের পূর্বে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে না। ১৯৯৪ সালে ইউনিয়ন অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ের সদস্যপদ অনুমোদন দেয় এবং প্রত্যাশা করা হয় যে, আগামী বৎসর পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেক প্রজাতন্ত্র এবং তারপর সম্ভবত স্লোভেনিয়া, স্লোভাকিয়া এবং বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের জন্য সদস্যপদ প্রদান করা হবে। তুরস্ক হতাশ হয়ে পড়ে। কেননা সেন্ট্রাল ইউরোপের দেশ এবং ইউনিয়নের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য জার্মানি তুরস্কের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সক্রিয় কোনো সমর্থন প্রদান করেনি।[২৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে তুরস্কের সঙ্গে শুল্ক ইউনিয়ন স্থাপন করলেও পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ তুরস্কের জন্য একটি স্বপ্ন এবং কিছুটা রহস্যজনকভাবেই থেকে যায়।

তুরস্ক ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়ার অভিপ্রায়ে সকল সময়ই কেন লাইনের শেষ প্রান্তে অপেক্ষমাণ? প্রকাশ্যে অবশ্য ইউনিয়নের কর্মকর্তারা জানান যে, তুরস্কের আয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের অনেক নিচে। তাছাড়া তুরস্কের মানবাধিকারের সূচকও সন্তোষজনক নয়। তবে অপ্রকাশিত কারণ হল এই যে, তুরস্কের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গ্রিসের উপর্যুপরি বাধাদান এবং আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, তুরস্ক একটি মুসলমান দেশ। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্কের ৬০ মিলিয়ন মুসলমানদের জন্য, যার অধিকাংশ বেকার, তাদের সীমানা উন্মোচন করে রাখতে ইচ্ছুক নয়। তাছাড়া ইউনিয়ন মনে করে, সাংস্কৃতিকভাবে তুর্কিরা ইউরোপীয় সংস্কৃতি ধারণ করে না, তাই তুর্কিরা ইউরোপীয় নয়। এমতাবস্থায় তুরস্ককে ইউনিয়নভুক্ত করা সমীচীন হবে না।

তুরস্কের মানবাধিকার সম্পর্কে ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট ওজাল বলেন, 'তুরস্কের মানবাধিকারের রেকর্ড ভালো নয় বলে সদস্যপদ প্রদানের অস্বীকৃতি একটি খোঁড়া যুক্তি আসল কারণ হল, আমরা মুসলমান আর তারা হল খ্রিস্টান। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরা বলতে চান না যে, ইউনিয়ন হল একটি খ্রিস্টানদের ক্লাব।' '... তুর্কিরা মনে করে যে, ইউরোপে মুসলমান-অধ্যুষিত তুরস্কের কোনোপ্রকার স্থান নেই।'[২৮]

মক্কার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং ব্রাসেলস কর্তৃক বঞ্চিত হয়ে তুরস্ক সোভিয়েটবিহীন বিশ্বে তাসখন্দের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। প্রেসিডেন্ট ওজাল ও অন্যান্য তুর্কিনেতারা বিদেশে তুর্কিসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যকে গুরুত্ব দেন এবং নিকট প্রতিবেশী হিসেবে আড্রিয়াটিক সাগর থেকে চীনের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত তুর্কি জাতগোষ্ঠীর সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি করতে চান। এজন্য আজারবাইজান, তুর্কিমেনিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরজিস্তানের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে তুরস্ক নতুন প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আদাজল খেয়ে নেমে পড়ে। এজন্য তুরস্ক সেখানে ১.৫ বিলিয়ন ডলার দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পসুদে অর্থ ধার দেয়। ৭৯ মিলিয়ন ডলার খয়রাতি সাহায্য দেয়। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের ব্যবস্থা করে দেয় (রুশ ভাষাভাষি চ্যানেলের বিপরীতে), টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। বিমান সেবার উন্নয়ন করা হয়। ওইসব দেশ থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তির মাধ্যমে তুরস্কে পড়ালেখার জন্য নিয়ে আসা হয়। ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, কূটনীতিক ও শত শত সামরিক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তুরস্ক থেকে বহু শিক্ষক প্রজাতন্ত্রগুলোতে তুর্কিভাষা শিক্ষা দেবার জন্য গমন করেন। এবং প্রায় ২০০০ হাজার যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে চাওয়া হয়। একজন তুর্কি ব্যবসায়ী যেমন বলেন, 'আজারবাইজান এবং তুর্কেমেনিস্তানের উন্নয়নের সঠিক উন্নয়ন সহযোগী পাওয়া গিয়েছে। তুর্কিদের জন্য এটি কোনো কষ্টের কাজ নয়। তুরস্কের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি অভিন্ন, প্রায় একই ধরনের ভাষা এবং আমরা একই হাঁড়ির খাবার খেয়ে থাকি।'[২৯]

ককেশীয় ও সেন্ট্রাল এশিয়ার তুর্কিঘেঁষা সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের সঙ্গে তুরস্কের এ সখ্য যে শুধুমাত্র এলাকার নেতৃত্ব হাতে তুলে নেবার অভিপ্রায়ে করা হয়েছে তা নয়, সেসঙ্গে ওই সকল মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকায় ইরান এবং সৌদিআরবের আধিপত্য বিস্তার ও তার সাথে মৌলবাদী মতাদর্শ সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলাও এর অন্যতম কারণ। তুর্কিরা তাদের মতাদর্শকে দেখতে চায় যেমন 'একটি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আর সেসঙ্গে বাজার-অর্থনীতির সমর্থক দেশ হিসেবে।' তদনুযায়ী তুরস্ক সেন্ট্রাল এশিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে চায়। রাশিয়া এবং ইসলাম, এ দুয়ের ভেতর একটি বিকল্প হিসেবে তুরস্ক নিজেকে বিবেচনা করে এবং বলাবাহুল্য, তারা সেজন্যও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়া জরুরি বলে মনে করে।

১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ওজালের মৃত্যু, সুলেমান ডেমিরেলের ক্ষমতারোহণ, তার্কি প্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য তুরস্কের অর্থবরাদ্দের সীমাবদ্ধতা এবং রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তুরস্কের 'নিকটতম বিদেশে' আধিপত্য বিস্তারের প্রারম্ভিক উদ্যোগ বেশকিছুটা ভাটা পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর তার্কি অর্থাৎ প্রাক্তন প্রজাতন্ত্রগুলোর নেতারা প্রথমেই আস্কারায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন, কিন্তু পরবর্তীতে রাশিয়ার চাপে রিপাবলিকসমূহ রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণ করতে থাকেন এবং

এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তারা তাদের সাংস্কৃতিক পরমাত্মীয় তুরস্ক এবং পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদের প্রভু রাশিয়ার মধ্যে একটি ভারসাম্য ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে। অবশ্য, তারপরও প্রজাতন্ত্রগুলো তাদের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নির্ধারণ করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে রিপাবলিকগুলোর তেলসম্পদ (বিশেষ করে আজারবাইজান) বিদেশে রপ্তানির নিমিত্তে তুরস্কের ভূমি ব্যবহারপূর্বক ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত তা বিস্তৃত করতে উদ্যোগী হয়।

তবে মুদ্রার অপরদিক হল, তুরস্ক যখন প্রাক্তন সোভিয়েটের মুসলমান রিপাবলিকগুলোতে যোগসূত্র স্থাপনে ব্যস্ত, তখন তার ধর্মনিরপেক্ষ কেমালপন্থী পরিচয় নিজভূমি তুরস্কের অভ্যন্তরেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। অন্যান্য দেশের মতো, শীতলযুদ্ধাবসানের পর তুরস্কে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অরাজকতার প্রধান ইস্যু হিসেবে 'জাতীয় পরিচয় ও নৃগোষ্ঠীক পরিচিতির প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ে।'[৩১] এমতাবস্থায় ধর্মের মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার বিষয়টি গ্রাহ্য হতে থাকে। কেমাল আতাতুর্ক কর্তৃক প্রণীত ও তুরস্কের এলিটদের দ্বারা সমর্থিত তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় গুরুতর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হয়। বিদেশে বসবাসরত তুর্কিরা ক্রমান্বয়ে ইসলামধর্মমুখী হয়ে পড়তে থাকে এবং তাদের নিজদেশে তা অবলোকন করতে তারা আগ্রহী হয়। 'অনেক তুর্কি জার্মানি থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং ইসলামের প্রতি জার্মানিদের ঘৃণার কথা প্রচার করতে থাকেন।' জনগোষ্ঠীর মূলধারার চিন্তাচেতনা ও আমল ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামকেন্দ্রিক হতে শুরু করে। ১৯৯৩ সালে দেখা যায়, তুরস্কের রাস্তায় ইসলামি কায়দায় দাড়ি এবং নেকাব-পরিহিতা রমণীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তাছাড়া মসজিদে নামাজের জন্য উপস্থিতিও পূর্বের তুলনায় বাড়তে থাকে। বইয়ের দোকানগুলো ইসলামি বইপুস্তক, অডিও-ভিডিও ক্যাসেটে পরিপূর্ণ হতে থাকে; বাড়তে থাকে ক্রেতার সংখ্যা। একটি জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ২৯০টি প্রকাশনা সংস্থা এবং মুদ্রণ সংগঠন ও প্রকাশক, ৪টি দৈনিক পত্রিকা ইসলাম নিয়ে বইমুদ্রণ ও প্রকাশনা করতে থাকে। অ-রেজিস্ট্রিকৃত ৩০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও এবং টেলিভিশনকেন্দ্র অনবরত ইসলাম সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে।'[৩২]

প্রথমত, তুরস্কে ধর্মীয় চেতনা ও মনোভাবের আশঙ্কাজনকভাবে উত্থান মোকাবিলা করতে তুরস্কের শাসকেরা মৌলবাদীদের সমর্থন দিতে ও বিপরীতে তাদের সমর্থন পেতে যা করা প্রয়োজন তা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ধর্মবিষয়ক অফিস পরিচালনা করে মসজিদ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ,সকল সরকারি বিদ্যালয়ে ধর্ম বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ, স্কুলসমূহে ইসলামধর্মের জন্য অর্থবরাদ্দ করে। ধর্ম বিষয়ে পড়ালেখার জন্য স্কুল স্থাপন করা হয়, এবং সেখান থেকে হাজার হাজার স্নাতক কৃতকার্য হয়ে আসতে থাকে। ফরাসি দেশের বিপরীতে তুর্কি সরকার স্কুলে মুসলমান মেয়েদের স্কার্ফ

পরার অনুমতি প্রদান করে। কেমালের দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার ৭০ বৎসর পরে তা আবার ফিরে এল।[৩৩] সরকারি এসব কার্যক্রম আসলে ইসলামপন্থীদের চাপেই করা হল। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায় ১৯৮০-১৯৯০ সালে তুরস্কে ইসলামিকরণের ঝড়ো হাওয়া কত প্রবল বেগে বয়ে গেল।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের পুনরুত্থান তুরস্কের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য পালটিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যেমন তুর্গুত ওজাল খুব খোলামেলাভাবেই ইসলামের প্রতীক ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেন। অন্যান্য স্থানের মতো তুরস্কেও গণতন্ত্র দৈশিককরণের শিকার হয় এবং ওই গণতন্ত্র হয় ধর্মীয় ধাঁচের গণতন্ত্র এবং এভাবে তা ধর্মের মধ্যে ফিরে আসে। জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখানোর আকাঙ্ক্ষা এবং ভোট লাভের জন্য রাজনীতিকরা এমনকি সামরিক বাহিনী, যারা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, তারা পর্যন্ত জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে মূল্য দিতে শুরু করেন। জনপ্রিয় সরকার হতে হলে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে থাকতেই হবে। তবে এলিট ও আমলাগণ এবং সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শী। ইসলামি ভাবধারা সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল, ফলে ১৯৮৭ সালে সামরিক অ্যাকাডেমি হতে কয়েকশো ক্যাডেটকে ইসলামি ভাবধারার ধারক হওয়ার অভিযোগে অপসারণ করা হয়। অবশ্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো পুনর্জাগরিত ইসলামি ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য ইসলামি মতাদর্শীদের সমর্থন দিতে থাকে, যা আতাতুর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[৩৪] ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে স্থানীয় নির্বাচনে মৌলবাদী ওয়েলফেয়ার পার্টি ও তদ্রূপ অন্যান্য সমঝোতাসম্পন্ন ৫টি দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ ভোট পায়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী সিলারের ট্রুথ পার্টি পেয়েছিল শতকরা ২১ ভাগ ভোট। অন্যদিকে, শতকরা ২০ ভাগ ভোট পায় প্রয়াত ওজালের মাদারল্যান্ড পার্টি। ওয়েলফেয়ার পার্টি তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অর্জন করে, যথা ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারা। এর ছয়মাস পরে ১৯৯৫-এর ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ওই দল ভালো করে এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে। অন্যান্য দেশের মতো তুরস্কেও মৌলবাদী সমর্থন মূলত যুবসমাজ থেকে আসতে থাকে। এদের মধ্যে ছিল ফেরত আসা অভিবাসী, সমাজের ছিন্নমূল ও অধিকারবঞ্চিত অংশ এবং শহরে নব্য আগত অভিবাসী... ।[৩৫]

তৃতীয়ত, তুরস্কে ইসলামের পুনরুত্থান সেদেশের বিদেশ নীতিতেও প্রভাব ফেলে। প্রেসিডেন্ট ওজালের নেতৃত্বে তুরস্ক গাল্ফযুদ্ধে পশ্চিমাদের সমর্থন জুগিয়েছিল। তিনি ভাবছিলেন যে, এ-ধরনের সমর্থনদানের বিনিময়ে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করবে। তবে শেষপর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি: এমনকি ন্যাটো পর্যন্ত তুরস্ককে সমর্থন দিতে ইতস্তত করে। ইরাক কর্তৃক তুরস্ক আক্রান্ত হলে ন্যাটো একটি অ-রুশ দেশের দ্বারা আক্রান্ত তুরস্ককে সমর্থন দিতে চায়নি।[৩৬] তুর্কিরা ইসরাইলের

সঙ্গে তাদের সামরিক সখ্য বজায় রাখতে থাকে, যা তুরস্কের ইসলামপন্থীরা সুনজরে দেখেনি। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৮০-এর দশকে তুরস্ক আরবের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে এবং ১৯৯০-এর দশকে বসনিয়ার মুসলমান এবং আজারবাইজানকে সমর্থন দেয়। তারপরও বলকান এলাকা, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দৃষ্টিতে বিচার করে বলা যায় যে, তুরস্কের বিদেশনীতি ক্রমাগতভাবে ইসলামপন্থী হতে থাকে।

একটি সভ্যতাসম্পন্ন পরিচয়ে ফিরে আসার জন্য যে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়, তুরস্ক বেশ কয়েক বৎসর ধরে তার দুটি শর্ত পূরণ করে আসছে। তুরস্কের এলিটগণ সর্বতোভাবে সমর্থন জানাতে ইচ্ছুক এবং জনগণও নীরবে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। প্রাপক এলিট এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা যদিও তা চান না, তবুও এই ইস্যুটি ঝুলন্ত এবং ভারসাম্যাবস্থায় রয়েছে। তুরস্কের অভ্যন্তরে ইসলামি পুনঃজাগরণবাদীরা সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে জনগণের মধ্যে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলছে এবং এভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও পাশ্চাত্যপন্থী তুর্কি এলিটদের অবমূল্যায়ন করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাধা হিসেবে তুরস্কের দুটি অবস্থা দায়ী; তা হল, প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের ওপর নেতৃত্ব গ্রহণে তুরস্কের ইচ্ছা এবং তুরস্কে ইসলামিধারার পুনঃজাগরণ, যা আতাতুর্কের উত্তরাধিকারত্বকে অস্বীকার করে থাকে। এ সবকিছুই বলে দেয় যে, তুরস্ক একটি ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবেই থাকবে। এ সবকিছু সত্ত্বেও তুরস্কের নেতৃত্ব বরাবরই বলেন যে, তাদের দেশ একটি 'সেতুর' মতো যা বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। ১৯৯৩ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার যুক্তি দেখান যে, তুরস্ক একই সঙ্গে দুই, অর্থাৎ 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারক' আবার 'মধ্যপ্রাচ্যেরও অংশবিশেষ'।

আর এভাবেই তুরস্ক দুটি সভ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে চলেছে, যা বস্তুগত ও দার্শনিকোচিত উভয় অর্থেই সত্য। জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সিলার সবসময়ই নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচিত করান। আবার যখন তিনি ন্যাটো-জোটে কথা বলেন, তখন তিনি যুক্তি দেখান যে, 'ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচারে তুরস্ক একটি ইউরোপীয় দেশ।' প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডিমেরিলও অনুরূপভাবে বলেন যে, 'তুরস্ক দেশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু, যা পূর্ব-পশ্চিম এবং চীন ও পশ্চিমের মধ্যে বন্ধন রচনা করেছে।'[৩৭] যদিও এই সেতুটি কৃত্রিমভাবে তৈরি, এবং এর দুপারে শক্ত ভিত্তি থাকলেও একটি অন্যটির অংশ নয়। তুরস্কের নেতৃত্ব যখন তাদের দেশকে একটি সেতুর কথা বলেন; তখন তারা নিজেরাই স্বীকার করে নেন যে, তুরস্ক একটি ছিন্নরাষ্ট্র বৈ কিছু নয়।

মেক্সিকো

১৯২০-এর দশক থেকে তুরস্ক একটি ছিন্নরাষ্ট্র হিসেবে চলে আসলেও মেক্সিকো ১৯৮০-এর দশকের পূর্বে ছিন্নরাষ্ট্র ছিল না। তবে উভয় দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকদিন থেকেই সাযুজ্য রয়েছে। তুরস্কের মতো মেক্সিকোরও ছিল সর্বতোভাবে এবং স্ফটিকের মতো পরিষ্কার অপাশ্চাত্য সভ্যতা। এমনকি বিংশ শতাব্দীতে অক্টোভিয়া পাজ তুলে ধরেন যে, মেক্সিকোর চরিত্র

'কোর' এবং তা ভারত-উদ্ভূত। নিঃসন্দেহে এটি অ-ইউরোপীয়।'[৩৮] ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেক্সিকো অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যাতে হাত লাগিয়েছিল পাশ্চাত্য বিশ্ব। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মেক্সিকোতে নতুন জাতীয় পরিচয় ও নতুন একদলীয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। তুরস্কে বিপ্লবের ধারা ছিল ইসলামি ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা ও সেইসঙ্গে অটোম্যান সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তার বিনিময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবনধারাকে নিয়ে আসা ও তা অনুসরণ করা। অন্যদিকে মেক্সিকোতে রাশিয়ার মতো বিপ্লব ঘটেছিল সহযোগিতা ও খাপখাওয়ানোর মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপাদানসমূহ গ্রহণ করা, যার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল একটি নতুন ধারার জাতীয়তাবাদ, যে জাতীয়তাবাদ পশ্চিমা গণতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রকে বাতিল করে দিয়েছিল। এভাবে প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ তুরস্ক নিজেকে ইউরোপীয় বানাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মেক্সিকো চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে অস্বীকার করেই নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৮০ দশক পর্যন্ত মেক্সিকো এমন অর্থনৈতিক ও বিদেশনীতি গ্রহণ করেছিল, যা সদাসর্বদা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী।

তবে ১৯৮০ সাল থেকে অবস্থা বদলাতে থাকে। প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডি লে মাদ্রিদ যা শুরু করেন তা ছিল 'উত্তরমুখী'। প্রেসিডেন্ট কার্লোস সালিনাস ডি গোরতারি যা সামনে এগিয়ে নেন, তা হল মেক্সিকোর উদ্দেশ্য, বাস্তবতা, কার্যক্রম, পরিচয়, ইত্যাদি যা ১৯১০ সালের পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে সূচনা হয়েছিল, তা এগিয়ে নেয়া। সালিনাস প্রকৃতপক্ষে মেক্সিকোর ক্ষেত্রে তুরস্কের আতাতুর্ক-এর মতো ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আতাতুর্ক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়েছিলেন, যা ছিল তার সময়ে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধের মূলমন্ত্র। সেলিনাস অর্থনৈতিক উদারতাবাদকে এগিয়ে নিলেও পাশ্চাত্যের মতো রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেননি। তুরস্কের কেমাল আতাতুর্কের কার্যক্রম যেমন সেখানকার এলিটগণ সমর্থন জানিয়েছিলেন, তেমনি সেলিনাস-এর গৃহীত কার্যক্রম মেক্সিকোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিটগণও সমর্থন জানায়। তাদের অনেকেই আবার সেলিনাস-এর মতোই, যুক্তরাষ্ট্রেই লেখাপড়া করেছেন। সেলিনাস নাটকীয়ভাবে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করেন, বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় ফিরিয়ে দেন, বিদেশী বিনিয়োগ এগিয়ে নেন, ট্যারিফ ও ভর্তুকি হ্রাস করতে সক্ষম হন, বৈদেশিক ঋণ পুনঃবিন্যাস করেন, শ্রমিক সংগঠনগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন, উৎপাদনসীমা বৃদ্ধি করেন এবং সর্বোপরি তিনি মেক্সিকোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে উত্তর আমেরিকার মুক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। মধ্যপ্রাচ্যের একটি মুসলমানদেশ থেকে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন কেমাল আতাতুর্ক, অন্যদিকে সেলিনাস-এর সংস্কারের লক্ষ্য ছিল মেক্সিকো লাটিন আমেরিকার একটি দেশ থেকে তাকে উত্তরআমেরিকার দেশে রূপান্তরকরণ।

অবশ্য, এটি মেক্সিকোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় 'পছন্দ' ছিল না। বস্তুত মেক্সিকোর এলিটগণ সদাসর্বদা মার্কিনবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। তারা ধারণা করতেন, তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী ও সংরক্ষণবাদিতার পথ পৃথিবীর বহুদেশ বহুশতাব্দী ধরে

অনুসরণ করে এসেছে। অনেক মেক্সিকান মনে করেন যে, এর উৎকৃষ্ট বিকল্প হিসেবে বরং মেক্সিকো স্পেন, পর্তুগাল, দক্ষিণআমেরিকার দেশসমূহের সঙ্গে একটি 'ইবেরিয়ন' সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তুলতে পারে।

মেক্সিকো কি শেষপর্যন্ত তার উত্তরআমেরিকার প্রতি বেড়ে ওঠা ক্ষুধা মেটাতে পারবে? বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক এলিট এ-পথের সমর্থক; একথা সত্য। অন্যদিকে, উত্তরআমেরিকাও মেক্সিকোকে গ্রহণ করতে মোটামুটি রাজি, অবশ্য এক্ষেত্রে প্রচুরসংখ্যক অভিবাসীর ঢল নামার একটি বিপদজনক সম্ভাবনা রয়ে যায়। তুরস্কের বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর দিকে লক্ষ্য রেখে ইউরোপীয় এলিট ও জনগণ তুরস্ককে ইউরোপভুক্ত করতে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। অন্যদিকে, বৈধ বা অবৈধ পথে ব্যাপক হারে মেক্সিকান অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে যাতে যেতে পারে, এরূপ একটি যুক্তি ও শর্ত সেলিনাস নাফটার (NAFTA) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'হয় তোমরা আমাদের পণ্য গ্রহণ করবে, অথবা আমাদের মানুষজন নেবে।' তুরস্ক এবং ইউরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য অত্যন্ত গভীর, কিন্তু সে তুলনায় মেক্সিকো ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য তত গভীর নয়। মেক্সিকোর ধর্ম হল ক্যাথলিকতন্ত্র। এর ভাষা হল স্প্যানীয়। এর এলিটগণ মূলত ইউরোপপন্থী (যেখানে তারা তাদের সন্তানাদিকে লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়ে থাকেন)। অতিসম্প্রতি তারা তাদেরকে মার্কিন মুল্লুকে পাঠাতে শুরু করেছে।

অ্যাংলো আমেরিকা, উত্তর আমেরিকান ও স্প্যানীয়, ইন্ডিয়ান মেক্সিকো পরিচয় অনেকটা গ্রহণযোগ্য, যতটা না খ্রিস্টীয় ইউরোপীয় এবং মুসলমান তুরস্ক। এতসব মিল থাকার পরও 'নাফটা' গঠনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাফটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইতে দেখা যায়। বিশেষত অভিবাসীর বানভাসা স্রোত ঠেকানো নিয়ে অনেক মার্কিনী চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তাছাড়া কলকারখানাগুলো দক্ষিণদিকে সম্প্রসারণকেও তারা ভালোচোখে দেখেনি। তদুপরি প্রশ্ন তোলা হয় যে, আদৌ মেক্সিকো উত্তরআমেরিকীয় উদারতাবাদ এবং আইনের শাসন বাস্তবায়নের যোগ্যতা রাখে কি-না।'[৩৯]

একটি ছিন্নরাষ্ট্র থেকে কৃতকার্যতার সঙ্গে সরে আসার আর-একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের সাধারণ সম্মতি, যদিও সর্বতোভাবে জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন তেমন নেই। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, দেশের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণ কী ভাবছে তা জানা। ১৯৯৫ সালের নববর্ষের দিন কয়েক হাজার সুসংগঠিত চিয়াপাস সমর্থক উগ্র গেরিলা মেক্সিকোর উত্তরআমেরিকাকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। তাদের এ কার্যক্রম মেক্সিকোর বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং জনমতের অন্যান্য বাহকের দৃষ্টি ও সহমর্মিতা অর্জন করেছিল। ফলে দেখা যায়, মেক্সিকোর এলিট ও জনগণ নাফটার সদস্য হওয়া ও মেক্সিকোর উত্তরআমেরিকাকরণের বিপক্ষে অবস্থান নেন। প্রেসিডেন্ট সেলিনাস খুব সচেতনভাবেই রাজনৈতিক সংস্কার ও গণতন্ত্রায়ণের চাইতে তাঁর সংস্কার-কর্মসূচির অগ্রাধিকারের তালিকায় অর্থনৈতিক সংস্কার ও পাশ্চাত্যকরণকে উপরের দিকে রেখেছিলেন। একথা বলা যায় যে, এভাবে অর্থনৈতিক সংস্কার ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা আসলে

মেক্সিকোর রাজনৈতিক সংস্কার তথা গণতন্ত্রায়ণকে এগিয়ে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় : মেক্সিকোর আধুনিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ণ কি মেক্সিকোর অপাশ্চাত্যকরণের জন্য চূড়ান্ত সহায়ক হবে, যা ক্রমান্বয়ে নাফটাকে দুর্বল করবে এবং তা আসলে কি ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে পরিবর্তন ডেকে আনবে? মেক্সিকোর উত্তরআমেরিকাকরণ কি সেখানকার গণতন্ত্রায়ণের সঙ্গে উপযুক্ত?

অস্ট্রেলিয়া

রাশিয়া, তুরস্ক এবং মেক্সিকোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, অস্ট্রেলিয়া শুরু থেকেই একটি পাশ্চাত্যদেশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। পুরো বিংশ শতাব্দী ধরেই দেশটি প্রথমে ব্রিটেন এবং তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। শীতলযুদ্ধকালীন অস্ট্রেলিয়া যে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের একটি সদস্যরাষ্ট্র ছিল তাই নয়; সেসময়ে দেশটি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার সঙ্গে একত্রিত হয়ে পাশ্চাত্যের সামরিক ও গোয়েন্দা বিষয়ক একটি 'কোর'রাষ্ট্র হিসেবে নিজের ভূমিকা রেখেছিল। ১৯৯০-এর দশকে অস্ট্রেলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্তগ্রহণ করে যে, তারা পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের মিত্রতা থেকে সরে আসবে এবং একটি এশীয় দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা-কিছু করণীয় তা করতে দ্বিধান্বিত হবে না। এরই ধারাবাহিকতায় ভৌগোলিকভাবে তারা প্রতিবেশী এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী পল কিয়েটিং ঘোষণা দেন যে, 'অস্ট্রেলিয়া সাম্রাজ্যবাদের শাখা অফিস হিসেবে আর কাজ করবে না, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্র হিসেবে কাজ করবে এবং এশীয়দের সঙ্গে একাত্ম হতে শুরু করবে।' তিনি আরও বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব পরিচয় ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য এছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।' বিশ্বের বুকে অস্ট্রেলিয়া নিজেকে একটি বহুধাবিভক্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি হিসেবে পরিচিত করতে চায় না। অস্ট্রেলিয়া একটি এশীয় দেশ এবং সেজন্য অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সাংবিধানিকভাবে দেশটিকে একটি 'আহরিত' দেশ হিসেবে বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো হবে। প্রধানমন্ত্রী কিয়েটিং-এর মতে বিগত দিনগুলোতে ব্রিটেনের সঙ্গে অতিসখ্য দেশটিকে অসাড় করে তুলেছে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে এভাবে সম্পর্ক বজায় রাখলে দেশটির নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'এশিয়াত্ব' আর বহাল থাকবে না। বিদেশমন্ত্রী গারেথ ইভানও অনুরূপ মত পোষণ করেন।'[৪০]

অস্ট্রেলিয়ার এশীয়করণের প্রত্যয়ের ভিত্তি ছিল এই যে, ধরে নেয়া হয়েছিল, অর্থনীতি দেশের জাতীয় লক্ষ্যে পৌছতে সংস্কৃতিকে পদদলিত করে থাকে। মূল কারণ ছিল পূর্বএশিয়ার অর্থনীতির গতিশীল উন্নয়ন ও তার ফলে ওইসব দেশে অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসারের মধ্যে নিহিত। ১৯৭১ সালে পূর্ব এবং দক্ষিণএশিয়া অস্ট্রেলিয়ার সমগ্র রপ্তানির শতকরা ৩৯ ভাগ গ্রহণ করত : কিন্তু ১৯৯৪ সালে পূর্ব ও

দক্ষিণএশিয়া অস্ট্রেলিয়ার রপ্তানির শতকরা ৬২ ভাগ গ্রহণ করছে এবং বিনিময়ে নিজেদের শতকরা ৪১ ভাগ সামগ্রী অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি করছে। বিপরীত চিত্রে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে অস্ট্রেলিয়া তার রপ্তানির শতকরা ১১.৮ ভাগ ইউরোপীয় সমাজে, আর শতকরা ১০.১ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে। তাই দেখা যায়, অস্ট্রেলীয় অর্থনীতি এশীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই নির্ভরশীলতার ফলে সৃষ্ট বলয় অস্ট্রেলীয়দের মনে এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি করে যে, বৈশ্বিক অর্থনীতি তিনটি মূলধারার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এ ব্লকগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান এশীয় ব্লকের অভ্যন্তরে।

এহেন অর্থনৈতিক যোগসূত্রের পরও অস্ট্রেলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাসম্পন্ন দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং কার্যত একটি 'ছিন্নরাষ্ট্র' হিসেবেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রথমত, ১৯৯০-এর দশকে অস্ট্রেলীয় এলিটগণ মোটেও দেশটিকে ছিন্নরাষ্ট্রের কবলমুক্ত করার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন না। কোনো কোনো মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়, প্রশ্নটি একটি দলীয় ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন লিবারেল পার্টির নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে কখনও কখনও পরস্পর বিপরীত অবস্থান কিংবা এর বিরোধিতা করে থাকেন। লেবার সরকারও এ-বিষয়ে বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ কর্তৃক মোটারকমের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তাই দেখা যায়, এশীয়করণের পক্ষে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার মতৈক্য দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে জনমতও ছিল পরস্পরবিরোধী। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলীয় জনগণের শতকরা ২১ ভাগ থেকে ৪৬ ভাগ ছিল রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পক্ষে। এই ক্ষেত্রে সমর্থন ছিল দোদুল্যমান এবং ক্ষয়িষ্ণু। অস্ট্রেলীয় পতাকা থেকে ইউনিয়ন জ্যাক বাদ দেয়ার প্রশ্নে সমর্থকদের হার শতকরা ৪২ ভাগ থেকে মে ১৯৯২-তে ৩৫ ভাগে (১৯৯৩) উপনীত হয়। একজন অস্ট্রেলীয় কর্মকর্তা এ-বিষয়ে ১৯৯১ সালে বলেন, 'জনগণের জন্য এটি উদরপূর্তি করা খুবই কঠিন। যখন আমি বলি ধাপে ধাপে অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে, আমি তখন অনেক ঘৃণাযুক্ত পত্র প্রাপ্ত হই।'[৪১]

তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এশীয় দেশের এলিটগণ অস্ট্রেলিয়ার এশীয়মুখিতার ক্ষেত্রে ততবেশী গ্রহণোন্মুখ নয়, যতটা ইউরোপীয় এলিটগণ তুরস্কের জন্য গ্রহণোন্মুখ। এশীয় দেশের এলিটগণ পরিষ্কার করতে চান যে, অস্ট্রেলিয়া যদি সত্যই এশিয়ার অংশ হতে চায়; তবে তাকে অবশ্যই পরিপূর্ণ ও সত্যিকার অর্থে এশীয় হতে হবে, যা তার পক্ষে হওয়া সম্ভব। একজন ইন্দোনেশীয় কর্মকর্তার মতে, 'এশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যজনক সংহতি একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছে, তা হল, এশীয় দেশসমূহ কীভাবে এ সংহতিকে স্বাগত জানায়। এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সংহতির জন্য অস্ট্রেলিয়ার জনগণ ও সরকারকে এশীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে

হবে।' অস্ট্রেলিয়ার এশীয়করণ উদ্যোগ আর পাশ্চাত্যের প্রতি তার দুর্বলতার মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে। 'সাংস্কৃতিকভাবে অস্ট্রেলিয়া এখনও ইউরোপীয়।' ১৯৯৪ সালে এরূপ মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ : '... এজন্য আমরা মনে করি অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় এবং তাই তার পূর্বএশীয় অর্থনৈতিক 'ককাসের' সদস্য হওয়া সমীচীন হবে না। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু সাংস্কৃতিকভাবে এখনও ইউরোপীয়, সেহেতু আমাদের 'ফোরামে' এসে তার ইউরোপীয় সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলার অধিকার থাকবে। অথচ, আমরা এশীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং এশীয় সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। অতএব, অস্ট্রেলিয়া আমাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে তেমন খাপ খায় না। এ কারণেই আমি অস্ট্রেলিয়াকে 'ইয়েকের' সদস্য হওয়ার বিষয়ে বিরোধিতা করে থাকি। সুতরাং, এটি গায়ের চামড়ার রঙের জন্য নয়, সংস্কৃতির জন্য।'[৪৩] সে কারণে, এশীয়রা অস্ট্রেলিয়াকে তাদের সংঘের বাইরে বের করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঠিক অনুরূপ কারণে ইউরোপীয়রা তুরস্ককে তাদের ইউনিয়নভুক্ত করতে পারছে না (তারা 'আমাদের' থেকে পৃথক বা তারা 'আমাদের' নয়)।

তাহলে দেখা যায়, মাহাথির যেমন বলেছেন, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধই হল প্রধান অন্তরায় যার দরুন অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে না। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মুক্ত সংবাদপ্রবাহ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর নিত্য সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। একজন অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকের মতে, এ অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে বাস্তব সমস্যা, 'আমাদের পতাকা নিয়ে নয় বরং তা হল সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুসৃত প্রত্যয়গুলো নিয়ে। আমি সন্দেহ করি, তুমি এমন কোনো অস্ট্রেলীয়কে পাবে না, যে এশীয় অঞ্চলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সংহতির বিনিময়ে তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কোনো একটি বিষয়কে ছাড় দেবে।'[৪৪]

এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চারিত্রিকসহ রীতি, শৈলী, আচরণগত পার্থক্য স্পষ্ট; মাহাথির যেমনটি বলেন, এশিয়া তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অতি সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, সমন্বিত, অ-সরল, অ-বিচারমূলক, অ-বাস্তব এবং সংঘাত-বিবর্জিত পথে এগুতে আগ্রহী। অথচ, অস্ট্রেলীয়রা বিপরীতভাবে পরোক্ষ, নীরস, দুর্বোধ্য, স্পষ্টবাদী, অসংবেদনশীল তথা ইংরেজিভাষাভাষি অপরাপর মানুষের ন্যায় লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে থাকে। সংস্কৃতির এই সংঘাত প্রধানমন্ত্রী পল কিয়েটিং-এর এশীয়দের সঙ্গে আচরণের ভেতরই ধরা পড়ে। কিয়েটিং অস্ট্রেলীয় জাতীয় চরিত্রের চরম দিক উন্মোচন করেছেন। অস্ট্রেলিয়াকে এশীয় হতে হবে, এমন খোলামেলা ও নির্দয় যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে কিয়েটিং অনবরত এশীয় নেতৃত্বের দ্বারা রুষ্ট, হতাশাগ্রস্ত এবং বিরাগভাজন হয়েছেন।[৪৫] কিয়েটিং-ইভানের কার্যক্রমকে অদূরদর্শী বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তারা উভয়েই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অতিগুরুত্ব দিতে গিয়ে সংস্কৃতিক বিষয়াদিকে উপেক্ষা করেছেন। এ অবস্থাকে অস্ট্রেলিয়ার মূল আর্থিক সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর অপপ্রয়াস হিসেবে অনেকে গণ্য করে থাকেন।

অন্যদিকে, তাদের এ প্রচেষ্টাকে একটি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের নিরিখে দেখা যায়, যার দ্বারা তারা উদীয়মান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু তথা

পূর্বএশিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া হল প্রথম পাশ্চাত্যদেশ, যে দেশ পাশ্চাত্যচ্যুত হয়ে উদীয়মান অপাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হতে উৎসাহিত হয়েছিল। অনেকে দ্বাবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যদ্বাণী করেন এভাবে : 'শুরুতে ঐতিহাসিকগণ হয়তো পেছনে ফিরে তাকিয়ে কিয়েটিং-ইভানের এশীয়করণ প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্যের পতনের একটি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করবেন।' যদি এই পথ অস্ট্রেলিয়া এখন অনুসরণ করে, তবে বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যাবে না এবং এই সৌভাগ্যবান দেশটি চিরস্থায়ীভাবে একটি ছিন্নরাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হবে এবং এটি একই সঙ্গে 'সাম্রাজ্যবাদের শাখা অফিস' (যেমনটি পল কিয়েটিং মন্তব্য করেছেন) এবং 'এশিয়ার নব্য শ্বেত আবর্জনা হিসেবে গণ্য হবে' যেমনটি লি কুন ইয়েই চিহ্নিত করেছেন।[৪৬]

অস্ট্রেলিয়ার জন্য এটি একটি অ-পরিহারযোগ্য পরিস্থিতি নয়। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বাসনা, অস্ট্রেলিয়াকে একটি এশীয় শক্তি হিসেবে গণ্য করার পরও অস্ট্রেলীয় নেতৃত্ব দেশটিকে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ হিসেবে গণ্য করতে চায়। এমনকি কিয়েটিং-এর পূর্বসুরী প্রধানমন্ত্রী রবার্ট হাওয়াকও তেমনটি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। যদি অস্ট্রেলিয়া নিজেকে ব্রিটেনের রাজতন্ত্র থেকে অবমুক্ত করে একটি পৃথক প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখতে চায়, তবে এটি হবে তেমনধারার সারিতে বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশটি ব্রিটেন থেকে উদ্ভূত, একটি অভিবাসীসম্পন্ন দেশ, যার আকার মহাদেশের ন্যায়, যার অধিবাসীর ভাষা ইংরেজি, যে দেশটি তিনটি যুদ্ধের 'মিত্র' হিসেবে পরিচিত, যে দেশটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়, যদিও মনে হয় জনসংখ্যার বিচারে দেশটি এশীয়দের দ্বারা ভরপুর হতে চলেছে।

সাংস্কৃতিকভাবে এ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জুলাই ৪, ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণায় অস্ট্রেলীয় মূল্যবোধেরই প্রতিফলন রয়েছে; এশীয় মূল্যবোধের নয়। অর্থনৈতিকভাবে দেখা যায়, দেশটি যেসব দেশের সঙ্গে সংযুক্ত, তার থেকে পৃথক থাকতে চায়। তারা নাফটার সম্প্রসারণ চায় এবং উত্তর আমেরিকা-দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল যুক্ত করতে চায়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড হবে অংশীদার। এ-ধরনের জোট সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় ও বোঝাপড়াপূর্বক অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়নের একটি শক্ত ভিত্তি ও তার পরিচয়-সংক্রান্ত সংকট দূর করতে সহায়ক হবে। অপরদিকে, অস্ট্রেলিয়াকে এশিয়া বানানোর প্রচেষ্টা হবে বোকার মতো কাজ।

পাশ্চাত্যের সংক্রমণ ও সাংস্কৃতিক ভগ্নমনস্কতা

যখন অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব দেশটিকে এশীয়করণের ধ্যানে মগ্ন, তখন অন্যান্য ছিন্নরাষ্ট্র, যেমন তুরস্ক, মেক্সিকো, রাশিয়া তাদের দেশকে পাশ্চাত্যকরণের কাজে ব্যস্ত। তাদের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে বিবেচ্য, এজন্য যে, এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। কেননা এ-বিষয়ে ক্ষমতা কতটুকু আছে, যা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা এবং দেশীয় সংস্কৃতির

সম্মান রক্ষা করার প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে নিজত্ব রক্ষা করে নিজেকে নবায়ন করার প্রশ্ন দেখা দেয়। নতুনত্ব ধারণ করা এবং পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ হজম করা অত সহজ কাজ নয়। প্রত্যাখ্যানপন্থীরা পাশ্চাত্যের কোনোকিছুই গ্রহণ করতে নারাজ, আবার মোস্তফা কেমালীয় ধারাও ব্যর্থ হয়েছে। যদি অপাশ্চাত্য সমাজকে আধুনিক করতে হয়, তবে তাদেরকে নিজস্ব পথেই এগুতে হবে, পাশ্চাত্যের পথে নয়। জাপানকে ছাড়িয়ে যেতে হলে নিজস্ব ধারায়, নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানাদি ও মূল্যবোধের চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিজস্ব সংস্কৃতির অহংকারে অনুপ্রাণিত হয়ে উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের সংস্কৃতির কোনোপ্রকার মৌলিক পুনঃস্থাপনের মতো কাজ কার্যত হবে নিয়তির দ্বারা পূর্বলিখিত ব্যর্থতার মতো। যখন তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাদানগুলো তাদের সমাজে খাপ খাওয়াতে চাইবে, তখন তারা কখনোই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল বা 'কোর' বিষয়গুলোকে পদদলিত, কিংবা চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিতে পারে না। বিপরীতভাবে দেখা যায়, অপাশ্চাত্য সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংক্রমণ সবসময়ই উল্টো ফল ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। তবে এই সংক্রমণ নাছোড়বান্দার মতো বজায় থাকলেও তা বিধ্বংসী নয়। রোগী বেঁচে থাকলেও পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকে না। রাজনৈতিক নেতারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেও তারা ইতিহাস থেকে নিজেদেরকে পিছুটান দিতে পারেন না। তারা তাদের দেশকে একটি ছিন্নরাষ্ট্র তৈরি করলেও পাশ্চাত্যরাষ্ট্র বানাতে পারবেন না। তারা সাংস্কৃতিক ভগ্নমনস্কতার মাধ্যমে তাদের সমাজকে দূষিত করতে পারলেও তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কিন্তু চলমান থেকেই যায়।

অধ্যায়-৭

কোররাষ্ট্র (প্রধান), এককেন্দ্রিকবৃত্ত এবং সভ্যতার সুবিন্যস্তকরণ

সভ্যতা ও তার সুবিন্যস্তকরণ

শীতলযুদ্ধের দুটি বৃহৎ শক্তির উচ্ছেদের ফলে আবির্ভূত বৈশ্বিক রাজনীতিতে প্রধান সভ্যতাসমূহের কোররাষ্ট্রগুলোর দ্বারা অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রলুব্ধ ও প্রতিরোধকরণ কার্যক্রম তেমন আর ফলপ্রসূ নয়। এই পরিবর্তন খুব পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্য, অর্থোডক্স এবং সিনিক সভ্যতার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোররাষ্ট্রগুলোর সভ্যতার গোষ্ঠীবদ্ধতা, সদস্যরাষ্ট্র হওয়ার প্রশ্নে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিল থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে প্রতিবেশী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমরূপ, তারাও বিবেচ্য হচ্ছে এবং সর্বোপরি বিতর্কিত হলেও দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশী দেশের ভিন্ন সভ্যতাকে কোনো কোনো সময়ে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, ওইসব সভ্যতাসম্পৃক্ত জোটের (ব্লকের) রাষ্ট্রগুলো কোররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে কেন্দ্র করে 'এককেন্দ্রিক বৃত্ত' সৃষ্টি করে থাকে। এভাবে সেখানে তাদের পরিচয় ও সংহতি ওই বৃত্তের বা জোটের (ব্লকের) ভেতরে একীভূত করতে চায়। একটি কোররাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না-পাওয়ার কারণে ইসলাম তার 'সাধারণ সচেতনতা' সৃষ্টির লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেও শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক স্তরের সাধারণ রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করতে পেরেছে মাত্র। নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রয়েছে, এমন রাষ্ট্রগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই, এমন রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে জোট সৃষ্টি করে থাকে। কোররাষ্ট্রের বেলায় এ-বিষয়টি খুবই সত্য। কোররাষ্ট্রগুলো সেইসব রাষ্ট্রকে নিজের মধ্যে টানে, যাদের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সাযুজ্য রয়েছে এবং সেইসব রাষ্ট্রকে ভাগিয়ে দেয়, যার সঙ্গে তার সংস্কৃতির যোগসূত্র নেই। নিরাপত্তার খাতিরে কোররাষ্ট্র অন্যসংস্কৃতিসম্পন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা করতে পারে, তবে পরবর্তীতে আবার বিরুদ্ধাচরণ করতেও দ্বিধা করে না। উদাহরণ হিসেবে চীনের সঙ্গে তিব্বত, রাশিয়ার সঙ্গে তাতার ও মধ্যএশীয় মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার বিবেচনায় কিছু রাষ্ট্র তাদের কোররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জর্জিয়া এবং রাশিয়া

উভয়েই অর্থোডক্স দেশ; কিন্তু জর্জিয়রা ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে সবসময়ই কনফুসীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আসছে, যদিও তাদের মধ্যে শত্রুতার ইতিহাস রয়েছে। হয়তো সময়ের আবর্তে দেশগুলোর মধ্যে তাদের সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের আলোকে একটি বৃহত্তর সংস্কৃতিবোধ সৃষ্টি করবে, যা তাদেরকে একত্রিত করবে। যেমন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ একত্রিত হয়েছে।

শীতলযুদ্ধকালীন যে সুবিন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া কাজ করেছে, তা ছিল মূলত তৎকালীন দুটি ব্লকের আধিপত্যের দৃষ্টিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং তৃতীয় বিশ্বে তার প্রভাব সম্পর্কিত। বর্তমান আবির্ভূত বিশ্বে বৈশ্বিক শক্তি সেকেলে, আর বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায় গঠন একটি অলীক কল্পনা মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রসহ কোনো দেশই আজ আর বিশ্বনিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য আগ্রহ দেখায় না। বর্তমান বহুধাবিভক্ত জটিল বিশ্বপরিস্থিতিতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সুবিন্যস্তকরণের একটি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব হয় সভ্যতার নিরিখে সুবিন্যস্ত হবে, নতুবা আর কোনোভাবেই নয়। অধুনা বিশ্বে কোররাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সুবিন্যস্তকরণের উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। আর এ-কাজটি সম্পন্ন হয় বিভিন্ন কোররাষ্ট্র ও সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে।

বিশ্বে কোররাষ্ট্রসমূহ একটি নেতৃত্বদানকারী ও প্রভাবশালী ভূমিকা রাখছে। এজন্য বিশ্বকে আমরা 'প্রভাবিত হওয়া বিশ্ব' বলতে পারি। কিন্তু বিশ্বে কোররাষ্ট্র কর্তৃক প্রভাবিত অবস্থার ক্ষেত্রে সমজাতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন সদস্যরাষ্ট্রসমূহের তরফ থেকে ঠাণ্ডা মেজাজ ও পরিমার্জনজনক অবস্থাও সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমজাতীয় সংস্কৃতির বলেই কোররাষ্ট্রসমূহ তার সদস্যরাষ্ট্র ও বহিঃরাষ্ট্রের ও তার প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্ষমতাপ্রয়োগকে বৈধ করে দেয়। এমতাবস্থায়, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস ঘালি কর্তৃক ১৯৯৪ সালে প্রভাব রক্ষার্থে শান্তিমিশনের জন্য সৈন্য আহ্বানকে অরণ্যে রোদন বৈ কিছু বলা যায় না। কেননা উক্ত আহ্বানে এক-তৃতীয়াংশের বেশি জাতিসংঘের শান্তিমিশন বাহিনীর লোক আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী শক্তিগুলো সরবরাহ করেনি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখতে সে-অঞ্চলের কোর ও সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই বলা যায়, জাতিসংঘ আঞ্চলিক শক্তির কোনো বিকল্প হতে পারে না। আঞ্চলিক শক্তিসমূহই কোররাষ্ট্রকেন্দ্রিক বৈধতা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

একটি কোররাষ্ট্র নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। কারণ, সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তাদের ওপর কর্তৃত্বকে সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার বন্ধন মনে করে। সভ্যতা হল বস্তুত একটি সম্প্রসারিত পরিবারের মতো। পরিবারের প্রাচীন সদস্যদের মতো কোররাষ্ট্র তার আত্মীয়রূপী সদস্যরাষ্ট্রের ওপর সমর্থন, প্রভাব ও নিয়মতান্ত্রিকতা আরোপ করে থাকে। এরকম আত্মীয় সম্পর্কিত কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে আরও অনেকগুণ বেশি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে বিরোধ মীমাংসাপূর্বক এবং নিয়মাবলি আরোপপূর্বক আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখার ক্ষমতা সীমিত। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এমনকি শ্রীলংকা কোনোক্রমেই ভারতকে নির্দেশদাতা দেশ

হিসেবে দক্ষিণএশিয়ায় মেনে নেবে না; অন্যদিকে পূর্বএশিয়ার কোনো দেশই এরূপ দেশের ভূমিকায় জাপানকে মেনে নেবে না।

এরূপ মুরুব্বীসম্পন্ন কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে সভ্যতাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। কেননা এমতাবস্থায় বিরোধসমূহ মীমাংসাপূর্বক নির্দেশাবলি প্রয়োগ করার তেমন কেউ অবশিষ্ট থাকে না। একটি ইসলামি কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণে বসনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল সে-ধরনের এড্ হক ভূমিকা নিতে। অথচ, সার্বিয়ার ওপর রাশিয়া এবং ক্রোয়াটদের ওপর জার্মানি 'কোররাষ্ট্রসুলভ' ভূমিকা নিতে দ্বিধা করেনি। তবে, বসনিয়ার সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছিল। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেখানে তেমন কোনো সামরিক কৌশলগত অবস্থান ছিল না, এমনকি তাদের আগ্রহও ছিল না। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি। তাছাড়া অসুবিধা আরও দেখা দেয়, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বসনিয়ার কোনোপ্রকার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল না, এবং আরও বলা যায়, ইউরোপ তার অভ্যন্তরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনে অখুশি ছিল। বলাবাহুল্য, এ কারণে সেখানে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধপ্রবণতাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। আফ্রিকা এবং আরববিশ্বে কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে এবং এ কারণেই সুদানের গৃহযুদ্ধের কোনোপ্রকার মীমাংসা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, যেখানে কোররাষ্ট্র উপস্থিত, সেখানে সভ্যতার ধারায় নবতর আন্তর্জাতিক নির্দেশাবলি কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।

পাশ্চাত্যের প্রত্যাঘাত

শীতলযুদ্ধাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বৃহৎ, বহুমুখী, বিবিধ ধরনের সভ্যতাসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর কেন্দ্র। আর সোভিয়েট ইউনিয়নের পুনরায় সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ছিল তারা প্রতিরোধরত। খ্রিস্টশক্তির দ্বারা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীবদ্ধতাকেও বহুভাবে নামকরণ করা হত, যেমন 'মুক্ত বিশ্ব', 'পশ্চিমা জগৎ', 'মিত্রজোট' ইত্যাদি, যা গঠিত ছিল অনেক রাষ্ট্র নিয়ে, যদিও সেখানে সমগ্র পাশ্চাত্যশক্তির সমর্থন ছিল না। তুরস্ক, জাপান, গ্রিস, কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইসরায়েল এবং আরও একটু ঢিলাঢালাভাবে বলা যায়, অন্যান্য দেশ, যেমন তাইওয়ান, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তান প্রমুখ এ জোটভুক্ত ছিল না। এটি আরও অস্বীকৃতি পেয়েছিল সেইসকল দেশ থেকে, যে সকল দেশ স্বল্পমাত্রিক বহুধাকৃষ্টিসম্পন্ন, যার ভেতর ছিল সমগ্র অর্থোডক্স দেশসমূহ (গ্রিস ব্যতীত), সেইসকল কিছু দেশ, যারা ঐতিহাসিকভাবে ছিল পাশ্চাত্য, ভিয়েতনাম, কিউবা, কিছুটা স্বল্প আকারের হলেও ভারত এবং কিছু সময়ের জন্য একাধিক আফ্রিকার দেশ।

শীতলযুদ্ধাবসানের পর এই বহুদেশীয় ও বহুসভ্যতাবিশিষ্ট জোট ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন, বিশেষ করে 'ওয়ার্শ প্যাক্টের' ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ছিল নাটকীয়। খুব ধীরগতিতে হলেও বহুধাবিভক্ত সভ্যতাগুলোর দ্বারা গঠিত সেই জোটগুলো যেমন 'মুক্ত বিশ্ব', নতুন সাজে, নতুন অবয়বে পুনরায় পাশ্চাত্য

ধারার সঙ্গে মিল রেখে মঞ্চে আসতে থাকে। পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্য নির্ধারণের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণের প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে থাকে।

ইউরোপীয় কোররাষ্ট্রসমূহ, যেমন ফ্রান্স, জার্মানি একটি চক্রবদ্ধ হয়ে বেলজিয়ামের অন্তরস্থ গোষ্ঠীভুক্ত হয়। নেদারল্যান্ড এবং লুক্সিমবার্গ, এই দেশদুটি আগে থেকেই পণ্যসামগ্রী ও জনমানুষের চলাচলের ওপর বাধানিষেধ তুলে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছিল। অন্য সদস্যরাষ্ট্র, যেমন ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং গ্রিস ১৯৯৫ সালে ওই সংগঠনের সদস্য হয়। অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া ছিল ওই সংগঠনের সহযোগী সদস্য। ১৯৯৪ সালে বাস্তবতার আলোকে জার্মানি এবং ফ্রান্সের শাসকদলগুলোর কর্মকর্তারা একটি পৃথক ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। জার্মানরা প্রস্তাবনা পেশ করেন যে, ইউনিয়নের 'মূল-প্রধান (হার্ডকোর) সদস্য হবে ইউনিয়নের আদি সদস্যরাষ্ট্রবৃন্দ, যা থেকে বাদ যাবে ইটালি এবং শুধুমাত্র জার্মানি ও ফ্রান্স থাকবে 'কোর অব দি হার্ড কোর' হিসেবে। হার্ডকোর সদস্যরা শীঘ্রই একটি আর্থ ইউনিয়ন স্থাপন করবে, যার দ্বারা দেশগুলোর বিদেশ ও সামরিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বিত করা হবে। প্রায় একই সঙ্গে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী এডুয়ার্ড বালার্ডুর তিন-চাকা-বিশিষ্ট ইউনিয়ন গঠনের উপদেশ দেন, যাতে থাকবে ৫টি প্রাক-সমন্বিত দেশ, কোররাষ্ট্র তাদের তৈরি করবে, অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রে মিলিত হয়ে 'চক্র' গড়ে তুলবে। নতুন রাষ্ট্রগুলো যারা সদস্যপদ লাভে আগ্রহী তারা 'বহিঃচক্র' গড়ে তুলবে। পরবর্তীতে ফরাসি বিদেশমন্ত্রী এলাইন জুপে, এ ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন : বহিঃচক্র গড়ে উঠবে অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে, যাতে থাকবে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলো, 'মধ্যম চক্রে' থাকবে সদস্যরাষ্ট্রগুলো। আর তারা সবাই সাধারণ রীতিনীতি ও নির্দেশ মান্য করবে, যেমন সাধারণ বাজার, আবগারি সংঘ ইত্যাদি। কতিপয় 'অভ্যন্তরস্থ চক্র' থাকবে, যারা ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে তৎপর থাকবে, আর এর সদস্যরা অন্যান্যদের তুলনায় হবে 'সঠিক ও যথেষ্ট'ভাবে কর্মতৎপর। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, আর্থিক সমন্বয়, বিদেশ নীতি ও তদ্রূপ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবে ওই হার্ডকোরভুক্ত দেশগুলো।[১] অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভিন্নধর্মী কাঠামোর প্রস্তাব করেন, যার মূল বক্তব্য ছিল 'কোর' এবং 'নন-কোর' সদস্যের মর্যাদা, ক্ষমতা, সদস্য, সহযোগী সদস্যের অবস্থান এবং সদস্য আর অ-সদস্যদের মধ্যে ব্যবধানসংক্রান্ত।

শীতলযুদ্ধকালীন ইউরোপ একটি একক ইউনিট হিসেবে বজায় ছিল না। কম্যুনিজমের পতনের কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন : ইউরোপ কী? ইউরোপের সীমানা উত্তরদিকে। পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণদিকে জল দ্বারা তা নির্ধারিত। তবে দক্ষিণদিকের সঙ্গে সংস্কৃতির পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। কিন্তু ইউরোপের পূর্বপার্শ্বের সীমানা কোথায়? কারা ইউরোপীয় হিসেবে চিহ্নিত হবেন এবং এমতাবস্থায় কারা হবেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো এবং এর সমতুল্য সংগঠনের সদস্য?

এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে দেখতে হবে সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারায়, যে ধারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে মুসলমান এবং অর্থোডক্স জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই ধারা খুঁজতে পেছনে যেতে হবে, যেখানে রোমান সাম্রাজ্যের ভাগবাটোয়ারা যা ৪র্থ শতকে ঘটেছিল এবং যা পরবর্তীতে ১০ম শতকে 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল'। এই ধারাটির বর্তমান রূপ কম করে হলেও বিগত পাঁচ শত বৎসর যাবৎ চলে আসছে। উত্তরদিকে যেখানে ফিনল্যান্ড, রুশদেশ এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ অবস্থিত, যেমন ইস্তনিরা, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পশ্চিমে বেলারুশ পর্যন্ত বিস্তৃত; অর্থোডক্স ইউক্রেনের মধ্যদিয়ে রোমানিয়া, ক্যাথলিক হাঙ্গেরীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য দেশ, যেমন যুগোস্লাভিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভানিয়ার প্রজাতন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্যই বলকান এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের সীমারেখা এর জন্য বিবেচ্য। এটিকে ইউরোপের সাংস্কৃতিক সীমানা বলা চলে। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে এটি ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সীমানা হিসেবে বিবেচ্য ছিল।

সভ্যতার নমুনা (প্যারাডাইম) এভাবে একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট গ্রহণযোগ্য উত্তর বের করে দিয়েছে সেই প্রশ্নের, যে প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল কোথায় ইউরোপের শেষ সীমানা ? ইউরোপের শেষ সীমা মূলত পাশ্চাত্যে খ্রিস্টানধর্মের বিশ্বাসী মানুষের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং অন্য ভাষায় বলা যায় : ইউরোপের শেষ যেখানে, সেখান থেকে ইসলাম ও অর্থোডক্স-এর শুরু। এ-ধরনের জবাবই পশ্চিম ইউরোপীয়রা শুনতে ভালোবাসেন। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ-ধরনের বক্তব্যকে গভীরভাবে সমর্থন জানিয়ে থাকেন। মাইকেল হাওয়ার্ড যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, ইউরোপের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি প্রদানের ওপর সোভিয়েট-যুগে কালিমা লেপন করা হয়েছিল। বিশেষ করে সেন্ট্রাল ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ ছিল এর লক্ষ্যবস্তু। সেন্ট্রাল ইউরোপ বলতে সেই অঞ্চলকে বুঝায়, যেখানে একদা পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয়তন্ত্র বজায় ছিল। প্রাচীন ভূমি যেখানে ছিল হাপর্সবার্গ সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকস্লোভাকিয়া (একত্রে) পোল্যান্ড এবং জার্মানির পূর্বাংশ। পূর্ব ইউরোপ বলতে বুঝায় সেইসব অঞ্চল, যা অর্থোডক্স গির্জা কর্তৃক আনুকূল্য পেয়েছিল। এ অঞ্চল মূলত কৃষ্ণসাগরীয় এলাকা, তথা বুলগেরিয়া, রুমানিয়াকে নিয়ে গঠিত। 'আর ওইসব দেশগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তা রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত।' তিনি আরও যুক্তি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রথম কাজ হবে সেন্ট্রাল ইউরোপীয়দের পুনঃআত্মস্থ করা, যাতে তারা আমাদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যে একাত্ম হয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে লন্ডন, প্যারিস, রোম, মিউনিখ, লাইফজিক, ওয়ার্শ, প্রাগ এবং বুদাপেস্ট-এর সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। এর দুইবৎসর পরে পিয়ারে বেহার মন্তব্য করেন যে, নতুন ফাটলরেখা আসছে যা হবে ইউরোপীয় খ্রিস্টধর্মভিত্তিক, এর একদিকে থাকবে পাশ্চাত্য খ্রিস্টতন্ত্র

(রোমান ও প্রটেস্ট্যান্ট) এবং অন্যদিকে থাকবে ইউরোপ যা পূর্বাঞ্চলের খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত এবং ইসলামের ঐতিহ্যমণ্ডিত অংশ। আরও কেউ কেউ ইউরোপের বিভাজন দেখছেন এবং তারা বলেন যে, ইউরোপ গতানুগতিক পূর্ব ও পশ্চিমভিত্তিক বিভক্ত নয় এবং এ বিভক্তি হবে সংস্কৃতিভিত্তিক। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের রেখা, সেসাথে পোল্যান্ড এবং বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ ইউরোপের পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং অন্যটি হল পূর্ব-ইউরোপীয় বলকান দেশসমূহ যা এর বাইরে অবস্থিত। একজন ইংরেজ যুক্তি দেখান যে, '... পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের গির্জার মধ্যে বড় মাপের ব্যবধান রয়েছে ... স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, রোমের নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে খ্রিস্টধর্ম দীক্ষিত হয়েছে বা 'সেলটিক', অর্থাৎ জার্মান মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে এসেছেন তার সেসব দেশ একদিকে; আর যারা পূর্ব বা দক্ষিণপূর্বে অবস্থানরত এবং খ্রিস্টধর্ম লাভ করেছে কন্সটান্টিনোপলের (বাইজানিটাইনের) নিকট থেকে তারা আছেন অন্যদিকে।'[২]

সেন্ট্রাল ইউরোপের মানুষজনও এই বিভেদিত ধারাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন না। 'যেসব দেশ কম্যুনিজম থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাজার অর্থনীতিমুখী হয়েছে, সেইসব দেশ কিন্তু ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টের নিরিখে, এমনকি অর্থোডক্স ধারায় বিভক্তি থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত করতে পেরেছে।' এক শতাব্দী আগে লিথুয়ানিয়ার প্রেসিডেন্ট যুক্তি দেখান যে, 'লিথুয়ানীয়দের দুটি সভ্যতার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে, আর তা হল ল্যাটিন বিশ্ব যা রোমান ক্যাথলিক ব্যাবস্থায় আত্তীকৃত হয়েছে, এবং যে ধারায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।' বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার জন্য বিরাট সৌভাগ্য বয়ে আসে, কেননা তারা পাশ্চাত্যের অংশ হয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানাদিকে ঢেলে সাজাতে পারবে, কিন্তু সেইসঙ্গে তারা কিন্তু তাদের অর্থোডক্স বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায়। বিশেষ করে বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া এবং বাইজানটাইনের সঙ্গে সবসময়ই নিকটবর্তী থেকেছে।



The Eastern Boundary of Westren Civilzation

ইউরোপের সঙ্গে পাশ্চাত্য খ্রিস্টরাজত্বকে এক করে দেখার কারণে সুস্পষ্টভাবে কিছু মাপকাঠি পাওয়া যায়, যাতে নতুন সদস্যের ইউনিয়নভুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় সত্তা, সুতরাং এর সদস্যসংখ্যাও ইউরোপের মধ্যে সীমিত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ১৯৯৪ সালে সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্য, এমনকিছু দেশ যেমন অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেনকে সদস্যপদ দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালের বসন্তকালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রাক্তন সোভিয়েটের সকল প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সদস্যপদ বিতরণ না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহকে বাধানিষেধের বাইরে রাখা হয়। সেন্ট্রাল ইউরোপের ৪টি দেশ, যথা পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়াকে সহযোগী সদস্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়, এবং সেসঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের দুটি দেশ, যথাক্রমে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াও সহযোগীর মর্যাদা লাভ করে। তবে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ পেতে হলে এইসব দেশগুলোকে হয়তো একবিংশ শতাব্দীর কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়ার আগেই সেন্ট্রাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করবে। তবে এখনও সন্দেহ রয়েছে, আদৌ বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া সদস্যপদ লাভ করবে কি না। অবশেষে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর সদস্যপদ লাভের বিষয়টি আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য ইতোমধ্যে দাখিলকৃত মুসলমান-অধ্যুষিত তুরস্ক, অতিক্ষুদ্র মাল্টা এবং অর্থোডক্স সাইপ্রাসের আবেদন ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মুলতুবি করে রাখা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে লক্ষণীয় যে, ওইসব দেশই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে, যেসব দেশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে এবং একই সাথে আর্থিকভাবে উন্নত।

যদি এই মানদণ্ড মেনে চলা হয়, তবে পোল্যান্ড, চেকপ্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, যেমন স্লোভানিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং মাল্টা কোনো-না-কোনো সময় ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্ত হবে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। কেননা ওই দেশগুলো ইউরোপীয় দেশ।

সভ্যতার যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বলা যায় যে, ন্যাটো এবং এর সদস্যপদেরও সম্প্রসারণ প্রয়োজন রয়েছে। শীতলযুদ্ধের শুরু হয়েছিল সেন্ট্রাল ইউরোপে সোভিয়েট রাজনৈতিক-সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে ন্যাটো গঠন করেছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নের আগ্রাসী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলার নিমিত্তে। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে ন্যাটো পশ্চিম-ইউরোপের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সংগঠন হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে।

শীতলযুদ্ধ শেষে ন্যাটোর কেন্দ্র এবং স্থানীয় পর্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে সেন্ট্রাল ইউরোপে পুনরায় যেন কোনোভাবেই রাশিয়ার আধিপত্য ও সামরিক আগ্রাসী ও নিয়ন্ত্রণ শুরু না হয় তা নিশ্চিতকরণ। একটি পশ্চিম ইউরোপীয় সংগঠন হিসেবে ন্যাটো

খুব সঙ্গত কারণেই তার সদস্যপদ শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে সীমিত রাখে। অবশ্য, সেসব দেশকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী থাকতে হবে, আর রাজনৈতিকভাবে হতে হবে গণতান্ত্রিক, এবং সামরিক বাহিনীর ওপর থাকতে হবে পূর্ণ বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ।

শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইউরোপের নিরাপত্তা বিষয়ে আমেরিকার কাজকর্ম ছিল সর্বজনীন। এ অভ্যাগম ছিল শান্তির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা, যা ছিল ইউরোপীয় জনগণ এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের ভূমিকার ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ইউরোপ-ভ্রমণের সময় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে উক্ত মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ক্লিনটন বলেন, 'যুক্তির সীমানা এখন নতুন আচরণ দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে, পুরাতন ইতিহাসের নিরিখে নয়। আমি সবাইকে বলতে চাই ... ইউরোপের নতুন পথ আঁকতে আমরা অবশ্যই ইউরোপের সর্বত্র গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। আমরা অবশ্যই স্বল্প ফলাফল চাই না।' এর এক বছর পর ক্লিনটনের বক্তব্য, বিশেষ করে 'পুরাতন ইতিহাস' এবং 'স্বল্প ফলাফলের' বিষয়টি সভ্যতার সীমানা বা পার্থক্যের ভেতর প্রতিফলিত হতে দেখি। প্রশাসন সক্রিয়ভাবে ন্যাটোর সদস্যপদ সম্প্রসারণের মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেয়, এজন্য প্রথমে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকপ্রজাতন্ত্র এবং শ্লোভাকিয়াকে বিবেচনায় রাখা হয়, তারপর সম্ভবত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের পালা আসবে।

রাশিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধিতা করে। তবে, রাশিয়ার সঙ্গে আছে এবং যারা তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী আর পাশ্চাত্যঘেঁষা, তারা যুক্তি দেখান যে, এ সম্প্রসারণ চূড়ান্তভাবে জাতীয়তাবাদী, এবং পাশ্চাত্যবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির হাত শক্ত করবে। ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্যকে খ্রিস্টতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত এমন দেশসমূহের মধ্যে সীমিত থাকতে দেখা যায়। অন্যদিকে, রাশিয়া নিশ্চিত হতে চায় যে, ন্যাটোর সদস্যপদ সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, মোলদাভিয়া, বেলারুশ এবং ইউক্রেন-এ সম্প্রসারিত হবে না (যতক্ষণ না ইউক্রেন অখণ্ড থাকে)। রাশিয়া ন্যাটোর সম্প্রসারণ পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে সীমিত রাখার পক্ষপাতী এবং অর্থোডক্স দেশসমূহের ওপর তার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বহাল রাখতে চায়। অর্থোডক্স দেশসমূহ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন, এমনটি তারা নিশ্চিত হতে চায়।

বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের জন্য সভ্যতার নিরিখে পার্থক্য নির্ণয়ের কার্যকারিতা ফলাও করা হয়। প্রাক্তন সোভিয়েট-বলয়ের অধীনস্থ প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য হিসেবে চিহ্নিত। বলাবাহুল্য, তাদের ভাগ্যও তেমনি ইউরোপের ভাগ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিনও বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সোভিয়েট বলয়ে আবদ্ধ হওয়াকে মেনে

নিতে পারেনি। এজন্য দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা অর্জনের সকল আন্দোলন ও কর্মসূচির একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটব্যবস্থার পতনের পর দ্রুত সেখান থেকে সোভিয়েটবাহিনীর অপসারণ চেয়েছে। রাশিয়াও এ বার্তা পেয়েছিল যে, তার অধীনস্থ অন্যান্য প্রজাতন্ত্র থেকে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিতে ভিন্নতর; তাই তারা বহির্দেশীয়ও বটে। ক্লিনটন প্রশাসনের এই সাফল্যকে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন এভাবে যে, 'এ কার্যক্রম আসলে ইউরোপের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে বড় ধরনের অর্জন।'

যখন ন্যাটোর সম্প্রসারণের জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এর সম্ভাব্য সংকোচনের প্রশ্নটিও দেখা দিচ্ছে। গ্রিসের ন্যায় অপাশ্চাত্য একটি দেশ উভয় সংগঠনেরই সদস্য, অন্যদিকে তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য এবং ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য আবেদনকারী দেশ। এ সকল সম্পর্ক কিন্তু শীতলযুদ্ধের ঔরসজাত। তাই প্রশ্ন আসে : এসব দেশ কি শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সভ্যতার দ্বারা নির্ধারিত বিশ্বে পূর্বের ন্যায় অবস্থান করবে?

ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়টি জটপাকানো এবং ন্যাটো-জোটে তুরস্কের সদস্যপদ ওয়েলফেয়ার পার্টির দ্বারা আক্রান্ত। তুরস্কের ন্যাটো-জোটের সদস্যপদ বহাল থাকা নির্ভর করছে তাই ওয়েলফেয়ার পার্টির ওপর। ওয়েলফেয়ার পার্টি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে হয়তো ন্যাটো-সদস্যপদ আর বহাল রাখবে না এবং হয়তো তুরস্ক কেমাল আতাতুর্কের পদাঙ্ক থেকে সরে এসে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং সেই ধারার নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে যাবে। এটি হতে পারে, তবে তুরস্কের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায়, এমনটি হয়তো সহসা ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। ন্যাটো-জোটে তুরস্কের ভূমিকা যাই হোক না কেন, তুরস্ক অনবরত এবং ক্রমাগতভাবে বলকান, আরববিশ্ব এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার প্রতি মনোযোগ দিয়ে চলেছে।

গ্রিস পাশ্চাত্যসভ্যতার অংশীদার নয়, কিন্তু ধ্রুপদী সভ্যতার এটি সূতিকাগার বিশেষ। গ্রিকসভ্যতার ওপর ভিত্তি করে অধুনা পাশ্চাত্যসভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তুরস্ককে বাধা দিতে গিয়ে গ্রিস বারবার বুঝাতে চায় যে, তারা খ্রিস্ট সংস্কৃতির উত্তরসুরি। সার্বীয়, রুমানীয়, বুলগেরীয়দের মতো না হয়ে গ্রিসের ইতিহাস পাশ্চাত্যের প্রশ্নে ঘোরানো পেঁচানো।

গ্রিস একটি ব্যতিক্রমী দেশ, যে দেশকে অর্থোডক্সসম্পন্ন ইউরোপীয় সংগঠনের বহির্জগৎ বলা চলে। এদেশটি এখনও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটো-জোটের স্বাভাবিক সদস্য নয়। তাই উভয় সংগঠনের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে খাপখাওয়ানো গ্রিসের জন্য সমস্যা বটে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত গ্রিস সামরিক শাসক কর্তৃক শাসিত হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন না-করা অবধি ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করতে পারেনি। দেশটির নেতৃবৃন্দ প্রায়শই মূল ইউরোপীয় ধারা থেকে

বাইরে চলে যান এবং পাশ্চাত্যদেশগুলোর বিরাগভাজন হয়ে থাকেন। অন্যান্য ন্যাটোভুক্ত দেশের তুলনায় দেশটি দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান নিদেনপক্ষে ব্রাসেল্‌স-এর পর্যায়ে নিতে সর্বমহলের চাপের মধ্যে দেশটিকে থাকতে হয়। এসব কারণে, দেশটিকে ইউনিয়নের জন্য একটি 'সমস্যাবহুল রাষ্ট্র' হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অপ্রকাশ্যে ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশগুলো, গ্রিসকে সদস্যভুক্ত করা যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, এমন মনে করে থাকে।

শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে উপর্যুপরি এবং ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রিসের নীতিসমূহ পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মেসেডোনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রিস-প্রদত্ত অবরোধকে পাশ্চাত্যবিশ্ব মোটেও সুনজরে দেখেনি। এমনকি ইউরোপীয় কমিশন গ্রিসের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে ইউরোপীয় 'কোর্ট অব জাস্টিসে' আবেদন পর্যন্ত করেছিল। প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে বিরোধের জের ধরে গ্রিস ইউরোপের মূল শক্তিসমূহের দ্বারা প্রণীত ও বাস্তবায়নের জন্য অগ্রায়নকৃত কাজকর্মের সঙ্গে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলে। গ্রিস সার্বিয়াকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান করে এবং ওইসব এলাকায় জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর গ্রিস তার শত্রুসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে গ্রিস এবং রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় 'সাধারণ শত্রু' তথা তুরস্কের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। গ্রিস রাশিয়াকে গ্রিস নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাসে অবস্থান গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। এভাবে তারা পরস্পরের তাদের অর্থোডক্স-ধর্মসুলভ সহমর্মিতার নিদর্শন প্রদর্শন করে। গ্রিস-নিয়ন্ত্রিত সাইপ্রাস অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের দ্বীপভূমিতে সার্বীয় ও রুশদেরকে অভিনন্দন জানায়।

১৯৯৫ সালে প্রায় ২০০০ রুশ ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাইপ্রাসে কাজ শুরু করে দেয়। সেখানে রুশ, সার্ব এবং সাইপ্রাসীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রিস-সাইপ্রাসীয় সরকার রুশদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে শুরু করে। গ্রিস ও রাশিয়া ককেশীয় এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায় তেলসম্পদ আবিষ্কারে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এরূপ একটি সমঝোতা স্থাপিত হয় যে, তেল পাওয়া গেলে ওই তেল মুসলমান-অধ্যুষিত তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমানএলাকাকে এড়িয়ে বুলগেরিয়ার মধ্যদিয়ে পাইপলাইন সংযোগপূর্বক ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসা হবে। দেখা যায়, সর্বোপরি মোটামুটিভাবে গ্রিসের বিদেশনীতি ও সম্পর্ক ছিল সাংঘাতিকভাবে অর্থোডক্স ধর্মের প্রতি পক্ষপাতমূলক। গ্রিস নিঃসন্দেহে ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ বজায় রাখতে পারবে। সাংস্কৃতিক ধারায় সভ্যতা গঠনের প্রক্রিয়ায় বলা যায়, ওই সদস্যপদগুলো নড়বড়ে, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্টদের জন্য সমস্যাসংকুল হয়ে দেখা দেবে। শীতলযুদ্ধকালীন বৈরিতা শীতলযুদ্ধাবসানোত্তর বন্ধুত্বে রূপ নিচ্ছে, কিংবা বিপরীতভাবে বন্ধুত্ব বৈরিতায় রূপ নিচ্ছে।

রাশিয়া এবং তার নিকটতম বিদেশ/প্রতিবেশী

রাশিয়া এবং তার নিকটপ্রতিবেশী দেশগুলো জারতন্ত্র এবং কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার। তবুও সভ্যতার ব্লক হিসেবে রাশিয়া পশ্চিম-ইউরোপের অনেককিছুই সমানভাবে ধারণ করে থাকে। 'কোর' হিসেবে রাশিয়া ফ্রান্স এবং জার্মানির সমকক্ষ। বেলারুশ এবং মোলদাভিয়া, কাজাকিস্তানের স্লাভিক অর্থোডক্সের অভ্যন্তরীণ চক্রের খুবই কাছাকাছি নিজের অবস্থান নিশ্চিত করে রাশিয়া। ওইসব প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ রুশ-বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে, আর্মেনিয়া ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার মিত্র। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে ওইসব প্রজাতন্ত্রের প্রায় সকলখানেই ছিল রাশিয়ামুখী সরকারব্যবস্থা। আর ওইসব প্রজাতন্ত্রের সরকার সাধারণত নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অধিকাংশ অর্থোডক্স-সমর্থকসম্পন্ন দেশ হিসেবে পরিচিত জর্জিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও তা কিন্তু হালকা প্রকৃতির। ইউক্রেনের বিরাট অংশ অর্থোডক্স-সমর্থক হলেও উভয় দেশই 'দৃঢ়' জাতীয় পরিচয় দ্বারা চেতনাসমৃদ্ধ। অর্থোডক্স বলকান-এলাকায় বুলগেরিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া এবং সাইপ্রাসের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ; যদিও রুমানিয়ার সাথে সম্পর্ক কিছুটা কম-বন্ধুত্বের। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলমান রিপাবলিকসমূহ নানা কারণে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলো বিপরীতভাবে ইউরোপমুখী এবং অত্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে তারা রাশিয়ার প্রভাববলয় থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

মোটের ওপর বলা চলে, রাশিয়ার নেতৃত্বে অর্থোডক্স ধর্মীয় বিশ্বাসীদের নিয়ে একটি ব্লক গড়ে উঠেছে। এর আশেপাশে আপেক্ষিকভাবে দুর্বল মুসলমান রাষ্ট্রের অবস্থান রয়েছে, যে রাষ্ট্রগুলোর ওপর কমবেশি রাশিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় এবং অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত রাষ্ট্রগুলো প্রভাবিত হোক এমনটিও রাশিয়ার সহ্য নয়। বিশ্বের দ্বারা এই পদ্ধতি গৃহীত ও অনুমোদিত হোক, রাশিয়া এমন প্রত্যাশা ধারণ করে থাকে।

১৯৯৩ সালে ইয়েলৎসিন বলেন যে, বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের নিকট রাশিয়া প্রত্যাশা করে যে, 'তারা যেন প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত অঞ্চলসমূহের ওপর রাশিয়ার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কর্ণধার হিসেবে রাশিয়াকে মেনে নেয়।' তৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৈশ্বিক স্বার্থে একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল, অন্যদিকে রাশিয়া আঞ্চলিক ও সভ্যতার দৃষ্টিতে আজ একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত অর্থোডক্স দেশসমূহ ইউরেশিয়া ও বিশ্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ রুশ-ব্লক অগ্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার সময়ে তেমন ৫টি দেশই প্রাথমিকভাবে উচ্চমাত্রার জাতীয়তাবাদী ধারায় কাজ করেছিল। এভাবে তারা তাদের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করতে এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে মস্কোর প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী

হয়েছিল। পরে অবশ্য অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতার আলোকে অন্তত ৪টি দেশকে রাশিয়ামুখী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল এবং কার্যত তাদেরকে ওই একই কারণে রাশিয়ামুখী রাজনীতিকেও এগিয়ে নিতে হয়েছিল। ওইসব দেশের মানুষ তাদের নিরাপত্তার জন্য মস্কোর সমর্থন প্রত্যাশা করেছিল। জর্জিয়ায় রাশিয়ার সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে সরকারব্যবস্থায় ওই একইরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

আর্মেনিয়া ঐতিহাসিকভাবে আগাগোড়াই তার নিজস্ব স্বার্থে রাশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তারই কারণে দেখা যায়, প্রতিবেশী মুসলমানদের দিক থেকে আসা ভয়ভীতি এড়িয়ে যেতে রাশিয়া সবসময়ই আর্মেনিয়ার পক্ষ নিয়েছে। এই জাতীয় সম্পর্ক সোভিয়েট-পরবর্তী যুগেও অব্যাহত রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে আর্মেনিয়া রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে থাকে। দুটি দেশ পরস্পরের কৌশলগত স্বার্থ দেখে থাকে।

বেলারুশ তার জাতীয় পরিচয় সম্পর্কে খুবই চেতনাসমৃদ্ধ ছিল। দেশটি আর্মেনিয়ার চাইতেও অধিক মাত্রায় রাশিয়ার সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। বেলারুশের অনেক মানুষ নিজের দেশের চেয়ে বরং পরিচয়ের বেলায় নিজেদের রুশ বলতে ভালোবাসে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে বেলারুশের আইনসভা মধ্যমপন্থী ও নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তির দখলে চলে যায়। এরা ছিলেন মূলগতভাবে রাশিয়ামুখী রক্ষণশীলতার নিগড়ে আবদ্ধ।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার ভ্লাদিমির জিরিনভস্কি নামে একজন রাশিয়ামুখী নেতাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। বেলারুশ শুরুতেই 'কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস' (CIS)-এ যোগদান করে। ১৯৯৩ সালে গঠিত অর্থনৈতিক ইউনিয়নে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে বেলারুশও চার্টার্ড সদস্য। দেশটি রাশিয়ার সঙ্গে একটি আর্থিক ইউনিয়ন গঠনে রাজি হয়। এভাবে বেলারুশ রাশিয়ার নিকট তাদের পরমাণুশক্তি হস্তান্তর করে। সেসঙ্গে দেশটি তাদের ভূমিতে অন্য অঞ্চলের জন্য রাশিয়ার সৈন্যসমাবেশের অনুমতি প্রদান করে। আর ১৯৯৫ সালে বেলারুশ রাশিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর মালদাভিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। অনেকেই ভেবেছিলেন যে, দেশটি হয়তো রুমানিয়ার সঙ্গে সংহতি সৃষ্টি করবে। এই ধরনের ঘটনা ঘটার ভীতি ও আশঙ্কার সঙ্গে আসলে সেখানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। এই আন্দোলন ঘটতে থাকে পূর্বাঞ্চলের 'রুশিফাইড' এলাকায়। এতে মস্কোর গোপন সমর্থন ছিল, আর সক্রিয় সমর্থন ছিল রাশিয়ার ১৪তম সৈন্যবাহিনীর, যার ফলে সৃষ্টি হয় ট্রান্স-ডাইনেস্টার প্রজাতন্ত্রের। রুমানিয়ার সঙ্গে একত্রিত হওয়ার প্রশ্নে মালদাভিয়ার মনোভাব ও ইচ্ছায় পরবর্তীতে উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও রাশিয়ার অর্থনৈতিক চাপের কারণে উক্ত বিচ্ছিন্নবাদী মনোভাব হ্রাস

পায়। মালদাভিয়া সিআইএস-এ যোগদান করে এবং রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারিত করে। ১৯৯৪ সালে মালাভিয়ার রাশিয়ান দল পার্লামেন্টে বিপুল বিজয় অর্জন করে।

উল্লিখিত তিনটি দেশের জনমত বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনটি দেশে সরকার সামরিক-কৌশলগত কারণে ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে শুরু করেছিল। অনেকটা ইউক্রেনেও পরবর্তীতে তদ্রূপ ঘটনা ঘটেছিল। তবে জর্জিয়ার বেলায় ঘটনা অন্যরকম ঘটেছিল। ১৮০১ সাল অবধি জর্জিয় রাজা জর্জি-XIII-এর শাসনের সময় পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বজায় ছিল। তিনি আসলে তুর্কিদের থেকে তাঁর দেশ রক্ষায় ডাক দিয়েছিলেন। রুশবিপ্লবের তিন বৎসর পরে ১৯১৮-১৯২১ পর্যন্ত জর্জিয়া পুনরায় স্বাধীন থেকেছে, কিন্তু বলশেভিকরা জোরপূর্বক জর্জিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর জর্জিয়া পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেখানে তখন একটি জাতীয়তাবাদী কোয়ালিশন নির্বাচনে জয়ী হয়। কিন্তু এই দলের নেতার আত্মঘাতী কার্যকলাপের কারণে তিনি সহিংস তৎপরতার ভেতর দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী এডওয়ার্ড এ শেভার্ডনেজ দেশে ফিরে এসে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন এবং ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল অবধি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আফখাজিয়া নামক একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক তিনি বিরোধিতা প্রাপ্ত হন, এই গোষ্ঠীটি রাশিয়ার নিকট থেকে কার্যকর সমর্থন পেয়েছিল। তাছাড়া ক্ষমতাচ্যুত গামসখুরদিয়ার অনুসারীদের দ্বারাও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকেন। কিং জর্জিকে ছাড়িয়ে যাবার মানসে তিনি বলেন যে, 'আমাদের বড় মাপের কোনো পছন্দ নেই।' এমতাবস্থায় মস্কোর নিকট সাহায্য চাইতে হবে। রুশবাহিনী তাঁকে সমর্থন দেয়, তবে জর্জিয়ার সিআইএস যোগদানের বিনিময়ে। ১৯৯৪ সালে জর্জিয়া রাশিয়ার সময়সীমাবিহীন তিনটি সামরিক স্থাপনা গ্রহণের প্রস্তাবে রাজি হয়। রাশিয়ার এরূপ সামরিক হস্তক্ষেপ জর্জিয়ার সরকারব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতাকামী জর্জীয়দের এভাবে চূড়ান্তরূপে রুশমুখী করা হয়।

প্রাক্তন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহের মধ্যে ইউক্রেন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইউক্রেন স্বাধীনভাবেই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। তবে সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রজাতন্ত্রটি মস্কোর অংশ এবং শাসনাধীন চলে যায়। ১৬৫৪ সালে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যখন কাজাক নেতা বোহধান খেমেলিয়াৎস্কি (Bohdan Khamelnytsky) পোল্যান্ডের শাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন। রাশিয়ার জারের সঙ্গে তিনি জোটবদ্ধ হন, যার বিনিময়ে মস্কো পোল্যান্ডের শাসন মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে সমর্থন জোগাবে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ইউক্রেন স্বাধীন ছিল, ওই সময় বাদ দিয়ে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইউক্রেন রাজনৈতিকভাবে মস্কো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তবে ইউক্রেন একটি 'ফাটলযুক্ত রাষ্ট্র' যার রয়েছে দুটি ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। সভ্যতাসংক্রান্ত ফাটলরেখা মূলত 'পাশ্চাত্য'

এবং 'অর্থোডক্স' ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন, আর এ-ধরনের টানাপড়েন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে।

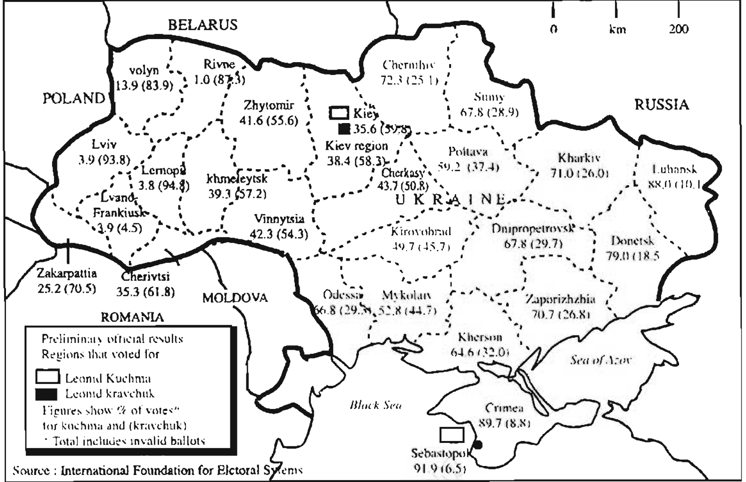
অতীতে একসময় পশ্চিম ইউক্রেন ছিল পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যেভুক্ত। এর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ 'ইউনিয়েটি গির্জার' প্রতি অনুগত। এ-ধরনের গ্রির্জা অর্থোডক্স কার্যক্রম পরিচালনা করলেও পোপের আধিপত্য মেনে নিয়ে ছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যারা পশ্চিম ইউক্রেনীয় বা ইউক্রেনীয় ভাষায় কথা বলে থাকেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কট্টর জাতীয়তাবাদী। অন্যদিকে পূর্ব ইউক্রেনীয়রা সর্বতোভাবে অর্থোডক্স-ধর্মে বিশ্বাসী এবং অংশত রুশভাষায় কথা বলে থাকেন। ১৯৯০-এর দশকে দেখা যায়, সেখানে শতকরা ২২ ভাগ ছিল রুশ, কিন্তু স্বদেশী মিলে শতকরা ৬১ ভাগ মানুষ রুশভাষায় কথা বলে থাকেন। সেখানে অধিকাংশ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) শিক্ষার্থী স্কুলে রুশভাষা শিখে থাকে।[৬] ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রুশ মানুষজনে ভরা ছিল এবং রুশ ফেডারেশনের অংশ বলে বিবেচিত হত। এমতাবস্থায় ক্রুশচেভ এটিকে ইউক্রেনের নিকট হস্তান্তর করেন, যা ছিল ৩০০ বৎসর পূর্বের খেমেয়েলিয়াৎস্কির প্রতি একটি স্বীকৃতি বিশেষ।

পূর্ব ও পশ্চিম ইউক্রেনের পার্থক্য সেখানকার জনসাধারণের চিন্তাচেতনা, আচার-আচরণের মধ্যদিয়েও প্রকাশ পেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯২ সালে পশ্চিম ইউক্রেনে বসবাসরত এক-তৃতীয়াংশ রুশ জনগোষ্ঠী (কিয়েভে যেখানে মাত্র শতকরা ১০ ভাগ রুশ বসবাস করে থাকে) বলেন যে, তারা রুশবিরোধী বিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। ১৯৯৪ সালে পূর্ব-পশ্চিম প্রভেদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভেতর দিয়ে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পদাধিকারী লিওনিদ ক্রভচিক, যিনি রুশদের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং বলেন যে, তিনি এখন জাতীয়তাবাদী, একথার ফলাফল হিসেবে তিনি পশ্চিম ইউক্রেনের তেরোটি প্রদেশ থেকে শতকরা ৯০ ভাগ ভোট অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনিদ কুচমা, পূর্ব অঞ্চলের ১৩টি প্রদেশে থেকে সমসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট অর্জন করেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারণায় ইউক্রেনমুখী বক্তব্যকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। বাস্তবে খুবই সংকীর্ণ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৯৯৪ সালে ১৬৫৪ সালের পুরোনো দর্শন তথা খেমেলিয়াৎস্কিপন্থীরা সরকার গঠন করেন। একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ উক্ত নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল 'ইউরোপীয় সমর্থক স্লাভ' যারা পশ্চিম ইউক্রেনে বসবাস করে থাকেন, অন্যদিকে 'রুশ-স্লাভ' যারা পূর্বাঞ্চলে বসবাস করেন তাদের মধ্যে পার্থক্যরেখা বলে দেয়। সেসাথে এও বলে দেয় ইউক্রেনীয়দের কী করা উচিত। এটি কোনোভাবেই কোনো নৃগোষ্ঠীক বিভেদ নয়, যতটা না সাংস্কৃতিক।'[৮]

এ-ধরনের বিভেদের ফলাফল হিসেবে ইউক্রেন ও রাশিয়ার সম্পর্ককে তিনটি ভাবে দেখা যায়।

Ukraine: A Cleft Country



প্রথমত, ১৯৯০-এর দশকে পারমাণবিক শক্তি ক্রিমিয়া প্রসঙ্গ : ইউক্রেনে রুশদের অধিকার, কৃষ্ণসাগরে জাহাজ ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ এ-দ্বন্দ্ব সশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে মনে করেছিলেন। কোনো কোনো পশ্চিমাবিশ্লেষক মনে করেন যে, যুদ্ধ বাধলে পশ্চিমাবিশ্বের উচিত হবে ইউক্রেনকে সমর্থন দেয়া, কেননা ইউক্রেনের হাতে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি যার দ্বারা রাশিয়ার আগ্রাসনকে বাধা দেয়া সম্ভব।[৯] যদি সভ্যতা বলতে যা বুঝায় তা আমরা বুঝে থাকি, তাহলে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে সহিংসতা নিরর্থক। এ দুটোই স্লাভিক দেশ। দুটো দেশেই রয়েছে প্রাথমিকভাবে অর্থোডক্স ধর্মীয় সমর্থক মানুষ, যারা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে সম্পর্কিত এবং যাদের মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম অহরহ ঘটে যাচ্ছে। উভয়পক্ষের মধ্যে বহু বিবদমান ইস্যু এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী মানুষ থাকার পরও উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ কঠিন সময় পরিক্রমের মাধ্যমে বাধাবিপত্তিসমূহ দূর করে একটি নরম ও মধ্যমপন্থী উপায় বের করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৪ সালের মধ্যভাগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইউক্রেনে সর্বতোভাবে একজন রুশমুখী প্রেসিডেন্ট নির্বাচত হওয়ার পর মনে করা হয় যে, উভয়দেশের মধ্যে চলমান বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে, যেখানে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে মারমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে রয়েছে; রয়েছে রাশিয়া এবং বাল্টিক অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা। কিন্তু দৃশ্যত রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে কোনোপ্রকার সহিংস সংঘাত ঘটতে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, এ-ধরনের একটি সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না যে, ইউক্রেন বিভাজিত হয়ে যেতে পারে, কেননা সেখানে ফাটলরেখা রয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বাঞ্চল রাশিয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে। বিচ্ছিন্নতার ইস্যুটি প্রথম আসতে পারে ক্রিমিয়ার অবস্থা থেকে। ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রায় শতকরা ৭০ জনই রুশ। ১৯৯১ সালে একটি গণভোটের মাধ্যমে জনগণ রাশিয়ার কবল থেকে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৯২ সালের মে মাসে ক্রিমিয়ার জাতীয় সংসদ তাদের স্বাধীনতার বিষয়টি অনুমোদন দেয়। তবে ইউক্রেনের চাপে পরে তা বাতিল করা হয়। রুশ পার্লামেন্টও ১৯৫৪ সালে ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেছিল।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে ক্রিমিয়ার জনগণ এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন, যিনি রাশিয়ার সঙ্গে ক্রিমিয়ার ঐক্য গড়ার জন্য প্রচারণা চালিয়েছেন। এ-ধরনের পরিস্থিতি অনেকের মনে প্রশ্ন এনেছে : তাহলে কি ক্রিমিয়াই পরবর্তী নয়াগোরনো-কারাবাক বা আফখাজিয়া হতে যাচ্ছে?[১০] তবে এর উত্তর কিন্তু সমস্বরে উচ্চারিত হয় : 'না'। ক্রিমিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে থাকেন এবং মীমাংসায় আসার বদলে স্বাধীনতার দাবিতে একটি গণভোটের আয়োজন করেন। ১৯৯৪ সালের মে মাসে পুনরায় পরিস্থিতি অগ্নি-উন্মুখ হয়ে পড়ে; যখন ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৯২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করে, যার ফল হিসেবে কার্যত ক্রিমিয়াকে ইউক্রেন থেকে স্বাধীন করে দেয়। অবশ্য রুশ এবং ইউক্রেনের নেতৃবৃন্দ সহিংসতা রোধকল্পে এই ইস্যুটি ধামাচাপা দিতে চেয়েছেন এবং এর দুইমাস পরে রুশপন্থী খুচমা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ক্রিমিয়ার স্বাধীনতার স্পৃহাকে খাটো করে দেখতে থাকেন।

ওই নির্বাচন অবশ্য বাস্তবে ইউক্রেনের রুশপন্থী পশ্চিমাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেতনাকে উস্কে দেয়। কিছু কিছু রুশ এ-ঘটনাকে সাধুবাদ দেয়। একজন রুশ জেনারেল বলেন : পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বৎসরের ভেতর ইউক্রেন অথবা পূর্ব-ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে ফিরে আসবে। আর পশ্চিম-ইউক্রেন নরকে যেতে পারে।[১১] তবে পশ্চিমাবিশ্বমুখী ইউক্রেনের অংশটিকে কেবলমাত্র পশ্চিমাবিশ্বের কার্যকর সমর্থন পেয়েই টিকে থাকতে পারবে।

তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দৃশ্য হচ্ছে এই যে, ইউক্রেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে, তবে তা থাকবে ফাটলযুক্ত হয়ে। থাকতে পারে স্বাধীন হয়েও, অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই চলতে হবে। সেখানকার পরমাণু ও সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত ইস্যুর মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পরপরই অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত দীর্ঘস্থায়ী প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিক অগ্রাধিকারের বিবেচনায় রাখতে হবে। জন মরিসন রুশ-ইউক্রেন সম্পর্কের বিষয়কে ফ্রাঙ্কো-জার্মান সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। [১২] ফ্রান্স

এবং জার্মানি ইউরোপের কোররাষ্ট্রে উপনীত হয়েছে আর রাশিয়া ও ইউক্রেনকে কোর হিসেবে প্রতিভাত হতে হলে অর্থোডক্স বিশ্বের মধ্যে ঐক্য আনতে হবে।

বৃহত্তর চীন এবং এর যৌথ অগ্রগতির প্রত্যয় ও ক্ষেত্র

ঐতিহাসিকভাবে চীন নিজেকে একটি 'সিনিক এলাকার' মধ্যে পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে। এই সিনিক এলাকার মধ্যে আছে কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লিউ চিউ দ্বীপাবলি, অংশত কিছু সময়ের জন্য জাপান এবং এশিয়ার অন্তরস্থ এলাকার মধ্যে আছে অ-চীনা মানচুইউ, মঙ্গল, ইউহার্স, টার্ক এবং তিব্বত। এসব দেশ নিরাপত্তাজনিত কারণেই নিয়ন্ত্রিত হত। এতদ্ব্যতীত 'বহিঃএলাকায় রয়েছে 'বারবারিয়ানরা' যারা অন্যকোনো উপায় না-থাকার দরুন চীনের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে।'[১৩] অধুনা সিনিক সভ্যতার কাঠামো কেন্দ্রীয় কোর হল হানের চীন এবং তাকে ঘিরে রয়েছে প্রদেশসমূহ; কার্যকরভাবে যাদের রয়েছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। প্রদেশসমূহ মূলত চীনাগোষ্ঠীভুক্ত হলেও অ-চীনাদের দ্বারা গঠিত প্রদেশ রয়েছে, যেমন তিব্বত, জিনজিং। চীনাসমাজ বস্তুত বেজিং-কেন্দ্রিক (যেমন হংকং, তাইওয়ান)। আবার এমনও রয়েছে যারা চীনমুখী এবং ক্রমাগতভাবে যাদের ভেতর চীনমুখিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে (সিঙ্গাপুর)। আরও আছে ব্যাপকভাবে চীনা-বংশোদ্ভূত মানুষ দ্বারা গঠিত দেশ, যেমন থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন এবং সেসঙ্গে আছে কিছু অ-চীনা দেশ, যেমন উত্তরকোরিয়া, ভিয়েতনাম। কিন্তু এদেশগুলোও ব্যাপকভাবে চীনের উদ্ভাবিত কনফুসীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত।

১৯৫০-এর দশকে চীন নিজেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে পরিচিত করে। কিন্তু পরবর্তীতে এ সখ্য বজায় থাকেনি। চীন-সোভিয়েট বিভেদের ফলে চীন নিজেকে মার্কিন ও সোভিয়েট এ দুটি বৃহৎশক্তির বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। এ কার্যক্রমের কিছু জমা এবং কিছু খরচ উভয়দিকই ছিল। নিক্সন-প্রশাসনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির পরিবর্তন হলে চীন নিজেকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মার্কিন-সোভিয়েট শক্তির খেলায় ভারসাম্যাবস্থায় আসতে চেষ্টা করে। তবে ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যখন দুর্বল মনে হচ্ছিল, তখন চীন নিজেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে এগোয়। ১৯৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও আর্থিক দিক থেকে যখন আবার শক্তিশালী হতে থাকে এবং রাশিয়া যখন অর্থনীতির দিক থেকে দুর্বল হতে শুরু করে ও আফগানিস্তানের পাঁকে পড়ে যায়, তখন চীন নিজেকে দূরত্বে নিয়ে আসে। বৃহৎশক্তির প্রতিযোগিতা শেষ হলে চীনের 'তুরুপের তাস' মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, চীনকে বিশ্বরাজনীতিতে তার ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হয়। চীন মোটামুটিভাবে দুটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে, প্রথমত, চীনকে চীনাসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিতকরণ। দ্বিতীয়ত, তারা মনে করে যে, এটি করতে পারলে চীনাসভ্যতা-অধ্যুষিত অন্যান্য সমাজ চীনামুখী হয়ে উঠবে। এভাবে একটি কোররাষ্ট্র

হিসেবে চীন বিশ্বসভ্যতার ওপর দাঁড়াতে পারবে। চীন তার ঐতিহ্য ফিরে পাবে, যা তারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হারিয়েছে। পূর্বএশিয়ার একটি শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে চীন এভাবে আবির্ভূত হয়ে উঠবে।

চীনের এই অগ্রগণ্য ভূমিকাকে বিভিন্নভাবে দেখা সম্ভব। প্রথমত, এভাবে চীন বিশ্বব্যাপী কাজকর্মে নিজেকে যে ভূমিকায় দেখতে চায়; দ্বিতীয়ত, বিদেশে অবস্থানরত চীনারা কীভাবে চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে; তৃতীয়ত, হংকং, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চীনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা। এর ফলে উক্ত দেশগুলোর সঙ্গে চীনের একাত্মতা চীনকে তাদের নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং এভাবে চীনকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার শক্তিধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

চীন সরকার মনে করে যে, চীন একটি কোররাষ্ট্র। চীনকে ঘিরে অন্যান্য চীনাসম্প্রদায় আবর্তিত হবে। চীনা পরিচয় বর্ণভিত্তিক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। চীনা হল তারা, যাদের 'মধ্যে বর্ণ, রক্ত, এবং সংস্কৃতির ঐক্য রয়েছে'—এভাবেই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের পণ্ডিতজনেরা বলে থাকেন। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে এজাতীয় চিন্তাচেতনা চীনের সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি মহল থেকে শোনা যেতে থাকে। দেশে এবং বিদেশে বসবাসরত চীনাদেরকে 'মিরর টেস্ট' ও এর মুখোমুখি হতে হয়। এভাবে চীনা সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি নির্ধারণের মুখ্য মানদণ্ডে পরিণত হতে থাকে। চীনা-পরিচয়ের বিষয়টি বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত থাকলেও এখন চীনারা এ পরিচয় নির্ধারণের বেলায় সাংস্কৃতিক বিবেচনাকেই প্রধান বলে গণ্য করে থাকে।[১৫]

ঐতিহাসিকভাবে চীনা-পরিচয়টি অন্যান্য চীনাদের সঙ্গে চীনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণীত হতে থাকে। চীনাদের এই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিষয়টি প্রকারান্তরে মূল চীনের এবং চীনাসংস্কৃতি-অধ্যুষিত এলাকার আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ফলে, সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে চীনাসংস্কৃতি এগিয়ে যায়।

সুতরাং, 'বৃহত্তর চীন' এমন একটি বিষয় যা কেবলমাত্র বিমূর্ত কোনো ধারণা নয়। এ ধারণাটি দ্রুত বিকাশমান সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে চীনারা চীনকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। এ উন্নয়ন যে শুধু মূল ভূখণ্ডের চীনাদের দ্বারাই হয়েছে তা নয়। এ উন্নয়নের ছোঁয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্য তিন/চারটি ব্যাঘ্রকেও স্পর্শ করেছিল। পূর্বএশিয়ার অর্থনীতি দারুণভাবে চীনামুখী, চীন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং চীন-কেন্দ্রিক। ১৯৯০-এর দশকে হংকং, তাইওয়ান এবং সিঙ্গাপুরে বসবাসরত চীনারা মূল ভূখণ্ডে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন, যে অর্থ ওইসময় মূল ভূখণ্ডের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। তাছাড়াও পৃথিবীর অপরাপর স্থানে বসবাসরত চীনারা চীনের মূল ভূখণ্ডের উন্নতির জন্য অর্থপ্রেরণ অব্যাহত রেখেছিল।

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ফিলিপাইনে চীনা মানুষের সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগ, কিন্তু তারা ওই দেশের অভ্যন্তরীণ বিক্রির শতকরা ৩৫ ভাগ সম্পন্ন

করত। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগে ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার চীনা ছিল শতকরা ২-৩ ভাগ, কিন্তু তারা শতকরা ৭০ ভাগ বেসরকারি গার্হস্থ্য পুঁজির নিয়ন্ত্রণ করত। ২৫টি বৃহৎশিল্পের ১৭টি চীনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং একজন ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব দেশের শতকরা ৫ ভাগ গড় জাতীয় আয়ের মালিক বলে বলা হয়ে থাকে। ১৯৯০-এর দশকে থাইল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ ছিল চীনাবংশোদ্ভূত, কিন্তু ১০টি বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ৯টির মালিক ছিল চীনারা, যারা মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের মালিক। মালয়েশিয়ায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী চীনাবংশোদ্ভূত হলেও প্রায় সমগ্র অর্থনীতিই চীনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[১৬] জাপান এবং কোরিয়া বাদে সমগ্র পূর্বএশিয়ার অর্থনীতি চীননির্ভর।

সম-উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে একটি বৃহত্তর চীনের আবির্ভাব মূলত পারিবারিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা 'ব্যামবু নেটওয়ার্ক' এবং সাংস্কৃতিক মিলের কারণে ঘটা সম্ভব। বিদেশে কর্মরত চীনারা পশ্চিমা বা জাপানি ব্যবসায়ীদের থেকে চীনে ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অনেক বেশি কার্যকর ও দক্ষ। চীনের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী দেখা যায়, বিশ্বস্ততা ও প্রত্যয়াবলি সবই নির্ভর করে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ওপর। সবক্ষেত্রে লিখিত আইনকানুন বা অন্যান্য বিধিনিষেধ এতটা কার্যকর নয়। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসাবাণিজ্য খোলার জন্য চীনের চেয়ে বরং ভারতকে বেশি পছন্দ করে। কেননা চুক্তির কার্যকারিতা চীনে ব্যক্তিগত সম্পর্কনির্ভর, অতএব ঝুঁকিবহুল। একজন জাপানি মন্তব্য করেন যে, 'চীন তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেন সীমানাবিহীন অবস্থার পর্যায়ে এনে লাভবান হচ্ছে।'[১৭] একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী, বিদেশে বসবাসরত চীনাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন এভাবে যে, 'চীনাদের রয়েছে ব্যবসাভিত্তিক দক্ষতা, ভাষা দক্ষতাও তারা অর্জন করে থাকেন। এর সঙ্গে তারা 'ব্যামবু নেটওয়ার্ক' যুক্ত করে স্বাচ্ছন্দ্য পারিবারিক বন্ধনের ধারাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়...।' চীনের মূল ভূখণ্ডে বসবাসরত এবং মূলভূখণ্ডের বাইরে বসবাসরত চীনাদের সম্পর্কে লি কুয়ান ইয়ো বলেন, 'আমরা নৃ-জাতিগোষ্ঠীগতভাবে চীনা। পূর্বপুরুষদের থেকে বয়ে আসা কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি আমরা সকলে সমানভাবে বহন করছি...। আমরা চীনারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে এবং এগুতে চাই।' তাদের এই নৈকট্যবোধের ভিত্তি সম্ভবত তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। এর ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সুনাম খুব সহজে অর্জিত হয়ে থাকে; আর বলাবাহুল্য, যে-কোনোপ্রকার ব্যবসায়িক অগ্রগতির জন্য এ-ধরনের সম্পর্ক একটি ইতিবাচক ভিত্তিস্বরূপ।[১৮] ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে বিদেশে বসবাসরত চীনারা উন্নাসিক বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় যে, কোয়াংসি (Quanxi) যোগাযোগ ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহাল থাকলে উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা এবং আইনকানুন তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় না। ১৯৯২ সালে হংকং-এ দ্বিতীয় চীনা বিনিয়োগ সম্মেলনে সমরূপ সংস্কৃতি যে উন্নয়নের মূল পূর্বশর্ত তা পরিষ্কারভাবে

তুলে ধরা হয়। সিনিক বিশ্ব সর্বত্র এ বক্তব্য তুলে ধরে যে, সাংস্কৃতিক সাযুজ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে থাকে।

তিয়ানআনমেনস্কোয়ারে ঘটনার পর চীনে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক তৎপরতা হ্রাস পায়, কিন্তু চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দুর্বার গতিতে সামনে এগুতে থাকলে বিদেশে বসবাসরত চীনারা তাদের নিজভূমে অর্থ-বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে থাকেন। এর ফলাফল ছিল প্রায় নাটকীয়। চীনের সঠিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মক গতি পায়। ১৯৯২ সালে শতকরা ৮০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (১১.৩ বিলিয়ন ডলার) ছিল বিদেশে বসবাসরত চীনাদের। এর প্রধান উৎস ছিল হংকং (৬৮.৩ শতাংশ), তাইওয়ান (৯.৩ শতাংশ)। সিঙ্গাপুর, ম্যাকাও এবং অন্যান্য স্থান থেকেও বিনিয়োগ আসতে থাকে। ওই একই সময়ে বিপরীতভাবে চীনে জাপানের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছিল শতকরা ৪.৬ ভাগ। সমগ্র বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ৫০ বিলিয়ন ডলার, যার শতকরা ৬৭ ভাগ ছিল চীনা উৎস থেকে আগত। বাণিজ্যিক বিকাশও ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। চীনে তাইওয়ানের পণ্য রপ্তানি ১৯৮৬ সালে শতকরা ৮.০ ভাগ থেকে ১৯৯২ সালে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় শতকরা ৩৫ ভাগ। চীনে সিঙ্গাপুরের রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১৯৯২ সালে শতকরা ২২ ভাগ, যেখানে পূর্বে ছিল শতকরা ২ ভাগেরও কম। ১৯৯৩ সালে মারি উইলডেনবাউম বলেন যে, সম্প্রতি অত্র অঞ্চলে জাপানের আধিপত্যের পরও চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থবিষয়ক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব। কৌশলগতভাবে যেখানে প্রচুর পরিমাণ প্রযুক্তি এবং উৎপাদন-উপকরণ রয়েছে (তাইওয়ান); নজিরবিহীন বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী রয়েছে; রয়েছে বাজারজাতকরণের অপূর্ব সুযোগ এবং আছে সহায়ক ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি (হংকং); আছে চমৎকার যোগাযোগব্যবস্থা (সিঙ্গাপুর); আছে দারুণ আর্থিক অবস্থা (উপরের তিনটি একত্রে); আছে পুঁজি, আছে সম্পদ ও শ্রমিক (মূল চীন)।[২০] এতদ্ব্যতীত, চীনের রয়েছে বিশাল ও সম্প্রসারিত বাজার এবং ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে চীন উক্ত বিশাল বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করছে এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করছে।

চীনারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং কমবেশি তারা ওইসব দেশে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেও মাঝেমধ্যে সেসব দেশে চীনাবিরোধী তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার মিদান দাঙ্গা ছিল অন্যতম যা সহিংসরূপ নিয়েছিল।

মালয়েশীয় ও ইন্দোনেশীয়রা তাদের দেশে কর্মরত চীনাদের দ্বারা চীনের মূল ভূখণ্ডে বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। এখানেই শেষ নয়, প্রেসিডেন্ট সুহার্তকে জনগণের নিকট বলতে হয়েছিল যে, চীনাদের দ্বারা পাচারকৃত পুঁজি ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ওপর কোনোপ্রকার বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসরত চীনারা বারবার বলতে থাকেন, যেদেশে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যেদেশে কাজকর্ম ও বসবাস করছেন সেই দেশের প্রতিই তাদের আনুগত্য

রয়েছে। তারা কোনোক্রমেই পূর্বপুরুষের দেশের প্রতি অনুগত নয়। ১৯৯০-এর দশকে দক্ষিণএশিয়ার দেশসমূহ থেকে চীনের দিকে পুঁজিপ্রবাহ কিন্তু তাইওয়ানিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামে বিনিয়োগের কারণে বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল।

চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহযোগী এবং সংস্কৃতির সঙ্গী হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ক্রমান্বয়ে চীনের আবাসভূমির সঙ্গে নিজেদের অন্তরস্থ করে তুলছে। হংকং চীনের অংশ হওয়ায় আগের মতো আর লন্ডন কর্তৃক শাসিত হচ্ছে না, এখন তার শাসনকর্তা হল বেজিং। ব্যবসায়ীরা চীনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও এমন কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে কাজ করলে চীন বিরাগভাজন হয়। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, চীনারা যখন সংক্ষুব্ধ হন তখন তারা অতিদ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখান। ১৯৯৪ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক ব্যবসায়ী বেজিং-এর প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন যারা আগে হংকং-এর পরামর্শক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৯০-এর দশকে হংকং-এর ওপর চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। মূল ভূখণ্ডের বিনিয়োগ সেখানে জাপান ও মার্কিন বিনিয়োগের যোগফলেরও অধিক পরিলক্ষিত হয়।[২১] ১৯৯০-এর দশকে হংকং এবং চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয় দৃশ্যত সমাপ্ত হয়। রাজনৈতিক সমন্বয় ও সংহতি সমাপ্ত হয় ১৯৯৭ সালে।

চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ১৯৮০-এর দশকে তাইওয়ানের সম্পর্ক হংকং-এর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সাল থেকে চীনের এই দুটো প্রজাতন্ত্র একে অপরের স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে। একের সঙ্গে অন্যের যুদ্ধংদেহী সম্পর্ক বজায় থাকে। সমুদ্রপাড়ে বহুসময় তারা একের প্রতি অপরে গোলাবারুদ ছুড়তে ব্যস্ত থাকে।

ডেং জিওপিং ক্ষমতা সুসংহত করার পর অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে পা বাড়ান, মূল ভূখণ্ডের সরকার বিরোধ মীমাংসার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে তাইওয়ানি সরকার তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং আগের 'তিনটি না' নীতির (যেমন : কোনো চুক্তি নয়, কোনোপ্রকার মীমাংসা নয় এবং কোনোপ্রকার সমঝোতা নয়) পুনর্বিবেচনা করতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে প্রথম মীমাংসা লাভ করা হয়। ঘটনাটি ছিল একটি ছিনতাই বিমান আকাশপথে ফিরিয়ে আনা বিষয়ে, আর এর পরবর্তী বৎসরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তাইওয়ানিদের মূল ভূখণ্ডে ভ্রমণের ওপর থেকে বাধানিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়।[২২]

এরপর থেকে তাইওয়ান এবং চীনের মূলভূখণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হতে শুরু করে। এভাবে তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাজমান চীনাত্ববোধ জাগ্রত হয়ে পারস্পরিক আস্থার সৃষ্টি করে। তাইওয়ানের মীমাংসাকারীর মতে তাইওয়ান এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক হল 'পানিতে ভরপুর রক্তের মতো', তাই একে অন্যের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেয়া দরকার। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে প্রায় ৪.২ মিলিয়ন তাইওয়ানীয় মূল চীনা-ভূখণ্ড ভ্রমণ করেন এবং প্রায় ৪০,০০০ মূলভূখণ্ডের চীনা তাইওয়ান ভ্রমণ করেন।

৪০,০০০ চিঠিপত্র এবং ১৩,০০০ ট্রাঙ্কল প্রতিদিন বিনিময় হতে থাকে। উভয় চীনের মধ্যে বাণিজ্য ১৯৯৩ সালে ১৪.৪ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছে। প্রায় ২০,০০০ তাইওয়ানি প্রায় ১৫ থেকে ৩০ বিলিয়ন ডলার অর্থ মূলভূখণ্ডে বিনিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালের আগে তাইওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু তাইওয়ানিরা ১৯৯০ দশকে অনুভব করেন যে, 'তাদের মূল বাজার মূলভূখণ্ড হওয়াই যুক্তিযুক্ত।' তাইওয়ানি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্য মূল ভূখণ্ডের সস্তা শ্রমশক্তি ছিল একটি আর্কষণীয় বিষয়। কেননা তাদের নিজেদের দেশে রয়েছে শ্রমিকের স্বল্পতা।

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে উভয় দেশের সরকারের ভেতর মীমাংসার অগ্রগতি হয়। ১৯৯১ সালে তাইওয়ান মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ত্বরান্বিত করার জন্য 'স্ট্রেইট এক্সচেঞ্জ ফাউন্ডেশন' গঠন করে; অন্যদিকে মূল চীনে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর রিলেশান অ্যাক্রোস দি তাইওয়ান স্ট্রেইট' গঠন করে যাতে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে তাদের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে মূলভূখণ্ড ও তাইওয়ানে মিটিং হয়। ১৯৯৪ সালে একটি সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একথাও শোনা যায় যে, দুটি দেশের মধ্যে একটি 'সামিট' অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝিতে এসে দেখা যায়, উভয় দেশের মধ্যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে তাইওয়ানের অংশগ্রহণ, এবং তাইওয়ানের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পুনর্নির্ধারণ ইত্যাদি। তবে, শেষের এ বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। কেননা এ ইস্যুটিকে জোরের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে তাইওয়ানিরা মূলভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরাতে চায়নি। অন্তত 'ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি' এমনটি ভেবেছিল। এমনকি ডিপিপি নেতারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নির্বাচনে জয়ী হতে পারলে তাইওয়ানের স্বাধীনতার এজেন্ডাটি তারা তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে নেবে না।

দুটি সরকার একত্রে তাদের সাধারণ ও পরস্পর স্বার্থের বিষয়গুলো এগিয়ে নিতে একমত হয়। স্পার্টলি এবং অন্যান্য দ্বীপে চীনের সার্বভৌমত্বের দাবিটি একত্রে তুলে ধরা হয়। ১৯৯০-এর দশকে উভয় দেশ খুব ধীরে হলেও তাদের যৌথস্বার্থ এগিয়ে নিতে থাকেন, আর এভাবে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও পরিচয় বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

এই ঐক্যমুখী আন্দোলন অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৯৫ সালে বাতিল হয়ে যায়। কেননা তাইওয়ানি সরকার কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যপদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট লি টেংহিউ একটি ব্যক্তিগত সফরে আমেরিকা গমন করেন এবং তাইওয়ানে ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ১৯৯৫ সালে সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে চীন তাইওয়ানের আশেপাশে মিজাইল ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে এবং তাইওয়ান নিয়ন্ত্রিত দ্বীপগুলোর কাছাকছি সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। এই ধরনের ঘটনা মোটামুটিভাবে দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে

ধরে। যেমন তাইওয়ানের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন না করেই কি গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব? ভবিষ্যতে কি তাইওয়ান স্বাধীনতা অর্জন না করেই গণতন্ত্র বহাল রাখতে পারবে?

মূল চীনা ভূখণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের সম্পর্ক দুটি পর্যায়ে অতিক্রম করে তৃতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে। চীনা সরকারকে সকল 'চীনাদের সরকার' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের একটি দাবি জানানো হলে এ-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে তাইওয়ানের অবস্থান কী হবে? এ ধারণা থেকে কি তাইওয়ান বাদ যাবে? এক্ষেত্রে চীনের মূল ভূখণ্ডের ধারণা হল 'এক চীন বা এক দেশ, কিন্তু দুই ব্যবস্থা'।

তাইওয়ানের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিবর্গ দাবি করেন যে, তাইওয়ানের রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। তাইওয়ান আপেক্ষিকভাবে খুব সংক্ষিপ্ত সময় মূল চীন দ্বারা শাসিত হয়েছে। তাছাড়া তাইওয়ানের আঞ্চলিক ভাষা মান্দারিন ভাষা থেকে কিছুটা বোধাতীত। অর্থাৎ তারা বলতে চান, তাইওয়ানি সমাজ অ-চীনা এবং সে-কারণে তাদের স্বাধীন হওয়ার দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া তারা আরও বলতে চান, যেহেতু তাইওয়ানি সরকার আজকাল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সঠিক পরিমাণে সক্রিয় সে-কারণে তাইওয়ান চীনের অংশ, এটি ভাবার কোনোপ্রকার অবকাশ নেই। তাইওয়ান বস্তুত একটি স্বাধীন দেশ, যদিও বেজিং-এর নিকট একথাটি সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। আর এ কারণে, বারবার তারা অস্ত্রের জোরে তাইওয়ানিদের এ মনোভাবকে দমন করার পক্ষপাতী। চীনা সরকার মনে করে যে, ১৯৯৭ সালে হংকং এবং ১৯৯৯ সালে মাকাও-এর চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি আসলে তাইওয়ানকে চীনা মূলভূখণ্ডের সঙ্গে একত্র হওয়ার দরজা উন্মোচিত করে দিয়েছে। তবে তা কবে হবে এটি সময় বলে দেবে। যে-কোনোভাবে বেজিং তাইওয়ানকে মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী। সামরিক রাস্তা এজন্য উপযুক্ত বলে তারা মনে করে থাকেন। ধারণা করা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে শক্তি অথবা সমন্বয়, কিংবা এ দুটো ধারার সংমিশ্রণে কাজটি সম্পন্ন হবে।

১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে কম্যুনিজম-বিরোধী সিঙ্গাপুরের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিল ঠাণ্ডা। তাছাড়া সিঙ্গাপুরের তুলনায় চীন অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল অনেক পিছিয়েপড়া দেশ। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলে সিঙ্গাপুর মূলভূখণ্ডের চীনদেশের সঙ্গে ঐতিহ্য অনুযায়ী সম্পর্কোন্নয়ন করতে সচেষ্ট হয়।

১৯৯২ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর মূল চীনা ভূখণ্ডে ১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। পরবর্তী বৎসরে ঘোষণা দেয় যে, চীনে 'দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর' নামে একটি শিল্পনগরী গড়ে তোলা হবে। সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট লি চীনের অগ্রগতির একজন গুণমুগ্ধ বনে যান। ১৯৯৩ সালে তিনি বলেন, 'যেখানে কাজ সেখানেই চীন।'[২৪] এভাবে দেখা যায়, সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ গতানুগতিক পথে অর্থাৎ শুধু মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় স্থির না-রেখে তা চীনের দিকে ধাবিত করা হয়।

১৯৯৩ সালে সিঙ্গাপুর প্রায় অর্ধেক চীনা প্রকল্পে সহায়তা দেয়। ১৯৭০-এর দশকে লি কুয়ান ইউ যখন চীন সফর করেছিলেন, তখন তিনি উপর্যুপরিভাবে মান্দারিন ভাষার পরিবর্তে ইংরেজিভাষায় কথা বলেছিলেন, তবে তার দুই দশক পরে তিনি আর তা করবেন বলে মনে হয় না।

ইসলাম : সংযুক্তিবিহীন চৈতন্য

আধুনিক পাশ্চাত্যের তুলনায় রাজনৈতিক আনুগত্যের কাঠামো আরবীয়দের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। পশ্চিমের নিকট জাতিরাষ্ট্র হল রাজনৈতিক আনুগত্যসম্পন্ন একটি সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। সংকীর্ণ চেতনা ও তা থেকে প্রসূত আনুগত্য জাতিরাষ্ট্রের আনুগত্যের মধ্যে বিলীন ও অধীনস্থ হবে, এটিই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রত্যাশা। ধর্মীয়, ভাষাভাষি, অঞ্চলভিত্তিক, কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতিভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা জাতিরাষ্ট্রের বৃহত্তর চেতনার নিকট কম-গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রের চেতনা জাতির সমগ্র ভালোমন্দ ও অখণ্ড চেতনার ধারক ও বাহক, নাগরিকদের নিকট থেকে জাতিরাষ্ট্র তেমন আনুগত্য ও সমর্থন চায়। কিন্তু ইসলামি জগতের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের জাতিরাষ্ট্রের আনুগত্যের ভিত্তির বিপরীত ভিত্তি যেখানে কার্যকর?

ইসলামের আনুগত্য মাঝখানে ফাঁপা এবং তা পুরোহিততান্ত্রিক আনুগত্য বিশেষ। এ দুধরনের আনুগত্য সম্পর্কে ইরা লাপিডাম বলেন, 'দুটি মৌল কাঠামোভিত্তিকভাবে বিষয়টি আবর্তিত হয় এবং একদিকে থাকে পারিবারিক ও রক্তসম্পর্ক, গোত্রসম্পর্ক; অন্যদিকে থাকে বিভিন্ন সংস্কৃতির একত্রীকরণ, ধর্ম এবং বৃহত্তর দৃষ্টিতে সামাজিক চেতনা।'[২৫] একজন লিবীয় পণ্ডিত প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। যেমন 'গোত্রতন্ত্র এবং ধর্মীয় (ইসলাম) চেতনা এখনও আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং আরবীয়দের সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একথাগুলো অধিকভাবে সত্য। গোত্রতান্ত্রিকতা হচ্ছে আরবীয় রাষ্ট্রের রাজনীতির মৌল বিষয়। তাহমিন বাশির যেমন বলেন, 'গোত্রের হাতে রাষ্ট্রীয় পতাকা।'

সৌদিআরবের প্রতিষ্ঠাতা তার দক্ষতার মাধ্যমে গোত্রগুলোর মধ্যে 'কোয়ালিশন' গঠন করেছিলেন, আর এজন্য বৈবাহিক সম্পর্কসহ অন্যান্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। সৌদি রাজনীতি এখনও গোষ্ঠীভিত্তিক। সেখানে সুদারি (Sudairis) ও সামারাস (Shammars) গোষ্ঠীসহ অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। লিবিয়ার রাজনীতিতে কম করে হলেও ১৮টি পরস্পরবিরোধী গোত্র সক্রিয় রয়েছে। সুদানে রয়েছে ৫ শতাধিক গোত্র। আর সর্ববৃহৎ গোত্রের অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ।[২৬]

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, সেন্ট্রাল এশিয়ায় জাতীয় পরিচয় বলে তেমন কিছু ছিলই না। 'আনুগত্য ছিল গোত্র ও রক্তের সম্পর্ক, সম্প্রসারিত পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমিত; কোনোক্রমেই সেখানে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কোনো আনুগত্য সৃষ্টি হয়নি।'

এক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, 'মানুষের মধ্যে চরমভাবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরনের সাযুজ্য রয়েছে এবং ইসলাম হল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঐক্য আনয়নকারী শক্তি; কিন্তু তারপরও আমিরের শক্তি সেখানে বড়।'

চেচেন-এ বহুধাবিভক্ত গোত্র রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, 'সোভিয়েট যুগে যদিও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে চেচনিয়ায় ছিল তাদের গোত্রকেন্দ্রিক নিজস্ব অর্থনীতি।'[২৭]

শুরু থেকে অদ্যাবধি ইসলামে রয়েছে ছোটছোট গোত্র এবং বিশাল ও বিশিষ্ট বিশ্বাস। গোত্র এবং উম্মা হল মুসলমানদের মূল চালিকাশক্তি এবং এভাবেই 'আনুগত্য' নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই জাতিরাষ্ট্র এ অবস্থায় প্রায় গুরুত্বহীন।

আরববিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে বৈধতার সংকট। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্বেচ্ছাচারী, তারা আসলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যাবাদের জাতক এবং তাদের সীমানা প্রায়শই অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, যেমন বারবারীয় ও কুর্দীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এইসব রাষ্ট্রসমূহ আরবজাতিকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করে রেখেছে। অন্যদিকে সমগ্র আরবজাতিকে নিয়ে একটি প্যান-আরব রাষ্ট্র কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। অপরপক্ষে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর আস্থাশীল হলে একটি জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অর্থহীন হয়ে যায়। একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসেবে ইসলামি মৌলবাদীরা জাতিরাষ্ট্রের ধারণাতে আস্থা রাখে না। কেননা মুসলমানের অর্থই একত্রে একটি জাতি। মার্কসবাদ ও সর্বহারা শ্রমিকদের একজোট হওয়ার তাগিদে তারাও জাতিরাষ্ট্রে বিশ্বাস করে না। ইসলামে জাতিরাষ্ট্র অস্বীকার করার পরও যেসব রাষ্ট্র তেমনভাবে বিদ্যমান রয়েছে, সেসব রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হয়নি; শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হল ইরাকের সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্রের যুদ্ধ।

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলামি পুনর্জাগরণের পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে, ওই একই কারণসমূহ ইসলামি উম্মার পরিচয় নির্ধারণের বেলাতেও কাজ করেছে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত ১৯৮৯-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বলেন :

> উপনিবেশবাদ সমাপ্তকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের বাস্তবতার সঙ্গে মুসলমানদের ভূমিতলে তেলসম্পদের প্রাচুর্যসহ বর্তমান অত্যাধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার প্রয়োগের কারণে বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মক্কায় হজ্জব্রত পালনের সংখ্যা দিনদিন বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। এসব মানুষের মধ্যে সেখানে পারস্পরিক ও সাধারণ পরিচয়ের চেতনা তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত হয়। সেখানে মিলিত হয় বিভিন্ন দেশের মুসলমান, যেমন চীন, সেনেগাল, ইয়েমেন, বাংলাদেশের হাজিগণ। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ-ফিলিপাইন আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে। তাদের মধ্যে সখ্য বৃদ্ধি পায়, আর তারা জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে হালকা ভাবতে শেখে। তেহরান, মক্কা, কুয়ালালামপুরে অহরহ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সেমিনার

সিম্পোজিয়াম করে যাচ্ছেন। ক্যাসেট, ভিডিওর দ্বারা ইসলামের বাণীসমূহ জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে চলেছে ... ।[২৮]

বিশ্বে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যানুভূতি ও সংহতিবোধ জাগ্রত হওয়ার পেছনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনও অবদান রেখে চলেছে। ১৯৬৯ সালে সৌদিআরবের নেতারা পাকিস্তান, ইরান, মরোক্কো, তিউনেশিয়া, এবং তুরস্ককে নিয়ে রাবাত-এ ইসলামি সামিট গঠন করে। এই সংগঠন থেকে ইসলামি কনফারেন্স-এর জন্ম হয় জেদ্দায় ১৯৭২ সালে। দৃশ্যত, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানগণ এই কনফারেন্সের আওতাধীন।

খ্রিস্টান, অর্থোডক্স, বৌদ্ধ, হিন্দু অধ্যুষিত সরকারসমূহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় কোনো সংগঠন গড়ে তোলেনি যা ধর্মের ওপর নির্ভর করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু মুসলমান সরকারগুলো তা করছে। এছাড়াও সৌদিআরব, পাকিস্তান, ইরান, এবং লিবিয়া সরকার অনেক বেসরকারি সংগঠনের দায়দায়িত্ব বহন করছে; যেমন বিশ্ব মুসলমান কংগ্রেস (এটি পাকিস্তানের দ্বারা সৃষ্ট), মুসলিম ওয়ার্ডলিগ (সৌদিআরব দ্বারা সৃষ্ট)। এভাবে মুসলমানগণ প্রায়শই ব্যতিক্রমী এসব সংগঠনের মাধ্যমে একাত্ম হয়ে উঠেছে ... ।[২৯]

প্রথমত, ইসলামি চেতনার সঙ্গে সংযোগশীল থাকার আন্দোলনে দুটি স্ববিরোধী পরিস্থিতির জন্ম দেয়। প্রথমত, ইসলামি প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগিতাশীল ক্ষমতার কেন্দ্রের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়। এ অবস্থায় মুসলিম উম্মার পরিচয়ের চেতনাকে পুঁজি এবং তা শাণিত করা হয় বিশেষ নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই প্রতিযোগিতা একদিকে প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং তাদের সংগঠন, ও অন্যদিকে সৌদিআরবকে তার কর্তৃত্ব রক্ষার্থে ভিন্নভাবে এগুতে অনুপ্রাণিত করে। তাই দেখা যায়, সৌদিআরব আরবলিগকে প্রতিরোধ করার মানসে ওআইসি'র জন্ম দেয়, যখন 'আরবলিগ' প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্ব ছিল। ১৯৯১ সালে গাল্ফযুদ্ধের পর সুদানের নেতা হাসান আল তারাবি একটি সংগঠন তথা 'পপুলার আরব অ্যান্ড ইসলামিক কনফারেন্সের' জন্ম দেন। এটি ছিল মূলত সৌদিআরব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওআইসি-কে খাটো করার জন্য। পিআইসি'র তৃতীয় সম্মেলন খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের শুরুতে। এ সম্মেলনে ৮০টি মুসলমান দেশের হাজার হাজার প্রতিনিধি যোগদান করে।[৩০] উপরন্তু, আফগানযুদ্ধের ফলে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, যেমন আলবেনিয়া, চেচনিয়া, মিশর, তিউনেশিয়া, বসনিয়া, প্যালেস্টাইন, ফিলিপাইনসহ অন্যান্য স্থানে যারা মুসলমান হওয়ার কারণে সংঘাত-সংগ্রাম করেছে তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ ও যোগসূত্র বেড়ে যায় এবং অনেকেই আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশ নিতে যায়। যুদ্ধাবসানের পর তারা অনেকেই পেশোয়ারে অবস্থিত দাওয়া এবং জিহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং আফগানিস্তানে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক দায়দায়িত্বরত ক্যাম্পে প্রবেশ করেন। ইরানের শিয়া-পরিচয়ের কারণে সুন্নিদের সঙ্গে বিভেদ বজায় থাকে। সুদানের সঙ্গে ইরানের নিবিড় সামরিক সখ্য বজায় থাকে। ইরানের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী

সুদানের এ-সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা ব্যবহার করে, আর উভয় দেশের সরকার মিলিতভাবে আলজেরিয়াসহ অন্যান্য স্থানে মৌলবাদীদের সমর্থন জোগাতে থাকে। ১৯৯৪ সালে হাসান আল তারাবির সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে ইরান এবং ইরাক নিজেদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য পদক্ষেপ নেয়।[৩১]

দ্বিতীয়ত, উম্মার ধারণা সর্বতোভাবে জাতিরাষ্ট্রকে অবৈধ করে দেয়। তবে উম্মা অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি বা দুটি কোররাষ্ট্র থাকা দরকার। কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে মুসলমানদের তেমন কোনো কোররাষ্ট্র নেই। একটি একত্রিত ধর্মীয়-রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীকে ইসলামে বুঝানো হয়ে থাকে। এটি অর্জনের জন্য কোররাষ্ট্র একান্ত প্রয়োজন। অতীতে এমন কোররাষ্ট্র ছিল এবং সেক্ষেত্রে খিলাফত এবং সুলতানকে এক করে দেখা হত, অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ছিল এক এবং অভিন্ন। এ দুটো মিলিত হয়েই একক শাসক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পেরেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে আরব কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য বিজয় যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে তার রাজধানী ছিল দামেস্কো। তবে, এ থেকে অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদ ও পার্শির প্রভাবিত আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। দশম শতাব্দীতে অন্য একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কায়রো এবং কোরজাভোতে। এর চারশত বৎসর পরে তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করে ১৪৫৩ সালে কন্সটান্টিনোপল দখল করে এবং পরে ১৫১৭ সালে আর একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় অনুরূপ সময়ে অন্য তুর্কিগণ ভারতবর্ষ জয় করে এবং সেখানে পরবর্তীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় পাশ্চাত্যের উদ্ভব ঘটে আর কার্যত তা অটোম্যান সাম্রাজ্য এবং মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। কোনোপ্রকার কোররাষ্ট্র পেছনে না-রেখেই তাদের পতন হয়। তাদের ভূখণ্ড পাশ্চাত্যশক্তির মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। এসব রাষ্ট্র দুর্বলরাষ্ট্রে পরিণত হয়, যেখানে খ্রিস্টধাঁচের বিদেশী ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়, আর তা ছিল গতানুগতি ইসলামি রাষ্ট্রের বিপরীত ধাঁচের। এ কারণে, বিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো মুসলমানরাষ্ট্র অবশিষ্ট ছিল না, যে-রাষ্ট্র শক্তির জোরে ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বে এবং ধর্মীয় বৈধতার মাধ্যমে মুসলমান এবং অমুসলমান এলাকায় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

একটি কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণেই ভেতরে ও বাইরে ইসলামি দেশে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই রয়েছে। ইসলামের একটি বড় দুর্বলতা সংযুক্তিবিহীন চৈতন্য এবং সেসঙ্গে তা অন্যান্য সভ্যতার জন্য ভয়ভীতির একটি বড় উৎসও বটে। এই পরিস্থিতি কি স্থায়ী হতে চলেছে ?

একটি ইসলামিক কোররাষ্ট্রের প্রয়োজন, যে রাষ্ট্রের থাকবে অর্থনৈতিক দৃঢ় ভিত্তি, সামরিক শক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতা, ইসলামধর্মীয় পরিচয় এবং ইসলামি উম্মাকে নেতৃত্ব দেবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় যোগ্যতা।

৬টি দেশ সময়ে-সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে নেতৃত্ব দেবার জন্য সম্ভাব্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন তাদের কেউই আর একটি কোররাষ্ট্র হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে না। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ মুসলমান দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এদেশটি প্রান্তে অবস্থিত ইসলামি দেশ এবং ইসলামের কেন্দ্রভূমি আরব থেকে বহুদূরে অবস্থিত, এখানকার ইসলামধর্ম কোমল ধরনের যা অনেকটা 'দক্ষিণএশীয় ব্রান্ডের ইসলাম।' এদেশের মানুষ এবং সংস্কৃতি একটি মিশ্র প্রকৃতির; যার ভেতর আছে দৈশিক জনগোষ্ঠী, মুসলমান, হিন্দু, চৈনিক এবং এখানে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবও রয়েছে।

মিশর একটি আরবীয় দেশ। মিশরে প্রচুর জনসংখ্যা রয়েছে। এর অবস্থান ইসলামি বিশ্বের 'কেন্দ্রে' এবং দেশটি ভৌগোলিক দিক থেকে এবং কৌশলগত অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ। মিশরে রয়েছে ইসলামি শিক্ষার জন্য অগ্রগামী একটি বিশ্ববিদ্যালয় 'আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়'। মিশর একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তার রয়েছে নির্ভরতা। দেশের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; তাছাড়া তেলসমৃদ্ধ আরবীয় দেশগুলোও মিশরের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়।

ইরান, পাকিস্তান এবং সৌদিআরব সকলই মুসলমানরাষ্ট্র এবং সবাই মুসলিম উম্মার ওপর নেতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এজন্য তারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তারা বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার দায়দায়িত্ব বহন করে থাকে এবং বিভিন্ন ইসলামি গোষ্ঠীর জন্য অর্থের যোগান দেয় আফগানিস্তানে যুদ্ধে মুজাহিদিন গেরিলাদের সমর্থন দেয়। মুসলমান জনগণকে জয় করতে সেন্ট্রাল এশিয়ায় ইরান একটি বড় মাপের দেশ। তার অবস্থান কেন্দ্রস্থলে, জনসংখ্যা, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং তেলসমৃদ্ধতা এবং মধ্যমমানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশটিকে একটি কোররাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার যোগ্যতা রাখে। বিশ্বে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানই হল সুন্নি, কিন্তু ইরান হল একটি শিয়াধর্মাবলম্বী দেশ। ফার্সিভাষা হল আরবির পরই মুসলমানভাষা। কিন্তু দেখা যায়, ফার্সি ভাষাভাষি লোক এবং আরবি ভাষাভাষি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে সংঘাতময় ও দ্বন্দ্বপূর্ণ।

পাকিস্তানের ভৌগোলিক আয়তন এবং জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি এর নেতৃত্বকে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল করে তুলেছে যে, তারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে, মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা সৃষ্টি এবং ইসলামি ধারার জন্য কথা বলার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু সমস্যা হল পাকিস্তান আপেক্ষিকভাবে একটি দারিদ্র্যপীড়িত দেশ; দেশটি অভ্যন্তরীণ নৃগোষ্ঠীক দ্বন্দ্বে জর্জরিত; তাছাড়া রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক বিবাদ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিরতার রেকর্ড খুব ভালো নয় এবং ভারতের সঙ্গে অনবরত বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই রয়েছে। এর জন্য পাকিস্তানকে অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। সেসঙ্গে অ-মুসলমান, যেমন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ওই একই কারণে সম্পর্ক রাখা তারা জরুরি মনে করে থাকে।

সৌদিআরব হল ইসলামের আদি বাসস্থান, ইসলামের পবিত্র আলো সেখানে প্রজ্বলিত হয়েছিল। এদেশের ভাষা আরবি। সৌদিআরবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি

তেলসম্পদের মজুদ রয়েছে। এর শাসকসম্প্রদায় দেশটিকে একটি কট্টর ইসলামি পথে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সৌদিআরব ছিল একক ইসলামি প্রভাবে প্রভাবশালী দেশ। সৌদিআরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয় তারা করে থাকে মসজিদ নির্মাণ থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক ও রাজনৈতিক দলের পেছনে। এ ছাড়াও তারা অর্থ দেয় বিভিন্ন ইসলামি সংস্থাকে, এমনকি সন্ত্রাসীগোষ্ঠীও এ অর্থের ভাগ পায়। তবে, কম জনসংখ্যা ও ভৌগোলিকভাবে বিপদসংকুল অবস্থানে অবস্থিত থাকার জন্য দেশটি তার নিরাপত্তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল।

তুরস্কের রয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা, মধ্যমানের উন্নয়ন পরিস্থিতি; রয়েছে জাতীয় প্রশ্নে প্রবল ঐকানুভূমি এবং সামরিক ঐতিহ্য। এ অবস্থায় তুরস্ক একটি 'কোর ইসলামি দেশ' হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয়, তুরস্কের সমাজ হল ধর্মনিরপেক্ষ। কেমাল আতাতুর্ক তুরস্ককে অটোম্যান সাম্রাজ্যের কবলমুক্ত করেছিল। তুরস্ক ওআইসি-এর চাটার্ড সদস্যপদ পর্যন্ত পায়নি, এর কারণ হল তার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। যতদিন পর্যন্ত তুরস্ক একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্র ও তার নেতৃত্ব তুরস্ককে সহজে মেনে নেবে না।

তাহলে তুরস্ক কীভাবে এবং কী ধারায় নিজেকে উপস্থাপন করবে? এক হতে পারে, তুরস্ক একটি ভিক্ষুকরাষ্ট্রের মতো হতাশা ও লজ্জাজনকভাবে পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য ধর্না দেয়া বন্ধ করতে পারে এবং ইসলামি ঐতিহ্য ও চাহিদা মোতাবেক পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব নিয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব এগিয়ে আসতে পারে।

তুরস্কে মৌলবাদ আবির্ভূত হওয়ার পথে, ওজালের সময় তুরস্ক আরববিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। তুরস্ক সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে নৃগোষ্ঠীক মিলের কারণে সেখানে একটি ভূমিকা রাখতে গিয়েছিল। তুরস্ক বসনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে তুরস্ক বলকান-এলাকার মুসলমানসহ মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তুরস্ক অনেকটা দক্ষিণআফ্রিকার মতো হতে পারে। তুরস্ক বিদেশীমতবাদ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করতে পারে। যেমন দক্ষিণআফ্রিকা বর্ণবাদকে বাদ দিয়েছে এবং এভাবে প্রায় বিলুপ্ত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সভ্যতার দিকনির্দেশক রাষ্ট্রে পরিণত হতে চলেছে। ভালো-মন্দ উভয়দিক থেকেই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমাদের মতাদর্শ। তুরস্ক ইসলামের নেতৃত্ব দেবার মতো গুণাগুণ রাখে। আর তা করতে হলে তুরস্ককে কেমাল আতাতুর্কের 'লিগ্যাসি' বাদ দিতে হবে, এমনকি রাশিয়া যেমন লেনিনকে বর্জন করেছে. তুরস্কের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আরও কঠোরভাবে বাদ দিতে হবে। এভাবে হয়তো তুরস্ক একটি ছিন্নরাষ্ট্র থেকে ইসলামের জন্য 'কোররাষ্ট্রে' উন্নীত হতে পারে।

(ঘ)

সভ্যতার সংঘর্ষ

অধ্যায় - ৮

পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্য বিশ্ব : বিভিন্ন সভ্যতার আন্তঃসম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

পাশ্চাত্যের সর্বজনীনতা

ইতোমধ্যে আবির্ভূত বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সভ্যতায় আবদ্ধ রাষ্ট্রের সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ না হয়ে প্রায়শই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোনো কোনো সভ্যতা আদতেই অন্যসব সভ্যতার তুলনায় অধিক মাত্রায় সংঘাতপ্রবণ। ক্ষুদ্র পরিসরে ইসলাম এবং তার গোঁড়া অংশ, হিন্দু, আফ্রিকান ও তাদের প্রতিবেশী পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপক ফাটলরেখা ও সহিংস অবস্থা লক্ষ করা যায়। আর বৃহত্তর বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের মধ্যে বিভাজন এবং মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য এশীয় সমাজভুক্ত মানুষের বিভেদের কারণে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা এবং কারও কারও সিনিকসুলভ চিন্তাচেতনার কারণে ভবিষ্যৎ পৃথিবী মারাত্মক উত্তপ্ত ও সংঘাতময় হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমাজগৎ একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সভ্যতার ওপর আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পাশ্চাত্য দুনিয়ার শক্তিসামর্থ্য এবং কৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার শক্তিসামর্থ্য ও কৃষ্টির আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কার্যত পাশ্চাত্যসভ্যতা পৃথিবীর সর্বজনীন সাধারণ সভ্যতা নির্মাণের বেলায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার শক্তি ও সামর্থ্যের আপেক্ষিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর পাশ্চাত্য কৃষ্টির আধিপত্য ম্লান হতে শুরু করে। কেননা অপাশ্চাত্যের মানুষ তাদের একান্তই নিজস্ব সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল এবং তা লালন-পালন, ধারণ এবং পরিবর্ধনে ক্রমান্বয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে থাকে। পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের সভ্যতার বৈসাদৃশ্যসমূহ কার্যত তাদের উভয়ের সম্পর্কের বেলায় একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হতে শুরু করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি-পুষ্ট একটি 'অভিন্ন বিশ্বজনীন সভ্যতা' এগিয়ে নিতে আমেরিকার প্রয়াস উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের ফলে পশ্চিমাবিশ্বে এ-ধরনের একটি মনোভাব সুদৃঢ় হয় যে, পাশ্চাত্য মতাদর্শ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উদারনৈতিকতাবাদ, প্রকৃত প্রস্তাবে সারাবিশ্বব্যাপী সমাদৃত, আর তা সর্বজনীন ও সুযুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই একটি মিশনারি জাতি, বিশ্বাস করে যে, অপাশ্চাত্য দেশের জনগণ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, সীমিত সরকারের ধারণা, মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আইনের শাসনের মতো বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে এবং সেই মূল্যবোধসমূহ নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ অপাশ্চাত্য সভ্যতাগুলো এ ধারা গ্রহণ করে তা এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হলেও অপাশ্চাত্য সভ্যতার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী সভ্যতাগুলো এ বিষয়ে সন্দেহপ্রবণ এবং সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে, আর কার্যত এর বিরোধিতা করতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্যের নিকট যা 'সর্বজনীন', বাদবাকি বিশ্বের অন্যান্যদের নিকট তা 'সাম্রাজ্যবাদ' স্বরূপ।

পাশ্চাত্যবিশ্ব তাদের দ্বারা প্রণীত ও অনুসারিত আদর্শগুলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে। আর সেগুলো বজায় রাখতে ও সামনে এগিয়ে নিতে তারা সদাসর্বদা কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও ওইসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থগুলোকে বিশ্বসম্প্রদায়ের 'সামগ্রিক স্বার্থ' বলে চালিয়ে নিতে চায়। অবস্থা এমন যে, কিছু কূট এবং সুবচনমূলক বিশেষ্য জাতীয় শব্দাবলি প্রয়োগ করে তারা অন্যের চোখে ধুলো দিয়ে থাকে (যেমন 'মুক্তবিশ্ব')। প্রকৃতপক্ষে এজাতীয় শব্দাবলির অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্রসহ অপরাপর পশ্চিমাশক্তির স্বার্থরক্ষামূলক কার্যকলাপেরই বিশ্বব্যাপী 'বৈধতা' প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশগুলো আসলে অপাশ্চাত্য দেশগুলোর অর্থনীতিকে নিজেদের বলয়াবদ্ধ করার এবং তার ওপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুখরোচক শব্দ, যেমন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মতো কথা বলে থাকে। আইএমএফ-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমারা লাগসই ব্যবস্থা ও কৌশলের নামে বিভিন্ন জাতির ওপর নানাপ্রকারের শর্ত ও নীতি আরোপ করে কার্যত তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অপাশ্চাত্য দেশে ভোট নিলে নিঃসন্দেহে দেখা যাবে আইএমএফ সেখানকার অর্থমন্ত্রী ও কতিপয় ব্যক্তির সমর্থন অর্জনে সক্ষম হলেও আপামর গণমানুষ তাদের বিপক্ষে ভোট দেবে। এই পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আইএমএফ-এর প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা তথা নেতিবাচক এক অভূতপূর্ব মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, যা কি-না আইএমএফ সম্পর্কে জর্জি আরভাটোভ (Georgi Arbatov's)-এর মূল্যায়নকেই সমর্থন দেবে। আরভাটোভ বলেন, 'আইএমএফ-এর কর্মকর্তারা নব্য বলশেভিক, যারা জনগণের অর্থ নিজেদের দখলে নিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক, পরদেশী এবং অকার্যকর বিষয়সমূহ চাপিয়ে দিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওই সকল দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কঠিন পরিস্থিতির ভেতর ফেলে দেয়।'[১] অপাশ্চাত্যরা অবশ্য পশ্চিমা নীতি ও প্রায়োগিক পর্যায়ে তার তফাতের বিষয়টি দ্বিধাহীনচিত্তে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয়। ভণ্ডামি আর দ্বৈতনীতিই হল দাম্ভিকতা এবং সর্বজনীনতার মূল্য।

গণতন্ত্রায়নের কথা বলা হলেও তার মাধ্যমে ইসলামিক মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আসীন হওয়াকে সহ্য করা হয় না। ইরান এবং ইরাকের জন্য পরমাণুঅস্ত্র-বিরোধী সিদ্ধান্ত মানার কথা বলা হলেও, ইসরায়েলের জন্য তা মোটেও প্রযোজ্য নয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অমরত্বের সুধা মনে করা হলেও, কৃষির উন্নয়ন লক্ষ্যে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। চীনের বেলায় মানবাধিকারের বিষয়টি তাদের নিকট গুরুত্ব পেলেও সৌদিআরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তেলসমৃদ্ধ কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের আগ্রাসনের বিষয়টি শোরগোল তোলে, কিন্তু তেলসম্পদবিহীন বসনিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসনের ঘটনার কোনোপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ নেই। অতএব, দেখা যায়, বিশ্বজনীন এককমানসমৃদ্ধ ধারণার প্রায়োগিক নীতির সংকট খুবই স্পষ্ট। বরং সর্বক্ষেত্রে দ্বৈতনীতিই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যদিয়ে অপাশ্চাত্য সমাজগুলো নিজেদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আধিপত্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। পূর্বএশিয়া খুব চমৎকারভাবেই পাশ্চাত্যের অর্থনীতির সঙ্গে কমবেশি সমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এশিয়া ও মুসলিম দেশগুলো সামরিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারসাম্য আনার জন্য সংক্ষিপ্ত এবং সোজা পথের সন্ধান করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বজনীন চাহিদা, পশ্চিমাশক্তির আপেক্ষিক ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি এবং অপাশ্চাত্য সমাজের ক্রমাগত আপনমুখী দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব কার্যত পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের সম্পর্ক কঠিন করে তুলছে। পরস্পরের প্রতি এই শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ককে মূলত দুটি বিভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। (ক) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এবং চ্যালেঞ্জমুখী সভ্যতাসমূহ; যেমন চীন ও ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাশক্তির সদাসর্বদা অপ্রীতিকর, বৈরী এবং শত্রুমনোভাবাপন্ন সম্পর্ক রয়েছে। (খ) অপেক্ষাকৃত দুর্বল সভ্যতাসম্পন্ন লাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকা যেহেতু অনেকাংশেই পশ্চিমাশক্তি-নির্ভর, সেহেতু তাদের সঙ্গে, বিশেষভাবে লাটিন আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিমাশক্তির সীমিত ও স্বল্পমাত্রিক সংঘাত পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

রাশিয়া, জাপান এবং ভারতের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক আগের দুটি গ্রুপের তুলনায় ভিন্নতর এবং তা একই সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘাতের পর্যায়ের। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 'কোররাষ্ট্র' কখনও পাশ্চাত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জিং, আবার কখনও পাশ্চাত্যের সঙ্গে একই সূতায় গাঁথা। এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ওই দেশগুলোর অবস্থা দোদুল্যমান। কখনও পশ্চিমাসভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার কখনও ইসলামিক ও 'সিনিক' সভ্যতার দোলাচলের ভেতর আবর্তিত হয়ে থাকে। ইসলামিক ও চৈনিক সভ্যতা সাংস্কৃতিকভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ যা পশ্চিমাসভ্যতার তুলনায় ভিন্নতর এবং তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে উন্নত। উভয় সভ্যতার শক্তিসামর্থ্য পশ্চিমের তুলনায় ক্রমবর্ধিষ্ণু। ফলে পশ্চিমের সঙ্গে তাদের মূল্যবোধ ও স্বার্থের সংঘাত বহুমাত্রিক এবং তীব্রতর। কারণ, বিশ্বে একক কোনো ইসলামিক 'কোররাষ্ট্র' নেই। ফলে বিভিন্ন প্রকার ইসলামিক দেশের সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক বিভিন্নমাত্রিক।

১৯৭০ সাল থেকে মৌলবাদের উত্থানের ফলে মুসলিমজগতে একটি সুস্পষ্ট পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব নিরবিচ্ছিন্ন ও সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যায়। ফলে ওই দেশগুলো

পাশ্চাত্যের প্রতি তাদের পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করে ক্রমাগতভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষী মনোভাব গ্রহণ করতে আরম্ভ করে, যার দরুন পশ্চিমের সঙ্গে কিছু ইসলামিক গোষ্ঠীর প্রায়-যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়। সেসঙ্গে শীতলযুদ্ধকালীন অবস্থায় বজায় থাকা ইসলামিক রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বন্ধন দুর্বল হতে শুরু করে। বিশ্বসভ্যতার ভবিষ্যৎরূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে পাশ্চাত্য এবং অপাশ্চাত্যের ভূমিকা নিয়ে কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজনীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ, ক্ষমতার বণ্টন এবং জাতি-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটবে কি-না বা এক্ষেত্রে ইসলাম এবং চীনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হবে কি-না—এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বাস্তববাদি তত্ত্ব দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, অপাশ্চাত্যের 'কোররাষ্ট্র'সমূহ একাঙ্গীভূত হয়ে পাশ্চাত্যশক্তির আধিপত্যের ওপর তাদের শক্তির ভারসাম্য ঘটাবে। কিছু কিছু অঞ্চলে এমনটি ইতোমধ্যে ঘটেছে। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ কোয়ালিশন অসম্ভাবনীয়ভাবে নিকটঅতীতে ঘটবে বলে মনে করা যায়। ইসলামিক এবং সিনিক সভ্যতা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজকাঠামো, ঐতিহ্য, রাজনীতি এবং জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরস্পর মৌলিক দিক থেকে পৃথক। সম্ভবত উভয়ের অন্তঃস্থায়ী বিধানগুলো একে অপরের সঙ্গে যতটুকু মিল, পাশ্চাত্যসভ্যতার সঙ্গে উভয় সভ্যতার মিলের মাত্রা তার চাইতে আরও বেশি। রাজনীতিতে 'কমন শত্রু' আসলে 'কমন স্বার্থের' ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়ে থাকে। ইসলামিক ও সিনিক সমাজ উভয়েই পশ্চিমাবিশ্বকে নিজেদের প্রতিপক্ষ ভেবে থাকে এবং সেমতো পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার মানসে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, যদিও মিত্রপক্ষ এবং স্তালিন হিটলারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল। এই জোটবদ্ধতা বিভিন্নধর্মী ইস্যুকেন্দ্রিক, যেমন মানবাধিকার, অর্থনীতি বিষয়ক, সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উভয়ের ঐক্যজোট গঠন সম্পর্কিত; বিশেষ করে সামরিক দিক থেকে অধিকতর শক্তিধর পশ্চিমাবিশ্বকে মোকাবিলা করতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক শক্তি অর্জন করা, ইত্যাদি। ১৯৯০ সালে 'কনফুসীয়-ইসলামিক সংহতি' স্থাপিত হয়েছিল একদিকে চীন, উত্তরকোরিয়া; অন্যদিকে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া এবং আলজেরিয়ার মধ্যে—শুধুমাত্র পশ্চিমাবিশ্বকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমের সঙ্গে অন্যান্যদের বিভেদের ইস্যুসমূহ আন্তর্জাতিক এজেন্ডা হিসেবে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ-ধরনের ইস্যু পশ্চিমাবিশ্বকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মমুখী করেছে, যেমন :

১. পশ্চিমাবিশ্বের সামরিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণুঅস্ত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ নীতি তৈরিকরণ, তথা পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ও প্রয়োজনে তার পাল্টা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানাদি জোরেশোরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য পাশ্চাত্যের ধারায় মানবাধিকার ফর্মুলা, গণতন্ত্র ইত্যাদি অপাশ্চাত্যদেশসমূহে রপ্তানি করা।
৩. নিজেদের সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্তে অপাশ্চাত্য দেশের উদ্বাস্তু ও অভিবাসী স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা।

উল্লিখিত তিনটি বিষয় দ্বারা পাশ্চাত্যবিশ্ব উদীয়মান অপাশ্চাত্য ধারার বিপরীতে নিজেদের শক্তি, প্রভাব ও স্বার্থ রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে।

অস্ত্রের দ্রুত বিস্তার

সামরিক শক্তিসামর্থ্যের পরিব্যাপ্তি মূলত বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল বিশেষ। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী হওয়ার সুবাদে জাপান, চীনসহ কিছু এশীয় রাষ্ট্র সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করেছে। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শীতলযুদ্ধোত্তর রাশিয়া যদি সফলতার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিতে পারে, তবে তাদের বেলাতেও সামরিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অপাশ্চাত্যের বহুদেশ উন্নত এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমাদেশ থেকে সংগ্রহ করেছে। রাশিয়া, চীন এবং ইসরায়েল নিজেরাই নিজস্ব ক্ষমতায় ও কায়দায় আধুনিক ও সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি করেছে। অপাশ্চাত্য সমাজের হাতে অস্ত্র সংগৃহীত হওয়ার দরুন এ প্রক্রিয়া সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আরও গতি পাবে।

এতদ্‌সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় বিশ্বের যে-কোনো স্থানে এককভাবে সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে সক্ষম। দৃশ্যত মার্কিনিরা একাই বিশ্বের যে-কোনো স্থানে বিমানবাহিনীর সাহায্যে বোমাবর্ষণ করার শক্তি রাখে। বিশ্বের প্রভাবশালী সভ্যতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সমগ্র বিশ্বব্যাপী সামরিকভাবে প্রভাব বিস্তারের একটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক দিক। পাশ্চাত্য ও অপাশ্চাত্যের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে গতানুগতিক সামরিক শক্তির ভারসাম্যের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্লা অনেক ভারী। অতএব, পাশ্চাত্যের এই সঞ্চিত শক্তির বিপরীতে অপাশ্চাত্য দেশের একটি প্রথমশ্রেণীর গতানুগতিক সামরিক প্রস্তুতি অর্জন করার জন্য যা-কিছু করণীয় তা করার সময় এসেছে। সময়ের প্রবাহে তারা উপলব্ধি করছে যে, এ অবস্থায় তাদেরও ব্যাপকভাবে গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র অর্জন করা ও তা ব্যবহারের রীতি-কৌশল আরও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী হতে ইচ্ছুক 'কোররাষ্ট্র' ও সভ্যতাসমূহ নিম্নোল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ওইসকল অস্ত্রশস্ত্র অর্জন করতে পারে।

প্রথমত, এ-ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ওই দেশগুলোকে তাদের প্রতিবেশী দেশ ও সভ্যতার ওপর কর্তৃত্ব করার শক্তি-সামর্থ্য যোগাবে।

দ্বিতীয়ত, এই অর্জিত শক্তি তাদের সভ্যতা ও অঞ্চলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র অথবা অন্যান্য বহিঃশক্তির আক্রমণকে নিরুৎসাহিত করবে। সাদ্দাম হোসেন আরও দুতিন বৎসর বিলম্ব করে, পরমাণুশক্তি অর্জন করে কুয়েত অভিযান চালনা করলে, তিনি শুধু কুয়েত নয়

সেসঙ্গে সৌদিআরবের তেলক্ষেত্রগুলোও নিজের দখলে আনতে পারতেন। অপাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে কিছু স্পষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তরকোরিয়ার সামরিক শ্লোগান এরূপ ছিল : 'আমেরিকানদের সৈন্যবাহিনী গঠন করতে দেয়া হবে না; আমেরিকানদের বিমানবাহিনীর শক্তি অর্জন করতে দেয়া হবে না; আমেরিকানদের সামরিক শক্তি অর্জানের সকল উদ্যোগে প্রচণ্ড বাধা দাও; যুদ্ধে আমেরিকানদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটাও'।

উপসাগরীয় যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আলোকিত একজন ভারতীয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার বক্তব্য এক্ষেত্রে আরও পরিষ্কার, আর তা হল : পারমাণবিক শক্তি অর্জন না করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিও না।[২] একথার সারমর্ম হচ্ছে : 'তোমার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকলে যুক্তরাষ্ট্র তোমার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবে না।' এ প্রসঙ্গে লরেন্স ফিডম্যান মনে করেন, 'পরমাণুঅস্ত্র প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে টুকরো টুকরো করার প্রবণতা বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর দাপট আগের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। পরমাণুঅস্ত্র বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শীতলযুদ্ধাবস্থার তুলনায় শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পশ্চিমাশক্তির ভূমিকা পূর্বের চেয়ে সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে, অর্থাৎ সবল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব লেস এসপিন উল্লেখ করেছেন, 'গতানুগতিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিমাদের তুলনায় অধস্তন অবস্থাকে (বর্তমান রাশিয়ার) পরমাণুঅস্ত্র পুষিয়ে দিয়েছে!' অর্থাৎ পরমাণুশক্তি এখানে 'সমতার' ভূমিকা পালন করেছে।

শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সামরিক শক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'গতানুগতিক অবস্থানকে প্রকৃতপক্ষে শত্রুপক্ষের দ্বারা পরমাণুশক্তি অর্জনকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করেছে। ফলে শত্রুপক্ষ পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে'।[৩] শীতলযুদ্ধোত্তর রাশিয়া তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় পরমাণুঅস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে ইউক্রেনের নিকট থেকে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমা ক্রয় করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাশিয়া বলতে চায় যে, তারা পশ্চিমাদের গতানুগতিক সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের খেসারত দিতে গিয়েই পারমাণবিক শক্তি অর্জনে ও তা আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী হয়েছে। শীতলযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণুঅস্ত্ররোধের প্রশ্নে জানায় যে, তারা পরমাণুঅস্ত্রের প্রথম ব্যবহারের সুযোগ থেকে সরে আসবে না। ফলে শীতলযুদ্ধোত্তর অবস্থায় ১৯৯৩ সালে রাশিয়াও জানিয়ে দেয় যে, তারা সোভিয়েট আমলে প্রথমে পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহার না-করার অঙ্গীকার আর রক্ষা করতে পারবে না। যুগপৎভাবে চীনও তার শীতলযুদ্ধাবসান পরবর্তী পরমাণুঅস্ত্র-প্রতিরোধ প্রশ্নে জানায় যে, তারাও প্রথম অর্থাৎ সবার আগে পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহার না-করার অঙ্গীকারে আর কঠোর থাকবে না।[৪] চীনের পরমাণু ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 'কোররাষ্ট্র' ও আঞ্চলিক শক্তিসমূহ সম্ভাব্য পশ্চিমা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনার জন্য উদ্বিগ্ন ও তৎপর হয়ে ওঠে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাণুঅস্ত্র পশ্চিমাবিশ্বকে আরও প্রত্যক্ষভাবে আতঙ্কিত করে তুলেছে। চীন এবং রাশিয়ার পরমাণুঅস্ত্রসহ দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আজ ইউরোপ এবং

উত্তরআমেরিকায় আঘাত আনতে সক্ষম। উত্তরকোরিয়া, পাকিস্তান, ভারত তাদের ক্ষেপণাস্ত্রশক্তি উন্নত থেকে উন্নততর করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেসব ক্ষেপণাস্ত্র পর্যায়ক্রমে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার সক্ষমতা ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। সামরিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন পরমাণুশক্তি অনেক বিচ্ছিন্ন সহিংস তৎপরতায় যুক্ত হতে পারে এবং ক্ষুদ্রপরিসরে, যা অত্যন্ত সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনতে পরে; যেমন সন্ত্রাস, বিক্ষিপ্ত সহিংসতা, গেরিলাযুদ্ধের বেলাতেও পরমাণুঅস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা ঐতিহাসিকভাবে দুর্বল অস্ত্রের মধ্যে সীমিত ছিল। অর্থাৎ, সাধারণত শক্তিশালী গতানুগতিক সামরিক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল না। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-উত্তর সময়ে পরমাণুঅস্ত্র গতানুগতিক সামরিক শক্তির পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে। অতীতে সন্ত্রাসীরা অত্যন্ত সীমিতভাবে সহিংস তৎপরতা চালাত, স্বল্পসংখ্যক মানুষের জীবনহানি ঘটত বা সীমিত আকারের সম্পদ বিনষ্ট হত। পরমাণুশক্তির ব্যবহারের ফলে পূর্বের এই ধারণা বর্তমানে বদলে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখন মাত্র গুটিকতক সন্ত্রাসী বড়মাপের সহিংসতা ও বহুমাত্রিক ব্যাপক ধ্বংস ডেকে আনতে সক্ষম। অপাশ্চাত্য শক্তিগুলো পৃথক পৃথকভাবে পরমাণুশক্তিতে দুর্বল বলে মনে হলেও তারা যদি একত্রিত হয়, তবে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে ইসলামিক ও কনফুসীয় দেশসমূহে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র জড়ো হতে থাকে। এর সব অস্ত্রের ব্যবহারবিধি ও প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিকভাবে তারা অবহিত হতেও শুরু করে। পাকিস্তান এবং সম্ভবত উত্তরকোরিয়া ক্ষুদ্রাকারে হলেও পরমাণুঅস্ত্র অর্জন করেছে বা অতি অল্প সময়ের নোটিশে তারা উক্ত অস্ত্র তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া তারা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে। ইরাকের হাতে জমা হয়েছে প্রচুর রাসায়নিক ও জীবাণুঅস্ত্র। তাছাড়াও ইরাক পরমাণুঅস্ত্র অর্জনে অনেক কাঠখড় পোড়াতে শুরু করে। ইরান পরমাণুঅস্ত্র অর্জনে আগ্রহী এবং তা ব্যবহারের জন্য উদ্‌গ্রীব। ১৯৮৮ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি ঘোষণা করেন যে, 'ইরানিরা অবশ্যই তাদের জন্য আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র, যেমন রাসায়নিকঅস্ত্র, জীবাণুঅস্ত্র, তেজস্ক্রিয় পদার্থ উদ্‌গিরণকারী অস্ত্র জমা রাখবে।' এর তিন বৎসর পর তাঁর উপরাষ্ট্রপতি ইসলামিক সম্মেলনে বলেন, 'যেহেতু ইসরায়েলের হাতে পরমাণুবোমা জমা রয়েছে, আমরা মুসলমানেরা অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা অ্যাটম বোমা তৈরি করে যাব এবং তা করা হবে জাতিসংঘের পরমাণুঅস্ত্র বিস্তার নিরোধক সিদ্ধান্ত অমান্য করেই।' ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে উচ্চপর্যায়ের এক মার্কিন অফিসার বলেন যে, ইরান পরমাণুঅস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিদেশ সম্পর্কিত মন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিসটোফার খোলামেলাভাবেই বলেন, 'আজকাল ইরান পরমাণুঅস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।' অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র, যেমন লিবিয়া, আলজেরিয়া, সৌদিআরবও পরমাণুঅস্ত্র তৈরি করতে ইচ্ছুক। আলিমাজরুই বলেছেন যে, ইসলামের বিজয়পতাকা (ক্রিসেন্ট) পাশ্চাত্যসহ সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব ফেলেছিল। ইসলাম তার সেই যুদ্ধে অন্য দুই সভ্যতা, যেমন দক্ষিণএশিয়ার হিন্দু ও জৈনধর্ম এবং মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক-ইহুদিবাদের সঙ্গে সমাপ্ত করলেই ভালো করত।

কনফুসীয়-ইসলামিক যোগসূত্রের বিষয়টি সম্প্রসারিত হচ্ছে আর তা ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ ভিত্তি পেয়ে থাকতে পারে। দেখা যাচ্ছে চীন অনেক মুসলিমবিশ্বে গতানুগতিক এবং অ-গতানুগতিক অস্ত্র হস্তান্তর করে চলেছে। আলজেরিয়ার মরুভূমির গোপন স্থানে শক্তিশালী পরমাণুচুল্লি স্থাপিত হচ্ছে, যেখান থেকে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হবে। লিবিয়ার নিকট রাসায়নিক অস্ত্র বিক্রি করা; সৌদিদের নিকট সিএসএস-২-এর মাধ্যমে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্র দেয়া; পরমাণু প্রযুক্তি ও মালমশলা ইরাক, লিবিয়া, সৌদিআরব, উত্তরকোরিয়াকে দেয়ার সঙ্গে প্রচুরসংখ্যক গতানুগতিক অস্ত্র ইরাককে দেয়া হচ্ছে। চীন কর্তৃক উল্লিখিত কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তরকোরিয়াও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদেশগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্ত্র সরবরাহ করছে।

টেবিল নং ৮.১

চীনের বাছাইকৃত অস্ত্র হস্তান্তর, ১৯৮০-১৯৯১

	ইরান	পাকিস্তান	ইরাক
যুদ্ধের মূল ট্যাংক	৫৪০	১১০০	১৩০০
যুদ্ধযান (সেনা বহনকারী)	৩০০	-	৬৫০
ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র	৭৫০০	১০০	-
কামান/রকেট নিক্ষেপক	১২০০*	৫০	৭২০
ফাইটার বিমান	১৪০	২১২	-
যুদ্ধজাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র	৩৩২	৩২	-
ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্র	৭৮৮*	২২২*	-

*এসব হস্তান্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

Source : Karl W Eikenberry, Explaining and Influencing Chinese Arms transfar (Washington National Defence University, Institute for National Strategic Studies. McNair Paper No. 36, February, 1995. P-12.

কনফুসীয়-ইসলামিক সামরিক সম্পর্কের একদিকে থাকছে চীন এবং উত্তরকোরিয়া আর অন্যদিকে রয়েছে পাকিস্তান ও ইরান। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চীনের তৈরি অস্ত্রের মূল গ্রাহক ছিল ইরান, পাকিস্তান এবং সেইসঙ্গে ইরাক। ১৯৭০ সালের প্রারম্ভে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক এক সামরিক সম্পর্ক রচিত হয়। ১৯৮৯ সালে চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে দশবৎসর মেয়াদি পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, অস্ত্রের উৎপাদন এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যৌথ গবেষণা, যৌথভাবে অস্ত্র উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সেসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে উভয়ের সম্মতিতে অস্ত্র বিক্রি করার মতো শর্তাবলি ছিল। ১৯৯৩ সালে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র-ক্রয়বিক্রয়ের আরও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সকল কিছুর ফলে পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি, সামরিক প্রযুক্তি চালান দেয়া ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে চীন আসলে পাকিস্তানের সামরিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ের রন্ধ্রে

রন্ধ্রে প্রবেশ করার পর্যায়ে চলে আসে। পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে জেটবিমান, ট্যাংক, গোলাবারুদ এবং ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের যাবতীয় সাহায্য গ্রহণ করতে থাকে। এতদ্ব্যতীত চীন পাকিস্তানকে পরমাণুঅস্ত্র আয়ত্ত করার বিষয়েও সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। উপরন্তু পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে এম-১১, ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পায় যা পরমাণুবোমা বহনে সক্ষমতা অর্জন করে। এ সব কাজই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বরখেলাপ। পাকিস্তানকে দেয়া বিভিন্নরকমের সামরিক সাহায্যের বদলে চীন পাকিস্তানের নিকট থেকে মধ্যাকাশে জ্বালানি ভর্তির প্রযুক্তিসহ স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র লাভ করে।

১৯৯০ সালের মধ্যে ইরানের সঙ্গে চীনের সামরিক সম্পর্কের দিগন্ত প্রসারিত হয়। ১৯৮০-এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরান তার সমগ্র অস্ত্রের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ সরবরাহ চীনের নিকট থেকে অর্জন করেছিল এবং ১৯৮৯ সালে চীন ইরানের একক সর্বোচ্চ অস্ত্র-সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। ইরানের পরমাণুঅস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টাতেও চীন দৃঢ়ভাবে হাত লাগায়। চীন-ইরান পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর দেশদুটি ১৯৯০ সালে, দশবৎসর ব্যাপী একটি সমঝোতা চুক্তিতে আসে যে তারা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, সামরিক কলাকৌশল ইত্যাদি পরস্পরের মধ্যে হস্তান্তর করবে। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি ইরানের পরমাণুবিশেষজ্ঞদের নিয়ে পাকিস্তান সফর করার পর চীনে যান এবং সেখানে তিনি পরমাণুঅস্ত্র সহযোগিতা বিষয়ে আরও একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এবং ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীন ইরানে দুটি ৩০০ এম ডাব্লিউ (300-MW) পরমাণুচুল্লি স্থাপন করে দেয়। ওই চুক্তি অনুযায়ী চীন ইরানে পরমাণুপ্রযুক্তি হস্তান্তর ও এ-সম্পর্কিত খবরবার্তা আদানপ্রদান, ইরানের বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের উন্নত ধারায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরি চাপে ইরানের সঙ্গে উক্ত চুক্তিটি চীন 'বাতিল' করে। 'বাতিল' শব্দটি ইউএনও কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও চীন কিন্তু নিজে ওই ঘটনাকে 'স্থগিত' হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। যা হোক, এর ফলে ৩০০ এম ডব্লিউ (300-MW) চুল্লি স্থাপনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চীন ইরানের নিকট ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্রনির্মাণ প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে চীন উত্তরকোরিয়ার মাধ্যমে ইরাকে সিল্কওয়ার্ম ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে। চীন ইরানকে ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির লাইসেন্স প্রদান করে। উত্তরকোরিয়া ইরানের প্রতি চীনের এসব কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন দেয় ও ইন্ধন জোগায়। তাছাড়াও উত্তরকোরিয়া বিভিন্ন কায়দায় ইরানকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। উত্তরকোরিয়া ১৯৯৩ সালে ৬০০ মাইল অতিক্রম করতে সক্ষম নরডং নামক ক্ষেপণাস্ত্র ইরানকে প্রদান করে। অন্যদিকে ইরান এবং পাকিস্তান একত্রে পরমাণুঅস্ত্র তৈরি করতে অগ্রসর হয়। ইরানের পরমাণুবিজ্ঞানীরা পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ অর্জন করে। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান এবং চীন একত্রে পরমাণুঅস্ত্র বিষয়ক একটি প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করে। এভাবে চীনের সহযোগিতায় পাকিস্তান ও ইরান ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে।

এসব কার্যক্রমের ফলে পশ্চিমাশক্তিসমূহ বুঝতে পারে যে, বিষয়টি তাদের জন্য ভীতিকর। এজন্য পশ্চিমাশক্তিগুলো একত্রিত হয়ে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সম্প্রসারণরোধের এজেন্ডা দ্রুত সামনে এগিয়ে নিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে ১৯৯০ সালে জনমত জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৫৯ ভাগ আমেরিকান মনে করে যে, আমেরিকার বিদেশনীতিতে পরমাণুঅস্ত্র নিরোধক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হওয়া উচিত। ১৯৯৪ সালে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ এবং বিদেশনীতি প্রণয়নের সঙ্গে সংযুক্ত শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ বিষয়টি অনুরূপভাবেই দেখেছে। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন পরমাণুঅস্ত্র বিস্তার নিরোধক এজেন্ডাটি সামনে নিয়ে আসেন এবং ১৯৯৪ সালের শেষার্ধে তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে 'জাতীয় জরুরি বিষয়' হিসেবে ঘোষণা করেন। কেননা তিনি মনে করেন, 'এটি জাতীয় নিরাপত্তা, বিদেশ নীতি ও মার্কিন অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি'। তিনি আরও মনে করেন, পরমাণুঅস্ত্রের বিস্তার, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের সজ্জা ও ব্যবহার বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করবে। ১৯৯১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ পরমাণুঅস্ত্র বিস্তার রোধকল্পে কাজ করার নিমিত্তে ১০০ জনবল নিয়ে কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এসপিন পরমাণুঅস্ত্র বিস্তার রোধকল্পে একটি পাল্টা ও প্রতিরোধক পরিকল্পনা পেশ করেন এবং এ-সম্পর্কে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের পদ সৃষ্টি করেন।

শীতলযুদ্ধকালীন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এক নজিরবিহীন অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। এজন্য তারা উভয়ই প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর ও অত্যাধুনিক পরমাণুঅস্ত্র তৈরি ও তা নিক্ষেপণের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে। এ প্রক্রিয়াটিকে 'নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ের বিশ্বে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ধরন বদলেছে মাত্র। পশ্চিমাবিদ্বেষীরা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র সংগ্রহ করছে, আর পশ্চিমারা ওই কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে চাইছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এটি 'নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ' না হয়ে বরং 'নির্মাণের বিপরীতে নির্মাণহীনতায়' নিয়ে আসার প্রচেষ্টা বিশেষ। পশ্চিমাদের পরমাণুশক্তির আকার ও পারঙ্গমতা, ওই প্রতিযোগিতার অংশ নয়। অস্ত্র-প্রতিযোগিতার ফলাফল-নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণের জন্য চাই দুইদিকের সম্পদ, যথা : একাগ্রতা এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতা। এটি পূর্ববিহিত ছিল না। নির্মাণের বিরুদ্ধে নির্মাণ না হয়ে নির্মাণের বিপরীতে নির্মাণহীনতা ও তা দমিয়ে রাখার বিষয়টি খুবই প্রগাঢ় যা বরং সহজেই অনুমানসাপেক্ষ। কেননা পশ্চিমাদের অস্ত্রনির্মাণ কাজ দমিয়ে রাখার কৌশল প্রকারান্তরে অন্যান্য সমাজে অস্ত্রনির্মাণ ও অস্ত্র জড়ো করার গতিকে হ্রাস করতে পারে। অপাশ্চাত্য সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, পাশ্চাত্য অপাশ্চাত্য নির্বিশেষে সকল সমাজের জন্য অস্ত্রব্যবসা, অস্ত্রপ্রযুক্তি, অস্ত্রতৈরি সম্পর্কিত দক্ষতার বিনিময়ে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থ, 'কোর'রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক অভিলাষ, আঞ্চলিক শক্তি প্রসারের মনোভাব এবং এর প্রতিকার হিসেবে আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার তৎপরতা—এসবই পশ্চিমাদেরকে অস্ত্রনির্মাণ কাজ দমিয়ে রাখার মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত পশ্চিমাদের প্রচেষ্টার ফলাফল বিশ্বের সকল জাতির স্থিতিশীলতাসহ আন্তর্জাতিক টানাপড়েন দূর করে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, অপাশ্চাত্য সমাজ পাশ্চাত্যের এ-ধরনের তৎপরতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। তারা মনে করে, পাশ্চাত্যের অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত উদ্যোগ প্রকারান্তরে অপাশ্চাত্যের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য বিস্তারের কূটকৌশল। এ কারণেই অস্ত্রনিরোধ সম্পর্কিত পশ্চিমা উদ্যোগ, বিশেষ করে মার্কিন প্রচেষ্টা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। এরকম ঘটনা কোরিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তরকোরিয়ার পরমাণুঅস্ত্রের কথা বিবেচনাপূর্বক তাকে ভবিষতের জন্য সমস্যাসংকুল বলে গণ্য করে। ১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সোজাসাপ্টাভাবে ঘোষণা দেন, 'উত্তরকোরিয়াকে পরমাণুবোমা তৈরি করতে দেয়া হবে না। এবং আমরা এ-বিষয়ে শক্ত অবস্থানেই থাকব।'

মার্কিন সিনেটরগণ, প্রতিনিধিসভার সদস্যবৃন্দ এবং বুশ-প্রশাসনের প্রাক্তন সদস্যরা পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই উত্তরকোরিয়ার পরমাণুশক্তি ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উত্তরকোরিয়ার পরমাণুশক্তির সম্ভাব্য বিস্তারকে মার্কিনিরা শুধু তাদের জন্যই নয়; সেসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করে। বিশেষ করে তা পূর্বএশিয়ার জন্য চিন্তার কারণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। উপরন্তু, এটি যদি দক্ষিণএশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

অন্যদিকে দক্ষিণকোরিয়া উত্তরকোরিয়ার পরমাণুবোমাকে আঞ্চলিক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখতে চায়। দক্ষিণকোরিয়ার অনেকেই উত্তরকোরিয়ার বোমাকে একটি 'কোরিয়ান বোমা' হিসেবে দেখতে ভালোবাসে। তারা মনে করেন যে, উত্তরকোরিয়ার বোমা কখনও দক্ষিণকোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না, বরং তা ব্যবহৃত হবে 'কোরিয়ার' স্বাধীনতা ও স্বার্থের প্রশ্নে জাপান কিংবা অনুরূপ শত্রুভাবাপন্ন বা কোরিয়ার জন্য ভীতিকর অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে। দক্ষিণকোরিয়ার সামরিক বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তারা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে রয়েছে একটি 'একত্রিত' কোরিয়া দেখবার জন্য। সুতরাং, উত্তরকোরিয়া পরমাণুবোমা হস্তগত করে নিন্দা কুড়ালেও প্রকারান্তরে পরবর্তীতে ওই বোমা দক্ষিণকোরিয়াকেই লাভবান করবে। এভাবে উত্তরকোরিয়ার বোমা এবং দক্ষিণকোরিয়ার শিল্পসমৃদ্ধি একত্রিত হয়ে সামনে এক কোরিয়া গঠিত হলে তারা পূর্বএশিয়ার একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রকাশিত হবে। সুতরাং, উত্তরকোরিয়ার পরমাণুবোমাকে ওয়াশিংটন ১৯৯৪ সাল থেকে যেভাবে দক্ষিণকোরিয়ার নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়, আদতে ঘটনা তেমন হয়তো নয়।

এভাবে দেখা যায় যে, পূর্বএশিয়ার পরমাণুঅস্ত্র সম্প্রসারণের ফলে আমেরিকার নিরাপত্তা বিষয়ক স্বার্থ আর তখনকার আঞ্চলিক স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর একটি বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ই উভয়ের পরমাণুশক্তি সম্পর্কে ভীতিকে সহজ ও সরলভাবেই গ্রহণ করেছে, অথচ আমেরিকা উক্ত ভীতি দূর করার জন্য তাদের চেয়ে যেন বেশি উদ্বিগ্ন।

বিভিন্ন শত্রুভাবাপন্ন দেশের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য সমতাসাধনমূলক ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার সম্ভবত খুবই সীমিত সাফল্য নিয়েই এগুচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কর্তৃক উভয় কোরিয়াকে কোনোভাবেই পরমাণুঅস্ত্র অর্জন করতে দেয়া হবে না, এমন ঘোষণার একমাস পরেই যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় যে, তারা ইতোমধ্যে ১টি বা ২টি পরমাণুবোমা অর্জন করেছে। এর পর যুক্তরাষ্ট্র তাদের কৌশল বদলিয়ে উত্তরকোরিয়াকে পরমাণুঅস্ত্র আর সম্প্রসারিত না করার জন্য নানারকম প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। তবে ভারত ও পাকিস্তানকে পরমাণুঅস্ত্র থেকে ফেরাতে বা উক্ত কার্যক্রম থেকে বিরত করতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়।

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে পারমাণবিক শক্তি বিস্তাররোধক সম্মেলনে এক্ষেত্রে চুক্তি নবায়নের প্রশ্নে যে জটিলতা পরিদৃষ্ট হয় তা হল : এ চুক্তিটি কি অনির্ধারিত সময়ের জন্য হবে, নাকি ২৫ বৎসরের জন্য হবে। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল অনির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি হোক। কিন্তু সম্মেলনে অন্যান্য রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করে বলে যে, এর আগে স্বীকৃত পাঁচটি বৃহৎশক্তির পারমাণবিক ক্ষমতা সীমিত করা দরকার। উপরন্তু মিশর চেয়েছিল এ চুক্তির নবায়ন করার আগে চুক্তিপত্রে ইসরাইলের স্বাক্ষর এবং ইসরায়েলের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র পরিদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এতকিছুর পরও সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ীই চুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান না-থাকা এবং কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুন মিশর ও মেক্সিকো কেউই শেষ অবধি যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছামাফিক সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নবায়ন হলেও সিরিয়া, জর্ডান, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, মিশর এবং মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান জাতীয় রাষ্ট্র, নাইজেরিয়ার মতো দেশ এ-বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১৯৯৩ সালে পারমাণবিক শক্তির প্রসার রোধের প্রশ্নে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরিবর্তিত হয়ে পরমাণুঅস্ত্র বিস্তারনিরোধক না হয়ে বরং তা পরমাণুঅস্ত্র বিস্তারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছে। তবে এ সবকিছুই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যুক্তরাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে পরমাণুঅস্ত্র প্রসার বিরোধী অবস্থান থেকে বরং পরমাণুঅস্ত্রের বিস্তারকে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহনীয় করার চেষ্টা শুরু করে। শীতলযুদ্ধের সময়কার পরমাণুঅস্ত্র সম্পর্কিত মনোভাব আসলে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দুনিয়ার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরমাণুশক্তি ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্রের ব্যাপক প্রসার আসলে পরস্পরভাবে বিভক্তসভ্যতাসম্পন্ন বিশ্বে একটি অনিবার্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়।

মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে কমপক্ষে ৩০টি দেশ কর্তৃত্বমূলক বা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ফিরে এসেছে। ভূমিধ্বংসের মতো এহেন পরিবর্তনের নানাবিধ কারণ রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিঃসন্দেহে এই রাজনৈতিক

পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর সেসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের কিছু প্রধান শক্তি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন স্পেন, পর্তুগাল, লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ফিলিপাইন, দক্ষিণকোরিয়াসহ পূর্ব ইউরোপে বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রায়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। দেখা যায়, যে সকল দেশে খ্রিস্টধর্ম ও পাশ্চাত্যের প্রভাব বেশি সেখানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া অধিকতর গতি পেয়েছে। লাটিন আমেরিকার তুলনায় দক্ষিণ এবং মধ্য ইউরোপের ক্যাথলিক ও প্রটোস্টান্ট-অধ্যুষিত অঞ্চলে গণতন্ত্রের নতুন মাত্রা দ্রুত স্থায়িত্ব পেয়েছে। পূর্বএশিয়ায় ক্যাথলিক এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেশ ফিলিপাইন ১৯৮০-এর দশকে গণতন্ত্রে ফিরে আসে। অন্যদিকে, দক্ষিণকোরিয়ায় ও তাইওয়ানের খ্রিস্টান নেতারা সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বাল্টিক প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্রায়ন সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। অর্থোডক্স রিপাবলিকসমূহে এ-কাজটি তত গতি না-পাওয়ায় অনিশ্চয়তার দোলাচলে নিমজ্জিত হয়। মুসলিম-অধ্যুষিত রিপাবলিকসমূহে গণতন্ত্রায়নের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৯০-এর দশকে কেবলমাত্র কিউবা ও আফ্রিকা ব্যতীত খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত এলাকায় গণতন্ত্রায়ন আশাব্যঞ্জক মাত্রা পেয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং গণতন্ত্রায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্ব, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে এই আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় যে, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লব অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হবে এবং এর ভেতর দিয়ে পশ্চিমাধাঁচের মানবাধিকার ধারণা ও রাজনৈতিকগণতন্ত্র সমগ্র বিশ্বে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমাবিশ্ব এ বিষয়টিকে তাই তাদের কর্মতৎপরতার সর্বোচ্চ এজেন্ডায় নিয়ে আসে। আমরা বুশ-প্রশাসনের নীতিতে এর প্রতিফলন দেখতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রবিষয়ক সেক্রেটারি জেমস বেকার ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষণা দেন যে, 'গণতন্ত্র বাধাহীনভাবে বহাল রয়েছে', এবং তিনি আরও বলেন, 'সত্যিকথা বলতে কী শীতলযুদ্ধাবসান পরবর্তী বিশ্বে' 'প্রেসিডেন্ট বুশ গণতন্ত্রকে সুসংহত ও আরও গতিশীল ও অগ্রগামী করতে আমাদের নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন'। এই প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বারংবার বলতে থাকেন যে, গণতন্ত্রায়নের অগ্রাভিযানই হল তার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এজেন্ডা এবং তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি এ বিষয়টি সম্পর্কিত বাজেটে পূর্বের চেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ অতিরিক্ত বরাদ্দ দেন। উপরন্তু, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রতিরক্ষাবিষয়ক সহকারী উল্লেখ করেন যে, বিশ্বে 'গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ করাই হল ক্লিনটন সরকারের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য।' প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের প্রতিরক্ষাসচিব বলেন যে, তাঁর সরকারের ৪টি মূল লক্ষ্যের মধ্যে গণতন্ত্রায়নের কার্যক্রম অন্যতম এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি তার অফিসে একটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্রায়ন নীতির সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টি এগিয়ে নেয়াও পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায়, পশ্চিমাশক্তি নিয়ন্ত্রিত

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে ঋণ ও অনুদান প্রদানের সঙ্গে মানবাধিকার রক্ষার শর্তটি জুড়ে দেয়া হয়।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এ-সম্পর্কিত ইউরোপ ও মার্কিন নীতি খুব সীমিত সাফল্য পায়। অপাশ্চাত্য সভ্যতার প্রায় সকল সদস্যই এ-বিষয়ে পশ্চিমা চাপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হিন্দু, অর্থোডক্স, আফ্রিকান এবং এমনকি কিছুটা হলেও লাটিন আমেরিকার দেশসমূহও। তবে গণতন্ত্রায়নের পশ্চিমা কার্যক্রম ও নীতির সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ আসে ইসলাম এবং এশিয়ার দিক থেকে। এ প্রতিরোধের চেহারা মূলত ইসলামের সুউচ্চ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের মনোভাব ও এশীয়সুলভ সুদৃঢ় আত্মম্ভরীভাব থেকে উৎসারিত। এশিয়ার মূলধারার সঙ্গে সখ্য গড়ার বেলায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী মূলত এশীয়দের অর্থনৈতিক অর্জন এবং তাদের ক্রমাগত বেড়ে ওঠা আত্মবিশ্বাস। এশিয়ার মুখপাত্রগুলো বারংবার পশ্চিমাবিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের ওপর সেকেলে নির্ভরশীলতা ও নতজানু অবস্থা বর্তমানে আর বজায় নেই। তাছাড়া ১৯৪০-এর দশকে জাতিসংঘ-প্রভাবিত পশ্চিমাবিশ্ব পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন করলেও বর্তমানে সে-অবস্থা আর বজায় নেই। এশীয় মুখপাত্রগুলো আরো লিখতে থাকে যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা এখন ইতিহাস মাত্র। 'এশিয়ায় মানবাধিকার এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা' শীর্ষক এক লেখায় জনৈক সিঙ্গাপুরের কর্মকর্তা বলেন, 'শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বের বাস্তবতার আলোকে বিশ্বপরিমণ্ডলে ক্ষমতার নতুন বিন্যাসকে অবশ্যই হিসাবে আনতে হবে ... পূর্ব এবং দক্ষিণএশিয়ার ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।'[১]

তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তরকোরিয়ার মধ্যে পারমাণবিক বিষয়ক সমঝোতাকে যথার্থই বলা যায় 'পুরোদস্তুর আত্মসমর্পণ', আর চীন এবং অন্যান্য এশীয় দেশের সঙ্গে মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নতজানু অবস্থা প্রকারান্তরে তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বৈ কিছু নয়। চীনকে 'পছন্দের' দেশের মর্যাদা প্রদানের প্রশ্নে দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন বিষয়ে ভীতি প্রদর্শনের পর ক্লিনটনের প্রশাসনের পররাষ্ট্র সচিবকে বেজিং-এ অপদস্ত করা হয়, এজন্য, এমনকি মুখরক্ষামূলক সদিচ্ছারও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের মানবাধিকার বিষয়ে তার পূর্বের মনোভাব আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করতে হয় এবং এমএফএন (Most favoured Nations) মর্যাদা ও মানবাধিকার বিষয়কে পৃথকভাবে দেখতে হয়। এতে করে চীন স্পর্ধা পেয়ে গেল এবং উপর্যুপরিভাবে তারা ক্লিনটন-প্রশাসন অপছন্দ কার্যক্রম ঘটিয়ে যেতে থাকল। যুক্তরাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের নিকট থেকেও প্রায় অনুরূপ আচরণ পেল এবং ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে সহিংসতাও এর একই সঙ্গে চলতে থাকল।

এশীয় দেশসমূহের কর্ণধারগণ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পশ্চিমা চাপ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে বিভিন্ন কারণে। আমেরিকান ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ সদাসর্বদা তাদের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে, যাতে করে দ্রুত উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে সরকার অর্থনৈতিক সম্পদ নষ্ট করে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের পথে কোনো বিঘ্ন না ঘটায়। এশীয় দেশসমূহ মানবাধিকার প্রশ্নে

পশ্চিমা চাপকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে মনে করে, এবং কারও ওপর এ-ধরনের আঘাত আসলে তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং সম্মিলিত প্রতিরোধের চিন্তা করে। তদুপরি তাইওয়ান, জাপান এবং হংকং-এর ব্যবসায়ীরা চীনে বড়মাপের বিনিয়োগ করেছেন, আর তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে চীনের সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীরা আমেরিকার সুসম্পর্ক দেখতে চায়, যাতে করে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে এমএফএন বজায় থাকে। এ কারণে জাপান-সরকার আমেরিকার মানবাধিকার নীতির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। তিয়ানআনমেনস্কয়ারের ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিয়াজাওয়া ঘোষণা দেন যে, 'মানবাধিকার সংক্রান্ত বিমূর্ত ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে আগ্রহী নই।' আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো মায়ানমারের সামরিক জান্তার ওপর চাপ প্রয়োগে আগ্রহী নয়। এ নিয়ে আসিয়ান-এর সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতবিরোধ সৃষ্টি হতেও দেখা গিয়েছে।

এতদ্ব্যতীত মানবাধিকার প্রশ্নে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশও তাদের বিকাশমান অর্থনীতির স্বার্থে পশ্চিমাপ্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহী।

এশিয়ার দেশসমূহ তাদের বিকাশমান অর্থনীতির স্বার্থে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে পশ্চিমা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি মূলত মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমা-বক্তব্যকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে চালাবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির নিরিখে এশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমাসভ্যতার সম্পর্ক আগের চেয়ে বদলে যাচ্ছে। সত্যি কথা হল, পশ্চিমাবিশ্বের তুলনায় এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রভাব সুদূর ভবিষ্যতে এশিয়ার সমাজ ও সরকারব্যবস্থার ওপর বর্তাবে বলে মনে করা যায়। এশিয়ার অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র আসবে যখন ওইসব দেশের ক্রমবিকাশমান বুর্জোয়া এবং মধ্যমশ্রেণী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে।

অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধকল্পে চুক্তির সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের ধারণা জাতিসংঘ কর্তৃক এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা কার্যত অমান্য হতে থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ভিন্ন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইরাকের বিরুদ্ধে এ প্রশ্নে আনীত নিন্দাপ্রস্তাব জাতিসংঘে ভোটে পরাজিত হয়। লাটিন আমেরিকার গুটিকতক দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলো এ বিষয়টি এগিয়ে নিতে অনীহা দেখায় এবং পাশ্চাত্যের এ প্রচেষ্টাকে তারা 'মানবাধিকার সাম্রাজ্যবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ সালে সুইডেন কমপক্ষে কুড়িটি পশ্চিমারাষ্ট্রের পক্ষে মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করলে দেখা যায়, এশীয় দেশসমূহ এ প্রস্তাবের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দেয়। ইরাকে মানবাধিকার লংঘনের প্রস্তাবও তেমনিভাবে ভোটে পাস হয়নি। ১৯৯০-এর দশকে প্রায় ৫ বৎসর চীন তার বিরুদ্ধে পশ্চিমা মদদপুষ্ট হয়ে আনীত মানবাধিকার লংঘনের প্রচেষ্টার অভিযোগটি এশীয় দেশসমূহের সমর্থন আদায়ের মাধ্যমে অকার্যকর করে দেয়। ১৯৯৪ সালে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে কাশ্মীরে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ আনার পর ভারত কিছু দেশের সম্মিলনে সে-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু মজার বিষয় হল,

পাকিস্তানের দুটি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র চীন এবং ইরাকও পাকিস্তানকে ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পরামর্শ দেয়। এর কারণ হল এই যে, উক্ত দুটি দেশেও বারবার মানবাধিকার লংঘন করা হয়ে থাকে। এ ঘটনার প্রক্রিয়া হিসেবে *দি ইকনমিস্ট* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কাশ্মীরে ভারতের বর্বরোচিত মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়। সবসময় মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে এমন দেশসমূহ, যেমন তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া, আলজেরিয়া প্রভৃতি এ-বিষয়ে সমালোচনাকে উতরিয়ে যায়। তাই দেখা যায়, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন অত্যাচারী দেশসমূহের হাত থেকে মানবাধিকার রক্ষার মহৎ দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হচ্ছে, অথচ এ সংস্থাটির স্রষ্টাদের লক্ষ্য তা ছিল না'।

মানবাধিকার প্রশ্নে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার পার্থক্য ও অমিল এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে পশ্চিমাবিশ্বের সীমিত সামর্থ্য জাতিসংঘের ভেতর দিয়ে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ভিয়েনায় জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বমানবাধিকার সংক্রান্ত অধিবেশনে। এখানে একদিকে ছিল ইউরোপীয় ও উত্তরআমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ, অন্যদিকে ছিল গোষ্ঠীগত ৫০টি অপাশ্চাত্য দেশ। ১৫টি সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে লাটিন আমেরিকার দেশ (কিউবা), একটি বৌদ্ধধর্মালম্বী দেশ (মায়ানমার), চারটি কনফুসীয় দেশ যাদের মধ্যে আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উন্নয়নের স্তর ইত্যাদি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে (সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, উত্তরকোরিয়া এবং চীন), ৯টি মুসলিম রাষ্ট্র (মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেন, সুদান এবং লিবিয়া)। এশীয় ইসলামিক গোষ্ঠীর এই ঐক্যের মূল নেতৃত্ব ছিল চীন, সিরিয়া এবং ইরাকের হাতে। উল্লিখিত দুটি গ্রুপের মধ্যে লাটিন আমেরিকার দেশসমূহ (কিউবা বাদে) সবসময়ই পশ্চিমাশক্তিকে সমর্থন দিয়ে আসছে; আর আফ্রিকা এবং অর্থোডক্স দেশসমূহ কখনও কখনও পশ্চিমাশক্তিকে সমর্থন দিলেও মূলত তারা পশ্চিমাবিরোধী অবস্থাতেই থাকতে চায়।

সভ্যতার দিক থেকে দেশগুলোর মধ্যে চলমান বিভেদের ইস্যু নিম্নোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করা যায়। যথা : সর্বজনীনতা বনাম আপেক্ষিকতার আলোকে মানবাধিকার সম্পর্কিত মনোভাবের পার্থক্য; অর্থনৈতিক, সামজিক ও উন্নয়নের অধিকার সম্পর্কিত আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার; সহযোগিতার প্রশ্নে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা; জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত কমিশন গঠন; ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্পর্কিত সরকারি সম্মেলনে বেসরকারি মানবাধিকার নেতৃত্বের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা নিয়ে বিতর্ক— যেমন দালাই লামাকে সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে দেয়া উচিত কি-না, কিংবা বসনিয়ার মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাব নেয়া হবে কি-না ইত্যাদি। দৃষ্টিভঙ্গিগত এ পার্থক্যের অনেক অংশই পশ্চিমাবিশ্ব এবং ইসলামিক ব্লকের মধ্যে সীমিত থাকে। ভিয়েনা সম্মেলনের দুইমাস আগে এশিয়ার দেশগুলো ব্যাংককে মিলিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে 'মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলো বিচার করতে হবে জাতীয় এবং আঞ্চলিক বিশেষত্ব, বিভিন্ন প্রকারের

ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির আলোকে'। তারা আরও অভিমত ব্যক্ত করে যে, একটি জাতীয় রাষ্ট্রের ওপর মানবাধিকার সম্পর্কিত অবস্থা পরীক্ষণের কার্যক্রম বরং ওই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের মতো কাজ। তদুপরি, মানবাধিকার পরিস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাত্রা ঠিক করার বিষয়টি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'উন্নয়নের অধিকারের' সর্বজনীন ঘোষণার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ভিয়েনা সম্মেলনের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে মতপার্থক্য একটি জটিল পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল, যা সম্মেলনপূর্ব অবস্থায় জেনেভায় বসে বারবার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

পাশ্চাত্যদেশগুলোর ভিয়েনা সম্মেলনের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ভালো ছিল না। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং কার্যবিবরণী পশ্চিমাবিশ্বের বিরোধীদের পক্ষে চলে গিয়েছিল। মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত উত্তম সিদ্ধান্তগুলো বাদ দিলে সম্মেলনের ফলাফল ছিল যৎসামান্য। একজন মানবাধিকার কর্মী উক্ত সম্মেলন সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন : 'ডকুমেন্টগুলো ছিল কালিমায় লেপটানো এবং স্ববিরোধপূর্ণ' এবং 'এ সম্মেলনটি ছিল এশীয় ও ইসলামি কোয়ালিশনের জন্য বিজয়সূচক আর পশ্চিমাবিশ্বের জন্য পরাজয়ের গ্লানিপূর্ণ'।[১৭]

ভিয়েনা-ঘোষণায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সম্মিলিত হওয়ার অধিকার, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না। এদিক থেকে বলা যায়, ভিয়েনা সম্মেলন ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের মানবাধিকার সর্ম্পকিত ঘোষণার তুলনায় ছিল দুর্বল। এই অবনতি আসলে পশ্চিমাবিশ্বের শক্তিহ্রাসের বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। একজন আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেন : ১৯৪৫ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ধারা আর অব্যাহত থাকল না; আমেরিকার আধিপত্য হোঁচট খেল, আর ১৯৯২ সালের ঘটনার পরও বলা যায়, তা আরও ছোট হয়ে গেল। বাস্তবে বিশ্ব আজ পশ্চিমাদের চেয়ে বরং আরব, এশিয়া এবং আফ্রিকার দখলে।

তাইওয়ান এবং হংকং চীনের এ-আন্দোলনে শরিক হয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং মানবাধিকার সংগঠনসমূহ বেইজিংকে অলিম্পিক আয়োজনের সুযোগদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ফলাফল ছিল সভ্যতার সংকটের ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রথম ব্যালটে বেইজিং আফ্রিকান জাতিসমূহের সমর্থনে ১ম স্থান দখল করে এবং সিডনি পায় ২য় অবস্থান। পরবর্তী নির্বাচনে (৩য়) যখন ইস্তাম্বুল ছিটকে পড়ে তখন কনফুসীয়-ইসলামিক সংযোগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বেজিং-এর পক্ষে বিপুল ভোট পড়ে। যখন বার্লিন এবং ম্যানচেস্টার ছিটকে পড়ে তখন তাদের উভয়ের ভোট চলে যায় সিডনির ঘরে এবং এভাবে ৪র্থ ভোটে সিডনি জয়ী হয়, যা কার্যত বেজিং-এর কপালে বড় ধরনের পরাজয় নিয়ে আসে। আর এজন্য বেজিং দায়ী করতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই। * পশ্চিমাবিশ্ব বেজিং-এর এ পরাজয়ের কারণ হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ে তাদের অবস্থানকে দায়ী করতে থাকে। তবে কেউ কেউ মনে করেন এর মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক, 'পশ্চিমা রাজনৈতিক শক্তির একটি বড় ধাক্কা'।[২০] পৃথিবীর অনেক মানুষ

নিঃসন্দেহে মানবাধিকার ইস্যুর চাইতে খেলাধুলার বিষয়টির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মানবাধিকার ইস্যুতে ভিয়েনায় পশ্চিমাশক্তির পরাজয় ঘটেছিল। তবে অলিম্পিক ইস্যুতে 'পশ্চিমা ধাক্কা' বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পশ্চিমাশক্তির দুর্বলতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান বিশ্বে অপাশ্চাত্য সমাজের প্রতি পশ্চিমাদের 'ধাক্কা' দেবার শক্তির যেমন ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তেমনি গণতন্ত্র সম্পর্কে পশ্চিমাবিশ্বের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমাশক্তির দুর্বলতার চিহ্নও ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

*** ৪টি ব্যালটের ভোট ছিল নিম্নরূপ**

	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
বেজিং	৩২	৩৭	৪০	৪৩
সিডনি	৩০	৩০	৩৭	৪৫
ম্যাঞ্চেস্টার	১১	১৩	১১	-
বার্লিন	৯	৯	-	-
ইস্তাম্বুল	৭	-	-	-
বিরত	-	-	১	১
যোগফল	৮৯	৮৯	৮৯	৮৯

শীতলযুদ্ধ-যুগে পশ্চিমাবিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রকে 'বন্ধুপ্রতিম স্বৈরশাসক' ধরনের শাসককুলের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশেষ করে সেইসব সামরিক অথবা অত্যাচারী স্বৈরশাসক ছিলেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। পশ্চিমাবিশ্বের জন্য এ-ধরনের শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বিষয়টি ছিল নীতিবিরুদ্ধ। শীতলযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমাবিশ্বের সহায়ক এবং বন্ধুপ্রতিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে ওই সকল দেশের সহযোগিতা প্রায়শই বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দিত। কেননা ওইসকল দেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ছিল বর্বরোচিত ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। তাদের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সহযোগিতার বিষয়টি নানাভাবে যুক্তিসঙ্গত করতে চাওয়া হত। তারা ছিল কম্যুনিস্টদের তুলনায় 'ছোট শয়তান' এবং অত্যাচারী শাসক হলেও কম্যুনিস্ট বিশ্বের তুলনায় ছিল কম অত্যাচারী এবং কম মানবাধিকার লংঘনকারী দেশ। ধারণা করা হত, তাদের আয়ু খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তারা সংশোধনযোগ্য, কেননা তারা অন্ততপক্ষে পশ্চিমা উদারনীতি গ্রহণে আগ্রহী ছিল। তদুপরি তাদের ওপর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষণীয় ছিল। অতএব, 'বড় শয়তানের' বিরুদ্ধে 'ছোট শয়তানকে' ব্যবহার করার মধ্যে কোনোপ্রকার অপরাধবোধ না-থাকারই কথা।

শীতলযুদ্ধকালীন বন্ধুপ্রতিম 'স্বৈরশাসক' এবং 'অ-বন্ধুসুলভ গণতন্ত্রের' মধ্যে বাছাই করার কাজটি পশ্চিমাবিশ্বের জন্য ছিল খুব কঠিন কাজ। পশ্চিমাবিশ্বের সহজ সমীকরণ হল : গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করবে এবং পাশ্চাত্যের প্রতি অনুগত থাকবে। যদিও তা সবসময় সত্য নয়, কেননা অপাশ্চাত্য দেশে প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্যবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী ১৯৯২ সালে পরিষ্কারভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হতে যাওয়া মৌলবাদীদের পিআইএস নির্বাচন বাতিল করে তাদের ক্ষমতায় আসার পথ রুদ্ধ করে দিলে পশ্চিমাবিশ্ব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পশ্চিমাবিশ্ব আরও আশ্বস্ত হয় যখন ১৯৯৫ সালে তুরস্কে ওয়েলফেয়ার পার্টি এবং ১৯৯৬ সালে ভারতে মৌলবাদী দল বিজেপি ক্ষমতা থেকে চলে যায়। অন্যদিকে, ইরানের সরকারব্যবস্থাও ইসলামি বিশ্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার হলেও পাশ্চাত্যের প্রতি চরম বিদ্বেষী। আবার, সৌদিআরব এবং মিশরে যদি গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় আসে, তবে হয়তো ওই সরকারও পশ্চিমের প্রতি কম-সহানুভূতিশীল হবে এবং অগণতান্ত্রিক ধারার প্রতিই অনুগত থাকবে, এমন ধারণা করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। চীনে জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত সরকার হতে পারে কট্টর জাতীয়তাবাদী সরকার। পশ্চিমাজগৎ মনে করে যে, অপাশ্চাত্য দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যে সরকারের জন্ম দেবে তা হবে পশ্চিমের প্রতি অবন্ধুসুলভ। সঙ্গত কারণেই তারা নির্বাচনের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারেন অথবা অপাশ্চাত্য দেশে গণতন্ত্রায়নের প্রতি সমর্থন দেবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

অভিবাসন

জনসংখ্যাতত্ত্ব বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, মানুষের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া-আসা (অভিগমন) ইতিহাসের চালিকাশক্তি বিশেষ। বিগত শতাব্দীগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অসম অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পার্থক্য এবং সরকারি নীতির ফলে গ্রিক, ইহুদি, জার্মান নৃগোষ্ঠী, নয়সি, টার্ক, রুশ, চেনিক এবং অন্যান্য স্থানে বিপুল সংখ্যায় অভিবাসন ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-ধরনের চলাচল ছিল শান্তিপূর্ণ, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল সহিংস। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা ছিল এমন একটি 'ডিমোগ্রাফিক নৃগোষ্ঠী' যারা বহিরাক্রমণ ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করত। ১৮২১ সাল এবং ১৯২৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন ইউরোপীয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অভিবাসী হয়েছিল, এর মধ্যে ৩৪ মিলিয়ন অভিবাসী হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। পশ্চিমারা ওই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান জয় করে সেখানকার সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উপরন্তু কম-জনসংখ্যা-অধ্যুষিত স্থানগুলোকে তাদের মতো করে বসতি স্থাপন করবার জন্য বেছে নেয়।

ষোড়শ এবং বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা রপ্তানিতে ইউরোপ একক অবস্থানে চলে এসেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অভিবাসন প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে এবং দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০০ মিলিয়ন, উদ্বাস্তু ছিল প্রায় ১৯ মিলিয়ন এবং অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন। এই নতুন ধাঁচের অভিবাসন কার্যত বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিকতা মোচনের ফলাফল। সেসঙ্গে নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম এবং মানুষকে সকল দেশে অভিবাসী হতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। এইসব রাষ্ট্রীয় নীতি অভিবাসী-সংখ্যাকে বাড়িয়ে তোলে। এতসংখ্যক অভিবাসনের কারণ অবশ্য আরও আছে, যেমন এটি আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। যাতায়াত-যোগাযোগের সহজলভ্যতা অভিবাসনের কাজকে সহজ, দ্রুত এবং কম-ব্যয়সম্পন্ন করে তুলেছে এবং অভিবাসীর সঙ্গে তার নিজস্ব দেশের পরিবারের

সম্পর্ক বজায় রাখার কাজকে সহজ করে তুলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমাজগৎকে দেশান্তরি হতে উদ্দীপ্ত করেছিল, তেমনি বিংশশতাব্দীতে অপাশ্চাত্য সমাজের দুর্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সেখানকার অধিবাসীদের দেশান্তরে যাবার প্রেরণা জুগিয়েছে। এক দেশ ছেড়ে বসবাসের জন্য অন্য দেশে চলে যাবার বিষয়টি নিজস্ব শক্তিসামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ। এক্ষেত্রে একটি 'ধারা' কাজ করে থাকে। যেমন মাইরন উইনার বলেন, 'দেশান্তরের মতো কাজ যখন একবার শুরু হয় তখন তা আপন গতিতে সামনে এগিয়ে যায়। অভিবাসিত ব্যক্তি আপন দেশে এসে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকে অভিবাসী হতে উৎসাহিত করে এবং সেসঙ্গে অভিবাসন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তারা তাদের জন্য অর্থসাহায্য, চাকুরি ও বাসস্থান খোঁজার মতো কাজও সম্পন্ন করে থাকে।' এ পরিস্থিতিকে তিনি বলেছেন একটি 'বৈশ্বিক অভিবাসন সংকট'।[২১]

পশ্চিমারা উপর্যুপরিভাবে পরমাণুঅস্ত্রের বিস্তারকে বাধা দিয়েছে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো বিষয়কে সমর্থন দিয়েছে। অথচ, অভিবাসন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল বিপরীতমুখী। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দুই দশকে এ-সম্পর্কিত মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখেনি। ১৯৭০-এর দশকে ইউরোপীয় দেশসমূহ অভিবাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষ করে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড অভিবাসনের ভেতর দিয়ে কর্মচারী-স্বল্পতার সংকট মোচনের উপায় খুঁজে পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে অভিবাসী হওয়ার জন্য ১৯২০ সাল থেকে চালু ইউরোপীয় পক্ষপাতিত্বমূলক কোটার আইনে পরিবর্তন আনে। এর ফলে যে নতুন আইন সৃষ্টি হয়, তার অধীনে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পায়। ১৯৮০-র দশকে উচ্চহারে বেকারত্ব ও অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 'অ-ইউরোপীয়' অভিবাসীর সংখ্যাধিক্যের কারণে ইউরোপ তাদের অভিবাসী-সংক্রান্ত আইনে পরিবর্তন আনে। এর কয়েক বছর পরে অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রও এ-সংক্রান্ত বিধিবিধান বদলিয়ে ফেলতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অপাশ্চাত্যের অভিবাসী ও উদ্বাস্তু এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। পশ্চিমাদেশে অভিবাসীর আন্তঃপ্রবাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর সংখ্যার সমকক্ষ হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালে ২০ মিলিয়ন প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, ১৫.৫ মিলিয়ন যায় ইউরোপে এবং ৮ মিলিয়ন যায় অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায়। আদি অধিবাসীর তুলনায় ইউরোপের প্রধান দেশসমূহে অভিবাসীর সংখ্যার হার গিয়ে দাঁড়ায় ৭ থেকে ৮ শতাংশে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৪ সালে অভিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮.৭ ভাগে গিয়ে ঠেকে, যা ছিল ১৯৭০-এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ক্যালিফোর্নিয়ায় ২৫ শতাংশ এবং নিউইয়র্কে জনসংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ১৬ ভাগ। কমপক্ষে ৮.৩ মিলিয়ন মানুষ ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। আর ১৯৯০-এর দশকের প্রথম ৪ বৎসরে যায় ৪.৫ মিলিয়ন মানুষ। প্রচুর সংখ্যক নতুন অভিবাসী অপাশ্চাত্য দেশ থেকে এসেছে। ১৯৮০ সালে জার্মানিতে বসবাসকারী বিদেশ থেকে আগতদের সংখ্যা ছিল ১৬,৭৫,০০০। ইতালিতে আগতদের মধ্যে বেশিরভাগই হল মরোক্কো, তিউনিসিয়া এবং ফিলিপাইন থেকে আসা।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় ৪ মিলিয়ন মুসলমান ফ্রান্সে বসবাস করে এবং ১৩ মিলিয়নের মতো মুসলমান অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বসবাস করে। ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশ অভিবাসী এসেছিল ইউরোপ এবং কানাডা থেকে; ১৯৮০-এর দশকে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ অভিবাসী এশিয়া, ৪৫ ভাগ লাটিন আমেরিকা এবং প্রায় ১৫ ভাগ আসে ইউরোপ ও কানাডা থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক জন্মহার খুবই কম, আর ইউরোপে তা প্রায় শূন্য পর্যায়ে। অভিবাসীদের মধ্যে জন্মহার খুবই উচ্চ এবং ধারণা করা হয় ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। এর ফলে পাশ্চাত্যে মানুষের মনের মধ্যে এমন ভয় ঢুকেছে যে, 'তারা এখন সেনাবাহিনী, ট্যাংক ইত্যাদি দ্বারা বিজিত হচ্ছে না বরং কালক্রমে অভিবাসীদের অধীনস্থ হয়ে যাচ্ছে যারা অন্যভাষায় কথা বলে, প্রার্থনা করে অন্য ঈশ্বরের, এমনকি তাদের কৃষ্টিও ভিন্ন।' তারা আরও ভয় পাচ্ছে যে, 'হয়তো অদূর ভবিষ্যতে অভিবাসীরা তাদের চাকুরি ছিনিয়ে নেবে, ভূমির সবটুকু দখল করবে, রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় অর্থের টান পড়বে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, অভিবাসীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জন্য বড় হুমকিস্বরূপ।' [২২] তাদের এই ভয়ভীতির মূল শেকড়ে ডিমোগ্রাফির চেহারা ফুটে উঠতে শুরুতে করেছে, স্টানলি হোফম্যান যেমন বলেন, 'এর ভিত্তি সাংস্কৃতিক সংঘাতের আশঙ্কার ওপর প্রতিষ্ঠিত যা আসলে জাতীয় পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত।'[২৩]

১৯৯০-এর দশকের শুরুতে ইউরোপের সকল অভিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান এবং বিষয়টি নিয়ে, বিশেষ করে মুসলমান অভিবাসীদের নিয়ে ইউরোপীয়রা ভাবতে থাকে। বিষয়টি জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত (ডিমোগ্রাফিক), কারণ ইউরোপীয়দের তুলনায় অভিবাসীদের উচ্চজন্মহার তাদের দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

জার্মানিতে তুরস্কের মুসলমানগণ বা ফ্রান্সে আলজেরীয় মুসলমানেরা কেউই সাংস্কৃতিকভাবে জার্মানি বা ফ্রান্সে একীভূত হতে পারেনি; ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও বিষয়টি অনুরূপ। জিন ম্যারি ডমেন্যাক বলেন এ বাস্তবতা থেকে, 'ইউরোপের সর্বত্র একটি ভীতির সঞ্চার হচ্ছে।'

অভিবাসীদের প্রতি যথাবিহিত সম্মান দেখিয়ে একজন আমেরিকান সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন :

> ইউরোপীয়দের বৈরী মনোভাব বিশেষভাবে প্রায়শই কিছুটা নৈর্বচনিক প্রকৃতির। অ-আরবীয় অভিবাসীদের প্রতি তাদের ভয় বা ঘৃণা তত বেশি নয়। তাদের বৈরিতা মূলত মুসলমানকেন্দ্রিক। ফ্রান্সে অভিবাসী শব্দের সমশব্দ হিসেবে ইসলামকে গণ্য করা হয়ে থাকে, যে ধর্মটি এখন ফরাসিদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর ধর্ম। তাদের এ মনোভাব আসলে নেতিবাচক এবং নৃতাত্ত্বিক ধারণা উৎসারিত বর্ণবাদি সাংস্কৃতিক বোধ থেকে জন্ম নেয়া।[২৪]

ফরাসিরা বর্ণবাদিতার চেয়ে বহুগুণ বেশি সংস্কৃতিমনা। তারা আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষদের বেশি গ্রহণ করে যারা আইনসভায় ফরাসিভাষায় সুন্দর বক্তব্য দিতে পারেন। কিন্তু ফরাসিরা কোনোভাবেই মাথায় স্কার্ফ পরিধান করে মুসলিম মেয়েরা স্কুলে আসুক তা সহ্য করতে নারাজ।

১৯৯০ সালে শতকরা ৭৬ ভাগ ফরাসি মনে করে যে, ফ্রান্সে বেশিসংখ্যক আরবীয় বসবাস করছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী ৪৬ শতাংশ আফ্রিকান, ৪০ শতাংশ এশিয়ান এবং ২৪ শতাংশ ইহুদি ধর্ম ও বর্ণের অতিরিক্ত জনসংখ্যা ফ্রান্সে বসবাস করছে। ১৯৭৪ সালে ৪৭ শতাংশ জার্মান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তারা আরবদেরকে প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায় না। পাশাপাশি শতকরা ৩৯ ভাগ পোলীয়দের, শতকরা ৩৬ ভাগ তুর্কিদের এবং শতকরা ২২ ভাগ ইহুদিদের প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চায় না।[২৫] পশ্চিম ইউরোপে সিমেটিক বিরোধিতা বৃহত্তরভাবে ইহুদিবিরোধিতায় রূপ নেয়।

১৯৯০-এর দশকে জার্মানিতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সহিংস মোড় নেয়। তাছাড়া মানুষ পূর্বের চেয়ে দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী এবং অভিবাসীবিরোধীদের পক্ষে বেশি ভোট প্রদান করতে থাকে। এই ধরনের সমর্থন পূর্বে কালেভদ্রে বৃদ্ধি পেত। জার্মানিতে ১৯৮৯ সালে রিপাবলিকান পার্টি ইউরোপীয় নির্বাচনে শতকরা ৭ ভাগ ভোট অর্জন করে, কিন্তু ১৯৯০ সালে ওই পার্টি জাতীয় নির্বাচনে ভোট পায় মাত্র ২.১ ভাগ। ফ্রান্সে ১৯৮১ সালে ন্যাশনাল ফ্রন্টের ভোট ছিল খুবই স্বল্প, কিন্তু ১৯৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯.৬ ভাগে এবং পরবর্তীতে বৃদ্ধির গতি সামনে অব্যাহত থাকে এবং ১২ থেকে ১৫ ভাগের মতো তা আঞ্চলিক ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে স্থিত হয়। ১৯৯৫ সালে দুজন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপতিপ্রার্থী সম্মিলিতভাবে প্রায় ১৯.৯ ভাগ ভোট পায়। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের মনোনীত মেয়র প্রার্থী টাউলন এবং নিস-এ জয়ী হয়।

ইটালিতে এমএসআই (MSI) ন্যাশনাল অ্যালাইন্স-এর সমর্থন ১৯৮০ সালের তুলনায় ৫ ভাগ থেকে ১৯৯০ সালে যথাক্রমে শতকরা ১০ এবং ১৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে বেলজিয়ামে ফ্লেমিন ব্লক/ন্যাশনাল ফ্রন্টের ভোট স্থানীয় নির্বাচনে পূর্বের চাইতে ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তবে, এককভাবে ফ্রন্টের ভোট এন্ডিয়াফ-এ ২৮ ভাগ বেড়ে যায়। অস্ট্রিয়াতে সাধারণ নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির ভোট ১৯৮৬ সালে ১০ ভাগের কম থেকে ১৯৯০ সালে ১৫ ভাগ এবং ১৯৯৪ সালে প্রায় ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত ইউরোপিয়ান পার্টিগুলো পাশ্চাত্যে মুসলমান-অভিবাসীবিরোধী; যেমন মুসলিমদেশে ইসলামিক পার্টিগুলো পাশ্চাত্যবিরোধী। উভয়ক্ষেত্রেই অসহিষ্ণু মনোভাব উগ্র আচরণ এবং সহনশীলতার অভাব দেখা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই সহিংসতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষণীয়। ইসলামিক এবং ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী পার্টি জাতীয় নির্বাচনের চাইতে স্থানীয় নির্বাচনে বেশি ভালো ভোট অর্জন করে থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই সরকার অ-সর্বজনীন আচরণ করতে অভ্যস্ত। ইসলামিক দেশে দেখা যায়, সরকারগুলো ইসলামি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, প্রতীক হয় ইসলামধর্ম সম্পর্কিত, তাদের নীতি ও তার বাস্তবায়নেও ইসলামি গন্ধ মেশানো থাকে। আবার ইউরোপে প্রধান ধারার দলগুলো যেন ক্রমাগত ডানপন্থী এবং অভিবাসনবিরোধী সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ইসলামিক দেশের মতো ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিও প্রায় ২০ ভাগ ভোটারের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রতিবাদী দলগুলো ওই সীমা লংঘন করতে পারে তখন, যখন তারা জোটবদ্ধ হয় বা যখন

প্রতিপক্ষের তেমন কোনো ভালো বিকল্প না থাকে। এ-ধরনের ঘটনা আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং কিছুটা হলেও ইটালিতে ঘটতে দেখা গিয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অভিবাসনবিরোধী মনোভাবের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে অনেকটা বাধ্য হতে হয়। ১৯৯০ সালে ফ্রান্সে জ্যাক সিরাক ঘোষণা দেন যে, 'অভিবাসন পুরোপুরিভাবে বন্ধ করতে হবে'। অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী চার্লস পাসু ১৯৯৩ সালে 'শূন্য অভিবাসনের' পক্ষে যুক্তি দেখান। তাছাড়া ফ্রাসোয়া মিতোঁরো, এডিথ ক্রেসন, ভেলেরি জিসকার্ড ডি. ইস্টিং প্রমুখ ফরাসি প্রথমশ্রেণীর রাজনীতিবিদ অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনে 'অভিবাসন' ছিল অন্যতম মূল ইস্যু এবং এই ইস্যুর জন্যই রক্ষণশীল দলগুলো বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে ফরাসি সরকারের নীতির কারণে অভিবাসীদের সন্তানদের নাগরিকত্ব, বিদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার এবং আলজেরীয়দের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্তির বিষয় খুবই জটিল হয়ে যায়।

অবৈধ অভিবাসীদের নিজদেশে ফেরত পাঠাবার জন্য পুলিশকে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের এ-সংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। জার্মানিতেও অভিবাসী-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করে তা পূর্বের তুলনায় কঠোর করা হয়। চ্যান্সেলর হেলমুট কোল এবং অন্যান্য নামিদামি রাজনৈতিক নেতৃত্ব অভিবাসন আইন নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাদের উদ্যোগেই সরকার জার্মানির সংবিধানের আর্টিকেল XVI সংরক্ষণের এবং সংশোধনপূর্বক রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের রাজনৈতিক কারণে শাস্তি দেয়ার বিধান রাখা হয় এবং সেসঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের সুযোগসুবিধা হ্রাস করা হয়। ১৯৯২ সালে ৪,৩৮,০০০ মানুষ জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আগমন করে। কঠোর আইনের কারণে ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১,২৭,০০০। ব্রিটেন পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ অভিবাসীকে স্বাগত জানায়। ১৯৮০ সালে তারা আকস্মিকভাবে বাৎসরিক অভিবাসী গ্রহণের সংখ্যা হ্রাস করে ৫০,০০০-এ নামিয়ে আনে। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ২০,০০০ থেকে ১০,০০০ এ কমিয়ে আনে। ইউরোপীয় ইউনিয়নেও অভিবাসী চলাচলের সংখ্যা হ্রাস করা হয়। মোটের ওপর ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পশ্চিম-ইউরোপের দেশসমূহ অভিবাসনের সংখ্যা অনেক হ্রাস করে; যদিও অ-ইউরোপের মানুষের জন্য অভিবাসনের দুয়ার এখনও খোলা রাখা হয়েছে।

অভিবাসনের ইস্যু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের তুলনায় অনেক বিলম্বে আসে এবং তা কোনোভাবেই ইউরোপের ন্যায় আবেগমিশ্রিত হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই অভিবাসীদের দেশ হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে দেশটি নবাগতদের আপন করে নিতে কোনোপ্রকার কার্পণ্য করেনি। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ইউরোপের অনুপাতে কম ছিল, যার দরুন অভিবাসনের কারণে কারও চাকুরি হারাবার ভয় ছিল না। আর এজন্য অভিবাসীদের প্রতি মনোভাব কঠোর হতে পারেনি। আমেরিকার অভিবাসীদের উৎসও ছিল ইউরোপের তুলনায় ভিন্নতর। সেখানে একক জাতীয়তার শক্তিশালী প্লাবনে দেশটি প্লাবিত হওয়ার ভয় ছিল না; যদিও একক বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের

আধিপত্য এক্ষেত্রে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাছাড়া ইউরোপের তুলনায় সেখানকার অভিবাসীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ ততবেশি ছিল না। মেক্সিকানরা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ও স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে, ফিলিপাইনের অভিবাসীরা ক্যাথলিক এবং ইংরেজিভাষায় কথা বলে থাকেন।

অভিবাসন সম্পর্কে উপর্যুক্ত ইতিবাচক দিক থাকবার পরও ১৯৬৫ সালের যে আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত এশিয়ান ও লাটিন আমেরিকান অভিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করেছিল, সে আইন সম্পর্কে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ৩৩ শতাংশ মানুষ অভিবাসীর সংখ্যা হ্রাসের কথা বলেছিল। কিন্তু ১৯৭৭ সালে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালে ওই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪৯ শতাংশে। আর ১৯৯০-১৯৯৩ সালে গিয়ে হয় ৬১ শতাংশ। জনমত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, ১৯৯০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের উপর্যুপরিভাবে প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ অভিবাসীর সংখ্যা হ্রাস করার পক্ষে মতামত প্রদান করে।[২৭] অভিবাসী সম্পর্কে আমেরিকানদের মনোভাবের এহেন পরিবর্তন শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গেই যে সম্পর্কিত তা নয়, সেসঙ্গে সাংস্কৃতিক, অপরাধ-সংক্রান্ত এবং জীবনযাপনের পদ্ধতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৯৪ সালে একজন পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন : 'অনেকে, সম্ভবত অধিকাংশ আমেরিকান এখনও দেখে যে, তাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে ইউরোপীয় এবং আইনের উৎস হচ্ছে ইংল্যান্ড, আর ভাষা হচ্ছে ইংরেজি, আর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী ভাবধারা হতে আগত, যাদের ধর্ম জুডো-খ্রিস্টীয় শেকড়ের মধ্যে গ্রথিত, যাদের মহত্ত্ব মূলত প্রোটেসট্যান্ট ভাবাদর্শের।' এ সবকিছু বিবেচনা করে শতকরা ৫৫ ভাগ জনগণ মোটের ওপর বলতে চায়, অভিবাসন এখন আমেরিকার সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ইউরোপীয়রা যেমন অভিবাসনের ক্ষেত্রে মুসলমান বা আরবদের ভয় করে, আমেরিকানরা সেখানে লাটিন আমেরিকান ও এশীয় উভয়কেই ভয় করলেও তাদের ভীতির পরিমাণ মেক্সিকানদের প্রতিই বেশি। ১৯৯০ সালে জনমত যাচাইয়ের জন্য যখন প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কোন্ দেশ থেকে আমেরিকায় অতিরিক্ত অভিবাসী গ্রহণ করা হয়েছে; তখন উত্তর পাওয়া গিয়েছিল মেক্সিকো থেকে সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া কিউবা, প্রাচ্য (দেশের নাম উচ্চারিত হয়নি), দক্ষিণ আমেরিকা, লাটিন আমেরিকা (দেশের নাম উচ্চারিত হয়নি), জাপান, ভিয়েতনাম, চীন এবং কোরিয়ার নামও উচ্চরিত হয়।[২৮]

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপের ন্যায় আমেরিকায় অভিবাসনবিরোধী ক্রমবর্ধমান গণউষ্মার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আদলে ডানপন্থী এবং অভিবাসনবিরোধী দলগুলো ভোট পেতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অভিবাসনবিরোধী প্রচারমাধ্যম, স্বার্থকামী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা অধিকতর কর্মতৎপর এবং সরব হয়ে ওঠে। তাদের অধিকাংশের লক্ষ্যবস্তু ছিল ৩.৫ মিলিয়ন বৈধ ও ৪ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসী এবং পরবর্তীতে সেমতো রাজনীতিবিদগণও এই মতামতে সাড়া দিতে থাকেন। ইউরোপের মতোই তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় অঙ্গরাজ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে, যারা আসলে অধিকাংশ অভিবাসীর খরচপত্রের যোগান দিয়ে থাকেন। এর ফলে দেখা যায়, ১৯৯৪ সালে

ফ্লোরিডা এবং পরবর্তীতে আরও ৬টি অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীরা ফেডারেল সরকারের নিকট অবৈধ অভিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি খরচ বাবদ ৮৮৪ মিলিয়ন ডলার দাবি করে মামলা দায়ের করে। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের গর্ভনর পেট উইলসন অবৈধ অভিবাসীদের সামাজিক, আর্থিক নিরাপত্তার দাবি অস্বীকার করে জনসমর্থন নিয়েই নির্বাচিত হন।

১৯৯৪ সালে ক্লিনটন প্রশাসন তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে অভিবাসন আইন কঠোর করেন। তিনি অভিবাসী নিয়ন্ত্রণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপসহ রাজনৈতিক আশ্রয়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আইন প্রণয়ন, সীমানা পাহারা জোরদারকরণ এবং মেক্সিকোর সঙ্গে সীমানা-দেয়াল তোলার ব্যবস্থা করেন। ১৯৯০ সালে গঠিত অভিবাসন আইন সংস্কার কমিশন ১৯৯৫ সালে বাৎসরিক অভিবাসীর সংখ্যা পূর্বের ৮,০০,০০০ থেকে নামিয়ে ৫,৫০,০০০ করার প্রস্তাব দেয়। অভিবাসীদের বয়স্ক সন্তান ও স্বামী/স্ত্রীর ক্ষেত্রে অভিবাসী হওয়ার অগ্রাধিকার রাখলেও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের বেলায় তা কঠোর করার প্রস্তাব দেয়। বলাবাহুল্য, এই সংবিধি 'এশীয়-আমেরিকান এবং হিস্পানিক সম্প্রদায়কে ক্রুদ্ধ করে দেয়'।[২৯]

১৯৯৫-৯৬ সালে আইনসভার মাধ্যমে কমিশনের অনেক প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেসঙ্গে অভিবাসন প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে কংগ্রেস প্রস্তুত হয়। ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ে অভিবাসন-বিষয়টি মার্কিন রাজনীতির অন্যতম প্রধান ইস্যুতে রূপ নেয়। ১৯৬০ সালে প্যাট্রিক বুচম্যান তাঁর রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অভিবাসনবিরোধী প্রচারণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। ইউরোপের ন্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অপাশ্চাত্য দেশ থেকে তাদের সমাজে অভিবাসী হয়ে আসার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কিন্তু এখানে একটি বড় প্রশ্ন দেখা দেয়, আর তা হল : ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্র কি আদৌ অভিবাসনের প্রবল জোয়ারের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম? ইতোমধ্যে ফ্রান্স এ-বিষয়ে কিছু হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। অতএব, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কী হবে এ নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা এখনই সম্ভব নয়। ইস্যুটি এমন নয় যে, ইউরোপ কি তাহলে মুসলমানীকরণ হবে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি হিস্পানিকরণ হতে যাচ্ছে?

তাহলে কি ইউরোপ এবং আমেরিকা এমন একটি প্রতীকী সমাজে পরিণত হচ্ছে, যে সমাজ দুটি ভিন্নধারার সভ্যতার দুটি সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে; যে সমাজ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে অভিবাসীদের ওপর এবং যারা আত্তীকরণের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারক হবে?

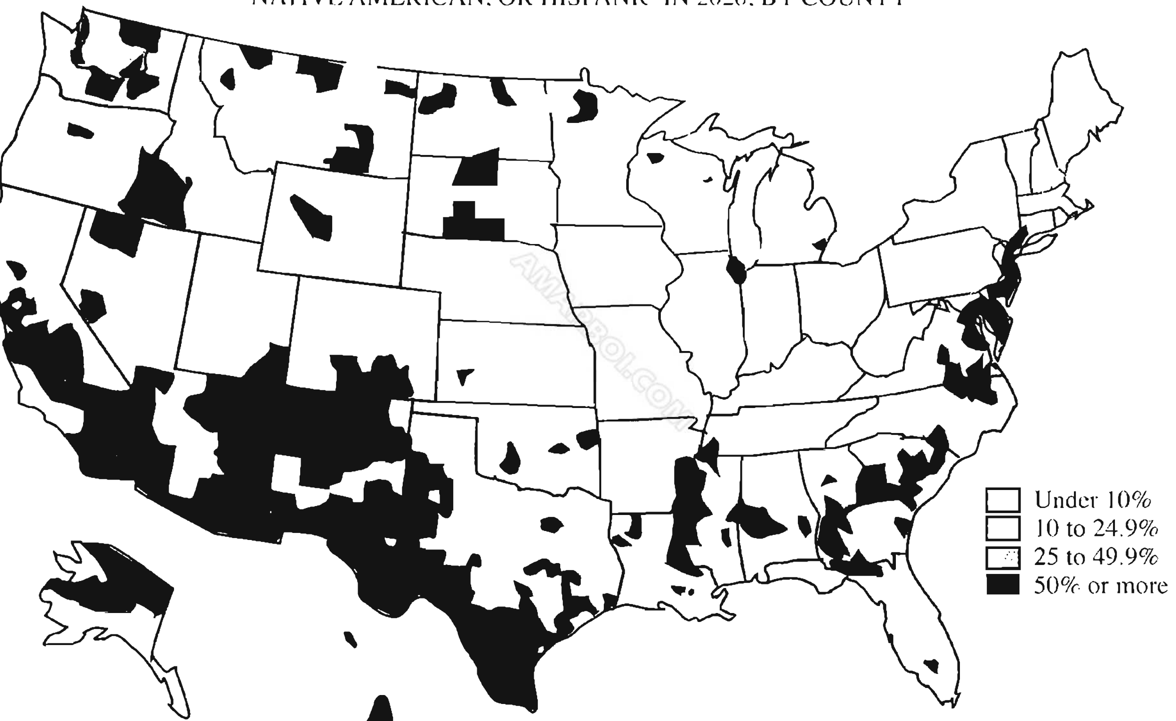
কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, ইউরোপীয় সমাজ সাধারণভাবে অভিবাসীদেরকে তাদের মধ্যে একীভূত করতে চায় না। তাছাড়া এ-কাজটি সহজও নয়, তদুপরি মুসলমান অভিবাসীগণ সাংস্কৃতিকভাবে আত্তীকৃত হতে চায় কি-না তাও পরিষ্কার নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, যেসব অভিবাসী স্থায়ীভাবে থেকে যাবেন তারা খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবেই সেখানে বিভক্ত হয়ে রয়ে যাবেন।

অনাগত এই বৈরী অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে ইউরোপের সরকারগুলো ও জনগণকে সম্মিলিতভাবে অভিবাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণারোপের ব্যয়ভার বহন করতে হবে; অভিবাসনবিরোধী কার্যক্রমের জন্য আর্থিক ব্যয় মেটাতে হবে; অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সামাজিকভাবে অভিবাসীদের পৃথক করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি ও সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করতে হবে; আর যা করা প্রয়োজন, তা হল, যাতে করে শ্রমিকের স্বল্পতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য জন্মহার বৃদ্ধি সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

মুসলমান জনসংখ্যার আগ্রাসী পরিস্থিতি হ্রাস পেতে পারে মুসলিম দেশসমূহে জন্মহার হ্রাস করার মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই উচ্চ। তবে কোনো কোনো দেশে তা ইতিমধ্যে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।[৩১]

জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার আসলে অভিবাসন-প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। আর যেহেতু মুসলিমদেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে; সেহেতু আশা করা যায়, ২০২৫ সালের দিকে অভিবাসনের চাপও হ্রাস পাবে। অবশ্য কথাটি সাব-সাহারার আফ্রিকার জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক কর্মতৎপরতা ও কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়; সেহেতু বলা যায়, আফ্রিকার পশ্চিম ও মধ্যভাগের মানুষ অভিবাসী হতে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং আরও বলা যায়, এরূপ হলে ইউরোপের 'মুসলমানকরণ' নীতি 'আফ্রিকাকরণ' কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে বিদূরিত হবে। এটি অবশ্য আফ্রিকায় 'এইডস্'সহ অন্যান্য রোগ, যেমন প্লেগ ইত্যাদির হ্রাস পাওয়া এবং দক্ষিণআফ্রিকার মানুষ অভিবাসী হতে কতটুকু আগ্রহী হয় তার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

মুসলমানগণ যেমন ইউরোপের জন্য সমস্যাসংকুল, তেমনি মেক্সিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমস্যাবহুল। যদি বর্তমান প্রবণতা নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে যায়, তবে আমেরিকার জনসংখ্যা একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে দারুণ পরিবর্তনের সূচনা করবে (টেবিল নং ৮.২)। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে, শতকরা ৫০ ভাগ সাদা আর ২৫ ভাগ হিস্পানিক। অভিবাসন আইনের পরিবর্তন করলে এবং কার্যকরভাবে অভিবাসনবিরোধী আইনের প্রয়োগ ঘটালে ইউরোপের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তেমন আশঙ্কা ততটা নাও থাকতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ইস্যু হল এই যে, হিস্পানিকরা আমেরিকার সমাজে কতটুকু আত্তীকৃত হবেন, যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা হতে পেরেছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের হিস্পানিকেরা যাতে করে দ্রুত আমেরিকার সমাজে মিলে যেতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা ও চাপ দুটোই আছে।


THE UNITED STATES: A CLEFT COUNTRY?
PROJECTED PERCENT OF POPULATION THAT WILL BE BLACK, ASIAN, NATIVE AMERICAN, OR HISPANIC IN 2020, BY COUNTY
Under 10%
10 to 24.9%
25 to 49.9%
50% or more
Source: Based on data from U.S Census Bureau. Rodger Doyle Copyright 1995 for U.S News & World Report

টেবিল ৮.২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা (বর্ণ ও নৃগোষ্ঠী ভিত্তিতে বন্টন) (শতকরা হিসেবে)

	১৯৯৫	২০২০ (প্রাক্কলন)	২০৫০ (প্রাক্কলন)
অ-হিস্পানিক সাদা	৭৪%	৬৪%	৫৩%
হিস্পানিক	১০	১৬	২৫
কালো	১২	১৩	১৪
এশীয় ও প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত	৩	৬	৮
আমেরিকান, ভারতীয় ও আলাস্কার আদিবাসী	∠১	∠১	১
সমগ্র (মিলিয়ন)	২৬৩	৩২৩	৩৯৪

Source : *U.S. Bureau of the Census. Population Projections of the U.S. by. Age, Sex, Race and Hispanic Origin* : 1995 to 2050 (Washington : U.S. Government Printing Office. 1996). pp. 12-13.

অন্যদিকে মেক্সিকোর অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের অভিবাসীদের চেয়ে নানা দিক থেকে পৃথক।

প্রথমত, ইউরোপীয় বা এশীয় অভিবাসীরা সাগর পাড়ি দিয়ে দূরদূরান্ত থেকে আসে, কিন্তু মেক্সিকানরা খুব কম-দূরত্ব থেকে আসে। তাছাড়া যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তারা অতিসহজে, এমনকি পায়েহাঁটা পথে তাদের দেশের ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, মেক্সিকোর অভিবাসীরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে থাকে এবং তারা মেক্সিকোর সমাজব্যবস্থা 'ইউকাটান' থেকে কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তৃত করে ফেলেছে (ম্যাপ- ৮.১)।

তৃতীয়ত, কিছু ঘটনা থেকে দেখা যায় যে, আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় মেক্সিকানরা অন্যান্য অভিবাসীর তুলনায় বেশি প্রতিরোধ তৈরি করে থাকে। অর্থাৎ, মেক্সিকানরা অভিবাসী হয়েও নিজের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ব্যাপারে বেশ কট্টর। সে কারণে ১৯৯৪ সালে ক্যানির্ফোনিয়া 'প্রস্তাব ১৮৭' নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয়।

চতুর্থত, অভিবাসী হিসেবে মেক্সিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের যে-অংশে বসবাস করে তা যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি অংশ যা যুক্তরাষ্ট্র উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেক্সিকোকে হারিয়ে জয় করে নিয়েছিল। এর কারণে, মেক্সিকানদের একটি প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই স্বাভাবিক যা মেক্সিকোর অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হতে চায়। হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই মেক্সিকানরা একবিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বসবাসের সীমা এবং সংখ্যা বর্ধিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর 'শক্তির ভারসাম্যের' পরিস্থিতি বারবার পরিবর্তিত হওয়ায় কার্যত পশ্চিমাদের জন্য তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, যেমন অস্ত্র সীমিতকরণ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন, অভিবাসন ইত্যাদি দিনদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। এ সবকিছুকে মোকাবিলা করার জন্য পশ্চিমাদের উচিত হবে তাদের অর্থনীতিকে জোরদার করে সেগুলোকে অন্যান্য সমাজের জন্য লোভনীয় করে তোলা। সেইসঙ্গে নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করা, বিভিন্ন ধর্মীয় নীতিগুলোর মধ্যে যৌক্তিক, সময়োচিত এবং যথার্থ সমন্বয় সাধন করা, ইত্যাদি। এতে করে অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে নাক গলানোর কম সুযোগ পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিরাপদ থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য অপাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেকার পার্থক্যকে পরিকল্পিতভাবে উস্‌কে দিয়ে ফায়দা লুটতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ এগিয়ে নেবার জন্য কার্যকর কৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ সভ্যতার মোকাবিলা করে যাবে, অন্যদিকে এভাবে কিছু 'সকলের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ' স্বার্থ জড়ো করে অন্যান্য দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা সভ্যতাকে একত্রিত করা সম্ভব হবে।

অধ্যায়-৯

সভ্যতার রাজনীতির বৈশ্বিক অবস্থা

কোররাষ্ট্র এবং ফাটলরেখার দ্বন্দ্ব

গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ই হল মানবসমাজের চূড়ান্ত পরিণতি। বৈশ্বিক পরিসরে সভ্যতার সংঘাত প্রকারান্তরে গোষ্ঠীসমূহের সংঘাত বৈ কিছু নয়। বর্তমানে আবির্ভূত বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠীগুলো কোনো কোনো সময়ে পূর্বনির্ধারিত জোট গঠন করে থাকে, নিতান্তই তাদের কিছু পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং বলাবাহুল্য এ-ধরনের জোট গঠন করার উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার বিরুদ্ধে তৃতীয় কোনো সভ্যতার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ ও প্রভাব প্রতিরোধ করা। বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্ক কখনও খুব আন্তরিক থাকে না বরং তা প্রায়শই শীতল এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগ এবং শীতলযুদ্ধের সময় স্থাপিত জোটসমূহ এখন টিকে থাকবে না বলেই মনে হচ্ছে। আন্তঃসভ্যতার ভেতর 'অংশীদারিত্ব' রাশিয়া ও আমেরিকার নেতারা যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে আবির্ভূত আন্তঃসভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে ওঠানামা করতে পারে, এমনকি তা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই এ সম্পর্ক হয়তো ভবিষ্যৎ 'ঠাণ্ডা শান্তি' বয়ে আনতে পারে। রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের বেলায় যেমনটি বলেছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন, `La guerra fria' যার অর্থ হল, 'অস্বস্তিকর সহাবস্থান'—একথাটি তখনকার মুসলমান এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা করতে ১৩শ শতাব্দীতে 'স্পেনিয়ার্ড' ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৯০-এর দশকে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে, ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের ভেতর এখন একটি সভ্যতাসম্পৃক্ত শীতলযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।[১] সভ্যতাভিত্তিক বিশ্বে শুধুমাত্র এমন একটি সম্পর্কই যে রয়েছে তা কিন্তু নয়। 'শীতল শান্তি', 'শীতল যুদ্ধ', 'বাণিজ্য যুদ্ধ', 'প্রায় যুদ্ধাবস্থা', 'অপ্রয়োজনীয় শান্তি', 'ঝক্কি ঝামেলা জাতীয় সম্পর্ক', 'সর্বব্যাপী শত্রুতা', 'প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান', 'অস্ত্রের প্রতিযোগিতা'—সম্ভবত এ-ধরনের বর্ণনাই প্রকৃত বর্ণনা যা বর্তমানে চলমান বিশ্বে সভ্যতাসমূহের সম্পর্কের বেলায় প্রযোজ্য। বিশ্বস্ততা ও বন্ধুত্বের বন্ধনের আজ বড় অভাব।

আন্তঃসভ্যতার সংঘাতের মোটামুটি দুটি প্রকার রয়েছে। আঞ্চলিক অথবা নিযুতাংশে প্রতিবেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ফাটলরেখা বরাবর; কিংবা একই সভ্যতার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর, যেমন প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার অভ্যন্তরে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। যেখানে পুরোনো রাষ্ট্রের পরিবর্তে নতুন নতুন রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টির পাঁয়তারা চলেছে।

ফাটলরেখাযুক্ত স্থানে সংঘাত ঘটে চলছে মোটামুটিভাবে মুসলমান এবং অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এ-ধরনের সংঘাতের কারণ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এ বইয়ের দশ এবং এগারো অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কোররাষ্ট্রগুলোর ভেতরও সংঘাত দেখা দেয়। আর এর কারণ হল, বিভিন্ন সভ্যতার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা। এ-ধরনের সংঘাত আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনের ধ্রুপদী ধাঁচের হয়ে থাকে, যথা :

১. জাতিসংঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের ওপর আপেক্ষিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তার কার্যাবলির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের নিমিত্তে;
২. অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, পারমাণবিক অস্ত্রের দখলদারিত্ব, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধকরণ এবং আপেক্ষিক সামরিক শক্তি অর্জন ও প্রদর্শন বিষয়ে বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রগুলো মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য;
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বাজার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক শক্তির অন্যান্য ইস্যুতে মতানৈক্য;
৪. এক সভ্যতা কর্তৃক অন্য সভ্যতার সাথে বসবাসরত এবং অত্যাচারিত তার রক্তধারার জনগোষ্ঠীর জীবন সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত কার্যক্রমের জন্য সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘাত;
৫. মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি সভ্যতা যখন অন্য একটি সভ্যতার উপর তার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে তৎপর হয় তখন সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়;
৬. কখনও কখনও ভূখণ্ড সম্পর্কিত ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত দেশগুলোর সঙ্গে কোররাষ্ট্রযুক্ত হয়ে সংঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে।

এইসব ইস্যু প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির ইতিহাসে বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

প্রথমত, যখন বিভিন্ন সভ্যতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলো সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন সেখানে সাংস্কৃতিক ইস্যু অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে। সাংস্কৃতিক পার্থক্য দ্বারা চালিত বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রগুলোর ভেতর পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে বিভক্তি দেখা দেয়, এবং তারা নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। প্রোপাগান্ডা তাদের অন্যতম বড় অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। শক্তি প্রয়োগে তারা পিছিয়ে থাকে না। কোররাষ্ট্রসমূহ সাধারণত একে অপরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে না। তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো অবস্থা এলে অবশ্য কোররাষ্ট্রগুলোও সভ্যতার ফাটলরেখা বরাবর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধে প্রত্যক্ষ সরাসরি জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, কোররাষ্ট্র যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে বিশ্বে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের ভেতর পরিবর্তন সূচিত করে থাকে। প্রাচীন গ্রিকসভ্যতায় এথেন্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রকৃতপক্ষে পিলোপোনেসীয় যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল বলে থুসিডাইডিস মন্তব্য করেছেন। দেখা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন যুদ্ধ আসলে 'আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ' ছিল, যা অহরহ সংঘটিত হয়েছে উদীয়মান ও অস্তমিত রাষ্ট্রশক্তিগুলোর মধ্যে। আধুনিককালে চীনের সভ্যতার বিকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তির ভারসাম্য আনতে সহায়ক হচ্ছে বলে মনে করা হয়। বিগত দিনে ঘটে যাওয়া প্রভাব-প্রতিপত্তিস্থাপন বিষয়ক যুদ্ধ, যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ শেষপর্যন্ত শান্তি পূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর কারণ হল এই যে, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ তেমন ছিল না।

কেননা নৃগোষ্ঠীক ও রক্তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই ছিল অধিক। শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের বেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে তেমন কোনো সাংস্কৃতিক সাযুজ্য নেই, সেজন্য সেখানে যে সশস্ত্র যুদ্ধ হবে না এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। ইসলামের গতিপ্রকৃতি ও মুসলমানদের কার্যকলাপ সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাটলরেখার জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে, চীনের উদয় সম্ভবত আন্তঃসভ্যতার কোররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাশ্চাত্য ও ইসলাম

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ পাশ্চাত্যের কিছু মানুষ যুক্তি দেন যে, ইসলামের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোনোপ্রকার বিরোধ নেই, পাশ্চাত্যের বিরোধ আছে শুধু উগ্রপন্থী ইসলামিক শক্তির সঙ্গে। তবে ১৪শ বছরের ইতিহাস কিন্তু অন্যরকম কথা বলে।

ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের (অর্থোডক্স এবং পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্মের) সম্পর্ক খুবই ঝঞ্ঝাবহুল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংঘাতে লেগে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ইতিহাসে ও বর্তমানে ইসলামের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের দ্বন্দ্বের তুলনায় যেন নস্যি। একদা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রায়শই দুটি ধর্মের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্ক শত্রুতা এবং যুদ্ধংদেহী হয়ে পড়ে। জন এপিস্টিও বলেন যে, তাদের 'ঐতিহাসিক গতিশীলতা' থেকে দেখা যায়... প্রায়শই তারা একে অপরের প্রতিযোগী হয়েছে; কখনও কখনও ক্ষমতা, ভূসম্পত্তি ও আত্মার তাগিদে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে।[২] শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ব্যাপী এ দুটো ধর্মের অনুসারীগণ কখনও একে অপরের নিকট পরাজিত হয়েছে, জয়ী হয়েছে, আক্রমণ করেছে, আবার আক্রান্তও হয়েছে।

প্রারম্ভে আরবীয় ইসলামি শক্তি সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত অন্যদের বিতাড়িত করে উত্তর আফ্রিকা, ইরেবিয়া মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য, উত্তর ভারত, জয় করে নেয়। প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে বিভক্তি স্থায়ী ছিল। কিন্তু এগারো শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টানেরা পুনরায় তাদের শক্তি প্রদর্শন করে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাসহ সিসিলি এবং টলেডো দখল করে নেয়। ১০৯৫

সালে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা 'ক্রুসেড' শুরু করে দেয়। এরপর প্রায় এক ও অর্ধ শতাব্দীর ধরে খ্রিস্টীয় অধিপতিগণ পবিত্রভূমিসহ এর সংলগ্ন এলাকা, যেমন নিকট প্রাচ্যে ১২৯১ সালে শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইতোমধ্যে তুরস্কের অটোম্যানগণ মঞ্চে আবির্ভূত হয়। তারা প্রথমে বাইজেনটাইনকে দুর্বল করে দেয়, এবং তারপর বলকান এলাকার অধিকাংশ এলাকাসহ উত্তরআফ্রিকা এবং ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল ও ১৫২৯ সালে ভিয়েনা দখল করে নেয়।

বানার্ড লুইস বলেন, 'প্রায় একহাজার বৎসর কাল অর্থাৎ মুসলমানদের প্রথম স্পেনে পদার্পণ থেকে তুর্কিদের দ্বারা ভিয়েনা জয় পর্যন্ত ইউরোপ সর্বক্ষণের জন্য মুসলমানদের ভয়ে ভীত থাকত।'[৩] ইসলাম হল একমাত্র সভ্যতা, যা পাশ্চাত্যের টিকে থাকাকে অন্তত দুবার সন্দেহের আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল।

তবে ১৫শ শতাব্দীতে এসে অবস্থান বদল হয়। খ্রিস্টানরা ক্রমান্বয়ে ইবেরিয়া, গ্রানাডা (১৪৯২ সালে) পুনরুদ্ধার করে। ইতোমধ্যে ইউরোপ সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের বিষয়ে নতুন ব্যবস্থা আবিষ্কার করে, ফলে পর্তুগিজীয়রা মুসলমানদের দৃষ্টি এড়িড়ে ভারত মহাসাগর ও তারচেয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যায়। অন্যদিকে, রাশিয়া প্রায় দুইশতাব্দী ব্যাপী চলে আসা তাতারদের শাসনের অবসান ঘটায়। অটোম্যানগণ একটি শেষ ধাক্কা দেয়, তারা ১৬৮৩ সালে পুনরায় ভিয়েনা ঘিরে ফেলে, তবে সেখানে ব্যর্থতা তাদের পশ্চাৎপদতার দিকে নিয়ে যায়।

বলকান এলাকার অর্থোডক্সরা অটোম্যান-শাসন মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, এবং কৃষ্ণসাগর ও ককেশীয় এলাকার দিকে রুশবাহিনীর নাটকীয় অভিযান প্রকৃতপক্ষে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভীত নড়বড়ে করে দেয়। তারপর থেকে অটোম্যানরা পিছু হটতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধাবসানের পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইটালি অসীম শক্তিবলে অটোম্যানদের অবশিষ্ট এলাকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন কায়েম করে শুধুমাত্র তুর্কি রিপাবলিক বাকি থাকে। ১৯২০ সালের ভেতর শুধুমাত্র চারটি মুসলমান দেশ— তুরস্ক, সৌদিআরব, ইরান ও আফগানিস্তান কেবল স্বাধীন রয়ে যায়, যেখানে কোনো অ-মুসলমান শাসন ছিল না।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশক থেকেই পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসনে ভাটা পড়তে থাকে। তবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধাবসানের পরে এই পতনের ধারা নাটকীয়ভাবে দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর বেশকিছু সংখ্যক মুসলমান জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্তমুসলমান দ্বারা দখলকৃত ৯২টি ভূমি অ-মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১৯৯৫ সালের হিসেবে দেখা যায়, তারমধ্যে ৬৯টিতে আবার মুসলমানগণ তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আরও দেখা যায়, ওই সময়ে কম করে হলেও ৪৫টি রাষ্ট্রে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। দেখা যায় যে, শতকরা ৫০ ভাগ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে। ১৮২০ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এমন যুদ্ধের প্রায় সবই ছিল মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে। ধর্মগুলোর মধ্যে চলমান এই যুদ্ধের প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে কিছু স্বল্পকালীন সত্তা, যেমন বারশো শতাব্দীতে

খ্রিস্টানদের ধৈর্য এবং বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে মৌলবাদের প্রসার। ওই দুটি সত্তার ওপরই দুটো ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক আজও নির্ণীত হচ্ছে।

এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ মূলত দুটো ধর্মের বৈশিষ্ট্যের ভেতর লুকায়িত আছে। সাধারণত দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয় মতপার্থক্য থেকে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের ধারণা হচ্ছে 'ঈশ্বর' এবং 'সিজারের' মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। একথা সত্য যে, উভয় ধর্মের ভেতর আবার নানারকম মিলও রয়েছে। যেমন উভয়ই একঈশ্বরপন্থী ধর্ম, উভয়ই সর্বজনীন, উভয়ের মতাবলম্বীগণ দাবি করে যে, খাঁটি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মানবজাতির উন্নতি করা যায়। উভয় ধর্মই মিশনারিপন্থী। উভয়ই মনে করে যে, অধার্মিকদের হেদায়েত করে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করা যায় এবং এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব। শুরু থেকেই ইসলাম যুদ্ধের ভেতর দিয়েই সম্প্রসারিত হয়েছে। সুযোগসুবিধা বুঝে খ্রিস্টধর্মও সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধের পথ নিয়েছিল।

'জিহাদ' এবং 'ক্রুসেড' শব্দদুটি সমার্থক। আর এ দুটি শব্দ কিন্তু প্রকারান্তরে বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মকেও পৃথক করে থাকে। উভয় ধর্মই 'পরমকারণবাদে' বিশ্বাসী কিন্তু অন্যসব ধর্ম তেমন ধারায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা অনেককিছুর ওপর নির্ভরশীল, যেমন জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা, ইত্যাদি। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল আরববিশ্ব থেকে বাইজানটাইন ও সামানিয়ান সাম্রাজ্যে ব্যাপকভাবে অভিবাসন। এ-ধরনের অভিবাসন ছিল নজিরবিহীন। এর কয়েক শতাব্দী পরে সংঘটিত ক্রুসেড ছিল মূলত অর্থনৈতিক উন্নতি, জনসংখ্যার স্ফীতি, এগারো শতকে ইউরোপে 'ক্লুনাইক পুনঃজাগরণ' যা অনেক অভিজাত ও কৃষককে পবিত্র ভূমির পানে ছুটে যেতে উৎসাহিত করেছিল।

অনেক কারণের সংমিশ্রণের ফলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে দ্বন্দ্ব ও ক্রমবর্ধমান হারে সংঘাত ঘটতে দেখা যায়।

প্রথমত, মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বেকারত্ব বেড়ে যায়, এবং এসব বেকারদের ইসলামের নামে প্রলুব্ধ করে দল ভারী করাও সহজ হয়ে যায়। এদের অনেকে আবার অভিবাসনের মাধ্যমে পশ্চিমা জগতে পাড়ি জমায়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামি পুনঃজাগরণ মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় এবং তারা পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার তুলনা করতে গিয়ে কার্যত ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, মুসলমানেরা মনে করেন যে, পশ্চিমারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সর্বজনীন মূল্যবোধ, ইত্যাদি কথা বলে থাকে বিশ্বের অন্যান্যদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য। এভাবে. মুসলমানগণ পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, কম্যুনিজমের পতনের ফলে আসলে মুসলমান ও পশ্চিমাবিশ্বের 'সাধারণ শত্রুর' (কম্যুনিজম) পতন হয়েছে, ফলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের আর কোনো সেতু থাকল না এবং কার্যত তখন একে অপরের খুঁত বের করতে থাকে এবং এভাবে তারা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমত, পশ্চিমাদের সঙ্গে অধিকতর সংস্পর্শে আসার ফলে মুসলমান এবং পশ্চিমা উভয়ের মধ্যে নিজ নিজ পরিচয়সূত্র জানার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়। এতে করে তারা নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ হতে শুরু করে এবং এটিও বুঝতে থাকে যে, তারা এক নয় বরং আলাদা। ফলে বন্ধুত্বের বদলে পয়দা হয় শত্রুতা।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতার মাত্রা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। তাই দেখা যায়, ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বে নবায়িত দ্বন্দ্ব মূলত ক্ষমতা ও সংস্কৃতির মৌল বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কে শাসক হবে, কারা শাসিত হবে? লেনিনের মতে রাজনীতির কেন্দ্রীয় ইস্যু হল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের প্রতিযোগিতা। লেনিন আরও বলেন, দুটি সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এ প্রশ্ন উত্থাপন করা নিরর্থক। যতদিন পর্যন্ত ইসলাম 'ইসলাম' হিসেবে টিকে থাকবে (থাকবে বলেই মনে হয়) এবং পশ্চিমাবিশ্ব 'পশ্চিমা' হয়ে টিকে থাকবে, ততদিন এ দুটি বৃহৎ সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক বিগত ১৪শত বৎসর যেভাবে চলে এসেছে সেভাবেই বজায় থাকবে।

সামনের দিনগুলোতে এ সম্পর্ক আরও বিচলিত হওয়ার মতো, এমন সম্ভাবনা স্পষ্ট, যা সৃষ্টি হবে উভয়ের বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য থেকে। ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ সম্পার্কিত; যদিও তা বর্তমানে আর অতীতের মতো তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৯০-এর দশকে ২৮টি ফাটলরেখার মধ্যে ১৯টিই ছিল মুসলমান ও অ-মুসলমান এবং মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্পর্কিত। ১১টি ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান সম্পর্কিত, আর ৭টি ছিল পশ্চিমা খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে আফ্রিকা ও দক্ষিণপূর্বএশিয়া সংক্রান্ত ফাটলরেখা। এগুলোর মধ্যে ১টি ছিল সহিংস এবং বলা যায় চরম সহিংস, আর তা সংঘটিত হয়েছে বসনীয় ও ক্রোয়াটদের মধ্যে। বলা যায়, এটি ছিল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমা খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রত্যক্ষ ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত। একদিকে ভূখণ্ড দখলের পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা, আর অন্যদিকে মুসলমানগণ কর্তৃক রাজ্যবিজয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়েছে বলে। মাত্র কিছুসংখ্যক এলাকায় পাশ্চাত্যের বলকান এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সীমানা চিহ্নিতভাবে রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, আজকাল ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমের সংঘাত রাষ্ট্রীয় সীমানাকেন্দ্রিক না হয়ে বরং আন্তঃসভ্যতার ইস্যু-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে; যেমন অস্ত্র নিরোধ, মানবাধিকার, গণতন্ত্র, তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ, অভিবাসন, ইসলামি মৌলবাদ এবং সেগুলোর ওপর পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ক।

শীতলযুদ্ধ পেছনে চলে যাবার পর এ-ধরনের ঐতিহাসিকভাবে পরস্পর শত্রুতামূলক সম্পর্ক, উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ১৯৯১ সালে বেরি বুজান বলেন যে, 'একটি সামাজিক শীতলযুদ্ধ ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে এসে পড়েছে, যেখানে ইউরোপের

অবস্থান ফাটলরেখার মধ্যে।' এই ধরনের সংঘাতপূর্ণ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের, এবং সেইসঙ্গে অংশত খ্রিস্টতন্ত্র ও ইসলামের ঐতিহাসিক শত্রুতা থেকে উৎসারিত। অংশত পাশ্চাত্যের শক্তির প্রতি ঈর্ষাকাতরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও কলোনি-পরবর্তী বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্য এবং বিগত দুই শতাব্দী ধরে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার বলয়ে আবদ্ধ এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের নিমিত্তে আগত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু, তিনি বলেছেন, 'ইসলামের সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বের সামাজিকভাবে সংঘঠিত শীতলযুদ্ধ পশ্চিমা দুনিয়াকে তাদের পরিচয়ের প্রশ্নে আরও ঐক্যবদ্ধ করবে এবং তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে একত্রিত হবে।' সুতরাং, শক্তিশালী ইউনিয়ন ইসলামের সঙ্গে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা শীতল যুদ্ধে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা দেবে এবং এতে তারা উৎসাহও জোগাবে। ১৯৯০ সালে ইসলাম বিষয়ে একজন পণ্ডিত বার্নার্ড লুইস ('মুসলমানদের প্রবল ক্রোধের উৎস') সম্পর্কে বলেন :

> এটি এখন সকলের নিকট পরিষ্কার যে সীমা-অতিক্রমকারী কিছু বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যা সরকারগুলো তাদের নীতির মাধ্যমে এগিয়ে নিচ্ছে এবং পরিস্থিতি অগ্নি-উন্মুখ করে তুলেছে। এ অবস্থাকে আমরা সভ্যতার সংঘাত বলে অভিহিত করতে পারি। এ-ধরনের সংঘাত যুক্তিবহির্ভূত হতে পারে, তবে অবশ্যই এটি আমাদের জুডো-খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বব্যাপী উভয়ের সম্প্রসারণ যখন ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা শত্রু দ্বারা প্রতিরোধমুখর, তখন সংঘাত অনিবার্য। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা উস্কানি না দিলেও তাদের মতো একই ধারায় তাদের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি।[৭]

প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা ইসলামি সম্প্রদায় থেকেও পাওয়া যায়। মোহাম্মদ সিদ-আহমেদ নামে মিশরীয় একজন সাংবাদিক ১৯৯৪ সালে বলেন, 'পশ্চিমা জুডো-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান সংঘাত পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে পূর্বের চীন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।' ১৯৯২ সালে একজন প্রখ্যাত ভারতীয় মুসলমান ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, 'পশ্চিমের সঙ্গে মুসলমানদের পরবর্তী সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এবং তার দ্বারা আরবসাগর থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় মুসলমান জাতিগুলোর নতুন বিশ্ব নির্মাণে সংগ্রামের সূচনা শীঘ্রই শুরু করবে।' তিউনেশিয়ার একজন আইনজীবীর মতে, 'সংগ্রাম ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে: উপনিবেশবাদ ইসলামকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। তবে আমি ইসলামপন্থী নই। আমি মনে করি, এ সংঘাত ধর্মীয় সংঘাত। এ সংঘাত হল দুটি সভ্যতার মধ্যে ঘটান সংঘাত।'[৮]

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে ইসলামের সামগ্রিক প্রবণতা ছিল পশ্চিমাবিরোধী। এ-ধরনের মনোভাব অংশত ইসলামি পুনর্জাগরণের চেতনা থেকে উৎসারিত হয়েছে, এবং সেসঙ্গে তারা মনে করে যে, পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামের ওপর আঘাত এনেছে, যা প্রতিরোধ করা পবিত্র কর্তব্য।' অতএব, তারা পশ্চিমাবিদ্বেষী হয়ে উঠছেন। এ বিদ্বেষের মাত্রা খুবই গভীর। অতীতে একজন মুসলমান বলতে পারতেন যে, 'আমাদের অবশ্যই পশ্চিমামুখী হতে হবে।' কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে এ-ধরনের বক্তব্য আর কারও পক্ষে এখন করা সম্ভব নয়। তাই, এখন মুসলমানদের মধ্যকার

রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকদের পক্ষে পশ্চিমাবিশ্বের গুণগান গাওয়া খুবই দুরূহ কাজ। প্রকারান্তরে তারা পশ্চিমের তুলনায় মুসলমান সভ্যতার উন্নতর অবস্থার কথাই বলবেন। মুসলমানেরা এই ভেবে ভীত হন যে, পশ্চিমাসভ্যতা তাদের ওপর আরোপিত হলে তাদের সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা পশ্চিমাসভ্যতাকে মনে করে বস্তু ও ভোগবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত, অধঃপতিত এবং অনৈতিক। এসকল কারণে এর প্রতিরোধ করা জরুরি, তা না হলে এর অনুপ্রবেশ মুসলমানদের মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থাকে গ্রাস করে ফেলবে।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত পক্ষে ধর্মহীনতার শামিল। এর ফলে অনৈতিকতার মতো পাপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং সম্ভবত পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শীতলযুদ্ধের সময় পশ্চিমারা তার শত্রুদের বলতেন 'ঈশ্বরবিহীন কম্যুনিজম', আর শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে মুসলমানেরা তাদের সভ্যতার দৃষ্টিতে পশ্চিমাবিশ্বকে বলেন 'ঈশ্বর বিহীন পশ্চিমাবিশ্ব'।

পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা, যেমন উদ্ধত, বস্তুবাদি, নির্যাতনকারী, পাশবিক এবং অধঃপতিত— এটি শুধুমাত্র মৌলবাদী ইমামগণই পোষণ করেন না, সেসঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বে মিত্রগণ মনে করে থাকেন, এমনকি বন্ধু ও সমর্থকগণও বলে থাকেন। ১৯৯০-এর দশকে কিছু মুসলমান লেখকের বই-পুস্তক পশ্চিমা দুনিয়া কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে; তেমনি একটি পুস্তকে *ইসলাম ও গণতন্ত্র* (ফাতিমা মেরনিসি) আধুনিক, উদারনীতিকে তুলে ধরা হয়েছে।[১০]

এই পুস্তকে পশ্চিমাবিশ্ব সম্পর্কে যে প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়েছে তা প্রায় তোষামদবিহীন। বলা হয়েছে যে, পশ্চিমাবিশ্ব 'সামরিকমুখী' 'সাম্রাজ্যবাদী' এবং 'স্নায়ুরোগাক্রান্ত' তারা অন্য জাতিকে উপনিবেশবাদী সন্ত্রাসের মধ্যে আতঙ্কিত করে রাখে (পৃ. সংখ্যা ৩,৯)। পশ্চিমাসভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে খ্যাত 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' হচ্ছে সকলপ্রকার অরাজকতার মূল উৎস (পৃ.৮)। পশ্চিমাশক্তি ভীতিকর। আরববিশ্বকে শিক্ষা দেবার জন্য যদি বোমা নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তবে পশ্চিমাবিশ্ব একাই সে ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

'... পাশ্চাত্য আমাদের সাধ্য ও সম্ভাবনাসমূহ তছনছ করে দিচ্ছে, তাদের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে চলেছে—এটি এমন একটি শক্তি, যা আমাদের নিঃশেষ করছে। আমাদের বাজার দখল করছে, আমাদের সম্পদ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করছে, নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা... ।'

পাশ্চাত্যবিশ্ব সামরিক বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে এবং তাদের উদ্ভাবিত অস্ত্রশস্ত্র অনুন্নত বিশ্বে বিক্রি করছে। পশ্চিমাবিশ্বের এহেন সর্বমুখী থাবা থেকে রক্ষা পেতে হলে মুসলমানগণকে তাদের নিজস্ব প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরি করতে হবে। নিজেদের জন্য নিজেরাই অস্ত্র তৈরি করতে হবে (সে অস্ত্র গতানুগতিক কিংবা পারমাণবিক তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলেননি) এবং এভাবে পশ্চিমাদের নিকট 'সামরিক নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে' (পৃ. ৪৩-৪৪)। এখানে পুনরায় বলা হচ্ছে যে, এসব কথা আয়াতুল্লাহ প্রদত্ত নয়।

তাদের রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় যুক্তি যাই হোক না কেন, মুসলমানেরা যুক্তি দেখান যে, মূল পার্থক্য হল তাদের সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি সংক্রান্ত। শেখ ঘানৌসী বলেন যে, 'আমাদের সমাজ পশ্চিমাসমাজের মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মূল্যবোধ দ্বারা চালিত।' একজন মিশরীয় সরকারি কর্মকর্তা বলেন, 'আমেরিকানরা এখানে আসেন এবং প্রত্যাশা করেন যে, আমরা যেন তাদের মতো হই।' তারা আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। 'আমরা তাদের থেকে ভিন্ন'– একথা বলেন মিশরের একজন সাংবাদিক। তিনি আরও বলেন যে, 'আমাদের রয়েছে পৃথক পটভূমি এবং একটি ভিন্ন ইতিহাস। এজন্য আমাদের একটি ভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার অধিকার রয়েছে।' জনপ্রিয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে উচ্চমার্গের মুসলিম প্রকাশনাগুলো সাংঘাতিকভাবে এই চিত্রটি তুলে ধরে যে, কীভাবে পাশ্চাত্যবিশ্ব মুসলমানদের পদানত, অপমানিত এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানাদি ও সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করে থাকে।[১১]

পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া যে শুধুমাত্র মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাই নয়, সেসঙ্গে বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রেরসরকারের কার্যকলাপ থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে।

উপনিবেশোত্তর তাৎক্ষণিক স্বাধীন দেশের সরকারসমূহ সাধারণত পাশ্চাত্যের অনুসারী হয়ে থাকেন। তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতাদর্শ এবং বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশকে অনুসরণ করে থাকেন। এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন আলজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া, যেখানে স্বাধীনতার অর্থ ছিল একটি বৈপ্লবিক চেতনা। পরবর্তীতে একের পর একটি দেশ নানা কারণে পাশ্চাত্যপ্রীতি থেকে দূরে সরে আসতে শুরু করে। কেউ কেউ আবার প্রচণ্ডভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে; যেমন ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরান, সুদান, লেবানন এবং আফগানিস্তান। কম নাটকীয়ভাবে যে-সমস্ত দেশে এ-ধরনের পরিবর্তন ঘটে তাদের মধ্যে রয়েছে, তিউনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া। শীতলযুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থনদাতা দুটি দেশ তুরস্ক ও পাকিস্তান অন্যান্য মুসলমান দেশ কর্তৃক এবং সেসঙ্গে অভ্যন্তরীণভাবে ভীষণরকমের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে তাদের সখ্য চাপের মুখে পড়ে যায়।

১৯৯৫ সালে পরিষ্কারভাবে পাশ্চাত্যপন্থী দেশ হিসেবে একমাত্র কুয়েতের নাম উচ্চারিত হতে থাকে, যদিও দশবছর পূর্বেও দেশটি তত পাশ্চাত্যপন্থী ছিল না। পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মুসলমান দেশ কুয়েত অথবা সৌদিআরব এবং গাল্ফের শেখ-শাসকগণ সামরিকভাবে পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল, অথবা মিশর এবং আলজেরিয়া পশ্চিমের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। ১৯৮০-এর দশকে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট শাসকদের পতনের পর তারা উপলব্ধি করে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আর পূর্বের মতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার অবস্থা নেই, ফলে তাদের জন্য সংকট নেমে আসে। তেমনি, পাশ্চাত্যের 'স্যাটেলাইট' হিসেবে পরিচিত মুসলমানদেশগুলো যখন বুঝতে পারবে যে, পশ্চিমাবিশ্বের পক্ষে আর তাদেরকে সামরিক ও আর্থিক সহযোগিতার যোগান দেয়া সম্ভব নয়, তখন তাদের ভাগ্যেও অনুরূপ অসহায় পরিণতি চলে আসবে।

মুসলমানদের মধ্যে বেড়ে ওঠা পশ্চিমাবিদ্বেষী পরিস্থিতিকে পশ্চিমাবিশ্ব 'মুসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট ভীতি' হিসেবে গণ্য করে থাকে। আর এ ভীতি আসে বিশেষভাবে মুসলমান মৌলবাদীদের নিকট থেকে। পরমাণুঅস্ত্র প্রসার, সহিংসতা এবং ইউরোপে অনাকাঙ্ক্ষিত অভিবাসনকারী হিসেবে মুসলমান ও ইসলামকে দেখা হয়ে থাকে। এ-ধরনের মনোভাব ও চিন্তাচেতনা সরকারি ও বেসরকারি জনমনেও দোল খায়। ১৯৯৪ সালে জিজ্ঞাস্য ছিল ইসলামি পুনঃজাগরণ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার স্বার্থের প্রতি হুমকিস্বরূপ কি না। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, এ প্রশ্নে ৩৫,০০০ নমুনার মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ উত্তর দেয় 'হ্যাঁ' এবং মাত্র ২৮ ভাগ উত্তর দেয় 'না'। এর ১ বৎসর পূর্বে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, আমেরিকার জন্য কোন্ দেশ সবচেয়ে ভীতিকর, এর উত্তরে এসেছিল ইরান, চীন এবং ইরাকের নাম। অনুরূপভাবে, ১৯৯৪ সালে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল : আমেরিকার জন্য সাংঘাতিক ভীতি কোথা থেকে আসতে পারে। যথাক্রমে শতকরা ৭২ ভাগ জনগণ এবং বিশিষ্ট নীতি নির্ধারক শতকরা ৬৯ ভাগ বলেন যে, পারমাণবিক বিস্তার এবং শতকরা ৬৯ ভাগ জনগণ এবং শতকরা ৩৩ ভাগ নীতিনির্ধারক বলেন 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ'। বলা বাহুল্য, উভয় বিষয় দুটিই ইসলামের সঙ্গে সংযুক্ত। উপরন্তু, শতকরা ৩৩ ভাগ জনগণ এবং শতকরা ৩৯ ভাগ নেতা ক্রমবর্ধমান ইসলামি মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভীতির কথা উল্লেখ করেন।

ইউরোপীয়গণও আমেরিকানদের অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেন। ১৯৯১ সালের বসন্তকালে শতকরা ৫১ ভাগ ফরাসি জনগণ বলেন যে, ফরাসি দেশের জন্য প্রধান ভীতি আসবে দক্ষিণদিক থেকে। চারটি দেশকে ফরাসি জনগণ ভীতির চোখে দেখে থাকেন, যার প্রতিটিই হল মুসলমান দেশ। এর মধ্যে ইরাক শতকরা ৫২ ভাগ, ইরান শতকরা ৩৫ ভাগ, লিবিয়া শতকরা ২৪ ভাগ এবং আলজেরিয়া শতকরা ২২ ভাগ।[১২] পশ্চিমাবিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। জার্মানির চ্যান্সেলর এবং ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেলের সুরে সুর মিলিয়ে ১৯৯৫ সালে বলেন যে, 'ইসলামি মৌলবাদ কম্যুনিজমের মতোই ভয়াবহ'। ক্লিনটন প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, 'ইসলাম হল পশ্চিমের বৈদেশিক শত্রু'।[১৩]

পূর্বাঞ্চল থেকে দৃশ্যত সামরিক হুমকি কেটে যাওয়ার পর ন্যাটোর পরিকল্পনাগুলো এখন দক্ষিণমুখী। কেননা ন্যাটো মনে করে দক্ষিণদিক থেকে হুমকি আসতে পারে।

'দক্ষিণের সৈন্যসারি' সম্পর্কে একজন আমেরিকান ১৯৯২ সালে বলেন যে, তা যেন ন্যাটোর কেন্দ্রীয় ফ্রন্টকে পরিবর্তন করে দ্রুত নতুন ফ্রন্টের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণদিক থেকে আসা এই ভীতির মোকাবিলা করতে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগাল যুগ্মভাবে সামরিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। মাঝেমধ্যে মাগরেব সরকারের সঙ্গে তারা ইসলামি চরমপন্থীদের মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

ইসলামি মৌলবাদীদের দ্বারা অনবরত হুমকি থাকার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপে সৈন্যসমাবেশ করে রাখতে হচ্ছে। মার্কিনবাহিনীর উপস্থিতি ইউরোপে ক্রমবর্ধমান ইসলামি মৌলবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো মহৌষধ নয়- বলে মন্তব্য করেন একজন প্রাক্তন মার্কিন সৈন্য। তিনি আরও বলেন, তবে এই সৈন্যরা

ইউরোপে সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। স্মরণ করতে হবে যে, '১৯৯০-৯১ সালের গাল্ফযুদ্ধের সময় মার্কিন, ফরাসি এবং ব্রিটিশ বাহিনী ওইসব সেনাঘাঁটি থেকে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এভাবেই তারা উক্ত এলাকায় কাজ করছে।'[১৪] তবে তিনি এ সত্যটি বর্ণনায় সংযুক্ত করলে ভালো করতেন যে, ওইসব সৈন্য সেখানকার স্মৃতিগুলো ভীতির সঙ্গে স্মরণ করে উল্টো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, এবং তাকে ঘৃণাও করে থাকে।

১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের ভেতর দিয়ে ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি আন্তঃসভ্যতা সম্পর্কিত 'প্রায়-যুদ্ধ' সৃষ্টি হয়েছে। এটিকে প্রায়-যুদ্ধ বলা যায় মোটামুটি তিনটি কারণে।

প্রথমত, সমগ্র ইসলামি শক্তি সমগ্র পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না। মৌলবাদী রাষ্ট্র (ইরান, সুদান) তিনটি অ-মৌলবাদী রাষ্ট্র যেমন ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, সেসঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক ইসলামি সংগঠন যারা সৌদিআরবের অর্থপুষ্ট হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তারা আরও যুদ্ধ করছে সাধারণভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধেও।

দ্বিতীয়ত, এটি একটি প্রায়-যুদ্ধ এজন্য যে, ১৯৯০-এর গাল্ফ-যুদ্ধ ছাড়াও এ যুদ্ধ কিছু সীমিত ধারায় সংঘটিত হয়। যেমন সন্ত্রাস, হঠাৎ হঠাৎ বিমানশক্তি প্রয়োগ, চাপা বা লুক্কায়িত কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক অবরোধ। অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের পর্যায়ে এটি হয় না।

তৃতীয়ত, এটি একটি প্রায়-যুদ্ধ, কেননা যতক্ষণ সহিংসতা থাকে ততক্ষণ এ যুদ্ধ থাকে এবং তারপরেও থাকে।

তবে প্রায়-যুদ্ধও একধরনের যুদ্ধ। ১৯৯১ সালে প্রায় দশসহস্রাধিক ইরাকি সৈন্য পশ্চিমাদের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে মারা যায়। এ ছাড়া ১৯৭৯ সালের পরে প্রায়শই এ-ধরনের মৃত্যু সেখানে ঘটে চলেছে। পাশ্চাত্যের অনেক মানুষ সেখানে মৃত্যুবরণ করছেন, এমনকি প্রকৃত গাল্ফযুদ্ধে তারা তত মরেনি। উভয়পক্ষই মনে করে যে, এ সংঘাত একদিন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেবে। ইতোপূর্বে খোমেনি যথার্থই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, 'ইরান কার্যকরভাবে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।'[১৫] আর গাদ্দাফি তো অহরহই বলেছেন পশ্চিমের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের কথা। অন্যান্য দেশের উগ্র মুসলমান-নেতৃবৃন্দ প্রায় অভিন্ন ভাষায় পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলে আসছেন। অন্যদিকে আমেরিকা মোটামুটি ৭টি দেশকে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ৫টিই হল মুসলমান দেশ—ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, সুদান; এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিউবা ও উত্তরকোরিয়া। এসব দেশ পশ্চিমের শত্রুদেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা তারা সুযোগ পেলেই তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিমাবিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে। মার্কিন কর্মকর্তারা অহরহ এসব দেশগুলোকে 'অপরাধী', 'দুর্বৃত্ত' দেশ হিসেবে বলে আসছেন। এজন্য তারা ওই দেশগুলোকে সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক ধারার বাইরে রেখে দেন, এবং সুযোগ পেলেই 'একক' বা 'যৌথ' আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বোমাবর্ষণের ঘটনাকে আমেরিকা 'আমেরিকার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহপূর্বক শহুরে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধঘোষণা বলে মনে করে থাকে।' যদি

মুসলমানেরা মনে করে থাকেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যদেশগুলো যদি মনে করে যে, ইসলামি শক্তিগুলো পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, তবে যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, একটি বড় ধরনের যুদ্ধ সম্মুখের দিনগুলোতে অপেক্ষা করছে।

এহেন প্রায়-যুদ্ধাবস্থায় প্রত্যেক পক্ষই মনে করে থাকে যে, তারা শক্তিশালী, অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষ দুর্বল। ইসলামি উগ্রবাদীরা পশ্চিমের মুক্ত দেশসমূহে গাড়িবোমার মাধ্যমে আতঙ্ক ও প্রাণহানি ঘটাচ্ছে। আর পশ্চিমের পেশাদার সামরিক কর্তৃপক্ষ ইসলামি শক্তির ওপর অপেক্ষাকৃত উন্নত বোমা বর্ষণ করে চলেছে। ইসলামি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী পশ্চিমা কিছু বিখ্যাত নেতানেত্রীকে হত্যার লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে; অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি শক্তিগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৫—এ পনেরো বৎসর আমেরিকা ১৭টি সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালনা করেছে বলে একজন মার্কিন মুখপাত্র স্বীকার করেছেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি অভিযানের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমানদেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এ-ধরনের অভিযান কোনো সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রায় নজিরবিহীন।

গাল্ফযুদ্ধ ব্যতীত অদ্যাবধি প্রত্যেক প্রতিপক্ষই এক্ষেত্রে সহিংসতাকে কিছুটা হলেও নিম্নমাত্রায় রাখতে চেষ্টা করেছে। সম্ভবত তারা এর দায়িত্ব এড়াতে চান বলেই এমন আচরণ করেছেন। *দি ইকোনমিস্ট* পত্রিকার মতে, 'যদি লিবিয়ার সাবমেরিন আমেরিকার কোনো জাহাজ ডুবিয়ে দেয়, তাহলে আমেরিকা সরকার এ-ধরনের কার্যকলাপকে যুদ্ধ বলেই ধরে নেবে...।[১৬] অপরদিকে শীতলযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যতটা না যুদ্ধে সহিংসতা এনেছিল এসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সহিংস।

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত বৃহৎশক্তিগুলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনমানুষ কিংবা সৈন্য হত্যা করে থাকে। প্রায়-যুদ্ধাবস্থাতেও এ-ধরনের মনমানসিকতাই সবসময় কাজ করে চলেছে।

আমেরিকা সবসময়ই বলে চলেছে যে, প্রায়-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানেরা খুবই সংখ্যালঘু, বৃহত্তর মুসলমানসমাজ তাদের এ-ধরনের উগ্র কার্যকলাপকে সমর্থন দেয় না। হয়তো এ বক্তব্যের সত্যতা রয়েছে। যদিও বাস্তবতা অন্য কথা বলে থাকে। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সহিংস তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাত্রা মুসলমানদেশে একেবারেই নেই বলেই চলে। এমনকি, পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল মুসলমানদেশের সরকারগুলোও পশ্চিমের বিরুদ্ধে সহিংস তৎপরতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো কার্যকর নিন্দা জ্ঞাপন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। অন্যদিকে, ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ মুসলমানদের সহিংসতার বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। দেখা যায়, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার দ্বন্দ্বে সমজাতীয় সভ্যতা বা 'আত্মীয়সুলভ সভ্যতা' শক্তিগুলো একে অপরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের মানুষ মনে করে যে, তাদের সভ্যতা সর্বজনীন ও তাদের সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় উন্নত। সুতরাং, উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে

দেবার একটা দায়িত্ব তাদের ওপর রয়েছে। সম্ভবত এই মৌল কারণেই পাশ্চাত্য ও ইসলাম দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এশিয়া, চীন এবং আমেরিকা : সভ্যতাসমূহের আধার

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার, বিশেষ করে পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক পরিবর্তন একটি বড় মাপের ঘটনা। ১৯৯০-এর দশকে এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একটি রমরমা অবস্থার জন্ম দেয়। অনেকেই এই উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বে বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে শান্তি ও সমঝোতা স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। এই আশাবাদ অত্যন্ত সন্দেহজনক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটতে দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও একটি দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ায়; বিশ্বে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ভারসাম্যের পরিস্থিতি বদল করে দেয়। অর্থনৈতিক লেনদেন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তা মানুষের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করে থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য সম্পর্কে মানুষ বুঝতে শিখে থাকে। এ থেকে সৃষ্টি হয় ভয়ভীতি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য 'লাভ' এবং 'দ্বন্দ্ব' দুটোই বাড়ায়। যদি পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হয় তবে বলা যায় : এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোকরশ্মি জন্ম দেবে এশিয়ার রাজনৈতিক অন্ধকার; এশিয়া হয়ে উঠবে রাজনৈতিকভাবে অস্থির এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতে পরিপূর্ণ।

এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এশীয়দের উদীয়মান আত্মবিশ্বাস আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে তিনভাগে ভেঙেচুরে দিয়েছে। যেমন :

প্রথমত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এশীয়দেশসমূহকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করছে। এর ফলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা; পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এতদঞ্চলে শীতলযুদ্ধের সময় ছিল অনুপস্থিত। এভাবে অত্র অঞ্চলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরস্পর শত্রুতা বেড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি একদিকে এশীয় সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে এশীয়দের দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করছে। এ দ্বন্দ্ব প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুরু হয়েছে। তবে, এ সংঘাত পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এশীয় প্রতিরোধের শক্তিকে দিন দিন বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, এশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে অত্র অঞ্চলে চীনের আধিপত্য বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে অন্যান্য এশিয়দেশকে চীনের আধিপত্যের বাস্তবতা মেনে নিতে হচ্ছে, অথবা চীনের সঙ্গে ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা করতে হচ্ছে।

কয়েক শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্যবিশ্ব 'এককভাবে' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া প্রথম পশ্চিমাবিশ্বের সম্পূরক হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং জাপান সম্পূরক শক্তি হিসেবে আসে আরও পরে, বিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপই ছিল

দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সহযোগিতার রাজনীতির প্রধান নায়ক। এমনকি শীতলযুদ্ধের সময়ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে, আর তা ঘটেছে একেবারে ইউরোপের অন্তরের অভ্যন্তরে। শীতলযুদ্ধোত্তর বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মৃত্তিকাতল হিসেবে এশিয়া, বিশেষ করে পূর্বএশিয়া চিহ্নিত হচ্ছে। এশিয়া এখন সভ্যতার মহাপাত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পূর্বএশিয়ায় রয়েছে কম করে হলেও ৬টি সভ্যতা—জাপানি, সিনিক, অর্থোডক্স, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং পাশ্চাত্য-এর সঙ্গে দক্ষিণএশিয়া যুক্ত হলে হিন্দুসভ্যতা সংযোজিত হয়। চারটি কোররাষ্ট্র, যথা—জাপান, চীন, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার মূল ঘটক দক্ষিণএশিয়ায় রয়েছে শক্তিশালী ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া হল ভীতিকর একটি শক্তিশালী মুসলমান রাষ্ট্র। এতদ্ব্যতীত, পূর্বএশিয়ায় মধ্যমমানের শক্তিসম্পন্ন আরও কিছু রাষ্ট্র আছে, যা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, যেমন কোরিয়া, তাইওয়ান এবং মালয়েশিয়া। সেসঙ্গে আরও যুক্ত হচ্ছে সম্ভাবনাময় ভিয়েতনাম। এর ফলে সে-অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুতর এবং জটিল ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে, যার সঙ্গে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের তুলনা করা চলে। ফলে, সেখানে দেখা দিয়েছে বহুধারা ও বহুমুখী শক্তির পরস্পর সমারোহ।

বহুমুখী ক্ষমতার বিন্যাস, বহুমুখী সভ্যতার ধারাই হল পূর্বএশিয়া ধারা। এ ধারাটিই কার্যত ইউরোপ থেকে পূর্বএশিয়াকে পৃথক করেছে। ক্ষমতা ও সংস্কৃতির এ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখিতা। পশ্চিমাবিশ্বের সব দেশেই রয়েছে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা; আছে মুক্তবাজার অর্থনীতি, উচ্চমানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অগ্রগতি। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে পূর্বএশিয়ায় একটি দেশে ছিল সুস্থির গণতন্ত্র। অস্থির গণতন্ত্র ছিল তথাকার অধিকাংশ নব্য স্বাধীন দেশে।

৪ অথবা ৫টি দেশে ছিল কম্যুনিস্ট ধরনের স্বৈরশাসন। সামরিক সরকার, ব্যক্তিগত স্বৈরশাসন এবং ছিল প্রভাবশালী একদলীয় কর্তৃত্বমূলক শাসন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে পূর্বএশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ছিল অমিল। জাপান এবং সিঙ্গাপুরের অবস্থা ভিয়েতনাম আর উত্তরকোরিয়ার অবস্থা এক ছিল না। যদিও সেখানে বাজার-অর্থনীতির একটি প্রবণতা শুরু হয়ে গিয়েছে, তবুও সেখানে নানাধরনের এবং বিভিন্ন ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করার মতো। উত্তরকোরিয়ায় রয়েছে কম্যুনিস্ট ধরনের কর্তৃত্বমূলক অর্থনীতি, অন্যত্র রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানার সংমিশ্রিত অর্থনীতি। হংকং-এ রয়েছে ব্যক্তিমালিকানা এবং ধনতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি।

সময়ে সময়ে আধিপত্যবাদী কার্যক্রমের পরও পূর্বএশিয়ায় (ব্রিটিশ অর্থে) পশ্চিম ইউরোপের মতো একটি আন্তর্জাতিক সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে।[১৭] বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একাধিক জোটগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়; যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো, পশ্চিম-ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় শান্তি ও নিরাপত্তার সংগঠন এবং অন্যান্য। তবে পূর্বএশিয়ায় একমাত্র আসিয়ান ব্যতীত ইউরোপের তুলনায় তেমন কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। সেখানেও তেমন কোনো বৃহৎ শক্তির উপস্থিতি নেই, যে শক্তি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারে।

তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান 'আদিম প্রক্রিয়ার' মাধ্যমে অর্থনৈতিক সংহতি আনতে চেষ্টা করছে বলে মনে হয়। ১৯৯০-এর দশকে আরও একটু বৃহত্তর আঙ্গিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে নিয়ে 'এপিইক' গঠিত হলেও বাস্তবে দেখা যায়, এ সংগঠনটি আসিয়ানের চেয়েও দুর্বল। এতদ্ব্যতীত, অত্র অঞ্চলে বহুপাক্ষিক একটি একক প্রতিষ্ঠান মুখ্য এশীয় শক্তিগুলোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠেনি।

পশ্চিম-ইউরোপীয় অবস্থায় বিপরীত ধারায় দেখা যায়, পূর্বএশিয়ার বিভিন্ন প্রকারের সংঘাতের পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ সজীব রয়েছে। চিহ্নিত দুটি বিবদমান শক্তি যেমন অশান্তির উদাহরণ হিসেবে 'দুই কোরিয়া' এবং 'দুই চীনের' নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ১৯৯৫ সাল থেকে মতাদর্শিক পার্থক্য হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দুই চীন এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্ক কিঞ্চিৎ উন্নতির সূচনাপর্ব শুরু হয়েছে।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে কোরিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও তার ধার অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধের ধার এখনও চকচক করছে। তবে, পূর্বের চেয়ে তা অনেক সীমিত, একথা মানতেই হবে। কেননা চীনের একজন জেনারেল বলেছেন, 'পারিবারিক বা সমগোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে যুদ্ধের ধারা এখন সীমিত।'[১৮] যদিও দুই চীন এবং দুই কোরিয়ার মধ্যে সহিংসতার সম্ভাবনা এখনও সীমিত রয়েছে, তবে প্রত্যাশা করা যায়, যেহেতু তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল প্রকট, সেহেতু হয়তো ভবিষ্যতে এসব শক্তিগুলো একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসবে।

পূর্বএশিয়ায় শীতলযুদ্ধকালীন সৃষ্ট সংঘাত বর্তমানের অর্থনৈতিক কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ধিষ্ণু হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে বলা হচ্ছে : 'বিবদমান ও সাংঘাতিক সংঘাতময় প্রতিবেশিত্ব বিরাজমান' যা 'দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্য পরিপক্বতা' পেয়েছে, এ অঞ্চলে যেন সদাসর্বদা 'শীতলযুদ্ধাবস্থা বিরাজমান' থাকছে। তাই, এখানে সবসময়ই যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকবে।'[১৯]

১৯৯০-এর দশকে ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপে ও এশিয়ায় সীমান্ত বিরোধ অনিষ্পন্ন থেকে যায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধগুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া এবং চীনের সীমান্ত বিরোধ, উত্তর দ্বীপাঞ্চলে চীন, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং আরও রয়েছে দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় দক্ষিণচীন সমুদ্র বিরোধ। সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার, চীনের সঙ্গে ভারতের এবং উভয়ের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ ১৯৯০-এর দশকে অংশত হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার তা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন চীন মঙ্গোলিয়া দাবি করে বসে। বাইরের শক্তির দ্বারা সমর্থিত ও মদদপুষ্ট সহিংসতা মিন্দানাও, পূর্ব তিমুর, তিব্বত, দক্ষিণ থাইল্যান্ড, পূর্ব মায়ানমারে ঘটে চলেছে। ১৯৯০-এর দশকে পূর্বএশিয়ায় অন্যান্য স্থানে রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি বিরাজ করছিল। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে কিছু মারাত্মক যুদ্ধ হতে দেখা গিয়েছিল, যা ঘটেছিল কোরিয়া এবং ভিয়েতনামের মধ্যে এবং এশিয়ার মূল শক্তিগুলোর মধ্যে চীন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাছাড়া পূর্বএশিয়ার প্রায় সকল প্রতিবেশী, যেমন কোরিয়া, ভিয়েতনামী, জাতীয়তাবাদী চীনাগণ, ভারতীয়, তিব্বতীয় এবং রুশগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে সীমান্ত বরাবরে সংঘাত করেছে। ১৯৯৩

সালে চীনের সামরিক বিশ্লেষণে ৮টি স্থানকে অতি-উত্তপ্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যা চীনের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বলে মনে করা হয়। পূর্বএশিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে বলা হয় 'অত্যন্ত ভয়ানক'। শতাব্দীকাল ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবার পর অদ্যকার ইউরোপ হয়েছে শান্তির নিবাস এবং সেখানে যুদ্ধ অকল্পনীয় বিষয়। পূর্বএশিয়া কিন্তু তেমন নয়। এয়ারন ফ্রিডবার্গ যেমন বলেন, 'ইউরোপের সংঘাতপূর্ণ অতীত হয়তো এশিয়ার ভবিষ্যৎ'।[২০]

অর্থনৈতিক গতিশীলতা, ভূখণ্ড সম্পর্কিত বিরোধ, পুনর্জাগরিত পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বএশিয়ার সামরিক খাতে বরাদ্দব্যয় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও শিক্ষিত জনগণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পূর্বএশীয় সরকার তাদের পুরাতন ও অযুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র এবং কৃষক-ধাঁচের সৈন্য পালটিয়ে যুগোপযোগী, আধুনিক, সম্প্রসারিত এবং আরও পেশাদারমুখী উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন করছে। এভাবে পূর্বএশিয়ায় আমেরিকার আগ্রহ থাকার পরও পূর্বএশিয়ার দেশসমূহ সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পূর্বএশীয় দেশসমূহ সাধারণত ইউরোপ, আমেরিকা ও প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট থেকে অস্ত্র ক্রয় করে থাকে। তবে এখন প্রযুক্তিগত বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশেই নিজেরা উন্নত ধরনের যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং যুদ্ধ-সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপন্ন করছে। জাপান এবং চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণকোরিয়া প্রভৃতি সিনিক রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে তাদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। পূর্বএশিয়ার উপকূলীয় ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় রেখে তারা নৌবাহিনীকে উন্নততর সাজে সজ্জিত করতে মনোযোগ দিয়েছে। ফলে, দেশগুলো পূর্বে একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যতা না-রাখলেও এখন তারা ক্রমাগতভাবে সে যোগ্যতা অর্জন করে চলেছে।

এই ধরনের সামরিক যোগ্যতার বেলায় স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এতে করে সেখানে পারস্পরিক সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।[২১] এমতাবস্থায় ক্ষমতায় অদলবদলের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারগুলো প্রয়োজনে ও বৈধভাবেই এগুচ্ছে। এখন থেকে আগামী দশ বৎসর পরে কে কার বন্ধু বা শত্রুতে রূপান্তরিত হবে, তা কে জানে?

এশিয়া-আমেরিকার শীতল যুদ্ধ

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশিয়ার দেশসমূহের সম্পর্ক (ভিয়েতনাম বাদে) ক্রমাগতভাবে ছিল শত্রুভাবাপন্ন, আর সব বিতর্কিত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ও তা ধারণ করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। সম্পর্কের এইরূপ প্রবণতা আমেরিকার সঙ্গে চীন ও জাপানের সম্পর্কের নিরিখে সমান্তরালভাবে নির্ণীত হয়। একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে জাপান এবং চীনও তাদের দেশে শীতলযুদ্ধাবস্থার কথা বলতে শুরু করে।[২২] এই যুগপৎ প্রবণতা বুশ-প্রশাসনের সময় শুরু হয় এবং ক্লিনটন-প্রশাসনের কালে তা গতি পায়। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশিয়ার দুটি প্রভাবশালী দেশ চীন এবং জাপানের সম্পর্ক টানটান

উত্তেজনার অবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতির কোনোপ্রকার উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি।

১৯৯০-এর দশকে জাপান-আমেরিকার সম্পর্ক নানা কারণে ক্রমাগতভাবে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণগুলোর মধ্যে ছিল গাল্ফযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা, জাপানে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান, আমেরিকা কর্তৃক উদ্ভাবিত মানবাধিকারের প্রশ্নে চীনসহ অন্যান্য দেশের অবস্থান সম্পর্কে জাপানের প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব, শান্তিমিশনে জাপানের ভূমিকা ও অবস্থান এবং সর্বোপরী অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বিশেষত তার মধ্যে বাণিজ্য অন্যতম। তাই দেখা যায়, বাণিজ্যের সম্পর্কের অবস্থান ছিল যে-কোনো বিচারে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।[২৩] ক্লিনটন-প্রশাসনের যুগে আমেরিকার কর্মকর্তারা জাপানের নিকট থেকে প্রায়শই অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা পেতে চায়। অন্যদিকে, জাপানের কর্মকর্তারা উক্ত চাহিদা মানতে তেমন রাজি ছিলেন না। ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে জাপানের ওপর বাণিজ্য বাধানিষেধ আরোপের ক্ষমতা প্রদান করে। এটিকে জাপান কর্তৃক, এমনকি গ্যাট থেকেও তার সমালোচনা করা হয়। এর অল্পকাল পরে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ও গুরুতর অবস্থান গ্রহণ করে, এবং তার ফল হিসেবে আমেরিকার কোম্পানিগুলোকে জাপানে চুক্তি ও কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বকভাবে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৯৫ সালের বসন্তকালে ক্লিনটন-প্রশাসন জাপানের গাড়ির ওপর শতকরা ১০০ ভাগ ট্যারিফ ধার্য করার হুমকি প্রদান করে। আর এভাবে উভয় দেশের মধ্যে 'বাণিজ্যযুদ্ধ' ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে জাপানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা জাপানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করেন।

এসকল বৎসরে উভয় দেশের জনগণ উভয় উভয়কে সহ্য করার শক্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলে। ১৯৮৭ সালে শতকরা ৮৭ ভাগ আমেরিকার জনগণ উত্তর দেয় যে, তারা জাপানের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব পোষণ করেন। অথচ ১৯৯০ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬৭ শতাংশে, আর ১৯৯৩ সালে এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫০ ভাগে। অন্যদিকে, ১৯৮৫ সালে শতকরা ৭৩ ভাগ জাপানি মনে করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। ১৯৯৩ সালে শতকরা ৬৪ ভাগ জাপানি বলেন যে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অ-বন্ধুসুলভ। ১৯৯১ সাল প্রকৃতপক্ষে শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মার্কিন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এ বৎসর উভয় দেশই সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বাতিল করে দেয়। এই প্রথমবারের মতো আমেরিকা জাপানকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পর্যায়ে নিয়ে আসে এবং জাপানকে তার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে। অন্যদিকে, জাপানও অনুরূপভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নিরাপত্তার জন্য প্রধান হুমকি হিসেবে মনে করতে শুরু করে।[২৪]

জনগণের মননজগতে পরিবর্তন উভয়ে দেশের এলিটসমাজের সঙ্গে মিলে যেতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বিপুলসংখ্যক অ্যাকাডেমিক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনে করেন যে, আমেরিকার উচিত জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত পার্থক্যের দিকটি মনে রাখা এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের

ক্ষেত্রে আরও কঠোর পথ অনুসরণ করা। মিডিয়া, অ-ফিকশন প্রকাশনা এবং জনপ্রিয় উপন্যাসে জাপানের প্রতিচ্ছবি ক্ষতিকর হিসেবে ফুটিয়ে তোলা শুরু হয়। জাপানেও অনুরূপ এবং সমান্তরালভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়। জাপানের নতুন প্রজন্ম মার্কিনবিরোধী মনোভাব নিয়েই বড় হতে থাকে। তা হলে দেখা যায়, উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি প্রতিরোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। উভয় দেশের ভোটারদের মনোভাবও সেভাবেই প্রস্তুত হতে থাকে।

১৯৮০-এর শেষদিকে এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমাগত বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে। দুই দেশের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক বিষয়ে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডেং জিওপিং একটি প্রবচনের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, আর তা হল, 'একটি নতুন শীতলযুদ্ধ' এ প্রবচনটি উপর্যুপরিভাবে চীনের প্রচারমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয় যে, 'চীন আমেরিকার সম্পর্ক ১৯৭৯ সালে দুই দেশের কূটনীনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির পর থেকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে।' চীনের কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত চীনের বিষয়ে মার্কিনীদের অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ জানাতে থাকেন। তারা বলতে থাকেন যে, 'আমেরিকা নতুন করে আধিপত্যের রাজনীতি শুরু দিয়েছে।' পাশ্চাত্যের শত্রুভাবাপন্ন শক্তি, যেমনটি প্রেসিডেন্ট জিয়ান জেমিন ১৯৯৫ সালের আগস্টে বলেন, 'আমেরিকা চীনের ভূখণ্ড ভাগাভাগি করে তাকে দুর্বল করতে চাইছে এবং এভাবে তারা চীনকে তাদের পদানত করতে চায়। আর সেসঙ্গে তারা চীনকে কৌশলগতভাবে দুর্বল করে তাকে অর্থনৈতিক হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে চায়।'[২৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত চীনের প্রায় সকল অভিযোগেরই প্রমাণ মেলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লি'কে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তাইওয়ানের নিকট ১৫০ এফ-১৬ এস বিমান বিক্রি করে, তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতকে একটি দখলকৃত সার্বভৌম ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। চীনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বেজিং এ অনুষ্ঠিতব্য ২০০০ অলিম্পিকের বিরোধিতা করে। তাছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলে। চীন কর্তৃক ইরানে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির উপাদান রপ্তানির তীব্র সমালোচনা করে। পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির কারণে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র আরও অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগের হুমকি প্রদান করে এবং 'ডব্লিওটিও'-তে চীনের সদস্যপদেরও বিরোধিতা করা হয়।

একপক্ষ অন্যপক্ষের ওপর পারস্পরিক গুরুতর অনাস্থার দৃষ্টিতে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ আনতে থাকে। আমেরিকা বলতে থাকে, চীন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্রি করছে। কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করছে, শ্রমিকদের দাসত্ব ও বন্দিত্বের অচলায়তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, চীন অভিযোগ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লি'কে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানায় এবং তাইওয়ানের নিকট অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান বিক্রি করে দেয়।

চীনের সামরিক বাহিনী হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা চীনের প্রতি মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। সামরিক বাহিনী চীনা-কর্তৃপক্ষকে সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কঠোর পথ অবলম্বন করতে চাপ দিতে থাকে। ১৯৯৩ সালে ১০০ চীনা জেনারেল প্রেসিডেন্ট ডেং-এর নিকট পত্র পাঠায় বলে অভিযোগ রয়েছে। উক্ত পত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তাছাড়া, তারা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনকে 'ব্লাকমেইল' করার বিরুদ্ধে চীনা-কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের শৈথিল্যেরও তীব্র সমালোচনা করে। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি গোপন রিপোর্ট চীনা সামরিক বাহিনী কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীনের প্রতি বৈরী আচরণ সম্পর্কে বলা হয়, 'চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মতাদর্শিক এবং সমাজব্যবস্থাসংক্রান্ত ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিরোধ উভয় দেশের সুসম্পর্ককে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে। আমেরিকার জনগণ মনে করে যে, পূর্বএশিয়া ভবিষ্যতে নিজস্ব অর্থনীতির মূল কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে... এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র পূর্বএশিয়ায় কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র দেখতে নারাজ।'[২৬] ১৯৯০-এর দশকে চীনা কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রকে চীনবিরোধী শক্তি হিসেবেই চিত্রিত করে।

চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী সম্পর্ক উভয়দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জাপানের ক্ষেত্রে যেমন ছিল, তেমনি এক্ষেত্রেও আমেরিকার জনমত বিভক্ত হয়ে যায়। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসা করার পক্ষে মত দেন। তারা বলেন যে, চীনের সঙ্গে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং এভাবে চীনকে গণতান্ত্রিক ধাঁচের জাতিরাষ্ট্রের সম্প্রদায়ভুক্ত করতে হবে। অন্যরা, চীনের প্রতি দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত দেন। ১৯৯৩ সালে মার্কিনীরা ইরানের পরই চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপদজনক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। এভাবে দেখা যায়, প্রায় এক দশক ধরে জাপান এবং চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমাবনতির দিকে চলে যেতে থাকে। মার্কিন-এশীয় খারাপ সম্পর্ক বিভিন্ন মাত্রায় হতে থাকে। এমনকি একদিকে এটি ব্যক্তিগত পর্যায়, যেমন অটো-যন্ত্রাংশ বিক্রয়, ক্যামেরা বিক্রয়, সামরিক স্থাপনা সংক্রান্ত; অন্যদিকে মারণাস্ত্র বিক্রয়, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের নকল ও কপিকরণ ইত্যাদির সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আমেরিকার জনগণ মনে করে যে, এশিয়ার দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চলমান সম্পর্ক মার্কিনস্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছে। আমেরিকার উচিত ছিল গতানুগতিক কূটকৌশল অবলম্বন করে দুটি দেশের মধ্যে বিরোধ তীব্র করা এবং একটি দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, অন্য দেশকে চাপে রাখা। কিন্তু এমনটি ঘটেনি। বৃহত্তর কারণগুলোর সঙ্গে ব্যক্তিগত ইস্যুসমূহ যুক্ত হয়ে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও জটিল করে তুলেছে।

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এশীয় দেশগুলোর পরস্পরক্রিয়া, যেমন ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারিত যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ প্রকারান্তরে একের কাছে অপরের স্বার্থ কোথায় তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এতে করে প্রত্যেক দেশের সমাজই কিছুটা হলেও

সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং তা প্রকারান্তরে দুইদেশের সম্পর্কের বেলায় বৈরী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ভীতি ১৯৫০-এর দশকে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তাবিষয়ক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছিল। ১৯৭০-এর দশকে চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওই একই কারণে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং ১৯৭৯ সালে ক্ষণস্থায়ী হলেও মোটামুটিভাবে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে উভয়ের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে সোভিয়েট-ভীতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। মজার বিষয় হল, শীতলযুদ্ধাবসানের পর তাদের সেই ঐক্যের মূলসূত্র আর অবশিষ্ট রইল না এবং তদস্থলে নতুন করে কিছুর উদ্ভবও ঘটল না। ফলে, স্বভাবতই উভয় শক্তির মধ্যে পরস্পর স্বার্থের দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা সজীব হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্বএশীয় দেশগুলোর মধ্যে এবং আমেরিকার সঙ্গে শক্তির ভারসাম্যের হেরফের ঘটিয়েছে। এশীয়রা তাদের নিজেদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় তাদের সভ্যতার উন্নতর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে। অন্যদিকে, শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে আমেরিকা মনে করে যে, তাদের সভ্যতা ও মূল্যবোধ সর্বজনীন এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য বা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাই তারা বিশ্বে অন্যান্য স্থানের মতো মনে করতে থাকে, এশীয় সংস্কৃতিকেও সর্বজনীন করার জন্য এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিকে সুষ্ঠু করার জন্য হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এশীয় এবং মার্কিন সভ্যতার সাংস্কৃতিক পার্থক্য দৃশ্যপটে চলে আসে। এখনও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ কনফুসীয় মূল্যবোধ ধারণ করে রয়েছে। কনফুসীয় ধারার মধ্যে আছে : মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, কর্তৃপক্ষের প্রতি মান্য, পদসোপান পুরোহিততন্ত্র, ব্যক্তিগত অধিকার বা স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া, ঐক্যমতের উপর গুরুত্বারোপ, দ্বন্দ্ব সংঘাত পরিহার, 'মুখ রক্ষা' এবং সর্বোপরি সমাজ ও ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা। অন্যদিকে দেখা যায়, আমেরিকার মূল্যবোধ ও বিশ্বাসসমূহ হল : ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সরকারের প্রতি সন্দিহান থাকা, কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখা, অতীতকে স্মরণে না রাখা, ভবিষ্যতের দিকে তেমন গুরুত্ব না দেয়া এবং বর্তমানে তাৎক্ষণিক পাওনা বুঝে নেয়া, ইত্যাদি। তাই দেখা যায়, এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎস সাংস্কৃতিক ও সমাজবোধের পার্থক্যের মৌল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এ-ধরনের পার্থক্যের বিশেষ প্রকারের ফলাফল আমেরিকা ও প্রধান প্রধান এশীয় সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, আমেরিকার উৎপাদিত পণ্যের বেলায় জাপানের প্রতিরোধ এবং বিনিয়োগের প্রশ্নে বাধানিষেধের বিষয়ে কূটনীতিকেরা বিভিন্ন তৎপরতা চালাতে

থাকেন। জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য-সংকট ও তা উত্তরণের নিমিত্তে দরদস্তুরের ধরন বরং শীতলযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্ত্রনিরোধ পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন সংকট ও দরদস্তুরের কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৯৫ সালে জাপানের শিল্পজ সামগ্রী আমদানি জাপানের জি.ডি.পি.-এর শতকরা ৩.১ ভাগ ব্যয় হয়, যেখানে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের আমদানির পরিমাণ গড়ে ছিল শতকরা ৭.৪ ভাগ। জাপানে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ছিল অতি ক্ষুদ্র, অর্থাৎ জি.ডি.পি.'র মাত্র ০.৭ ভাগ। যেখানে আমেরিকায় এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা ২৮.৬ ভাগ, আর ইউরোপে শতকরা ৩৮.৫ ভাগ। ১৯৯০-এর দশকে জাপানের বাজেট ছিল সর্বদাই উদ্বৃত্ত।[২৭]

সামগ্রিকভাবে জাপানের অর্থনীতি পাশ্চাত্য দ্বারা নির্দেশিত সর্বজনীন পথে এগিয়ে যায়নি। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ খুব সহজ সমীকরণের মাধ্যমে জানান যে, ডলারের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে জাপানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের দাবিটি মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। অপরদিকে, ১৯৮৫ সালের প্লাজা চুক্তি ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতি সংশোধন করে, তবে এর দ্বারা জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যঘাটতির ক্ষেত্রে তেমন কোনোপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। ইরানের মুদ্রার সঙ্গে ইয়েনের বিনিময় হার ইয়েনের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে জাপানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে জাপান মুদ্রাজনিত কারণে বাণিজ্যসুবিধা বা উদ্বৃত্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমাজগতে নেতিবাচক বাণিজ্যিক ভারসাম্যের কারণে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। জাপানের গড় বেকারত্বের হার ছিল শতকরা ৩ ভাগেরও কম, আর মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল শতকরা ১.৫ ভাগ।

১৯৯০-এর দশকে আমেরিকা এবং জাপানের অর্থনীতিবিদগণ দুটি দেশের ভিন্নধর্মী অর্থনীতির কথা স্বীকার করেন। জাপান কর্তৃক অত্যন্ত নিম্নমাত্রিক শিল্পসামগ্রী আমদানি সম্পর্কে একজন মন্তব্য করেন এভাবে যে, 'এটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক মানদণ্ড দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।' 'জাপানের অর্থনীতি পাশ্চাত্যের যুক্তি মেনে চলে না।' অন্য এক পণ্ডিতজন বলেন যে, 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যেভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করুন না কেন, এটি কোনোপ্রকার মুক্তবাজার অর্থনীতি নয়। জাপানিরা ... নিজস্ব ধারায় তাদের অর্থনীতিকে পরিচালিত করছে যা পাশ্চাত্যের ধারা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'[২৮]

তাহলে প্রশ্ন আসে : জাপানের অর্থনীতির বিশেষত্ব কী? প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে জাপানের অর্থনীতির রয়েছে স্বতন্ত্র চরিত্র, কেননা জাপান হল মৌলভাবে একটি অপাশ্চাত্য দেশ। জাপানের সমাজ ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য থেকে পৃথক, বিশেষ করে তা আমেরিকার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এহেন পার্থক্যসূচক দিকগুলো পণ্ডিতজনেরা তাদের বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।[২৯] তাহলে বলা যায়, জাপান এবং আমেরিকার মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য দূর করতে হলে, যে-কোনো একটি দেশের অর্থনীতিতে কিংবা উভয় দেশের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। আর এটি করতে গেলে উভয় দেশের কিংবা যে-কোনো একটি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে আনতে হবে মৌল পরিবর্তন। আর এ-ধরনের পরিবর্তন আশাতীত।

সমাজ ও সংস্কৃতি বদলায় একথা সত্য। আর তা হতে পারে বড় ধরনের কোনো সাংঘাতিক ঘটনার ফলশ্রুতিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের শোচনীয় পরাজয় পৃথিবীর অন্যতম যুদ্ধবাজ দুটি দেশের একটিকে শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত করে। এটি মনে করা যায়নি যে, হয় জাপান, নাহয় আমেরিকা একে অন্যের ওপর 'অর্থনৈতিক হিরোশিমা' প্রয়োগ করতে পারে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি দেশের সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির ভেতর পরিবর্তন আনতে পারে। ১৯৫০-এর দশক ও ১৯৭০-এর দশকে স্পেনে এমনটি ঘটেছিল। সম্ভবত, অর্থনৈতিক সম্পদাদি জাপানকে আমেরিকার মতো করে দেয়, অন্তত এর ভোগবাদি চরিত্র তেমনই বলে। ১৯৮০-এর দশকে জাপান এবং আমেরিকা বলে যে, তাদের দেশ একে অপরের মতো হবে। অবশ্য, কাঠামোগত কিছু সংস্কারের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়, যাতে করে দেশদুটি মিলে যাবার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু তা সফলকাম হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, দুই দেশের অর্থনৈতিক পার্থক্য গভীরভাবে তাদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার শেকড়ে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

তাহলে বলতেই হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে আছে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বীজ, আর সেই সংঘাতের ফল হিসেবে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের হেরফেরও লক্ষ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাঝেমধ্যে ওই সংঘাত থেকে কিছু লাভবান হলেও প্রকৃতপক্ষে লাভের মাত্রা ও তার প্রবণতা কিন্তু এশিয়ামুখী। অন্যদিকে, ক্ষমতার ভারসাম্যের হেরফের পুনরায় নতুন নতুন সংঘাতের জন্ম দিয়ে তাকে অবনতির দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, এশিয়ার সরকারগুলো তার নেতৃত্ব মেনে নিক এবং যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার সমাজের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাগুলো বাস্তবায়িত করুক। অন্যদিকে, এশিয়া ক্রমাগতভাবে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্বিত হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে আমেরিকার সমকক্ষ মনে করে থাকে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'আয়া' মনে করলেও 'শক্তিশালী' মনে করে না। এ উক্তিটি করেছেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট মি. উইনস্টন লর্ড। এমতাবস্থায়, বিভিন্ন এবং বিস্তৃত ইস্যুতে দেখা যায়, এশীয়রা আমেরিকার অবস্থানের বিপরীতে 'না' বলে থাকে। এশিয়া ও আমেরিকার সম্পর্ক বিষয়ে একজন জাপানি বর্ণনা করেছেন যে, 'এটি হল প্রথম বড় রেলগাড়ির ধ্বংসাবস্থা বিশেষ।' ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন কর্তৃক আমেরিকার বাজারে জাপানের পণ্যসামগ্রী প্রবেশের ওপর বাধা তুলতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মুরিহিরো হোসেকাওয়া তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। এর এক বৎসর পরে জাপানের বিদেশমন্ত্রী এই ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে মুখ খোলেন এবং বলেন যে, জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে, অর্থনৈতিক ইস্যুতে প্রতিযোগিতার এই যুগে জাপানের জাতীয় স্বার্থ এর নিছক পাশ্চাত্য হিসেবে আমেরিকার পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[৩০]

১৯৯০-এর দশকে আমেরিকার এশীয় নীতিতে, এশিয়া ও আমেরিকার পরিবর্তিত ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

প্রথমত, আমেরিকা মেনে নেয় যে, এশীয় সমাজের ওপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের তেমন নেই। যুক্তরাষ্ট্র তাদের কার্যক্রমকে দুইভাগে ভাগ করে নেয়। এর

একদিকে তারা রাখেন সেই বিষয়গুলো, যে বিষয়গুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। অন্যদিকে, আরও কিছু বিষয় যার মধ্যে সংঘাত বিরাজমান।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন অবশ্য চীনের ক্ষেত্রে আমেরিকার বিদেশ নীতিতে সর্বাগ্রে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে মার্কিন ব্যবসায়ী, তাইওয়ান এবং অন্যান্যদের মতামত ও স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তিনি অর্থনৈতিক ইস্যুগুলো থেকে 'মানবাধিকারের বিষয়টি বিযুক্ত করেন' এবং চীনের সরকারবিরোধীদের মদদ দেয়া থেকে কিছুটা বিরত থাকেন। ক্লিনটন প্রশাসন জাপানের ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ নীতি গ্রহণ করে এবং জাপানের নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের নিজস্ব ধারাকে মার্কিনীরা মেনে নেন এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থেকে তা বাদ দেন। অবশ্য বলতে হয়, এই ক্ষেত্রটিই সংঘাতের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র। এভাবে চীন ও জাপানের বাণিজ্যের বেলায় 'মানবাধিকারের অস্ত্রটি' প্রত্যাহার করে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদাসর্বদা উপর্যুপরিভাবে এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে একটি লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা প্রত্যাশা থেকে কিছুটা ছাড় দিতেও প্রস্তুত। এজন্য তারা, এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত 'গঠনমূলক কার্যক্রম' চালিয়ে যেতে চায়। তবে, এশীয় দেশগুলো অধিকাংশ সময় আমেরিকার এ উদ্যোগকে দুর্বলতা হিসেবে দেখেছে এবং এভাবে তারা আমেরিকার দাবিকে কোনোপ্রকার গুরুত্ব দেয়নি। এই ধারণাটি বিশেষভাবে চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কেননা তারা মার্কিনীদের সঙ্গে এম.এফ.এন.-এর বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাতে থাকে। তাই বলা যায়, এশিয়ায় আমেরিকার বদান্যতার মূল্য দেয়া হয়নি। তা কখনও লেনদেনের পর্যায়ে আসেনি বরং সেখানে মার্কিনীরা বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক ইস্যুতে মার্কিনীদের সংঘাতের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করার মতো। এক্ষেত্রে জাপানকে আমেরিকা সবসময়ই অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি প্রদান করছে যদি-না তারা তাদের দাবিসমূহ মান্য করে। সার্বক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী সমঝোতার প্রচেষ্টার ফল হিসেবে অবরোধ প্রবর্তনের পূর্বমুহূর্তে চুক্তির পর্যায়ে উপনীত হওয়া গিয়েছে। তবে চুক্তি অনুযায়ী দৃশ্যত মর্কিনীদের বিজয় বলে মনে হলেও জাপান চুক্তির বিষয়াদি প্রয়োগে কোনোপ্রকার আন্তরিকতা দেখায়নি। ফলে, চুক্তি চুক্তি হিসেবেই রয়ে যায়। প্রায় একইভাবে দেখা যায়, চীন মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করলেও তা বাস্তবায়নের বেলায় গড়িমসি করেছে। কপিরাইট আইন বারবার লঙ্ঘন করেছে, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। এসব ক্ষেত্রে তারা তাদের পূর্বেকার ধারামতোই চলেছে।

সংস্কৃতিগত পার্থক্য ও এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন এশিয়ার মানুষকে আমেরিকার বিরুদ্ধে একত্রিত হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৯৪ সালে দৃশ্যত এশিয়ার প্রায় সকল দেশ 'অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু

করে মালয়েশিয়া ও কোরিয়া অবধি' জাপানের পশ্চাতে একত্রিত হয়ে মার্কিনীদের দ্বারা প্রণীত এশীয় দেশের আমদানি চাহিদার নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

প্রায় একই সময়ে আরও একটি ইস্যুতে এশীয় দেশসমূহ আমেরিকার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, যেমন এম.এফ.এন.-এর বেলায় মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে চীনের পক্ষে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হোসো কাওয়া যুক্তি দেখান যে, মানবাধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা 'অন্ধভাবে ও হুবহু' এশিয়ায় প্রয়োগ করা যায় না। সিঙ্গাপুরের সি.কুয়ান ইউ আমেরিকাকে হুঁশিয়ার করে বলেন যে, 'চীনে মানবাধিকার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র যদি বেশি চাপাচাপি করে, তবে প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকায় আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে বন্ধুহীন হয়ে পড়বে।'[৩১]

আমেরিকার বিরুদ্ধে আরও একটি বিষয়ে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়; তা হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় জাপানের প্রার্থীকে আমেরিকা-সমর্থিত প্রার্থীর বিপরীতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ সমর্থন জানায়। অন্যদিকে, বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থায় আমেরিকার সমর্থিত প্রার্থী মেক্সিকোর সেলিনাস-এর বিরুদ্ধে জাপান দক্ষিণকোরিয়ার প্রার্থীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। ১৯৯০-এর দশকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এশীয়রা সর্বোচ্চভাবে উপলব্ধি করে এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাধারণ (কমন) চরিত্র লক্ষণীয়, আর এরই ফলস্বরূপ এশীয়রা সামগ্রিকভাবে আমেরিকা থেকে পৃথক।

শীতলযুদ্ধাবসান আমেরিকার সঙ্গে এশীয় দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান পরস্পরক্রিয়া এবং আমেরিকার শক্তির আপেক্ষিক হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় দেশগুলো আমেরিকার চাপ ব্যর্থ করার মতো শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। চীনের উত্থান আমেরিকার জন্য একটি বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। জাপানের চাইতে চীনের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত অনেক বেশি মারাত্মক, বিশেষ করে মানবাধিকার প্রশ্ন, তিব্বত ও তাইওয়ান ইস্যু, দক্ষিণ চীন সাগর এবং অস্ত্রনিরোধের ক্ষেত্রে তা বেশ উত্তপ্ত। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোনো প্রধান ইস্যু আজও দেখা যায়নি, যার ভেতর দিয়ে উভয় শক্তি 'সাধারণ' কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দিনদিন বেড়েই চলেছে।

জাপানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার পার্থক্য কার্যত সংস্কৃতির শেকড়ে সংযুক্ত। আর চীনের সাথে আমেরিকার দ্বন্দ্ব সাংস্কৃতিক পার্থক্যের চাইতেও বড় বিষয়, তা হল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। আমেরিকার নেতৃত্ব বা বিশ্বে আমেরিকার প্রাধান্য চীন মানতে রাজি নয়। অন্যদিকে, এশিয়ায় চীনের নেতৃত্ব ও আধিপত্য মানতে নারাজ আমেরিকা। প্রায় দুইশত বৎসর ধরে আমেরিকা ইউরোপে একক ক্ষমতাধর কোনো শক্তির উত্থান প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। আর প্রায় শতবৎসর পূর্ব থেকে চীনের 'দ্বার উন্মোচনের' নীতি গ্রহণ করাসহ এশিয়া ও আমেরিকা ইউরোপের অনুরূপ নীতি নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে আমেরিকা দুটি বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে মূলত নাজি ও সাম্রাজ্যবাদী জার্মানি, সাম্রাজ্যবাদি জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং কম্যুনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে। আমেরিকার এই ঐতিহাসিক নীতি প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এবং বুশ কর্তৃক সমর্থিত ছিল।

চীনের উত্থানকে আমেরিকা সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ আমেরিকা মনে করে, এর ফলে চীন এশীয়-অঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হবে এবং ফলে সেখানে আমেরিকার স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। ভবিষ্যতে এশিয়ার দেশসমূহের ক্ষমতার ভারসাম্যের ওপর আমেরিকা ও চীনের অবস্থান এবং সংঘাতের স্বরূপ নির্ভর করছে।

চীনের আধিপত্য : ভারসাম্যের সুবিধাজনক পক্ষে ঝুঁকে পড়া

৬টি সভ্যতা, ১৮টি দেশ, দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং দেশ ও সমাজ অভ্যন্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশ্নে পার্থক্য-সম্বলিত পূর্বএশিয়া একবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধারার ভেতর যে-কোনো ধারায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে। অত্র এলাকার প্রধান এবং মধ্যম মানের দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক একটি জটিল আকারে রয়ে গিয়েছে। বর্তমানের বহুধাবিভক্ত ও বহুমতসম্পন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং সম্ভবত ভারত একে অপরের ভারসাম্য বিধান করছে এবং একে অপরের প্রতিযোগীও হচ্ছে। পূর্বএশিয়ার রাজনীতি দুইমেরুবিশিষ্ট শত্রুতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। এর একদিকে থাকছে চীন এবং জাপান; অথবা জাপান এবং আমেরিকা, বা আমেরিকা ও চীন। এর বাইরের দেশগুলো হয় ওই দুইমেরুর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বা জোটনিরপেক্ষ অবস্থানে থাকছে। অথবা, সেখানে একমেরুর ধারা কাজ করছে, যেখানে গতানুগতিকভাবে পদসোপানের ধারায় বেজিং ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। যদি চীন তার অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে, যদি চীনের সংহতি বজায় থাকে, তবে চীন সম্ভবত পূর্বএশিয়ার নেতৃত্ব দেবে। অবশ্য, চীনের সাফল্য পূর্বএশিয়ার অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক খেলা এবং তার পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার ওপর অংশত নির্ভরশীল।

চীনের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভূখণ্ডের পরিধি, গতিশীল ও উন্নয়নমুখী অর্থনীতি এবং আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পূর্বএশিয়ার আধিপত্য বিস্তারের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে চীনের অর্থনৈতিক দ্রুত বিকাশের একটি ফলাফল। বিশ্বের প্রায় সকল বৃহৎ শক্তি, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন (প্রাক্তন) একপর্যায়ে সীমানার বাইরে সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ইত্যাদি বিস্তারের পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর এসব কিন্তু ওইসব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও শিল্প-উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। চীনের ক্ষেত্রেও সত্য যে, চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধি একই সঙ্গে ঘটে চলেছে।

প্রায় দুই হাজার বৎসরকাল যাবৎ চীন এশিয়ার অন্যতম সেরা শক্তি হিসেবে বজায় রয়েছে। চীন এখন তার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী। বিশেষ করে ব্রিটেন এবং জাপান কর্তৃক অপমানের দায় থেকে মুক্ত হতে চায় চীন। ১৯৮০-এর দশক থেকে চীন তার অর্থনৈতিক সম্পদাদি সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যয় করতে শুরু করে। যদি চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, তবে অর্থনৈতিক সম্পদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাববিস্তারজনিত ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাবে বলে মনে করা যায়। সরকারি পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৮০-এর দশকে চীনের সামরিক

ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে সামরিক খাতে ব্যয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালে ওই ব্যয় শতকরা আরও ২১ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে চীনের সামরিক ব্যয় পরিমাপ করা হয় মোটামুটিভাবে ২২ বিলিয়ন থেকে ৩৭ বিলিয়ন ডলার। এ ব্যয় ৯০ বিলিয়ন ডলারে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক পরিকল্পনার স্থান ও 'লক্ষ্য' সোভিয়েট ইউনিয়নের দিক থেকে সরিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক করে নেয়। এ কৌশল ছিল যুগোপযোগী, কেননা সোভিয়েটশক্তি ছিল তখন ক্ষয়িষ্ণু। কৌশলগত এ পরিবর্তনের অংশ হিসেবে তারা তাদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা নেয়। দূরপাল্লার যুদ্ধবিমান সংযোজন, যুদ্ধবিমানে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও আধুনিক করা হয়। এছাড়াও যুদ্ধবিমান বহনকারী বিমান তৈরি করারও পরিকল্পনা নেয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক কাজে লাগে এমন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের মতো সম্পর্ক স্থাপন করে চীন।

তাহলে দেখা যায়, চীন পূর্বএশিয়ার প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। পূর্বএশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমাগত চীনমুখী হয়ে পড়েছে। সেইসঙ্গে চীনাবংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সবচেয়ে ভীতিকর হল চীন ক্রমবর্ধিতভাবে দক্ষিণ-চীন সাগরের দাবি জোরদার করছে। এটি অর্জনের জন্য তারা প্যারাসেল দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপন, ১৯৮৮ সালে অনেকগুলো দ্বীপের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে এবং ফিলিপাইনের নিকট সামরিক উপস্থিতি জোরদার করে। তাছাড়া, ইন্দোনেশিয়ার ন্যাটোলা দ্বীপের নিকটবর্তী স্থানে গ্যাসক্ষেত্র দাবি করতে থাকে চীন। চীন পূর্বএশিয়ার মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিকে স্বল্পমাত্রিক সহ্য করার নীতি থেকে সরে এসে এর বিরুদ্ধে জোরেশোরে সোচ্চার হতে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময় জাপানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকে চীন উৎসাহিত করলেও শীতলযুদ্ধপরবর্তী সময়ে জাপানের সামরিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধিতা করে। এভাবে, চীন পূর্বএশিয়ার আধিপত্য অর্জনের জন্য পুরোনো কায়দায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পিছপা হয়নি।

এ-বিষয়ে চীনের কার্যক্রমকে এবং চীন যা চায় তা নিম্নলিখিতভাবে দেখা যায়—

- চীনারা তাদের ভূখণ্ডের সংহতিকে সমর্থন জানায়। তারা তিব্বতকে তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়, তারা হংকং এবং তাইওয়ানকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রতিজ্ঞ;
- পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে অর্থনীতি, মানবাধিকার, অস্ত্র সীমিতকরণ এবং অন্যান্য ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব চীন কর্তৃক সমর্থিত হয়;
- এশীয় অঞ্চলে চীনের আধিপত্য মেনে নেয়া এবং পরমাণুঅস্ত্র এবং গতানুগতিক অস্ত্রকে সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ জানানো;
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি এমনভাবে প্রণয়ন করা, যাতে করে চীনের স্বার্থ সবসময় এবং সকল ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত থাকে এবং চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়;

- চীন থেকে অভিবাসী গমনে বাধা না দেয়া। অন্যান্য এশীয় দেশে চীনাদের মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষা করা;
- অন্যান্য এশীয়দেশ যেন চীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং চীনা অভিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং অভিবাসী চীনারা যাতে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারে তা নিশ্চিত করা;
- চীন বা চীনা জোটের বিরুদ্ধে যে-কোনো শক্তির সঙ্গে, যে-কোনো ধরনের চুক্তি বা জোটগঠন থেকে বিরত থাকা;
- পূর্বএশিয়ায় ইংরেজির বদলে মান্দারিন ভাষাকে গুরুত্ব দেয়া।

বিশ্লেষকেরা চীনের আবির্ভাবকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ওয়েলহেলমাইনের জার্মানির আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো বৃহৎশক্তির আবির্ভাব সবসময়ই অস্থিরতা বয়ে আনে এবং চীনের আবির্ভাবও এর ব্যতিক্রম নয়। লি. কাউন ইউ বলেন যে, 'বৃহৎশক্তি হিসেবে চীনের অভ্যুদয় আগামী ৩০-৪০ বৎসরে বিশ্বে নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।' এটি বলা যায় যে, বিশ্বরাজনীতির খেলায় চীন একটি নতুন খেলোয়াড়। আর এটি সম্ভবত মানবেতিহাসে হবে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়।'[৩২]

যদি চীনের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে আরও এক দশক সামনে এগিয়ে যায় (যাবে বলেই মনে হয়) এবং চীন যদি তার ঐক্য বজায় রাখতে পারে (পারার সম্ভাবনা অধিক), তবে পূর্বএশীয় দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের খেলোয়াড় লাভ করবে।

ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো একটি বা দুটি পথে এই নতুন শক্তির উত্থানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। একা অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে 'কোয়ালিশনের' মাধ্যমে উদীয়মান শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে তারা যুদ্ধের মাধ্যমে ওই শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে। অন্যভাবেও টিকে থাকার চিন্তা তারা করতে পারে। রাষ্ট্রগুলো উদীয়মান শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে তালমিলিয়ে তার তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়েও নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। অথবা, তারা উপরোক্ত দুটি পথের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধন করেও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে নিরাপত্তার কোনো 'গ্যারান্টি' নাও অর্জিত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারসাম্য সবসময়ই কাঙ্ক্ষিত এবং তাঁবেদারিত্বের চাইতে উত্তম। যেমনটি স্টিফেন ওয়াল্টি বলেন :

> সাধারণ সমীকরণে দেশগুলো ভারসাম্যমুখী হয়ে থাকে। তাঁবেদার রাষ্ট্র হওয়ার বিপদজনক দিক থাকে, কেননা এক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা রক্ষা করার দায় বেশি বর্তায়, প্রভাবশালী শক্তিকে তোষামোদ করে তাদের নিকট থেকে সুবিধাদি অর্জন করে নিতে হয়। সুতরাং, শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করে চলাই নিরাপদ। তবে এক্ষেত্রে প্রভাবশালী রাষ্ট্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলো এক্ষেত্রে সমমনা রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কোয়ালিশন বা জোট গঠন করতে পারে ...।[৩৩]

ওয়াল্টি-এর বিশ্লেষণে প্রকৃতপক্ষে দুর্বল ও ক্ষুদ্রশক্তির জোটবদ্ধতার ইঙ্গিত রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার জোটবদ্ধতার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রগুলো বাহ্যিক শক্তির ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হতে চায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অধুনা ইউরোপেও সাধারণত শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতি জনপ্রিয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি ভারসাম্যের স্বার্থে নিজ নিজ হিসাব মতো জোট গঠন করে ও জোট বদলায়। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর একটি অংশ ফিলিপ-II ও লুইস XIV, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, নেপোলিয়ন, দি কাইজার এবং হিটলারের ভয়ে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রয়োজনে জোট অদলবদল করেছিল।

শক্তির ভারসাম্য আনতে গিয়ে রাষ্ট্র হয় প্রাথমিক অথবা মধ্যম ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রথমত, ধরা যাক 'ক' রাষ্ট্র 'খ' রাষ্ট্রের শক্তির বিরুদ্ধে ভারসাম্য আনতে চায়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রটি 'গ' এবং 'ঘ' রাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বাঁধে এবং তারা সম্মিলিতভাবে সামরিক শক্তি গঠন করতে পারে যা প্রকারান্তরে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দিকে দেশগুলোকে নিক্ষিপ্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় 'ক' এবং 'খ' দেশদুটি প্রাথমিক পর্যায়ের পক্ষ থেকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত, দেশটি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো দেশকে আক্রমণাত্মক দেশ মনে না করেই 'খ' এবং 'গ' রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য আনতে ইচ্ছুক, কেননা হয়তো 'খ' এবং 'গ' একসময় শক্তিশালী হয়ে 'ক' দেশটির জন্য ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে। এমতাবস্থায়, 'ক' দেশটি 'খ' ও 'গ' দেশের বিপক্ষে মধ্যমশক্তির ভারসাম্য আনয়নকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর 'খ' এবং 'গ' বিবেচিত হবে পারস্পরিক ভারসাম্যের প্রশ্নে প্রাথমিক দেশ হিসেবে।

চীন যদি পূর্বএশিয়ার একটি আধিপত্যবাদী দেশ হিসেবে পরিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হয় তাহলে অন্যান্য দেশ সে-ঘটনাকে কীভাবে গ্রহণ করবে? বলা যায়, এ-বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ও অভিব্যক্তি একরূপ হবে না। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীন তার প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি করবে এবং চীনের আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করবে; আর এরমধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। আমেরিকার এ-ধরনের মনোভাব এটাই প্রমাণ করে যে, ইউরোপ বা এশিয়া কারও দ্বারাই আমেরিকা আর অধস্তন পর্যায়ে যেতে বা অধীনস্থ হতে চায় না। তবে, ইউরোপের পক্ষে আমেরিকাকে অধীনস্থ করা আজ তার কোনো লক্ষ্য নয়, কিন্তু এশিয়ার জন্য তা হয়তো সত্য নয়। এশিয়া আমেরিকাকে অধীনস্থ করার স্বপ্ন দেখলেও দেখতে পারে। পশ্চিম-ইউরোপের শক্তিগুলোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার একটি শিথিল মিল রয়েছে। আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য ইউরোপ কোনো হুমকি নয়। কিন্তু একটি একত্রিত, শক্তিশালী চীন কিন্তু আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য বাস্তবিক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে কি আমেরিকা তার স্বার্থরক্ষার জন্য সম্প্রসারণবাদী চীনের সঙ্গে পূর্বএশিয়ায় যুদ্ধে যাবে? চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে তা হবে আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে মাথাব্যথার মূল কারণ এবং বলাবাহুল্য, আমেরিকার

নীতিনির্ধারকগণ এ বিষয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনের সঙ্গে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। যদি আমেরিকা পূর্বএশিয়ায় চীনের আধিপত্যের মনোভাব ও কার্যক্রম বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে আমেরিকাকে এ-কাজ সম্পন্ন করার জন্য জাপানের জোটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এশীয় জাতিসমূহের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক এবং মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। আমেরিকান সৈন্যদের এশীয় এলাকায় উপস্থিতিকে আরও জোরদার করতে হবে। আমেরিকাকে তার সর্বজনীন মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে এবং আধিপত্য ও সম্প্রসারণের মধ্যে টিকে থাকার কৌশল ও মনোভাব রপ্ত করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দূরদৃষ্টির প্রশ্নে আমেরিকার সামর্থ্যের পুনর্মূল্যায়নসহ প্রয়োজনীয় সমঝোতার পথ দেখাতে হবে।

উপরের যে-কোনো পদক্ষেপেরই অনেক মূল্য ও ঝুঁকি রয়েছে। সমূহ বিপদ হল এই যে, আমেরিকার পক্ষে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ সঠিকভাবে নেয়া মুশকিল। যদি এ-কাজটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে না করা হয়, তবে হোঁচট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ যুদ্ধ কার্যকরভাবে চালিয়ে নিতে না পারলে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

যদি অন্য রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্যের জন্য প্রাথমিক ভূমিকা পালন করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে চীনকে মধ্যমশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। এক্ষেত্রে জাপান হতে পারে তেমন সম্ভাবনাময় শক্তি। সেক্ষেত্রে, জাপানের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন জাপানকে সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে, পারমাণবিক শক্তি অর্জন করতে হবে এবং অন্যান্য এশীয় দেশের সমর্থনে চীনের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় মাঠে নামতে হবে। জাপান হয়তো চীনকে প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট গঠনে আপত্তি করবে না। যদিও এটি খুবই অনিশ্চিত। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে শক্তি-ভারসাম্যের মধ্যম ভূমিকা গ্রহণেও অনিচ্ছুক এবং সামর্থ্যও রাখে না। নেপোলিয়নের সময়ে একটি নতুন ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ এবং এশিয়ার ভেতর ভারসাম্য আনতে যুক্তরাষ্ট্র ন্যূনতম অবদান রেখেছিল। আর এর ফলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এবং সকল হিসাবনিকাশ গরমিল হয়ে গিয়েছিল।

শীতলযুদ্ধের সময় খুব সঙ্গত কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে শক্তির প্রাথমিক ভারসাম্যের দিকে মনোযোগ প্রদান করেছিল। কেননা এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সেহেতু, যুক্তরাষ্ট্র কখনও ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তির জন্য মধ্যমশক্তি ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে সবসময়ই চাতুর্যপূর্ণ, ভঙ্গুর, ব্যর্থ এবং অ-দেশজ ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের সমর্থন প্রদানের প্রশ্নে সবসময়ই দেশ অদলবদল করেছে। তারা কখনও অযৌক্তিক কিন্তু নীতিগতভাবে ঠিক ছিল এমন দেশকে সমর্থন নাও দিয়েছে, আবার এমন দেশকেও সমর্থন দিয়েছে যে-দেশটিকে সমর্থন দেয়া নীতিগতভাবে সঠিক। এমনকি জাপান যদি চীনের বিরুদ্ধে শক্তির ভারসাম্য আনতে গিয়ে প্রাথমিক দেশের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা নেবে তা হবে প্রশ্নবিদ্ধ।

যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরভাবে ভীতিকর কোনো দেশকে প্রত্যক্ষভাবে বিরত করতে অন্যান্যদের সফলতার সঙ্গে জোটবদ্ধ করতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, এশীয় শক্তিসমূহের লেজুড়বৃত্তির মতো মনোভাব রয়েছে, তাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ভারসাম্য আনার জন্য মধ্যম ভূমিকা পালন প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

লেজুড়বৃত্তির দেশ সাধারণত বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল থাকে। এ সম্পর্কে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে :

প্রথমত, লেজুড়বৃত্তিসম্পন্ন দেশ সাধারণত একই ধরনের সভ্যতার অধীনস্থ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক 'সাধারণ' বিষয় থাকে, আর যেখানে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য নেই, সাধারণত সেখানে তেমন তাঁবেদার রাষ্ট্র দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, পরস্পর বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা নেই, তাই তা বদলাতে বা ওঠানামা করতে পারে। একটি বালক যখন অন্য বালকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন সে তার বয়স্ক ভাই-এর সাহায্য চায়। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে উক্ত বালক হয়তো তার বয়স্ক ভাইকে বাড়িতে ততবেশি পছন্দ করে না। রাষ্ট্রের বেলাতেও তেমন ঘটনা ঘটে এবং এভাবে বিভিন্ন সভ্যতার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক ভারসাম্যের মাত্রা ও গভীরতা ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ওঠানামা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোর ভেতর পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে, বিশেষ করে আরবের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম দেশের বিশ্বস্ততার নিম্নমাত্রার কারণে সংকট তৈরি হয়েছে।

উল্লিখিত প্রভাব ব্যতীতও তাঁবেদার রাষ্ট্রের ও তার ভারসাম্য ক্ষমতার বণ্টনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইউরোপীয় সমাজ অতীতে দীর্ঘদিন স্বৈরশাসনের অধীনে থাকলেও তারা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী আমলাতান্ত্রিক সংকটের, অথবা এশিয়ার ন্যায় 'প্রাচ্য দেশীয় উৎপীড়ক শাসককে' এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে শাসনতন্ত্র বহুত্ববাদী সমাজের ভিত্তি তৈরি করেছিল এবং এরকম একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে যে, ক্ষমতার কিছু অংশ অকৃত্রিম ও কাঙ্ক্ষিত। সেই মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ক্ষমতার ভারসাম্য অকৃত্রিম ও কাঙ্ক্ষিত এবং দেশদরদীদের উচিত হল তা রক্ষা ও বর্ধিষ্ণু করা। সুতরাং, ক্ষমতার ভারসাম্য যখন বিপর্যস্ত হয়, তখন ভারসাম্য-রক্ষাকারী উপাদানগুলোকে সক্রিয় করার দরকার হয়। ইউরোপীয় মডেলের আন্তর্জাতিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় মডেলের গণতান্ত্রিক সমাজ।

বিপরীতদিকে এশিয়ার সমতানির্ভর সাম্রাজ্যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুত্ববাদিতার এবং ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারায় তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। ইউরোপের তুলনায় চীনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তাঁবেদারিত্ব ছিল অনেক বেশি প্রত্যয়ী। '... চীনের সামরিক কর্তৃত্বের কাছে 'স্বশাসিত' ধারণা কোনো মূল্য বহন করত না, কিন্তু গতানুগতিক ইউরোপীয় সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্যের সমীকরণে এটি বজায় ছিল। চীনে ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেই (কেন্দ্রীয়ভাবে) সিদ্ধান্ত নেয়া হত।' এভারি

গোল্ডস্টেইন যুক্তি দেখান যে, তাঁবেদারিত্বের সংস্কৃতি কর্তৃত্বের বেলায় কম্যুনিস্ট চীনের রাজনীতিতে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত খুবই পরিষ্কার ছিল। ১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লব যখন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে অনিশ্চিত করে তোলে, তখন থেকেই কেবল ভারসাম্যের রাজনৈতিক চরিত্র সেখানে শুরু হয়েছিল।[৩৫] কিন্তু ১৯৭৮ সালে যখন আরও পরিষ্কারভাবে চীনে কর্তৃপক্ষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানান দেয়, তখন দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁবেদারি চরিত্র সেখানে পুনরায় বিপুল উদ্যমে শুরু হয়েছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, চীনে কখনও অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়সমূহের ভেতর তেমন কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। বহিঃবিশ্বের ধারায় চীনের সংযোগ ছিল মূলত চীনের অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি সম্প্রসারিত রূপ। রডরিক ম্যাক ফারকুহাব বলেন, বহিঃবিশ্বে চীনের প্রতিচ্ছবি আদতে কনফুসীয় ধারায় সমাজব্যবস্থার পদসোপান বা পুরোহিততন্ত্রেরই প্রকাশ বিশেষ। 'বিশ্বাস করা হত যে, এক গগনে যেমন দুই সূর্য থাকে না, তেমনি এক ভুবনে দুই সম্রাট থাকে না।' সে কারণে বলা যায়, চীনারা কখনই 'একাধিক মেরু এবং বহুস্বার্থসম্বলিত নিরাপত্তার ধারণার প্রতি সদয় ছিল না।' এশীয়রা স্বভাবগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বেলায় 'পুরোহিততন্ত্র মান্য করে থাকে।' ইউরোপীয় ধরনের আধিপত্যবাদী যুদ্ধের অনুপস্থিতি কিন্তু পূর্বএশিয়ার ইতিহাসে রয়েছে। ইউরোপের ন্যায় প্রায়োগিক ধরনের শক্তির ভারসাম্যের আচার-আচরণ এশিয়ার অজানা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যশক্তির আগমনের আগপর্যন্ত পূর্বএশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ছিল 'চীনাত্বকেন্দ্রিক' যেখানে অন্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধস্তনতা, সহযোগিতা ছিল প্রকট আর স্বশাসনের অনুজ্ঞা আসত বেজিং থেকে।[৩৬] বিশ্বজগতের নিয়ম সম্পর্কে কনফুসীয় আদর্শগুলো কখনও সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি। এশিয়ায়, বিশেষ করে চীনের পুরোহিততান্ত্রিক মডেলের আন্তর্জাতিক রাজনীতির শক্তি-ভারসাম্যের ধরন সঙ্গত কারণেই ছিল ইউরোপের তুলনায় ভিন্নমাত্রিক।

বিশ্বব্যবস্থার ভাবমূর্তির এমন ফলাফল হিসেবে চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তাঁবেদারির স্বাভাবিক প্রবণতার ঢেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করে। কনফুসীয় মতবাদের নিরিখে তারা তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাত্রা নির্ধারণ করার দরুন, তাদের বিদেশ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশ ও সংস্কৃতি-ভেদে পৃথক হয়ে থাকে। কোরিয়ার সংস্কৃতিও ঐতিহাসিকভাবে চীনের সঙ্গে মিলে যায়। শীতলযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুর ছিল চীনের শত্রুভাবাপন্ন দেশ। ১৯৮০-এর দশকে অবশ্য সিঙ্গাপুর তার আগের অবস্থান বদল করে এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অপরাপর দেশকে চীনের শক্তি বাস্তবতার কথা বিবেচনাপূর্বক তার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করে। ব্যাপক সংখ্যক চীনা-জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ হিসেবে এবং দেশটির নেতৃত্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি দারুণ ঘৃণা থাকার কারণে মালয়েশিয়াও চীনের অনুসৃত পথের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদি থাবা থেকে রক্ষা পেতে এবং ভিয়েতনামের দিকে থেকে আসা হুমকি

থেকে রক্ষা পেতে থাইল্যান্ড চীনের প্রতি নজর দেয়।

দক্ষিণপূর্বএশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনাম উভয়ই চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট আছে। ইন্দোনেশিয়া আকারে বড়, অবস্থান চীনের ভূমি থেকে দূরে, জনসংখ্যা মুসলমান-অধ্যুষিত, কিন্তু অন্যরাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত দক্ষিণ চীনসাগরে চীনের আগ্রাসন প্রতিহত করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৯৫ সালের শরৎকালে ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিরূপ পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়, আর উভয় দেশই চীনকে তাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকির উৎস হিসেবে গণনা করে।[৩৭]

ভিয়েতনাম যদিও একটি কনফুসীয় আদর্শানুপ্রাণিত দেশ, তবুও চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের সম্পর্ক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে খুবই বৈরী ছিল। ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনাম চীনের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। চীন এবং ভিয়েতনাম উভয় দেশই স্পার্টলি দ্বীপের ওপর অধিকার দাবি করে এবং দখলদারিত্ব চায়। সেজন্য উভয় দেশে নৌবাহিনীকে এ-কাজে ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯০-এর দশকের প্রারম্ভে ভিয়েতনামের সামরিক শক্তি চীনের তুলনায় অনেক হ্রাস পায়। পূর্বএশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভিয়েতনামও চীনের সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে বন্ধুরাষ্ট্রের সন্ধানে ছিল। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার কারণে ও আসিয়ানের সদস্যপদ প্রাপ্তি ভিয়েতনামকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে দু'পা এগিয়ে দেয়। আসিয়ানের মধ্যে বিভেদ এবং চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আসিয়ানের অনীহা, ভিয়েতনামকে কার্যত দুর্ভাগ্যের সাগরে নিক্ষেপ করে। তবে, মনে করা হয়, আসিয়ান চীনবিরোধী জোট হবে, অথবা আসিয়ান চীনের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামকে সমর্থন যোগাবে।

যুক্তরাষ্ট্র হয়তো চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে 'পারমাণবিক বিষয়টি' এবং দক্ষিণ-চীন সাগরকে চীনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে কতদূর সফলতার মুখ দেখতে দেবে তা ভেবে দেখার বিষয়। তবে চূড়ান্তভাবে বলা যায়, ভিয়েতনামের টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে কার্যকর বিকল্প হবে চীনকে ধারণ করে চলা...।[৩৮] ১৯৯০-এর দশকে চীন এবং উত্তরকোরিয়া ছাড়া পূর্বএশিয়ার অন্যান্য দেশ অত্র অঞ্চলে মার্কিন সামরিকবাহিনীর উপস্থিতি চলমান রাখতে সমর্থন জানায়। ভিয়েতনাম ব্যতীত অন্যান্য সকল রাষ্ট্রই চীনকে খাপখাওয়াতে ইচ্ছুক ছিল। ফিলিপাইন তার দেশে মার্কিন বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান প্রধান ঘাঁটি ও স্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটায়। আকিনাও দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া আরও ৬টি যুদ্ধজাহাজ তাদের সমুদ্রতীরে নোঙর করার মার্কিন-প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এ-ধরনের নোঙর তারা দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ব্যবহার করতে পারত। আরও একটি নিরাপত্তা বিষয়ক ঘটনা উল্লেখ করার মতো, তা হল : ১৯৯৫ সালে আসিয়ানের প্রথম আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জে চীনের দাবি ও চীনের দ্বারা অধীকৃত 'মিসচিফ রিক' সম্পর্কিত এজেন্ডা আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দেয়া হয়। এতে আসলে উক্ত এলাকা ও দ্বীপে চীনের

আধিপত্যকেই মৌনভাবে সম্মতি দেয়া হয় এবং কার্যত চীনকে প্রশ্রয়প্রবণ করে তোলা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে চীন যখন বিভিন্নভাবে তাইওয়ানকে হুমকি প্রদান করে, তখন অন্যান্য এশীয়দেশ শুনেও না শোনার ভান করেছিল এবং নীরবতা পালন করেছিল। তাদের এসব তাঁবেদারি কার্যকলাপের বিষয়ে মাইকেল ওক্‌সেনবার্গ বলেন, 'এশীয় নেতারা চীনের পক্ষে শক্তির ভারসাম্যের ঝুঁকে পড়াকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও, এবিষয়ে ভবিষ্যতে তারা কোনোপ্রকার ভূমিকা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত এবং সত্যি কথা হল, তারা চীনের সঙ্গে এখন কোনোপ্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যেতে চায় না। সেসঙ্গে তারা আমেরিকার চীনবিরোধী কোনো 'ক্রুসেডেও' অংশ নিতে চায় না।'[৩৯]

চীনের উত্থান জাপানের জন্য একটি দুশ্চিন্তার ঘটনা। জাপানিরা এর বিরুদ্ধে কী কৌশল গ্রহণ করবে তা নিয়ে জাপানিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তারা কি চীনকে নিজেদের সঙ্গে খাপখাইয়ে নেবে? তারা কি বাণিজ্যের ধারায় চীনকে সংযুক্ত করে এগুবে? তারা কি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে চীনের সঙ্গে ভারসাম্য এনে তবেই চীনকে প্রতিহত করবে? তারা কি নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চীনের সম্ভাব্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলবে? জাপান সম্ভবত এসব প্রশ্নের কোনো সুষ্ঠু জবাব নিজেদের মধ্যে স্থির না করা পর্যন্ত চুপ থাকবে।

তবে একথা সত্য, চীনকে সংহত রাখতে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির যৌথ উদ্যোগের ভেতর দিয়েই তা অর্থবহ করতে হবে। সম্ভবত, জাপান এজন্য একটু ধীরস্থিরভাবে এগুতে চায়। আর এজন্য পূর্বেই জাপানকে কিছু কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে :

১. বিশ্বের একমাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বনেতৃত্বে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বা তারা কতটুকুই বা সে যোগ্যতা রাখে;
২. এশিয়ায় চীনের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আমেরিকা কি আন্তরিক না;
৩. চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের ব্যবস্থাগ্রহণের খেসারত যাতে কম হয় সে-বিষয়ে বিবেচনা করা। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে যাতে করে খরচ কম থাকে এবং যুদ্ধ হলে তাতে ঝুঁকিও যেন থাকে সীমিত পর্যায়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে জাপান যেন অনেকটা চীনকে খাপখাইয়ে নেবার পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকের একক সিদ্ধান্তের দুঃখজনক এবং শোচনীয় পরিণতি ব্যতীত জাপান সাধারণত নিরাপত্তার জন্য ঐতিহাসিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী শক্তির বলয়ের মধ্যে জোটবদ্ধভাবে অবস্থান করার পক্ষপাতী। এমনকি ১৯৩০-এর দশকে জাপান সে-সময়ের বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে গতিশীল সামরিক ও মতাদর্শিক অক্ষশক্তির বলয়ের মধ্যেই স্থির ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপান খুব সচেতনভাবেই অ্যাংলো-জাপান জোটের মধ্যে ঢুকেছিল। কেননা সেসময়ে ব্রিটেন ছিল বিশ্বরাজনীতির নেতৃস্থানীয় শক্তি। ১৯৫০-এর দশকে তেমনি জাপান তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। চীনাদের ন্যায়

জাপানিরাও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও তাদের অভ্যন্তরীণ সমাজের পুরোহিততন্ত্রের মতো বিবেচনা করে থাকে। একজন প্রখ্যাত জাপানি চিন্তাবিদ এ বিষয়ে বলেন :

জাপান তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বা ঘরোয়া মডেলের নিরিখেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে থাকে। তারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে জাপানের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার আদলে দেখতে ভালোবাসে, যে সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা উল্লম্ব ধরনের কাঠামোর দ্বারা গঠিত ...।

তাই বলা যায় যে, জাপানের জোটবদ্ধতার সারবত্তা হল যতটা তাঁবেদারিত্বমূলক ততটা ভারসাম্যমূলক নয়। এবং জাপান সবসময়ই প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সঙ্গেই জোটবদ্ধ হতে চেয়েছে।'[৪০]

এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রশমিত হয়েছে এবং বিপরীতভাবে চীনের শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাচ্ছে, জাপান সে-বিষয়টি লক্ষ্য রেখেই নীতিনির্ধারণ করতে তৎপর হচ্ছে। জাপান এবং চীনের সম্পর্ক নিয়ে কিশোরী মাহবুবানী বলেন, 'কে এখানে প্রথম নাম্বারের? আর এর উত্তর কিন্তু খুবই পরিষ্কার। জাপানের সম্রাট ১৯৯২ সালে চীনকে যখন ভ্রমণের জন্য বেছে নিলেন, তখন বেজিং ছিল আপেক্ষিক বিচারে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন।'[৪১]

আদর্শিকভাবে জাপানের নেতৃত্ব এবং জনগণ নিঃসন্দেহে বিগত কয়েক দশক আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রের ছত্রছায়ার তলেই থাকতে চেয়েছে। এশিয়ায় আমেরিকার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকলে জাপান তার অবস্থান শক্ত করার অভিপ্রায়ে নিজেকে 'পুনঃএশীয়করণ'সহ চীনের শক্তির বাস্তবতা মেনে নিয়ে চীনের সঙ্গে সখ্যবৃদ্ধির চিন্তা করতে থাকে। যখন ১৯৯৪ সালে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, একবিংশ শতাব্দীতে কোন্ দেশ এশিয়ায় সবচেয়ে প্রভাবশালী হবে, শতকরা ৪৪ ভাগ জাপানি জনগণ চীনের নাম উচ্চারণ করেছিল, শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম নিয়েছিল, এবং মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ মানুষ জাপানের কথা বলেছিল।'[৪২] ১৯৯৫ সালে জাপানের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জাপান চীনের উত্থানের পক্ষে পথ পরিষ্কার ও চীনকে খাপখাইয়ে নেবে।' তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, সে সময় যুক্তরাষ্ট্র কী করবে? তার প্রাথমিক উত্তর ছিল : 'বিষয়টি পুরোপুরি অনিশ্চিত'।

চীনের আধিপত্য বিস্তার কিন্তু পূর্বএশিয়ায় উত্তেজনা ও সংঘাত হ্রাস করবে বলেই মনে হয়। সেসঙ্গে উক্ত এলাকায় আমেরিকা ও পশ্চিমাশক্তির প্রভাবও হ্রাস করবে। এ অবস্থা আরও যা করবে তা হল, আমেরিকাকে তার ঐতিহাসিক কিছু কাজ করা থেকে দূরে রাখবে, যেমন : 'পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে অন্য শক্তি দ্বারা পদানত করা থেকে বিরত করে রাখা'। তবে চীনের এই আধিপত্যের ফলাফল এশিয়ার দেশসমূহ ও আমেরিকার ওপর কীভাবে বর্তায় তা অনেকটা নির্ভর করবে চীনে কী ঘটে তার ওপর। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবসময়ই সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ায়, তবে সেসঙ্গে এটি রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং 'বহুত্ববাদিতা' এবং 'গণতান্ত্রিক' ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করে থাকে। দেখা যায় যে, এ প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে দক্ষিণকোরিয়া এবং তাইওয়ানে আরম্ভ হয়ে গেছে। উভয় দেশের খ্রিস্টান রাজনৈতিক নেতৃত্ব গণতন্ত্রকে সামনে এগিয়ে নিতে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে।

চীনের কনফুসীয় দর্শনের উত্তরাধিকারিত্ব, কর্তৃপক্ষের প্রতি এর গুরুত্বারোপ, নিয়মানুবর্তিতা, পদসোপান, ব্যক্তির ওপর সম্মিলিত জনগণের কম-প্রাধান্য মূলত গণতন্ত্রায়নের জন্য প্রবল প্রতিবন্ধক। যদিও দক্ষিণ চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেখানে ক্রমাগতভাবে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে, সেখানে একটি গতিশীল বুর্জোয়াগোষ্ঠী আবির্ভূত হচ্ছে, সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক সম্পদাদি জড়ো হচ্ছে, দ্রুত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ ঘটছে। চীনা জনগণের একটি বিরাট অংশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত হচ্ছে; তারা সেখানে ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগে অংশ নিচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে। এ সবকিছুই কিন্তু রাজনৈতিক বহুত্ববাদীতার একটি সামাজিক ভিত্তির জন্য ইতিবাচক।

রাজনৈতিক কার্যক্রমের দ্বার উন্মোচন, সাধারণত একটি কর্তৃত্ববাদি শাসনের জঠরে জন্ম নেয়া সংস্কারবাদীদের ক্ষমতাগ্রহণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। চীনে কি তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে? সম্ভবত ডেং-এর তাৎক্ষণিক পরবর্তী প্রাথমিক সময়ে না হলেও, তার পরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে তা ঘটতেও পারে। হয়তো একবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণচীনে রাজনৈতিক এজেন্ডা সম্বলিত গোষ্ঠী আবির্ভূত হবে, যদিও তা রাজনৈতিক দলের নামে হবে বলে মনে হয় না। আর এসব তৎপরতা সিঙ্গাপুর, হংকং ও তাইওয়ান দ্বারা সমর্থিত হবে। যদি সত্যিই দক্ষিণচীনে তেমন কিছু ঘটে যায় এবং সংস্কারপন্থীরা বেজিং-এ ক্ষমতা গ্রহণ করে, তাহলে সেখানে কোনো-না-কোনোভাবে একধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায়। তথায়, গণতন্ত্রায়ন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। অবশ্য, দীর্ঘমেয়াদিভাবে ভাবলে বলতে হয়, একটি সত্যিকার স্থায়ী বহুত্ববাদী ব্যবস্থা চীনে কায়েম হলে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে চীনের সংঘাত হ্রাস পাবে।

ফ্রিডবার্গ যেভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সম্ভবত সেটিই সত্য : 'ইউরোপের অতীত হল এশিয়ার ভবিষ্যৎ'। আরও হতে পারে এশিয়ার অতীতই এশিয়ার ভবিষ্যৎ। এশিয়ার জন্য হয় সংঘাতের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, অথবা আধিপত্য মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপন করা। পশ্চিমাশক্তি সম্ভবত 'সংঘাত' এবং 'ভারসাম্য' দুটি রাস্তা ধরেই হেঁটে থাকে। ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার বাস্তবতা এই বলতে শেখায় যে, এশিয়ার ক্ষেত্রে আধিপত্যের মাধ্যমেই শান্তির পথ খোলা রয়েছে। যে-সময়টি ইউরোপ ১৮৪০-এর দশক ও ১৮৫০-এর দশকে অতিক্রম করেছে, এশিয়ার সামনে হয়তো সেই সময় অনাগত। চীন হয়তো আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তার করবে এবং 'পূর্ব' এভাবেই তার হয়ে যাবে।

সভ্যতা ও কোররাষ্ট্র : একমত হওয়া

শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি বহুধাবিভক্ত বিশ্ব ও বহুধাবিভক্ত সভ্যতাসম্বলিত জগৎ আজ শীতলযুদ্ধসময়ের একক প্রভাববলয়াবদ্ধ এবং একক ফাটলযুক্ত পরিস্থিতির মধ্যে আর নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে উচ্চহারে জন্ম এবং এশীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে, বলা যায় পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে চ্যালেঞ্জএর সম্ভাব্যতাসমূহের

সংঘাত অন্যান্য সংঘাত ও ফাটলকে ছাড়িয়ে যাবে। মুসলমান দেশের সরকারগুলো ক্রমাগতভাবে পশ্চিমাবিশ্বের প্রতি অসহিষ্ণু ও বিরোধাত্মক হয়ে উঠছে এবং ক্রমেই নিম্ন ও উচ্চমাত্রার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পশ্চিমাবিশ্ব ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে চীন, জাপান এবং অন্যান্য এশীয়দেশের সম্পর্ক ক্রমাগত উত্তপ্ত ও সংঘাতময় হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে, যদি যুক্তরাষ্ট্র এশীয় দেশের ওপর চীনের আধিপত্যবাদিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ করে বসে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, কনফুসীয়-ইসলামিক সংযোগ চলমান থাকবে এবং তা আরও ব্যাপক ভিত্তি পাবে ও সুগভীর হবে। এ-ধরনের ঐক্যের মূল বিষয় হবে, মুসলমান এবং সিনিক সমাজের দ্বারা সম্মিলিতভাবে পাশ্চাত্যের অস্ত্র-সম্প্রসারণের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা, মানবাধিকার সংক্রান্তসহ অন্যান্য ইস্যু। এক্ষেত্রে কোর-বিষয়ে থাকবে পাকিস্তান, ইরান এবং চীন, যার গোড়াপত্তন ও জোটবদ্ধতা পেয়েছে ১৯৯০-এর দশকে প্রেসিডেন্ট সানংকুনের ইরান ও পাকিস্তান সফর এবং প্রেসিডেন্ট রাফসানজানির পাকিস্তান ও চীন ভ্রমণের ভেতর দিয়ে। 'এ সবকিছু ইরান, পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে দিয়ে সেখানে একটি সূচনাপর্বের জোটের আবির্ভাব ঘটে।' ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট রাফসানজানি ঘোষণা দেন যে, 'একটি কৌশলগত জোট ইরান এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজ করছে এবং এমতাবস্থায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ইরানের ওপর আক্রমণ হিসেবে ইরান বিবেচনা করবে।' এই ধারাকে শক্তিশালী করতে বেনজীর ভুট্টো ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরক্ষণেই ইরান ও চীন সফর করেন। এই তিনটি দেশের মধ্যে সমঝোতা হয় যে, তারা সকলেই সবসময় নিজেদের ভেতর রাজনৈতিক, সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিকভাবে যৌথ প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে সামরিক ও বেসামরিক খাতের বিভিন্ন দিক, যেমন সামরিক খাতে উৎপাদন প্রসার করবে এবং চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র বাদবাকি দেশে স্থানান্তর করবে।

এই ধরনের কার্যক্রম পাকিস্তানের ইসলামি চিন্তাবিদগণের দ্বারা ব্যাপক ও জোরালোভাবে সমর্থিত হতে থাকে। এটিকে তারা তেহরান-ইসলামাবাদ বেজিং অক্ষ হিসেবে দেখতে শুরু করেন। অন্যদিকে, তেহরান মনে করে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে খুব ঘনিষ্ঠ ও ধারাবাহিক একটি সম্পর্ক ইরান, চীন ও পাকিস্তান এবং কাজাকিস্তানের মধ্যে থাকা আবশ্যকীয়। ১৯৯০-এর দশকে একটি 'ডি ফ্যাক্টো'-জোট পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করার মানসে যাত্রা শুরু করেছিল, বিশেষ করে ভারতের দিক থেকে আসা নিরাপত্তার হুমকি এবং মধ্যএশিয়ায় তুরস্ক ও রাশিয়ার প্রভাববলয় প্রতিরোধ করার জন্য।[৬৩]

এই ত্রিদেশীয় জোট কি বৃহত্তর মুসলমান দেশ এবং এশিয়ার জন্য একটি 'কোর জোট' হিসেবে কাজ করতে সক্ষম? গ্রাহাম ফুলার যুক্তি দেখান যে, কনফুসীয়-মুসলিমপন্থী জোট কার্যকর হতে পারে, এজন্য নয় যে, মোহাম্মদ ও কনফুসিয়াস পশ্চিমাবিদ্বেষী ছিলেন। সংস্কৃতিগত কারণে তাদের দ্বারা পাশ্চাত্য অভিযুক্ত হয়ে থাকে।

কেননা পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্বকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যেখান থেকে তারা মনে করে যে, 'বিশ্বকে তারা আর কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না।' এ-ধরনের মনোভাব সবচেয়ে বেশি আসে মোয়াম্মদ গাদ্দাফির নিকট থেকে। তিনি ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ঘোষণা দেন :

'নতুন বিশ্বব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের ওপর আধিপত্য করবে, যদি তারা তা করতে পারে, তবে তার পর তারা কনফুসীয়-মতবাদকে তছনছ করবে এবং এভাবে চীন, ভারত ও জাপানের অন্যান্য ধর্মের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে... ।'

খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের বক্তব্য হচ্ছে : 'আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে, কম্যুনিজম ধ্বংস করা হবে, আমরা তা করেছি এবং এখন আমাদের (পশ্চিমাবিশ্ব) লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম ও কনফুসীয় মতবাদ ধ্বংস করা। এখন আমরা চীনের সঙ্গে একটি সংঘাত দেখতে ইচ্ছুক, যেখানে আমেরিকা থাকবে খ্রিস্টীয় ক্রুসেডের ক্যাম্পপ্রধান, আর অন্যদিকে চীন থাকবে কনফুসীয় ক্যাম্পের প্রধান। কোনোপ্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীতই আমরা খ্রিস্টীয় ক্রুসেডারদের পক্ষে। আমরা প্রয়োজনে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হব এবং এভাবে পরস্পরের সাধারণ শত্রুকে নির্মূল করব।'

গাদ্দাফী বলেন, মুসলমান হিসেবে আমরা চীনকে সমর্থন জানাই এবং আমরাও তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব ... আমরা চীনের বিজয় দেখতে চাই ... ।[৪৪]

পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কনফুসীয় ও ইসলামি শক্তির জোট গঠনের বিষয়ে এত আগ্রহ থাকার পরও চীনের পক্ষ থেকে তা হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন ১৯৯৫ সালে ঘোষণা দেন যে, চীন কোনোভাবেই কোনো দেশের সঙ্গে জোটে যাবে না। তাঁর এ ঘোষণা চীনের ধ্রুপদী ধারাকেই মনে করিয়ে দেয়, যেখানে মনে করা হয় (মধ্যযুগীয় সম্রাট) নিজস্ব ও কেন্দ্রীয় শক্তিই বড় শক্তি। চীনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো জোটভুক্ত হওয়ার দরকার নেই, তবে অন্যান্য দেশ প্রয়োজনে চীনের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতায় আসতে বাধা নেই। চীনও মনে করে পশ্চিমের সঙ্গে তার সংঘাতে মুসলমানগণ বড় বন্ধু হতে পারে। তদুপরি চীনে জ্বালানি তেলের উত্তরোত্তর চাহিদা চীনকে ইরান, ইরাক, সৌদিআরব-সহ কাজাকিস্তান ও আজারবাইজানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহিত করে। এ প্রকারের 'অস্ত্র-তেল-বন্ধুত্ব' সম্পর্কে একজন জ্বালানি-বিশেষজ্ঞ ১৯৯৪ সালে তাদের মনোভাব সম্পর্কে বলেন, 'এজন্য লন্ডন, প্যারিস বা ওয়াশিংটনের নিকট থেকে আর আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন দেখি না।'[৪৫]

পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অবশিষ্ট বিশ্বের কোর-সভ্যতাসমূহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের মনোভাব সবসময় একরূপ থাকে না। দক্ষিণের সভ্যতায় যেমন স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় কোনো কোররাষ্ট্র নেই; তারা উভয়ই পশ্চিমাশক্তিনির্ভর এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দিক থেকে আপেক্ষিকভাবে দুর্বল (অবশ্য সম্প্রতি লাটিন আমেরিকায় তা বদলাচ্ছে)। হয়তো পশ্চিমের সঙ্গে তাদের

সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা ভবিষ্যতে উল্টোদিকে হাঁটবে। লাটিন আমেরিকা সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চিমের কাছাকাছি।

১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে এখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্যের নিকটবর্তী হতে চেয়েছে। লাটিন আমেরিকার দুটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা বর্জন করেছে। ক্ষুদ্র সামরিক শক্তি নিয়েও লাটিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির প্রাধান্যকে ভালোচোখে দেখে না, যদিও তারা তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেও চায় না। লাটিন আমেরিকার অনেক দেশে দ্রুত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের সম্প্রসারণ কার্যত মিলেমিশে প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিক সংঘ গঠনে উদ্বুদ্ধ করছে যার সঙ্গে পশ্চিমের যোগসূত্র রয়েছে। এভাবে ধর্মীয় কারণেও লাটিন আমেরিকা পশ্চিমাবিশ্বের খুব নিকট চলে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সেন্ট্রাল আমেরিকা, ক্যারিবীয় এলাকার মধ্যে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামি সম্প্রদায় যেন ওই অঞ্চলকে একক সংস্কৃতির দিকে সামনে টানতে শুরু করেছে।

লাটিন আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বের সংঘাতের প্রধান প্রধান ইস্যু হল যথাক্রমে অভিবাসন, মাদক, মাদকসংক্রান্ত সহিংসতা, অর্থনৈতিক সমন্বয় (অর্থাৎ নাফটায় তাদের অংশীদারিত্ব এবং বিপরীতে মারকুসার ও এনডেন চুক্তির প্রশ্নে) সৃষ্ট পরিস্থিতি। নাফটায় মেক্সিকোর যোগদান পশ্চিমাসভ্যতার সঙ্গে তার 'ঘর বাঁধা' খুব সহজ ছিল না। হয়তো এর অগ্রগতি হবে খুব ধীরে, তা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গড়াবে এবং কখনও পূর্ণাঙ্গতা পাবে না। যদিও একথা সত্য, লাটিন আমেরিকার সঙ্গে পশ্চিমাবিশ্বের প্রভেদ পশ্চিমাসভ্যতার সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক কম।

আফ্রিকা তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে আফ্রিকার সম্পর্ক কিছু বেশি সংঘাতময়। তারপরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়ে যায়। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে দক্ষিণআফ্রিকা পছন্দ করে না, তারা পরমাণুঅস্ত্র পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে এবং ইতোমধ্যে এ-বিষয়ের অগ্রগতি ধ্বংস করেছে। তৎকালীন বর্ণবাদী সরকার বর্ণবাদবিদ্বেষী আক্রমণের ভয়ে এসব পরমাণু-কার্যক্রম শুরু করেছিল। বর্ণবাদী সরকার এসব অস্ত্র কালোবর্ণের সরকারের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে দিতে চায়নি বলেই হয়তো এমনটি ঘটেছিল। একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হল, দক্ষিণআফ্রিকা পরমাণুঅস্ত্র তৈরির যোগ্যতা থেকে সরে আসেনি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি কোররাষ্ট্রে পরিণত করতে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য রোধকল্পে হয়তো তারা পুনরায় উক্ত পরমাণু-কর্মসূচি পুনরুজ্জীবিত করতেও পারে। মানবাধিকার, অভিবাসন, অর্থনৈতিক ইস্যু এবং সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়সমূহ আফ্রিকা এবং পাশ্চাত্যের মধ্যেকার সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা বলে বিবেচিত হয়।

পূর্বতন উপনিবেশের সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে ফ্রান্সের প্রচেষ্টার পরও পশ্চিমাবিশ্ব বিযুক্তকরণের একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম আফ্রিকায় এগিয়ে চলেছে। সেখানে পশ্চিমাপ্রভাব ও সংস্কৃতিস্বার্থ হ্রাস পাচ্ছে, তাদের স্বকীয় সংস্কৃতি জাগ্রত হচ্ছে, এবং দক্ষিণআফ্রিকা অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ কৃষ্টির প্রভাব কমিয়ে আফ্রিকান সংস্কৃতি জোরদার করবে বলেই মনে হয়। যখন লাটিন আমেরিকায় পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া

চলছে, তখন আফ্রিকায় চলছে তার বিপরীত স্রোতোধারা। যদিও একথা সত্য, তারা উভয়েই পশ্চিমাবিশ্বের ওপর নির্ভরশীল এবং জাতিসংঘের সমর্থনের পরও পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে ভারসাম্য আনা অত সহজ হবে না। এ-বিষয়টি মোটেও তিনটি 'দোদুল্যমান সভ্যতার' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদের কোররাষ্ট্রই সাধারণত বিশ্বরাজনীতিতে তাদের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং এক্ষেত্রে তারা মিশ্র, পরস্পর বিপরীতমুখী, অনিয়মিত সম্পর্ক, পাশ্চাত্য ও তাদের চ্যালেঞ্জার সভ্যতার সঙ্গে বজায় রাখে। তারা সেইসঙ্গে পরস্পরের মধ্যে 'ওঠানামামূলক' সম্পর্ক বজায় রাখে। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করে দেখেছি, জাপান তার অন্তরাত্মার সন্ধানে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে নিজেকে চীনাভিমুখী করেছে। শীতলযুদ্ধচলাকালীন জোটবদ্ধতার মাধ্যমে জাপানের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও বজায় থাকলেও, জাপান এবং আমেরিকার সম্পর্ক অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে এ-সম্পর্ক হয়তো কখনও বাতিল হয়ে যাবে না। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক জটিল। কোরাইল দ্বীপমালা রাশিয়া ১৯৪৫ সাল থেকে দখল করে রেখেছে, কিন্তু জাপান এ বিষয়ে একটি বোঝাপড়ার মধ্যে আসতে চাইলেও রাশিয়া মোটেই আমল দিচ্ছে না। শীতলযুদ্ধাবসানোত্তর রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্প্রসারণ ঘটার ফলে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও আর জাপানের পক্ষে অবস্থান নেবার কোনো সুযোগ নেই, কেননা বিষয়টি সত্যিই অতীতের কালো গহ্বরে ঢুকে গেছে।

শীতলযুদ্ধের শেষ দশকে চীন খুবই কার্যকরভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'চীনা তুরুপের তাস' ব্যবহার করতে পেরেছিল। আর শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে রাশিয়া তার 'রুশ তুরুপের তাস' ব্যবহার করার সময় পেয়েছে। রাশিয়া এবং চীন একত্রিত হয়ে ১৯৫০-এর দশকে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের নিরিখে ইউরোপীয় ভারসাম্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। অন্যদিকে, রাশিয়া বিশ্বব্যবস্থায় কনফুসীয়-ইসলামি সম্পর্কের মধ্যে নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পশ্চিমাবিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাশিয়া তার নিকটতম প্রতিবেশী সভ্যতাগুলোর সঙ্গেও সমস্যার মধ্যে রয়েছে। শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাশিয়া পাশ্চাত্যশক্তির সঙ্গে ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে সব কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করেছে ও তার প্রতিক্রিয়া এবং অর্থ দাঁড়ায়, যথা :

১. ইউক্রেন দ্বিধাবিভক্ত না-হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া খ্রিস্টধর্ম-অধ্যুষিত সেন্ট্রাল ও পূর্ব ইউরোপে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সম্প্রসারণ দেখতে ইচ্ছুক নয়;

২. রাশিয়া এবং ন্যাটোর মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব থাকা দরকার, যাতে করে তারা পরস্পরের প্রতি আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন না হয়, তাদের মধ্যে যেন সমস্যাগুলো নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হতে পারে। নিরাপত্তা, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে কৌশল ঠিক করা যেতে পারে।

৩. অর্থোডক্স রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যকে রাশিয়ার ওপর আস্থা রাখতে হবে;

৪. শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাশিয়া মুসলমান প্রজাতন্ত্রসমূহকে নিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সমাধানে পাশ্চাত্যকে রাশিয়ার মেধা ও স্বার্থকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এজন্য, প্রয়োজনে সিইএফ চুক্তির পুনর্মূল্যায়ন করে গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বসনিয়ার মতো ইস্যু যেখানে পাশ্চাত্য ও রাশিয়া উভয়েরই স্বার্থ রয়েছে, সেখানে উভয় শক্তির একত্রে এগুবার প্রয়োজন রয়েছে।

যদি উপরোক্ত ধারায় একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রাশিয়া বা পশ্চিমাশক্তি কেউই কারও তরফ থেকে দীর্ঘমেয়াদি কোনো নিরাপত্তা বিষয়ে হুমকি হিসেবে প্রতিভাত হবে না। ইউরোপ এবং রাশিয়া উভয় দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই নিম্ন এবং উভয় দেশে বয়স্ক জনসংখ্যার হার অধিক, সে কারণে ওইসব সমাজে এমন বহু সংখ্যক যুবক নেই যারা কিনা সম্প্রসারণবাদী ও অপরাধপ্রবণ।

শীতলযুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে রাশিয়া-চীনের সম্পর্ক ছিল উল্লেখ করার মতো উত্তম এবং সহযোগিতাপ্রবণ। সীমান্ত বিরোধের সমাধান হয়ে গিয়েছিল; উভয়পক্ষের সামরিক বাহিনী সীমান্তএলাকা থেকে হ্রাস করা হয়েছিল; ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় একে অপরের দিকে পারমাণবিক অস্ত্র বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্র তাক করা থেকে বিরত থাকে, এবং তাদের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রীগণ কীভাবে মুসলমান সন্ত্রাসী ও মৌলবাদ মোকাবিলা করা যায়, সে-বিষয়ে যৌথ চিন্তাচেতনা শুরু করে।

রাশিয়া আরও লক্ষ্য করে যে, চীন তাদের দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক সামরিক সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে ইচ্ছুক, যেমন সামরিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি- ট্যাংক, জঙ্গিবিমান, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র।[৪৬] রাশিয়ার পক্ষ থেকে অত্যন্ত সচেতনভাবেই চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাওয়া হয়। কেননা এর মধ্যে দিয়ে রাশিয়া এশিয়ার 'অংশীদার' হিসেবে জাপানের সঙ্গে 'ঠাণ্ডা' সম্পর্ক 'উষ্ণ' করতে আগ্রহী ছিল। পশ্চিমাবিশ্বে ন্যাটোর মাধ্যমে সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, অর্থনৈতিক সংস্কার, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পশ্চিমা সংস্থাগুলোর সদস্যপদ প্রাপ্তি বিষয় তাদের বিবেচনায় ছিল। অন্যদিকে, চীনও পশ্চিমাবিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইল যে, পশ্চিমের বিরুদ্ধে তারা এক এবং প্রয়োজনে আঞ্চলিকভাবে সামরিক শক্তি অর্জন সম্ভব।

উভয় দেশই, ইসলামি ও কনফুসীয় ঐক্যের ন্যায় একই লক্ষ্য অর্জন তথা পশ্চিমা শক্তি ও সর্বজনীনতাকে প্রতিরোধ করার দিকে ধাবিত হয়। এ-ধরনের সম্পর্ক কতদিন টিকে থাকবে তা নির্ভর করবে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর :

প্রথমত, রাশিয়ার সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক স্থাপন ও তা পরস্পর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারা বা না-পারা;

দ্বিতীয়ত, পূর্বএশিয়ায় চীনের আধিপত্য রাশিয়ার অর্থনৈতিক, জনসংখ্যা সম্পর্কিত, সামরিক দিক থেকে স্বার্থের সংঘাতে যাবে কিনা।

চীনের অর্থনৈতিক গতিশীলতা সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে শুরু করেছে। সেখানে চীনা, জাপানি, কোরীয় ব্যবসায়ীগণ বাণিজ্যের সম্ভাবনা যাচাই বাছাই করছেন। রুশগণ সাইবেরিয়াতে তাদের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দৃষ্টিতে পূর্বএশিয়াকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে ইউরোপীয় রাশিয়াকে নয়। সবচেয়ে বড় ভীতিকর অবস্থা রাশিয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, সাইবেরিয়ায় চীনা-অভিবাসীদের নিয়ে। সেখানে চীন থেকে অবৈধভাবে প্রচুর অভিবাসী গিয়েছে। ১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা ৫ মিলিয়ন, যেখানে রুশ জনসংখ্যা মাত্র ৭ মিলিয়ন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাভেল গ্রাচেভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'চীনারা রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল শান্তিপূর্ণভাবে দখল করে নিচ্ছে।'

রাশিয়ার উর্ধ্বতন অভিবাসী সংক্রান্ত কর্মকর্তা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলেন যে, 'আমাদের অবশ্যই চীনের এ সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করতে হবে।'[৪৭] তদুপরি, প্রাক্তন সোভিয়েটের সেন্ট্রাল এশিয়ার রিপাবলিকগুলোর সঙ্গে চীনের উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে রাশিয়া ভালোচোখে দেখছে না। রাশিয়ার মনে এমন ভয়ভীতিও কাজ করে যে, চীন হয়তো আবার মঙ্গোলিয়া দাবি করে বসবে। কেননা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়া মঙ্গোলিয়াকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং দীর্ঘদিন মঙ্গোলিয়া সোভিয়েটের 'উপগ্রহ' হয়ে ছিল।

ইসলামের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে দেখলে দেখা যায়, যুদ্ধের ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছিল। রাশিয়া তুরস্কের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাছাড়া উত্তর ককেশীয় অঞ্চল এবং সেন্ট্রাল এশিয়ায়ও যুদ্ধ হয়েছিল। এখন রাশিয়া বলকান এলাকায় তুরস্কের আগ্রাসী মনোভাব দমন এবং ট্রান্সককেশীয় এলাকায় তুরস্কের আধিপত্য ঠেকাবার জন্য অর্থোডক্স গ্রিস ও আর্মেনিয়ার সঙ্গে একজোট হচ্ছে। রাশিয়া তার রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাববলয় রক্ষার্থে সেন্ট্রাল এশিয়ার সৈন্য সমাবেশ করছে এবং সি.আই.এস.-এর সদস্য হতে তাদের বাধ্য করছে। রাশিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে, কাস্পিয়ান সাগরের মজুদকৃত তেল ও গ্যাস পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার সরবরাহ লাইন দখলে রাখা। রাশিয়া উত্তর ককেশাসে ও চেসনিয়ায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং মুসলমান মৌলবাদীদের দমন করতে তারা তাজাক সরকারকে সহযোগিতা করছে। এই ধরনের নিরাপত্তামূলক তৎপরতা পুনরায় রাশিয়াকে চীনের নিকটে নিয়ে যায়। কেননা উভয় দেশই ইসলামি মৌলবাদের হুমকিতে 'ভীত ও সন্ত্রস্ত'। বিশেষ করে সেন্ট্রাল এশিয়ার ৫টি মুসলমান রিপাবলিক থেকে এমন হুমকির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য রাশিয়া ইরানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে। রাশিয়া ইরানে সাবমেরিন, উন্নতমানের জঙ্গিবিমান, বোমারু বিমান, ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং সামরিক-বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম বিক্রি করছে। তাছাড়া, রাশিয়া ইরানে হালকা ধরনের পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন এবং ইউরেনিয়াম সরবরাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। বিনিময়ে রাশিয়া সেন্ট্রাল এশিয়ায় ইসলামি মৌলবাদের বীজ উৎপাটনে ইরানের সহায়তা চায় এবং উক্ত এলাকায় তুরস্কের আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষে ইরানকে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করে। সামনের দিনগুলোতে রাশিয়া ইসলামি রিপাবলিক ও দক্ষিণ থেকে ভয়ভীতি প্রাপ্ত হতে পারে।

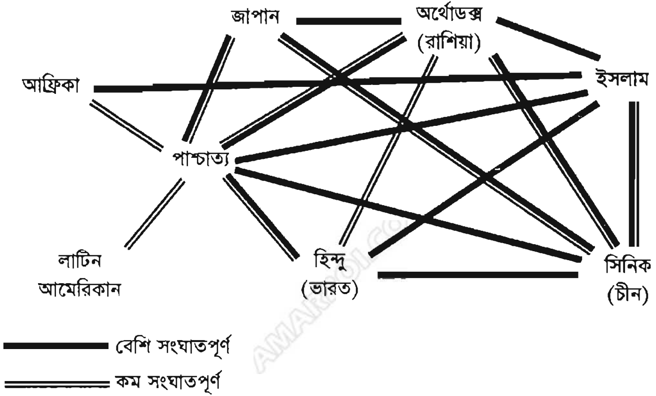
শীতলযুদ্ধকালীন তৃতীয় 'দোদুল্যমান' 'কোররাষ্ট্র হিসেবে ভারত আঁতাঁত করেছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে মূলত চীন ও পাকিস্তানের ভয়ে ভীত হয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন রাগান্বিত না থাকে, তখন ভারত তার প্রতি দূরত্ব বজায় রেখে চলে। শীতলযুদ্ধপরবর্তী সময়ে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সাংঘাতিক সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য তারা পারমাণবিক শক্তি দ্বারা উভয়ে শক্তির ভারসাম্য তৈরি করেছে। পাকিস্তান মুসলমানবিশ্বের সমর্থন পেলেও ভারতের জন্য সে-সমর্থন অর্জন করা দুষ্কর। এ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এটিকে অতিক্রম করার মানসে অতীতের মতো কিছু ইসলামি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে। শীতলযুদ্ধাবসানের পর চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের আগ্রহী হয় বিধায় ভারতের সাথে তার সম্পর্ক ভালো হতে শুরু করে, উত্তেজনা প্রশমিত হতে থাকে। তবে, এ প্রবণতা কতদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে তা বলা মুশকিল। চীন ইতোমধ্যে দক্ষিণএশিয়ার রাজনীতির মাঠে খেলতে শুরু করেছে, আর তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাচ্ছে। চীন পাকিস্তানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সহায়তাসহ অন্যান্য সামরিক সহযোগিতা প্রদান করছে। তাছাড়া, চীন মায়ানমারের মন জয় করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করে যাচ্ছে। মায়ানমারের অর্থনীতিক সহায়তায় বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সামরিক সহযোগিতা দিতেও চীন কার্পণ্য দেখাচ্ছে না। বিশেষ করে, সেখানে চীন নৌবাহিনী উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। চীনের শক্তির বহিঃপ্রকাশ এখন ঘটছে, তবে ভারতের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকবে একবিংশ শতাব্দীতে। এজন্য উভয়ের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা উচ্চমাত্রায় রয়েছে। 'এশিয়ার এ দুটো বড় শক্তির মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাও মূলত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক' বলে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন। ভারত শুধুমাত্র একটি বড় শক্তি হিসেবে জেগে উঠছে না, সেসঙ্গে ভারত চীনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর শক্তি হিসেবেও আবির্ভূত হচ্ছে।[৪৮]

চীন-পাকিস্তান জোট যদিও বৃহত্তর অর্থে কনফুসীয়-ইসলামি সম্পর্ক নয়, তবুও তার জন্য ভারত কিছুটা ভীত হয়েই রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রতী হয়। ভারত রাশিয়া থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে থাকে। ১৯৯০-এর দশকে ভারত রাশিয়া থেকে প্রায় সবধরনের সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র ক্রয় করেছিল। যেমন বিমানবাহী জাহাজ, 'ক্রুজনিক রকেট প্রযুক্তি' যার জন্য ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের বাধানিষেধের বোঝা নিক্ষিপ্ত হয়। সামরিক বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়, যেমন মানবাধিকার পরিস্থিতি, কাশ্মীর এবং অর্থনীতিকে উদারী করার বিষয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে চীনকে প্রতিরোধ করার মানসে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পাকিস্তানের সঙ্গে শীতল হয়ে যাবে এবং ভারতের সঙ্গে হবে উষ্ণ। একথা সত্য, দক্ষিণ-এশিয়ায় ভারতের শক্তির প্রসার যুক্তরাষ্ট্রের কোনোপ্রকার ক্ষতি না করে বরং লাভই করবে।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, কোররাষ্ট্রের সঙ্গে তার আওতাধীন সভ্যতাসমূহের সম্পর্ক প্রায়শই জটিল আকার ধারণ করে থাকে, আবার সে-সম্পর্ক

বদলিয়েও যায়। প্রায় সব সভ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রই অন্যরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বা এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কোররাষ্ট্রের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে থাকে, বা কোররাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াকে গণনা করে থাকে। এটি-যে সকল সময় সরলরেখায় চলে তা কিন্তু নয়। সাধারণ স্বার্থের নিরিখে দ্বিতীয় সভ্যতাসম্পৃক্ত রাষ্ট্র সাধারণ স্বার্থের যোগসূত্রতা রয়েছে, তা লক্ষ্য রেখেই তৃতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। এমনকি রাষ্ট্রটি হতে পারে অন্যসভ্যতাভুক্ত। অন্যদিকে একই সভ্যতাসম্পৃক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তঃসংঘাত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইসলামের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে।

ফিগার ৯.১ : সভ্যতাসম্পৃক্ত বৈশ্বিক রাজনীতি : আবির্ভূত হচ্ছে এমন জোট



তদুপরি, একই সভ্যতাসম্পন্ন দেশের কোররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পদের হেরফের উক্ত বিশেষ রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য 'ফাটলরেখার' নিরিখেও ঘটতে পারে। তাহলে, এভাবে একটি সাধারণীকরণ করা যায় যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোররাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তরস্থ সভ্যতার রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক বৈরী বা বন্ধুত্বপূর্ণ—এ দুভাবেই হতে পারে। এ বিষয়টি ৯.১ ফিগারে বিবৃত করা হল। শীতলযুদ্ধকালীন আপেক্ষিক দ্বিমুখী বিশ্ব আজ শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে বিতাড়িত হয়ে বহুমুখী বিশ্বে পরিণত হয়েছে। তাই এহেন বহুধাবিভক্ত সভ্যতাভিত্তিক বিশ্ব আজ জটিল সম্পর্কের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

অধ্যায় - ১০

উত্তরণমূলক যুদ্ধ থেকে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ

উত্তরণমূলক যুদ্ধ : আফগানিস্তান এবং গাল্ফ

মরক্কোর বিখ্যাত পণ্ডিত মাহ্দী এল্মাইদরা 'গাল্ফযুদ্ধকে' 'সভ্যতার প্রথম যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এ-ধরনের 'দ্বিতীয়' যুদ্ধ। প্রথমটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৭৯-১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট ও আফগানিস্তানের মধ্যে। উভয় যুদ্ধই সোজাসুজিভাবে এক দেশ দ্বারা অন্যদেশ ভৌগোলিকভাবে জয় করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা সভ্যতার যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়। ওই যুদ্ধদুটি বাস্তবে সভ্যতার গরমিল থাকার কারণে তথা নৃগোষ্ঠীক দ্বন্দ্বের ফলে ঘটেছিল।

আফগানিস্তানকে করদরাষ্ট্র বানাবার অভিপ্রায় এবং সোভিয়েট আগ্রাসনের ফলাফল হিসেবে আফগানযুদ্ধের শুরু। এ যুদ্ধ ছিল শীতলযুদ্ধসময়কালীন যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধকে সংগঠিত করতে এবং যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে যুক্তরাষ্ট্র হাত লাগিয়েছিল। আর এভাবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট বাহিনীর বিতাড়ন চেয়েছে।

আমেরিকানদের নিকট সোভিয়েটের পরাজয় ছিল অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সেই মতবাদ, যাতে বলা হয়েছিল, কম্যুনিস্ট সরকারকে হটাতে প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া সোভিয়েটের এ পরাজয় আমেরিকানদের ভিয়েতনামে শোচনীয় পরাজয়ের কাটা ঘায়ে কিছুটা হলেও মলম লাগিয়ে দেয়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলাফল ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী। যুদ্ধে পরাজয়ে সোভিয়েটসমাজের মানুষের সোভিয়েটের শক্তির ওপর আগের আস্থা আর থাকল না এবং সম্ভবত এটিও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার আর একটি কারণ। আমেরিকান ও পশ্চিমাদের নিকট জয় ছিল প্রত্যাশিত, তারা ভেবেছিল শীতলযুদ্ধের সময়ে এ জয় হবে একটি মাইলফলক, যা তাদের ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয়ের স্বাদ এনে দেবে।

তবে যারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়েছিল তাদের জন্য আফগানযুদ্ধ ছিল ভিন্ন অর্থবহ: এটি ছিল 'প্রথম বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ'[২] একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, এটি কোনো জাতীয়তাবাদী বা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল না

বরং এটি ছিল ইসলামের নীতির ওপর পরিচালিত একটি 'জিহাদ'। এ জয় কার্যত ওই শক্তিকে দারুণ আশাবাদ এনে দেয়। তারা ইসলামি শক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে জাপানিরা রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে যে আনন্দ পেয়েছিল, আফগানযুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় মুসলমানবিশ্বে তেমনি আনন্দ এনে দিয়েছিল। পশ্চিমাজগৎ যেখানে এ যুদ্ধজয়কে মুক্তবিশ্বের জয় মনে করেছিল; মুসলমানেরা সেখানে এ জয়কে ইসলামের জয় হিসেবে দেখেছিল।

আমেরিকার ডলার এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছিল আফগানযুদ্ধে সোভিয়েটকে পরাজিত করতে অপরিহার্য বিষয়। সেসঙ্গে ইসলামি বিশ্বের সমন্বিত শক্তিও কিন্তু এ যুদ্ধজয়ের জন্য ছিল অপরিহার্য। এখানে বিভিন্ন ধর্মী ও মতাবলম্বী ইসলামিশক্তি যুদ্ধে সহযোগিতা করতে নেমেছিল নিজ নিজ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। মুসলমানবিশ্বের মধ্যে সৌদিআরব থেকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য এসেছিল। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালে সৌদিআরব ৫২৫ মিলিয়ন ডলার যুদ্ধের জন্য দিয়েছিল। তারা ১৯৮৯ সালে ৭১৫ মিলিয়ন ডলারের শতকরা ৬১ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৩৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। তবে সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ এসেছিল। ১৯৯৩ সালে তারা ১৯৩ মিলিয়ন ডলার আফগান-সরকারকে দিয়েছিল। আফগান যুদ্ধের খরচ হিসেবে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩ বিলিয়ন থেকে ৩.৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। যুদ্ধে ২৫,০০০ স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন মুসলমানদেশ থেকে যুদ্ধ করতে যায়। সৌদিআরবসহ অন্যান্য মুসলমানদেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রধানত স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের জর্ডান থেকে বাছাই করে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হত। পাকিস্তান যোদ্ধাদের আশ্রয় ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করত। পাকিস্তানের মাধ্যমেই আমেরিকার টাকা খালাস করা হত। তবে, এ টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ তারা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামি মৌলবাদীদের নিকট হস্তান্তর করত। সমস্ত টাকার শতকরা ৫০ ভাগ যেত সুন্নি-নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হাতে। যেসব মুসলমান দেশের সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ আফগানযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল মার্কিন ও পাশ্চাত্যবিরোধী এবং তাই তাদের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করাকে তারা অনৈতিক এবং ইসলাম বিরোধী মনে করত। অবশেষে, মোটামুটি তিনটি কারণে সোভিয়েটবাহিনী পরাজিত হয় : তারা প্রতিপক্ষের সমকক্ষ ছিল না, আমেরিকার প্রযুক্তি এবং সৌদি অর্থ, মুসলমানদের জনবল ও সর্বাঙ্গীণ আগ্রহ।[৩]

আফগানযুদ্ধের ফলে ইসলামি সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর কোয়ালিশন সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে ইসলামকে অ-মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়। এ যুদ্ধের ফলে সেখানে রেখে আসা হয় অভিজ্ঞ যোদ্ধা, সেনা ছাউনি, প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র, সেনানিবাসের সুযোগসুবিধা, এবং বৃহত্তর আন্তঃইসলামি যোগাযোগের সুবিধ, যার মাধ্যমে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ সৃষ্টি সহজে করতে পারে। বিরাট অঙ্কের সামরিক সাজসরঞ্জাম; প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ অপ্রতিরোধযোগ্য স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এ বিজয় তাদের মধ্যে একটি আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। তারা মনে করতে থাকে যে, পরবর্তীতেও অন্যান্য স্থানে ও ক্ষেত্রে তাদের জয় আসবে।

এমতাবস্থায়, মুসলমানদের মধ্যে জেহাদি চেতনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ সালে একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, আফগান স্বেচ্ছাসেবীদের ভেতর 'জেহাদি চেতনা', ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বোধ শাণিত হয়। '...তারা পৃথিবীর দুটি বৃহৎ শক্তির একটিকে ধরাশায়ী করে, এখন তারা অন্য দেশটিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে।'[৪]

আফগানযুদ্ধ ছিল একটি সভ্যতাসংক্রান্ত যুদ্ধ, কেননা সর্বত্র মুসলমানগণ এ যুদ্ধকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে একটি 'একত্রিত প্রয়াস' হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, এ যুদ্ধে সর্বব্যাপী মুসলমানদের ঐক্যচেতনাকে জাগ্রত করেছিল, যে চেতনার শেকড় সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। গাল্ফযুদ্ধও তেমনি ছিল সভ্যতাসংক্রান্ত, কেননা পাশ্চাত্যর শক্তি প্রয়োগ করেছিল একটি মুসলমানদের আন্তঃদ্বন্দ্বের ভেতর। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের এ পদক্ষেপকে সমস্ত পাশ্চাত্য জনগণ সমর্থন জুগিয়েছিল। যুদ্ধে পাশ্চাত্যের অংশগ্রহণকে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ 'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাই তারা এর বিরুদ্ধে মানসিকভাবে একত্রিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের এসব কার্যক্রম ছিল তাদের দৃষ্টিতে 'সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার বহিঃপ্রকাশ'।

আরব এবং অন্যান্য দেশের মুসলমান সরকারগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সাদ্দাম হোসেন ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে সীমান্ত লঙ্ঘন করে, যার দরুন আরবলিগ তাঁর এ-কাজকে নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব আনে। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ১৪টি, বিপক্ষে ২টি এবং ৫টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ইরাকবিরোধী কোয়ালিশনে যোগ দিতে মিশর এবং সিরিয়া রাজি হয়। পাকিস্তান, মরক্কো ও বাংলাদেশ খুবই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য ওই কোয়ালিশনের জন্য প্রেরণে রাজি হয়। তুরস্ক তার ভূমি দিয়ে ইরাকের তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয়। ওই পাইপলাইন দিয়ে ইরাকি তেল রপ্তানির জন্য ভূমধ্যসাগরের বন্দরে যেয়ে থাকে। তদুপরি, তুরস্ক তার বিমানবন্দর কোয়ালিশন বাহিনীকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। এসব কাজের বদলে তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের তার দাবিকে আরও জোরদার করতে থাকে। পাকিস্তান এবং মরক্কো সৌদিআরবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করতে তৎপর হয়। মিশর তার দায়দেনা থেকে রেহাই পায়। সিরিয়া পায় লেবানন। বিপরীতভাবে ইরাক-সরকার জর্ডান, লিবিয়া, মরিতানিয়া, ইয়েমেন, সুদান এবং তিউনেশিয়া এবং পি.এল.ও. হামাস, এফ.আই.এম. এবং এতকিছুর পরও সৌদিআরবের আর্থিক সাহায্য পেতে থাকে এবং পশ্চিমাবিশ্বের আগ্রাসী কাজের প্রতি দোষারোপ করা অব্যাহত রাখে। অন্যান্য মুসলমানদেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া সমঝোতা প্রস্তাব দেয়, অবশিষ্টরা এ সবকিছু থেকে দূরে থাকতে চায় বা ক্লান্তিবোধ করতে থাকে।

মুসলমানদেশগুলোর সরকারগণ প্রাথমিক পর্যায়ে উল্লিখিত ইস্যুতে বিভক্ত থাকলেও শুরু থেকেই আরববিশ্ব এবং সমগ্র মুসলমানসমাজের জনমত ছিল সাংঘাতিকভাবে পাশ্চাত্যবিদ্বেষী। বিশেষ করে কুয়েত-অভিযানের তিন সপ্তাহ পরে ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশন, জর্ডান এবং সৌদিআরব ভ্রমণ শেষে একজন আমেরিকান রির্পোটার বলেন, 'আরব বিশ্ব' হল আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষে ভরপুর। তারা মনে করে, তারা নিজেরাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।'[৫] মরক্কো থেকে চীন অবধি

মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান সাদ্দাম হোসেনের জন্য মিছিল করে এবং 'তাঁকে একজন মুসলমান বীর হিসেবে আখ্যায়িত করে।'[৬] এটি স্ববিরোধী মনে হলেও সত্যবিবর্জিত নয় যে, 'গণতন্ত্র নিজেই এই সংঘাতের অংশবিশেষ।' সাদ্দাম হোসেনের প্রতি সমর্থনের প্রকৃতি ছিল 'অকৃত্রিম এবং সর্বব্যাপী', বিশেষ করে আরববিশ্বের সেই সকল দেশে, যেখানে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলনামূলকভাবে কম।[৭] মরক্কো, পাকিস্তান, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বলিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্যের সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন; এদের মধ্যে ছিলেন কিং হাসান, বেনজির ভুট্টো, সুহার্তো প্রমুখ, যাঁদের বিরুদ্ধে বদনাম ছিল যে তাঁরা পাশ্চাত্যের 'হুকুমদাস'।

কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এমনকি সিরিয়াতেও পরিলক্ষিত হয়, যেখানে 'জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ গাল্ফ-এলাকায় বিদেশী সৈন্য উপস্থিতিকে মেনে নিতে পারেনি।' ভারতের প্রায় ১০০ মিলিয়ন মুসলমান জনসংখ্যার ভেতর শতকরা ৭৫ ভাগ যুদ্ধের জন্য সরাসরি আমেরিকাকে দায়ী করেন। ইন্দোনেশিয়ার ১৭১ মিলিয়ন মুসলমান সর্বজনীনভাবে আমেরিকাকে এজন্য দোষারোপ করতে থাকেন। আরবের বুদ্ধিজীবীমহল সাদ্দাম হোসেনের নানাপ্রকার অন্যায় ও পাশবিকতা ভুলে গিয়ে আমেরিকার প্রতি গালমন্দ করতে থাকেন।[৮]

আরবীয় এবং অন্যান্য মুসলমানগণ সাধারণত যুক্তি দেখায় যে, সাদ্দাম হোসেন একজন নচ্ছার, স্বেচ্ছাচার, নিপীড়নকারী শাসক। কিন্তু তারা একই সঙ্গে (এফডিআর) ভাবতে থাকেন যে, 'সে আমাদেরই একজন স্বৈরাচার'। তাদের মতে, জয়ের জন্য অভিযান একটি নিতান্তই পারিবারিক বিষয়, যা পরিবারের সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে পরিচালিত হয়ে থাকে, আর যারা তার সূত্র ধরে ওই কাজে কিছু ভারিক্কি চালের তত্ত্ব, যেমন 'আন্তর্জাতিক বিচার' ইত্যাদি গালভরা বুলি আওড়ায়, আসলে তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করতে চায় এবং এভাবে আরবভূমিকে তাদের পদানত করতে প্রয়াসী হয়। একটি গবেষণা-রিপোর্টে আরব-বুদ্ধিজীবীদের মতামত পাওয়া যায়, 'সাদ্দাম হোসেন একজন দয়ামায়াহীন, একনায়ক ও কর্তৃত্ববাদি শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমগ্র আরববিশ্বের ঘোরতর শত্রু পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আমরণ লড়ছেন।' তারা 'আরববিশ্বকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন।' প্যালেস্টাইনের একজন অধ্যাপক বলেন, 'সাদ্দাম যা করেছেন তা খুবই অন্যায়', 'তারপরও আমরা পশ্চিমাদের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরাকের রুখে দাঁড়ানোকে দোষারোপ করতে পারি না।' পশ্চিমাবিশ্বে বসবাসকারী মুসলমানেরাও আরবভূমিতে অ-মুসলমান সৈন্যদের উপস্থিতিকে বিরোধী মনোভাব থেকেই দেখেছেন এবং তাকে তারা পবিত্র 'ভূমিকে' 'অপবিত্র' করার মতো কাজ বলে মনে করেছেন।[৯]

এককথায় বলতে হয়, প্রচলিত মনোভাব হল এমন যে, 'সাদ্দাম হোসেন অভিযান পরিচালনা করে খুব খারাপ কাজ করেছেন, কিন্তু পশ্চিমাবিশ্ব তাদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তার চাইতেও খারাপ কাজ করেছে। তাই বলতে হয়, সাদ্দাম পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে যথার্থ কাজই করেছেন, এবং তাঁকে সমর্থন দিয়ে আমরাও সঠিক কাজটিই করেছি।'

অন্যান্য ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের মতো সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর পূর্বেকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার কিন্তু এ-কাজের ভেতর দিয়ে বা তিনি ইসলামের নিকট বিরাট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে বসলেন। মুসলমানজগতে 'ইউ' (U) আকারের পরিচয়-বণ্টনের সূত্রানুযায়ী সাদ্দামের সামনে অন্যকোনো বিকল্প ছিল না। আরববিশ্বে এ-ধরনের নেতৃত্ব পছন্দ বা বাছাই করা হয় আরবীয় জাতীয়তাবাদ অনুসৃত পথ ধরেই।

তৃতীয় বিশ্ব কর্তৃক পাশ্চাত্যবিরোধিতা সম্পর্কে একজন মিশরীয় বলেন, 'এটি কার্যত ইসলামের উন্নত মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম, যার মধ্যে দিয়ে সমর্থকগোষ্ঠীকে একত্রিত করা সম্ভব।'[১০] প্রাতিষ্ঠানিক এবং আচার-অভ্যাস উভয় দিক থেকেই বলা যায়, যদিও অপরাপর মুসলমানদেশগুলোর চাইতে সৌদিআরব অধিকতর ও কট্টর ইসলামপন্থী দেশ, কিন্তু তার পরেও (ইরান এবং সুদান ব্যতীত) সৌদিআরব বিশ্বব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা ও তা লালনপালন করে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো ইসলামি আন্দোলনই ইরাকের বিরুদ্ধে পশ্চিমা পদক্ষেপ সমর্থন করেনি বরং তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করেছে। সেহেতু বলা যায়, মুসলমানদের নিকট যুদ্ধটি অতিদ্রুত সভ্যতার যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল; আর সেক্ষেত্রে ইসলাম হল অনতিক্রমনীয়ভাবে একটি খুঁটি বিশেষ। মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, সুদান এবং অন্যত্র ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী এ যুদ্ধকে 'ইসলামের এবং তার সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে' যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে, যা কিনা 'ক্রুসেডপন্থী ও ইহুদিদের' দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বলে ধরা হয়। তাদের পক্ষ থেকে ইরাককে সমর্থন দেয়াকে তারা এভাবে যুক্তিপূর্ণ করে যে, 'এটি আসলে ইরাকি 'জনগণের' ওপর সামরিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধ বৈ কিছু নয়।' ১৯৮০ সালের শেষদিকে মক্কার ইসলামি কলেজের ডিন সাকার আল-হাওয়ালি, একটি টেপরেকর্ডের মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, 'এ যুদ্ধ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়... এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমাশক্তির যুদ্ধ...।' এই টেপরেকর্ড সৌদিআরবের সর্বত্র বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছিল। প্রায় একই ভাষায় জর্ডানের বাদশাহ্ হাসান যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, 'এ যুদ্ধ সমগ্র আরব জাহানের বিরুদ্ধে, তাই এ যুদ্ধ কোনোক্রমেই শুধু ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ নয়।' অধিকন্তু, ফাতিমা সেরনিসি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট বুশের বহুকথিত বক্তব্য, যেমন 'ঈশ্বর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে', এটিও একটি ধর্মীয় বক্তব্য বৈ কিছু নয়, এবং এ থেকেও বলা যায়, এটি একটি 'ধর্মীয় যুদ্ধ'। যেন বলতে চাওয়া হয়, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ... যা 'খ্রিস্টীয় ক্রুসেডের' মতো। পাশ্চাত্য এবং ইহুদিশক্তি এই ক্রুসেডের জন্ম দিয়েছে এবং এটি তাদেরই যৌথ ষড়যন্ত্রের ফসল বলে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। তারই ফলে ওই 'খ্রিস্টীয়-ইহুদি সম্মিলিত ক্রুসেডের' বিরুদ্ধে মুসলমানদের সম্মিলিত 'জেহাদ'-এর আহ্বান জানানো হয়।

'মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমাদের যুদ্ধ'—এ নীতি মেনে নেবার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্যরেখা কিছুটা হলেও ফিকে হয়ে যায়। ফলে মুসলমানবিশ্বের মধ্যে ঐক্যপ্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলমানদেশের সরকার এবং ইসলামিগোষ্ঠীগুলো প্রতিনিয়ত ও জোরালোভাবে পশ্চিমাবিশ্বের নিকট থেকে

নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিতে আরম্ভ করে। আফগান এবং গাল্ফ যুদ্ধ পরস্পর বিবদমান মুসলমান, এমনকি যারা একে অপরের শিরশ্ছেদ করতেও প্রস্তুত ছিল, তারা সবাই একত্রিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ অর্জন করে। আরবের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, জাতীয়তাবাদি এবং মৌলবাদীরা; জর্ডান ও প্যালেস্টাইনের সরকারগণ, পিএলও এবং হামাস, ইরান এবং ইরাক; এরা সবাই মতভেদ ভুলে গিয়ে পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করল। সাকার আল হাওয়ালী যেমন বলেন, 'ইরাকের বাথপন্থীরা মনে করেন, আমাদের নিজের সংস্কৃতির মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু 'রোম' আমাদের শত্রু কিয়ামত পর্যন্ত।'[১২]

এই যুদ্ধ ইরাক এবং ইরাকের ভেতর পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটি সুযোগ এনে দেয় এবং এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুদ্ধের কারণেই ইরানের শিয়া-নেতাগণ পশ্চিমাবিশ্বকে দোষারোপ করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক 'জিহাদ' ঘোষণা করেন। ইরানের সরকারও পূর্বের শত্রুতার কথা ভুলে যেতে চাইল এবং উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।

আরববিশ্বের বাইরেও এই যুদ্ধের ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ ও সংঘাত হ্রাস করার সুযোগ পেল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঐক্যপ্রক্রিয়া এগিয়ে গেল। ইতোপূর্বে পাকিস্তান কখনও এমন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তেমন সুযোগ পায়নি। দক্ষিণাঞ্চলে সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধি ও ভারত থেকে আগত অভিবাসী মুসলমানদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকত, আর এটি চলছিল প্রায় ৫ বৎসরের অধিককাল ধরে। কিন্তু দেখা যায়, তারা উভয়পক্ষই আমেরিকাকে তাদের 'সাধারণ' শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে লাগল এবং তারা হাতে হাত ধরে আমেরিকার আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে মিছিল করল। পশ্চিম সীমান্ত এলাকার অতি-সংরক্ষণশীল উপজাতিরাও, এমনকি তাদের নারীগণও রাস্তায় নেমে এসে আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। বিভিন্ন স্থানে পবিত্র শুক্রবার দিন যেখানে আগে মানুষ প্রার্থনা করেনি, সেখানেও প্রার্থনার জন্য সমবেত হতে থাকে।'[১৩]

জনমত ছিল তীব্রভাবে ওই যুদ্ধের বিপক্ষে। যে-সকল সরকার কোয়ালিশনে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা হয় পিছিয়ে যেতে শুরু করে, অথবা বিভক্ত হতে থাকে, কিংবা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে থাকে। হাফিজ আল আসাদের মতো নেতাও তার বাহিনীকে সৌদিআরবের পবিত্রস্থান সংরক্ষণের জন্য নিয়ে আসেন এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থাকতে নির্দেশ দেন। তুরস্ক ও পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা যুদ্ধে কোয়ালিশনে অংশ নেয়ার জন্য তাদের সরকারের সমালোচনাপূর্বক নিন্দা জানাতে থাকেন।

মিশর ও সিরীয় সরকার কোয়ালিশন বাহিনীতে অনেক সৈন্য মোতায়েন করেছিল। তাদেরকে দেশের অভ্যন্তরে পশ্চিমাবিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য যথেষ্ট সৈন্য মোতায়েন করতে হয়। দেখা যায়, মুসলমানদেশে প্রায় সর্বত্র সরকার ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে। 'মাগরেব-এ ইরাককে সমর্থ দিতে যে গণবিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়, তা ছিল আশ্চর্য হওয়ার মতো।' তিউনেশিয়ার জনগণ প্রকাশ্যে পশ্চিমাবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার জন্য প্রেসিডেন্ট বেন আলীকে অতিদ্রুত পশ্চিমাবিরোধী

অবস্থানে চলে যেতে হয়। মরক্কো সরকার প্রথমে ১৫০০ সৈন্য কোয়ালিশন বাহিনী পাঠিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনগণ ইরাকের সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। আলজেরিয়ায় ৪০,০০০ ইরাকপন্থী মানুষ প্রেসিডেন্ট বেনভিডিটকে তাঁর পাশ্চাত্যপ্রীতি অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং তিনি ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'আলজেরিয়া তাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ইরাকের পক্ষে অবস্থান নেবে।'[১৪] ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে মাগরেবের তিনটি সরকার আরবলিগে ইরাককে নিন্দা জানিয়ে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু ওই বৎসরের শেষের দিকে তাদের দেশের জনগণের চাপে তারা আমেরিকার বিরুদ্ধে আনীত নিন্দা-প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে।

পশ্চিমারা অনেক অপাশ্চাত্য দেশের এবং অমুসলমান সভ্যতার নিকট থেকে খুবই স্বল্প সমর্থন পেয়েছিল। ১৯৯১ সালে শতকরা ৫৩ ভাগ জাপানি যুদ্ধের নিন্দা জানিয়ে এর বিরোধিতা করে, অন্যদিকে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ এ যুদ্ধকে সমর্থন দেয়। হিন্দুদের মধ্যেও এ-প্রশ্নে দেখা দেয় বিভক্তি। তারা আসলে সাদ্দাম হোসেন এবং বুশের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছে। 'দি টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয় যে, 'ধর্মীয় গোঁয়ার্তুমির দ্বারা পরিচালিত ইহুদি-খ্রিস্টীয় প্রবল শক্তিধর পক্ষের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলমানদের যুদ্ধ।'

গাল্ফযুদ্ধ এভাবে দেখা শুরু হয়েছিল যে, এটি ইরাক ও কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধ। কিন্তু তারপর এটি ইরাক এবং পশ্চিমাদের মধ্যে যুদ্ধে রূপ নেয়। পরে এটি মুসলমান এবং পাশ্চাত্যের মধ্যেকার যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। আবার অনেকেই একে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার যুদ্ধ বলতে চান, যেমন বলা হয়, 'এটি সাদা মানুষের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধ, নতুন অবয়বে তাদের প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব।'[১৫]

কুয়েত ব্যতীত কোনো মুসলমানদেশই যুদ্ধে তেমন আত্মনিবেদিত ছিল না। পুনরায় বলতে হয়, সর্বতোভাবেই সমগ্র মুসলমানবিশ্ব পশ্চিমা এ আক্রমণের বিরোধিতা করেছিল। যুদ্ধশেষে লন্ডন, নিউইয়র্কে বিজয়র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যকোথাও এমনটি হয়নি। সোহেল এইচ. হাসমি বলেন, 'এ যুদ্ধের সমাপ্তির ভেতর দিয়ে আরবীয়দের কোনোপ্রকার বিজয়-উল্লাস দেখার প্রয়োজন ছিল না।' বরং উল্টোভাবে সেখানে হতাশা, বিব্রতকর, অপমানজনক, আতঙ্কজনক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছে। আবারও পশ্চিমারাই তাদের বিজয় নিশ্চিত করল।

আর একবার অধুনা 'সালাহউদ্দিন', যিনি আরবীয়দের মধ্যে আশার আলো প্রজ্বলিত করতে পেরেছিলেন, পরাজিত হলেন পশ্চিমাদের প্রবল-প্রতাপশালী শক্তির কাছে, যা সমগ্র ইসলামি শক্তির জন্য অপমানজনক। ফাতিমা সেরনিসি জিজ্ঞাসা করেন, 'এ যুদ্ধ পরাজয়ের চাইতে আরবীয়দের আর খারাপ কী হতে পারত? সমগ্র পশ্চিমাশক্তি তাদের সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের উপর বোমাবর্ষণ করল? এটিই ছিল চূড়ান্ত ও বিভীষিকা।'[১৬]

যুদ্ধের পর কুয়েতের বাইরে অন্যান্য আরবজগতে গাল্ফ-এলাকায় আমেরিকার সৈন্যর উপস্থিতির বিষয়ে বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। কুয়েতকে শত্রুমুক্ত করা ও সাদ্দাম হোসেনকে নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করার চেয়ে, যেন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনবাহিনীর উপস্থিতি

বেশি শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এমতাবস্থায়, এমনকি মিশরের মতো দেশেও জনমত যেন সাদ্দামের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে লাগল। আরববিশ্বের যারা কোয়ালিশনে অংশ নিয়েছিল, তারা তাদের অবস্থান বদলাতে শুরু করল।[১৭] ১৯৯২ সালে মিশর ও সিরিয়াসহ অন্যান্যরা দক্ষিণ ইরাকে বিমান-উড্ডয়ন বাধানিষেধের বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১৯৯৩ সালে সৌদিআরব ও তুরস্ক ইরাকের বিরুদ্ধে বিমানহামলার বিরোধিতা করে। যদি পশ্চিমাবিশ্ব সুন্নি মুসলমান কর্তৃক শিয়া ও কুর্দিদের উপর বিমানহামলায় ব্যবহৃত হয়, তাহলে অর্থোডক্স সার্বীয়দের দ্বারা বসনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থে কেন তারা বিমানশক্তি ব্যবহার করেনি? ১৯৯৩ সালের জুন মাসে যখন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট বুশ-এর জের ধরে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইরাকে বিমানহামলার নির্দেশ দেন, তখন কিন্তু তার বিশ্বপ্রতিক্রিয়া 'সভ্যতার ধারায়' প্রতিফলিত হয়।

ইসরায়েল ও পশ্চিম-ইউরোপ বিমানহামলার এ ঘোষণাকে জোরালো সমর্থন দিল। রাশিয়া স্বার্থরক্ষার জন্য এ-কাজকে যুক্তিযুক্ত মনে করল। চীন এটিকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে চাইল। সৌদিআরব ও গাল্ফ-এর আমিরাতের দেশগুলো কোনো ধরনের মন্তব্য জানাল না। অন্যান্য মুসলমান দেশ, যেমন মিশর এ ঘটনার বিরোধিতা করে জানান যে, এটি পাশ্চাত্যের দ্বৈতনীতিরই উদাহরণ। ইরাক বলল যে, এটি 'জাজ্বল্যমান আগ্রাসন' যা মার্কিনের দ্বারা পরিচালিত একটি 'নয়া আগ্রাসী ও স্বার্থপরতামূলক তৎপরতা' বিশেষ।[১৮] বারবার জিজ্ঞাস্য হতে লাগল, কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাশক্তি (আন্তর্জাতিক শক্তিধর সম্প্রদায়) সমরূপ কার্যকলাপের জন্য (জাতিসংঘের ঘোষণা অমান্য করা) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা দেখায়?

সুতরাং, গাল্ফযুদ্ধ ছিল শীতলযুদ্ধোত্তর প্রথম সম্পদশালী সভ্যতাসমূহের মধ্যে যুদ্ধ। প্রশ্ন দেখা দেয় : পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ তেলমজুদক্ষেত্রটি কি পশ্চিমাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সৌদিআরব নিয়ন্ত্রণ করবে? কেননা তাদের নিরাপত্তার জন্য এটি প্রয়োজন, নাকি পশ্চিমাশক্তিবিদ্বেষী স্বাধীন সরকারগুলো তা নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে 'তেল অস্ত্র' হিসেবে পশ্চিমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। পশ্চিমাশক্তি সাদ্দামকে উৎখাতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা গাল্ফ-এলাকায় তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর উপস্থিতিকে একটি স্থায়ীরূপ দিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইরাক, ইরান এবং গাল্ফ সহযোগিতা কাউন্সিল এবং যুক্তরাষ্ট্র সমন্বিতভাবে গাল্ফ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করলেও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তা একচেটিয়াভাবে মার্কিন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

ফাটলরেখা বরাবর সংঘটিত যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

বংশ, গোত্র, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় জাতির মধ্যে যুদ্ধ পৃথিবীর সভ্যতার গোড়া থেকে অদ্যাবধি সবসময়ই সংঘটিত হয়েছে, কেননা এ সমস্ত বিষয় সর্বত্র এবং সকল সময়ে মানুষের আত্মপরিচয়ের শেকড় বা মূল হিসেবে কাজ করে থাকে। এসব সংঘাত বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে থাকে, এ কারণে তা বৃহত্তর ও প্রত্যক্ষভাবে অংশ-না-নেয়া মানুষের মতাদর্শিক অথবা রাজনৈতিক ইস্যুকেন্দ্রিক হয় না, যদিও সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলোর

বাইরে এর একটি মানবিক উৎকণ্ঠা অবশ্য থাকে। এ সংঘাতগুলো কলুষিত এবং রক্তাক্তও হয়ে পড়ে, কেননা সেখানে জড়িত থাকে পরিচয়ের মতো মৌল প্রশ্নাদি। তদুপরি এ-ধরনের সংঘাত হয় দীর্ঘস্থায়ী; হয়তো কখনও কখনও সমঝোতা বা চুক্তির মাধ্যমে তা মীমাংসিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, এ সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী; তাই পুনরায় তা শুরু হতে বিলম্ব হয় না। একপক্ষীয় সামরিক আধিপত্য ও শক্তিসামর্থ্যের মাধ্যমে তার সমাপ্তি হলেও সেখানে ঘটে যায় গণহত্যা ও অন্যান্য মানবতাবিরোধী কার্যক্রম।[১৯]

ফাটলরেখাসম্পৃক্ত যুদ্ধ মূলত বিভিন্ন সভ্যতার পরিচয়ে পরিচিত রাষ্ট্র, গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ফাটলরেখা সম্পর্কিত যুদ্ধ সবসময়ই সহিংস আকারের হয়ে থাকে। এ-ধরনের যুদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হতে পারে, আবার বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতরও হতে পারে। একই দেশের অভ্যন্তরেও ফাটলরেখাসমৃদ্ধ যুদ্ধ হতে পারে, রাষ্ট্র যদি সেখানে ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন পৃথক পৃথক এলাকা গঠিত দ্বারা হয়। এমতাবস্থায়, যে গোষ্ঠী সরকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, সাধারণত সেই গোষ্ঠী স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জন না-করা পর্যন্ত যুদ্ধ ও সংঘাত স্থায়ী হয়ে থাকে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে এ-ধরনের যুদ্ধ হয়, যদি সেখানে ভৌগোলিকভাবে মিশ্রপ্রকৃতির জনগোষ্ঠী থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, মালয়েশিয়ায় চীনা ও মালয়া জনগোষ্ঠীয় মধ্যকার সংঘাত, অথবা সর্বশক্তি নিয়ে সংঘটিত যুদ্ধ; যখন তা নতুন রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে বেধে যায়, কিংবা কোনো জনগোষ্ঠীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করতে চাওয়া হয়।

ফাটলরেখাজাতীয় যুদ্ধ অনেক সময় জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে শুরু হতে পারে। তবে সাধারণত ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে গিয়েই এ-ধরনের যুদ্ধ হয়ে থাকে। ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, সাধারণত একটি শক্তি কর্তৃক ভূখণ্ড বিজিত হয়। বিজয়ীশক্তি বিরোধী জনগণকে জোরপূর্বক বহিষ্কার করে, হত্যা করে, অথবা দুটি কাজই করে থাকে, যাকে বলা হয় 'এথনিক ক্লিনজিং'। এ-ধরনের সংঘাত হয় সহিংস, নৃশংস এবং কদর্যপূর্ণ। উভয়পক্ষই ব্যাপক ধ্বংসলীলা, সহিংসতা, ধর্ষণ এবং জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

ভূখণ্ডের দাবিদাররা দায়দায়িত্ব পেলে শুধু সেই ভূখণ্ড তাদের নিজেদের মনে করে, মনে করে এটি তাদের জন্য 'পবিত্র ভূমি', এর সঙ্গে তারা নিজেদের গোত্রগত পরিচয় একাত্ম করে দেখে থাকে। এমন যৌক্তিকতা, কাশ্মীর, পশ্চিমতীর, নাগারনো কারাবাক, ড্রিনা উপত্যকা, কসোভোতে দেখতে পাওয়া যায়।

ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করলেও তার সকল বৈশিষ্ট্য এখানে দেখতে পাওয়া যায় না। এ-ধরনের সংঘাত সাধারণত দীর্ঘসূত্রতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যখন এ-ধরনের যুদ্ধ একই দেশের অভ্যন্তরে ঘটে থাকে, তখন তা আন্তঃরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের চাইতে প্রায় ৬ গুণ বেশি সময় নেয়। যেহেতু এ যুদ্ধের মূল বিষয় থাকে মৌল ইস্যু তথা গোষ্ঠীগত পরিচয় ও ক্ষমতা-সংক্রান্ত; সেহেতু, তা আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠে

না। যখন কোনোপ্রকার সমঝোতার মধ্যে আসতে চাওয়া হয়, তখন কোনো পক্ষই কিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকে না, এজন্য যদিও কখনও কখনও কোনো সমঝোতা অর্জিত হয়, তা মোটেই স্থায়িত্ব পায় না। ফাটলরেখা সংযুক্ত যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু পুনরায় শুরু হয় (Off-again-on-again)। সাধারণত এ-ধরনের যুদ্ধে থাকে ব্যাপক সহিংসতা, আর কিছু সময়ের জন্য তা নিঃশব্দ হয়ে থাকে, কিন্তু তুষের আগুনের মতো হিংসাবিদ্বেষ ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে, তাই পুনরায় তা সময়সুযোগমতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। এ-ধরনের যুদ্ধে গণহত্যা থাকে নিত্যসঙ্গী। দীর্ঘসূত্রিতাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে ফাটলরেখাসম্পন্ন যুদ্ধে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের ন্যায় প্রচুর হত্যালীলা সংঘটিত হয়। চলে বিপুল মাত্রায় শরণার্থীকরণ। উদাহরণ হিসেবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কিছু চিত্র তুলে ধরা যায় : ১৯৯০-এর দশকে ৫০,০০০ ফিলিপাইনে, শ্রীলঙ্কায় ৫০,০০০-১,০০,০০০, কাশ্মীরে ২০,০০০, সুদানে ৫,০০,০০০-১.৫ মিলিয়ন, তাজাকিস্তানে ১,০০,০০০, ক্রোয়েশিয়ায় ৫০,০০০, বসনিয়ায় ৫০,০০০-২,০০,০০০, চেচনিয়ায় ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০, তিব্বতে ১,০০,০০০, পূর্ব তিমুরে ২,০০,০০০ হত্যা ঘটেছে।[২০] স্বভাবতই এ-ধরনের ক্ষেত্রে প্রচুরসংখ্যক মানুষ শরণার্থী হয়ে যায়। ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী এবং পুনঃপুনঃ সংঘটিত হয়। যেমন সুদানের সহিংসতা শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সালে এবং এটি চলমান ছিল ১৯৭২ সাল অবধি, যখন দক্ষিণ সুদানিদের জন্য একধরনের স্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সহিংসতা আবার ১৯৮৩ সালে শুরু হয়ে যায়। ১৯৯১ সালে শান্তিচুক্তির ভেতর দিয়ে শেষ হলেও পুনরায় ১৯৯৪ সালে শুরু হয়ে যায়। ১৯৯৫ সালে অস্ত্রবিরতির একটি চুক্তি সেখানে অর্জন করা গেলেও, এর চার মাস পর, আগ্রাসী ব্যাঘ্ররা শান্তিচুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়, এবং এর ফলে যুদ্ধ পুরোমাত্রায় আবার শুরু হয়ে যায়।

ফিলিপাইনে মোরো বিদ্রোহীরা ১৯৭০-এর দশকে সহিংসতা শুরু করে, ১৯৭৬ সালে একটি চুক্তির ভেতর দিয়ে তা প্রশমিত হয় মিরডানা ও এর কিছু এলাকায় স্বায়ত্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে সেখানে সহিংসতার পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদ্রোহীরা শান্তি-আলোচনায় আসতে অস্বীকার করে চলেছে। রুশ এবং চেচনীয় নেতারা অসামরিকীকরণমূলক একটি চুক্তিতে ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে পৌঁছলেও, পুনরায় সেখানে সহিংস যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যখন চেচনিয়রা রুশ এবং রুশপন্থী নেতাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। ফলে, ১৯৯৬ সালে সেখানে ব্যাপকভাবে রুশ-আক্রমণ শুরু হয়ে যায়।

প্রথমত, ফাটলরেখাসম্বলিত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেখানে থাকে চরম মাত্রায় সহিংসতা, মতাদর্শিক দ্বৈততাও থাকে অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের মতো পুরোমাত্রায়। তবে, এদের মধ্যে দুটো বিষয়ে পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় : প্রথমত, সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ সাধারণত নৃ-গোষ্ঠীক, ধর্মীয়, বর্ণবাদী, ভাষাগত বিষয় ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়। ধর্ম যেহেতু সভ্যতার পরিচয়ের প্রধানতম মানদণ্ড, সেহেতু ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ প্রায়শই সংঘটিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে। কোনো কোনো বিশ্লেষক এ মাত্রাটিকে খাটো করে দেখতে চান।

তারা বলতে চান যে, মানুষ নৃগোষ্ঠীক পরিচয় ও ভাষার মধ্যে অংশীদারিত্ব আনতে পারে। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, আন্তঃসভ্যতা বিবাহ, যেমন সার্বীয় ও বসনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে ঘটা ধর্মীয় মতপার্থক্য ফ্রয়েডীয় 'আত্মরতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পার্থক্য'[২১] দূর করা সম্ভব। এই বিচার অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার আদলে গড়া একটি অদূরদর্শীর মতামতের মতো। কেননা হাজার হাজার মানবইতিহাস বলে যে, ধর্মীয় পার্থক্য কোনোমতেই কোনো ক্ষুদ্র পার্থক্যের মধ্যে পড়ে না, বরং তা হল, মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের পার্থক্য। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কারণ তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে ভিন্নতা থেকে সৃষ্ট যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ; বিশেষ বিষয়মুখী হয়ে থাকে, এবং কার্যত আপেক্ষিকভাবে তা অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর মধ্যে তেমন বেশি ছড়িয়ে পড়ে না। বিপরীতভাবে, ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ এমন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত হয়, যেসব গোষ্ঠী বৃহত্তর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অংশবিশেষ। সাধারণ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে যেমন ধরা যাক গোষ্ঠী নং 'ক' গোষ্ঠী নং 'খ'-এর সঙ্গে যুদ্ধরত এবং গোষ্ঠী নং 'গ' এবং 'ঘ' এবং 'ঞ' এর কোনো কারণেই যুদ্ধে জড়িত হবে না যদি-না গোষ্ঠী নং 'ক' বা গোষ্ঠী 'খ' প্রত্যক্ষভাবে গোষ্ঠী নং 'গ' 'ঘ' এবং 'ঞ'-কে আক্রমণ করে। কিন্তু ফাটলরেখাসম্পৃক্ত যুদ্ধে, বিপরীতভাবে গোষ্ঠী নং 'ক' ১ ধরা যাক গোষ্ঠী নং 'খ' এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় উভয় গোষ্ঠী কিন্তু তাদের নিজ নিজ সভ্যতার লাইনে তথা আত্মীয়কুল পরিচয়, বংশ ইত্যাদি সমর্থক খুঁজবে। যেমন তখন তা হয়ে উঠবে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত বা গোষ্ঠী 'ক২' 'ক৩' 'ক৪' এবং 'খ২' 'খ৩' 'খ৪' এবং এসব গোষ্ঠী তাদের আত্মপরিচয়ের গোষ্ঠী হিসেবেই যুদ্ধে নেমে পড়বে। যোগাযোগ ও যাতায়াত মাধ্যমের দ্রুতগতি ও সহজলভ্যতা প্রকারান্তরে ফাটলরেখাসমৃদ্ধ যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেবার কাজ সহজ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন করে দিয়েছে। এভাবে ফাটলরেখার যুদ্ধ অতিদ্রুত 'আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ' করে থাকে।

বিশ্বের বর্তমান সাধারণ গতির সুবিধার কারণে ফাটলরেখায় অবস্থিত গোষ্ঠীগুলোর অন্যান্য বহিঃভাগে অবস্থিত তাদের আত্মীয়কুল এবং নৃগোষ্ঠীক ভাগীদারগণ তাদের নৈতিক, কূটনৈতিক, আর্থিক এবং বস্তুগত সমর্থন প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্কিত এই 'সংশয়সম্পন্ন যুদ্ধ ও সংঘাত' স্থায়ী ও সফল করার পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। এই 'কিন্ কান্ট্রি সিনড্রম' (Kin-country syndrome)-কে গ্রিনওয়েস আখ্যায়িত করেছেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে।[২২] সাধারণ, এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সহিংসতা ও আন্তর্জাতিকভাবে আন্তঃসভ্যতার সংঘাতের মতো রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। ১৯৯৫ সালে করাচিতে যখন একজন সুন্নি জেনারেল ১৮ মুসুল্লি হত্যা করলেন, তখন পাকিস্তান খুবই বেকায়দার মধ্যে পতিত হয়েছিল। হেবরনের প্যাট্রিয়ার্ক গুহায় প্রার্থনারত ২৯জন মুসলমানকে যখন ১৯৯৪ সালে একজন ইহুদি হত্যা করেছিল, তখন সে ঘটনা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কার্যত তা মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বশান্তির পক্ষে মারাত্মক পরিণতি ডেকে এনেছিল।

ঘটনাপ্রবাহ : ইসলামের রক্তাপ্লুত সীমানাচিহ্ন

সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও ফাটলরেখা বরাবর সংঘটিত যুদ্ধসমূহ ইতিহাসের উপাদান বিশেষ। এক হিসাবে দেখা যায়, শীতলযুদ্ধাবস্থায় এমন নৃগোষ্ঠীগত যুদ্ধ অন্ততপক্ষে বিশ্বে ৩২টি ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে আরব এবং ইসরায়েল, ভারত ও পাকিস্তান, সুদানি মুসলমান ও খ্রিস্টান, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ এবং তামিল, লেবাননের শিয়া ও মেরোনিটিস্‌দের মধ্যে হওয়া ফাটলরেখা সম্বলিত যুদ্ধ। পরিচিতি সম্পর্কিত যুদ্ধ যা 'সিভিল যুদ্ধের' প্রায় সমগ্র যুদ্ধের অর্ধেক পরিমাণ, এবং তা ১৯৪০-এর দশক ১৯৫০-এর দশকে ঘটেছে। কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ সিভিল যুদ্ধ যা পরবর্তী দশকগুলোতে সংঘটিত হয়েছে (১৯৫০-১৯৮০) তাতে নৃগোষ্ঠীক পরিচয়-সম্পৃক্ততা ছিল প্রবল। তবে, শীতলযুদ্ধের কারণে এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রবল দ্বন্দ্বের মধ্যে, এগুলো তেমন প্রচার পায়নি, অর্থাৎ অবস্থা ছিল অনেকটা প্রায় সূর্যের নিচে প্রদীপের আলোর মতো নিষ্প্রভ। শীতলযুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘাত চাঙা হয়ে ওঠে। নৃগোষ্ঠীক চেতনাসমৃদ্ধ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত সংঘাত একের-পর-এক ঘটতে দেখা যায়।[২৩] এ-ধরনের নৃগোষ্ঠীক এবং ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ কিন্তু পৃথিবীর সকল সভ্যতার বেলায় সমানভাবে হয়নি। প্রধান প্রধান ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ ঘটেছে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ার সার্বীয় ও ক্রোয়েটদের মধ্যে, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে এবং এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য স্থানে মুসলমান-অমুসলমানদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কম-সহিংসসম্পন্ন যুদ্ধ ঘটেছে। প্রধান প্রধান অধিকাংশ ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত হতে দেখা গেছে ইউরেশিয়া ও আফ্রিকায়, যেখানে সীমানা দ্বারা মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যরেখা টেনে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈশ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে সংঘাত ঘটেছে পাশ্চাত্য এবং অবশিষ্টের ভেতর। স্থানীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণে দেখা যায়, তা ঘটেছে মূলত ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে।

ব্যাপক শত্রুভাবাপন্ন সহিংস সংঘাত হতে দেখা গিয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে। বসনিয়ায় মুসলমানেরা একটি চরম বিপর্যয়পূর্ণ এবং রক্তাক্ত সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল, অর্থোডক্স সার্বদের সঙ্গে আবার তারা ক্রোয়েশিয়ার ক্যাথলিকদেরও সংঘাতেরও মুখোমুখি হয়েছিল। কসোভোতে আলবেনীয় মুসলমানেরা সার্বীয় শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে সমান্তরালভাবে একটি গোপন সরকার গঠন করে, এতে করে উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে ঘটতে থাকে চরম সহিংসতা। আলবেনীয় এবং গ্রিক সরকার উভয় দেশেই তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন। তুর্কি এবং গ্রিসীয়রা ঐতিহাসিকভাবে একে অপরের তরবারির নিচে মাথা দিয়ে রয়েছে। সাইপ্রাসে মুসলমান তুর্কি এবং অর্থোডক্স গ্রিকরা লাগালাগি বিবাদমান রাষ্ট্র গঠন করে রেখেছে। ককেসাসে তুর্কি এবং আর্মেনীয়রা ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরের শত্রু এবং আজেরিসে (Azeris) আর্মেনীয়রা নাগারনো-কারাবাগে যুদ্ধরত রয়েছে।

উত্তর ককেসাসে প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ চেচেন, ইংগুইস ও অন্যান্য মুসলমানগণ স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে মে মাসে যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ইংগুইস এবং অর্থোডক্স ওসেটিনাসদের মধ্যেও যুদ্ধ লেগে রয়েছে। ভলগা এলাকায় মুসলমান তাতারগণ রুশদের বিরুদ্ধে ১৯৯০-এর দশকে সংগ্রামে লিপ্ত

হয় এবং সীমিত সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করে মোটামুটি একটি সমঝোতা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী রাশিয়া সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমান জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায়ে ধীরে ধীরে সেখানে শক্তি প্রয়োগ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে আফগান এবং রাশিয়ার যুদ্ধ ছিল একটি প্রধান যুদ্ধ, সেখানে রাশিয়ার পরাজয়ের পর তাজিকিস্তানে ইসলামি পুনরুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে রুশবাহিনী নিয়োগ করা হয়। জিনজিয়াং এবং ইউগার্স এবং অন্যান্য মুসলমানগোষ্ঠী অত্র এলাকার মুসলমানদের চীনাকরণ প্রক্রিয়া ও তাদের নৃ-জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে রাশিয়ার আগ্রাসী তৎপরতা থেকে রক্ষার নিমিত্তে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ভারত তিনটি যুদ্ধে লড়েছে, একটি মুসলমানগোষ্ঠী ভারতের কাশ্মীরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ে চলেছে। আসামে মুসলমান অভিবাসীরা উপজাতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, ভারতের অনেক এলাকায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ-ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদ উত্থানের দ্বারা মদদপ্রাপ্ত হচ্ছে; উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলবাদী তৎপরতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধসম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ওপর অভিযোগ এনেছে, মায়ানমারে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে।

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় নিয়মিতভাবে চীনাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে; এবং সেসঙ্গে তারা তাদের অর্থনীতির ওপর চীনাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চলেছে। থাইল্যান্ডে মুসলমানগোষ্ঠী জোরালোভাবে বৌদ্ধধর্মপন্থী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। দক্ষিণ ফিলিপাইনে একটি ইসলামি পুনঃজাগরণ আন্দোলনকারীরা স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছে, আর তা করছে ক্যাথলিক সরকারের বিরুদ্ধে। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে ক্যাথলিক জনগণ অত্যাচারী মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত পূর্বের পর্যায়ে, অর্থাৎ ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের শুরুর দিকের মতো সংঘাতে রূপ নিয়েছে। ইসরাইল ইস্যুতে সেখানে ৪টি যুদ্ধ আরব ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। প্যালেস্টাইনীয়রা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইনটিফাদামূলক (Intifada) অবস্থান গ্রহণ করেছে। লেবাননে মেরনাইট খ্রিস্টানগণ শিয়াইট ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। ইথিওপিয়ায় অর্থোডক্স 'আমহারাস' ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের দমন করে আসছে এবং এভাবে সেখানে তারা মুসলমান 'ওরোমোরস'-এর দ্বারা প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। আফ্রিকার উত্তরের আরব ও মুসলমানদের সঙ্গে দক্ষিণের খ্রিস্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই রয়েছে। সুদানে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত যুদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছে। নাইজেরিয়ার রাজনীতিও সংঘাতপূর্ণ; সেখানে উত্তরাঞ্চলের (মুসলমান) 'ফুলানি-হাউসা' এবং দক্ষিণের খ্রিস্টান উপজাতির মধ্যে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চাদ, কেনিয়া এবং তানজানিয়ায় মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই রয়েছে।

ওইসব স্থানে মুসলমান ও খ্রিস্টান সভ্যতার ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স, হিন্দু, চীনা, বৌদ্ধ, ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সংঘাতপূর্ণ; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সহিংসতাপূর্ণ। মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, তারা সম্ভবত শান্তিপূর্ণভাবে অন্যান্য সভ্যতা ও প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাসে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় : মুসলমান এবং অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কি অন্যান্য সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের বেলাতেও প্রয়োজন? বস্তুত, তা নয়। মুসলমানেরা বিশ্ব-জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশীদার, কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বে সংঘটিত, আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে তাদের অংশীদারিত্ব অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি।

১. ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে সংঘটিত নৃগোষ্ঠীগত সংঘাতের ৫০টির মধ্যে মুসলমানেরা ২৬টিতে অংশ নিয়েছিল। বিষয়টি গভীরভাবে টেড রবার্ট গুড় (টেবিল ১০.১) কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর যার মধ্যে ১৫টিই ছিল মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে। দেখা যায়, ওই সময়ে অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চেয়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত তিনগুণ বেশি। মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত অভ্যন্তরীণ সংঘাতের মাত্রাও কিন্তু অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় বেশি। ইসলামের তুলনায় পশ্চিমাবিশ্ব মাত্র দুইটি আন্তঃসভ্যতা-বহির্ভূত ও দুইটি আন্তঃসভ্যতা-সম্পৃক্ত সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। গুড়ের হিসেব মোতাবেক ৬টি যুদ্ধের ভেতর ২,০০,০০০ বা তারও অধিক প্রাণহানি ঘটেছে সুদান, বসনিয়া, পূর্ব তিমুর-এর মধ্যে—তিনটিই ছিল মুসলমান-অমুসলমান সংঘাত; দুইটি (সোমালিয়া, ইরাক-কুর্দি) মুসলমান-মুসলমান সংঘাত এবং মাত্র একটি (এঙ্গোলা) ছিল অ-মুসলমান সংক্রান্ত সংঘাত।
২. ১৯৯৩ সালে 'দি নিউইয়র্ক টাইমস' ৪৮টি এলাকা চিহ্নিত করে, যেখানে দেখা যায় ৫৯টি দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছে। এর প্রায় অর্ধেকটিতেই মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে বা অমুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ৫৯টি সংঘাতের ভেতর ৩১টি সংঘাত ঘটেছে মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন সভ্যতার ভেতরে। গুড়ের প্রদত্ত তথ্যের সমান্তরাল, দুই-তৃতীয়াংশ (২১টি) সংঘাত ছিল মুসলমান ও অন্যান্যদের মধ্যে (টেবিল ১০.২)।

টেবিল নং ১০.১

নৃগোষ্ঠীগত রাজনৈতিক সংঘাত, ১৯৯৩-১৯৯৪

	সভ্যতাবহিঃর্ভূত	আন্তঃসভ্যতা সম্পৃক্ত	সমগ্র
ইসলাম	১১	১৫	২৬
অন্যান্য	১৯*	৫	২৪
সমগ্র	৩০	২০	৫০

* ১০টি ছিল আফ্রিকার উপজাতি সংঘর্ষ।

Source : Ted Robert Gurr, "Peoples Against State : Ethnopolitical. Conflict and the Changing World System," *International Studies Quarterly,* Vol 38 (September 1994) PP 347-78. I have used Gurr's classification of conflicts except for shifting the Chinese-Tibetan conflict, which he classifies as noncivilizational into the intercivilizational category, since it clearly is a clash between Confucian Han Chinese and Lamaist Buddhist Tibetans.

টেবিল নং ১০.২

নৃগোষ্ঠীক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, ১৯৯৩

সভ্যতাবহির্ভূত	আন্তঃসভ্যতা	মোট
ইসলাম - ৭	২১	২৮
অন্যান্য - ২১*	১০	৩১
সর্বমোট - ২৮	৩১	৫৯

* এর মধ্যে ১৯টি ছিল আফ্রিকার উপজাতি সংক্রান্ত সংঘাত।

Source : *New York times*, Feb.-7, 1993, PP-1, 14.

তিন ধরনের জটিল উপাত্ত মোটামুটিভাবে প্রায় একধরনের ফলাফল দিয়েছে : ১৯৯০-এর দশকের প্রারম্ভে মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে সংঘাতে বেশি ব্যস্ত ছিল। তারপর তারা অমুসলমানদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ আন্তঃসভ্যতা যুদ্ধই কিন্তু মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। মুসলমানদের সীমান্ত ছিল রক্তাক্ত, আর এটি হল তার অভ্যন্তরীণ মর্মকথা।*

মুসলমানদের সহিংসপ্রবণতা তাদের সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে ইসলামি দেশের সামরিক শক্তির গড় (অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জনসংখ্যার কতজন) এবং সামরিক বাহিনীর সম্পদ (সামরিক বাহিনীর সংখ্যা ও দেশের সম্পদের গড়পড়তা হিসাব) দুটোই কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ছিল অতি উচ্চ। বিপরীতভাবে খ্রিস্টীয় অন্যান্য দেশের অনুপাতে জনসংখ্যার তুলনায় সামরিক বাহিনীর জনবল ছিল নিম্নহারে। খ্রিস্টীয় দেশের তুলনায় মুসলমানদেশে এ হার ছিল প্রায় দ্বিগুণ (টেবিল নং-১০.৩)। জেমস পাইক বলেন, 'খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, ইসলামের সঙ্গে সামরিকত্বের একটি সংযোগ রয়েছে।'[২৫]

* কোনো একক বক্তব্য আমার (হানটিংটনের) *Foreign Affirs* প্রবন্ধে সংযুক্ত করা হয়নি যা কিনা "ইসলামের সীমানা রক্তাক্ত-এর চাইতে অধিক কঠিন।" আমি (হানটিংটন) এই মন্তব্য করেছি, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ওপর পরিচালিত একটি সাদামাটা গবেষণা ও জরিপের ওপর ভিত্তি করে, যার ভিত্তি ছিল গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মুখফেরানো উৎস থেকে নেয়া। অথচ, এগুলোর তাৎপর্য ও যথার্থতা রয়েছে।

টেবিল নং ১০.৩
মুসলমান ও খ্রিস্টীয় দেশে সামরিকত্ব

	গড় অনুপাত (সৈন্য সংখ্যার গড়)	গড় (সামরিক সম্পদ)
মুসলমান দেশ (এন = ২৫)	১১.৮	১৭.৭
অন্যান্য দেশ (এন = ১১২)	৭.১	১২.৩
খ্রিস্টীয় দেশ (এন = ৫৭)	৫.৮	৮.২
অন্যান্য দেশ (এন = ৮০)	৯.৫	১৬.৯

Source : James L Payc, *Why Nations Arms* (Oxford : Basil Blackwell, 1989) pp 125, 138-139. Muslim and Christian countries are those in which more than 80 percent adhere to the defining religion.

মুসলমানদেশসমূহ সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহিংসতা ও সংকটের অন্যতম উৎস; ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ১৪২টি আন্তর্জাতিক সংকটের ৭৬টি ছিল মুসলমান-সংক্রান্ত। ২৫টি ঘটনার মধ্যে সহিংসতা ছিল সংকটের প্রাথমিক পর্যায়; ৫১টি সংকটে মুসলমানদেশগুলো অন্যান্য উপায়ের সঙ্গে সহিংসতা আরম্ভ করেছিল। যখন তারা সহিংসতা শুরু করে, তখন তারা তা খুব জোরের সঙ্গেই করে থাকে। শতকরা ৪১ ভাগ ক্ষেত্রে তারা সহিংসতার পূর্ণমাত্রা ব্যবহার করেছে, তাছাড়া শতকরা ৩৮ ভাগ ক্ষেত্রে তারা সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। যখন মুসলমানদেশগুলো শতকরা ৫৩.৫ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতা আশ্রয় নেয় তখন যুক্তরাজ্য মাত্র ১১.৫ ভাগ ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭.৯ ভাগ ক্ষেত্রে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন শতকরা ২৮.৫ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতার পথ অবলম্বন করেছিল। প্রধান শক্তিগুলোর ভেতর কেবলমাত্র চীনের সহিংসতা মুসলমানদের সহিংসতা ছাড়িয়ে যায়। তারা শতকরা ৭৬.৯ ভাগ ক্ষেত্রে সহিংসতা প্রয়োগ করেছে।[২৬] বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানদের মারমুখো এবং সহিংস প্রবণতাকে কোনো মুসলমান অথবা অমুসলমানের পক্ষেই অস্বীকার করার জো নেই।

কারণসমূহ : ইতিহাস, জনসংখ্যাসংক্রান্ত নীতি ও রাজনীতি

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ এবং সেক্ষেত্রে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের পশ্চাতে কী কারণ থাকতে পারে? প্রথমত, এ-ধরনের যুদ্ধের বিষয় মুসলমানদের শেকড়ের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত রয়েছে। থেমে থেমে ঘটে যাওয়া ফাটলরেখা বরাবর বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে যুদ্ধ অতীতেও বারবার সংঘটিত হতে দেখা গেছে, যা কিনা অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের জন্য নিয়ে এসেছে ভয়ভীতি ও চরম অনিশ্চয়তা। পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমান ও হিন্দু, উত্তর ককেসাসে রুশ ও ককেশীয়, ট্রান্স ককেসাস এলাকায় আর্মেনীয় ও তুর্কিরা, প্যালেস্টাইনে আরবীয় ও ইহুদিগণ; ক্যাথলিক, মুসলমান, বলকান এলাকায় অর্থোডক্স; সেন্ট্রাল ইউরোপ ও বলকান এলাকায় তুর্কি ও রুশ; সিংহলী এবং তামিলগণ শ্রীলঙ্কায়, আরবীয় এবং

কৃষ্ণবর্ণের মানুষজন আফ্রিকায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। এ-ধরনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধ শতাব্দী ধরেই চলে এসেছে, যার ভিত্তি হল অসহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আর তা একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের বদলে সহিংসতার ভেতর দিয়ে সংঘাতময় সম্পর্ক তৈরি করেছে। একটি ঐতিহাসিক লিগ্যাসি যেন প্রস্তুত রয়েছে, যারা এ-ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় তারা যেন খুব সহজেই তা করে ফেলতে পারে। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই ইতিহাস জীবন্ত থাকছে ও এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তা আতঙ্কিতভাবেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে।

'বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যেন' 'পুনরায় বন্ধ হও এবং আবার কসাইখানা শুরু হও' (Off-again on again slaughter) ধরনের সহিংসতার ইতিহাস কেন এমন হল তা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। মোটের ওপর কেউ কেউ বলতে চান যে, সার্বীয়, ক্রোয়াট, এবং মুসলমানগণ দশকের-পর-দশক ধরে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে যুগোস্লাভিয়ায় বসবাস করে আসছিল। মুসলমান এবং হিন্দুগণ ভারতে শান্তিতে বসবাস করছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক নৃগোষ্ঠীক মানুষ থাকলেও সেখানে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল, যদিও সোভিয়েট-সরকার কর্তৃক খুব সামান্য অথচ উল্লেখযোগ্য কিছু অশান্তির ঘটনা সেখানে ঘটেছে। বিষুবরেখা অঞ্চলের স্বর্গখ্যাত শ্রীলঙ্কা দ্বীপে তামিল এবং সিংহলীগণ সুখে শান্তিতেই ছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ইতিহাস ওইসকল শান্তি-সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা বেশিদিন ধারণ করে রাখতে পারেনি। 'শান্তি' কার্যত 'অশান্তির' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, কেন তেমন ঘটল, ইতিহাস নিজে তা ব্যাখ্যা করতে অপারগ। নিশ্চয়ই এমনকিছু ঘটনা ও উপকরণ অবাঞ্ছিতভাবে এসে গেছে, যার জন্য এমন কিছু ঘটে চলেছে।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধিজনিত বিষয়টি এখানে অন্যতম বিবেচ্য। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা অন্য একটি গোষ্ঠীর আপেক্ষিক জনসংখ্যা হ্রাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে থাকে এবং সেসব চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গ্রুপগুলোর ভেতর প্রতিরোধকজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল এ অবস্থায় সামরিক শক্তির মধ্যেও ভারসাম্য নষ্ট হয়। কেননা, অধিক জনসংখ্যাবৃদ্ধিপ্রবণ গোষ্ঠীর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী কম জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্য গোষ্ঠী, যদিও সে গোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে উন্নত ও গতিশীলতা সত্ত্বেও সামরিক চাপের মধ্যে পতিত হয়ে পড়ে।

১৯৭০-এর দশকে লেবাননের ত্রিশবৎসরব্যাপী চলমান সাংবিধানিক নির্দেশাবলি ভেঙে পড়ার পশ্চাতে সেখানে শিয়াপন্থী জনসংখ্যার তুলনায় মেরনাইট খ্রিস্টানদের জোটে নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। গ্যারি ফুলার-এর মতে শ্রীলঙ্কায় সিংহলীদের ১৯৭০-এর দশকের বিদ্রোহ এবং ১৯৮০-দশকে তামিলবিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে ১৫ বৎসর থেকে ২৪ বৎসর বয়সী জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক রয়েছে। ওই সময় জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ ছিল যুবক (১৫-২৪)[২৭] (দেখুন ফিগার ১০.১)। একজন মার্কিন কূটনীতিক সিংহলী বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেন যে, এটি ঘটেছিল ২৪ বৎসর বয়সীদের কারণে এবং তামিল টাইগার বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও অন্যভাবে তত্ত্বটি সত্য ছিল,

সেখানে ১১ বৎসর বয়সের বালক-বালিকারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল ১১ বৎসর বয়সী, খুব কমই ছিল ১৮ বৎসর বয়সের উপরে।

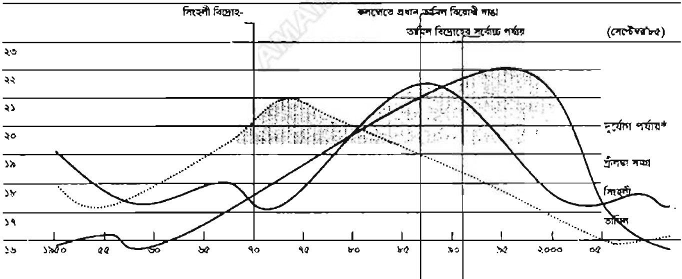
দি ইকোনোমিস্ট পত্রিকা বলে যে, 'টাইগারেরা ছিল কমবয়সী যোদ্ধা।'[২৭] একইভাবে দেখা যায়, রাশিয়ার ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধেও (রাশিয়ার দক্ষিণে ঘটেছিল রুশ এবং মুসলমানদের মধ্যে) জনসংখ্যার বয়স একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। ১৯৯০-এর দশকে সন্তান জন্মদানের মহিলাদের জন্য এ উর্বরতা রুশ-ফেডারেশনে ছিল শতকরা ১.৫ ভাগ, অন্যদিকে প্রাক্তন সোভিয়েট-অধীন সেন্ট্রাল এশিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এ হার ছিল প্রায় শতকরা ৪.৪ ভাগ। এজন্য সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিট হার ছিল ১৯৮০-এর দশকে রুশ-এলাকায় চেয়ে ৫ থেকে ৬ ভাগ বেশি। চেচনিয়ায় ১৯৮০-এর দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ২৬ ভাগ। চেচনিয়া ছিল তখনকার সময়ে রাশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল এলাকা, এর উচ্চজন্মহার প্রকারান্তরে অভিবাসী এবং যোদ্ধা সৃষ্টি করেছিল।[২৯]

একইভাবে মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে উচ্চজন্মহার কাশ্মীরে অভিবাসী বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সেখানে ভারতীয় শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে চলেছে।

ফিগার ১০.১

শ্রীলঙ্কা : সিংহলী ও তামিল যুবসংখ্যা

জনসংখ্যার মোট গড় হার : বয়স ১৫-২৪ বৎসর



* The critical level is the point at which youth make up 20 percent of more of the population.

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার আন্তঃসভ্যতার যুদ্ধের কিছু জটিল কারণ ছিল; আবার একথাও সত্য এ-যুদ্ধ অনেককিছুর জন্মও দিয়েছে। সম্ভবত এ-যুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কসোভোর জনসংখ্যাবিষয়ক পরিবর্তন। কসোভো ছিল সার্বীয় প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। এ-ধরনের মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশের অপ্রচলিত ক্ষমতা ছিল অনেক। তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৬১ সালে এখানে

জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ ছিল অর্থোডক্স সার্বীয়। আলবেনীয়দের জন্মহার ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং কসোভো শীঘ্রই যুগোশ্লাভিয়ার একটি অন্যতম ঘনবসতি এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৮০-এর দশকের ভেতর শতকরা ৫০ ভাগ আলবেনীয়র বয়স ছিল ২০ বৎসরের নিচে। এ কারণে এবং জীবিকার সন্ধানে অনেক অর্থোডক্স কসোভো ছেড়ে বেলগ্রেড বা অন্যান্য স্থানে পাড়ি জমায়। ফলে ১৯৯১ সালে কসোভোতে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ ছিল মুসলমান আর শতকরা ১০ ভাগ এসে দাঁড়ায় সার্বীয়।[৩০] সার্বিয়া কসোভোকে জেরুজালেমের মতো তাদের জন্য 'পবিত্র ভূমি' মনে করে থাকে। এ ছাড়াও ১৩৮৯ সালের ২৮ জুনের সেই বিখ্যাত যুদ্ধে তারা যখন তুর্কি অটোম্যানদের দ্বারা পরাজিত হয়, তখন থেকে প্রায় ৫ শত বৎসর তারা অটোম্যানদের দ্বারা শাসিত হয়।

১৯৮০ সালের শেষার্ধের ভেতর জনসংখ্যার ভারসাম্য পুরোপুরি আলবেনীয় মুসলমানদের দিকে চলে এলে তারা কসোভোকে যুগোশ্লাভিয়া একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মর্যাদাদানের দাবি জানায়। সার্বীয় ও যুগোস্লাভরা এর বিরুদ্ধে চলে যায়; তাদের ভয়ভীতি ছিল : কসোভো যদি এ অধিকার প্রাপ্ত হয়ে, তবে একদিন-না-একদিন কসোভো আলবেনিয়ার অংশ হয়ে যাবে।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে আলবেনীয়রা বিক্ষোভ ও দাঙ্গার মাধ্যমে তাদের দাবি বারবার জোরালোভাবে প্রকাশ করতে থাকে। সার্বীয়দের মতের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, নির্যাতন এবং সহিংসতার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। একজন ক্রোয়েশীয় বলেন, '১৯৭০-এর দশক থেকে কসোভোতে... অগণিত সহিংসতা চলছিল, যাতে সম্পত্তি ধ্বংস, লুটতরাজ, চাকুরিচ্যুতি, অপদস্থকরণ, ধর্ষণ, যুদ্ধ এবং হত্যা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। এর ফলে, সার্বীয়রা বলতে থাকে যে, তারা গণহত্যার শিকার হচ্ছে এবং তারা আরও জানিয়ে দেয় যে, এ অবস্থা তারা আর সহ্য করবে না।' ১৯৮৬ সালে সার্বিয়ার এ দাবিগুলো সেখানকার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় নেতাগণ এবং সামরিক কর্মকর্তা এবং প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'প্রাকসিস'-এর সম্পাদক প্রমুখ উত্থাপন করেন যে, সরকারকে অতিদ্রুত এই গণহত্যা বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

গণহত্যার যে-কোনো যৌক্তিক সংজ্ঞায় বলা যায়, এ অভিযোগ ছিল অতিরঞ্জিত। আলবেনিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল একজন সাংবাদিকের মতে, 'আলবেনীয় জাতীয়তাবাদীরা সার্বীয়ার সহিংস কার্যক্রম এবং সম্পত্তি কিছু ধ্বংস করেছে।'[৩১]

এ সবকিছুই কিন্তু সার্বিয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে একটি অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়, আর শ্লোভোদান মিলোসোভিচ এ সুযোগটি দেখতে পান। ১৯৮৭ সালে তিনি কসোভোতে একটি বক্তৃতার মাধ্যমে সার্বীয়দের ইতিহাস তুলে ধরেন ও ভূমিরক্ষার জন্য আবেদন জানান। এর পরই সার্বীয়রা কম্যুনিস্ট, অ-কম্যুনিস্ট এমনকি কম্যুনিস্ট-বিরোধীরাও তার চারপাশে ভিড় করতে শুরু করে। সেসঙ্গে তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা কসোভোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্বীয়দের অধিকার ও মানমর্যাদা রক্ষা করবে এবং আলবেনীয়দের উপর নির্যাতনসহ তাদেরকে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে ছাড়বে। মিলোসোভিচ শীঘ্রই একজন জাতীয়তাবাদী নেতায় পরিণত হন।[৩২] দুই

বছর পর, ১৯৮১ সালের জুন মাসে, মিলোসোভিচ কসোভো ফিরে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন ১ মিলিয়ন থেকে ২ মিলিয়ন সার্বীয়। তারা মুসলমানদের সঙ্গে ৬০০ বৎসর পূর্বেকার যুদ্ধের বৎসর উদ্‌যাপন করে তাদের জাতীয়তাবাদী ঐক্য ও চেতনা শাণিত ও আরও সুদৃঢ় করে তোলে।

সার্বীয়দের ভয়ে এবং তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আলবেনীয়রা পুনরায় বসনিয়ায় তাদের জনসংখ্যা নীতিতে পরিবর্তন আনে। ১৯৬১ সালে সার্বীয়রা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় ছিল শতকরা ৪৩ ভাগ, মুসলমান ছিল শতকরা ২৬ ভাগ। ১৯৯১ সালের মধ্যে বিপরীত চিত্র ফুটে ওঠে। সার্বীয় জনসংখ্যা শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৪ ভাগ। এই ত্রিশ বৎসরে ক্রোয়েশিয়ার জনসংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ থেকে শতকরা ১৭ ভাগে এসে দাঁড়ায়। একটি নৃগোষ্ঠী; অন্য নৃগোষ্ঠীকে বিতাড়িত ও নিশ্চিহ্ন করতে থাকে। একজন সার্বীয় যোদ্ধা ১৯৯২ সালে প্রশ্ন রাখেন, 'আমরা কেন শিশুদের হত্যা করছি?' উত্তর হল, 'কারণ কোনো একদিন তারা বড় হয়ে উঠবে, তাই আমরা আগে থেকেই তাদের শেষ করে দিচ্ছি।' এভাবেই মুসলমানদের জনসংখ্যার নীতি ও গতিপ্রকৃতির ওপর নির্মম প্রতিশোধের অগ্নি সেখানে জ্বলে ওঠে।

জনসংখ্যা নীতির পরিবর্তন এবং কার্যত যুবসংখ্যাধিক্য বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আন্তঃসভ্যতার মধ্যে সংগঠিত প্রায় শতকরা ২০ ভাগ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধের জন্য দায়ী। এটি অবশ্য এ-সম্পর্কিত সবকিছুকে ব্যাখ্যা করে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সার্বীয় ও ক্রোয়াটদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জনসংখ্যা নীতির কোনো সংস্রব ছিল না। তারা অতীত ইতিহাসে পরস্পরের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখেই বসবাস করে আসছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ক্রোয়েশীয়দের দ্বারা সার্বীয় হত্যা থেকেই সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে।

তাহলে বলা যায় : রাজনীতি সবসময়ই দ্বন্দ্বমুখর এবং রাজনীতি নিজেই দ্বন্দ্বের উৎস। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়, অটোম্যান, রুশসাম্রাজ্যের পতনের পর নৃগোষ্ঠীক এবং সভ্যতাসংক্রান্ত সংঘাত নতুন করে প্রাণ পায় এবং চাঙা হয়ে ওঠে। গজিয়ে ওঠা নতুন রাষ্ট্রসমূহ ছিল সেই সংঘাতের মূল কেন্দ্রভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানের পর ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ সাম্রাজ্য অবসানের পর একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। শীতলযুদ্ধাবসানের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ার পতন, আবারও একই ধরনের ফল বরং আরো জোরালো ও গতিশীলভাবে বয়ে আনল। জনগণ আর কোনোভাবেই নিজেদেরকে কম্যুনিস্ট বলে পরিচয় দিতে চাইল না; চাইল না বলতে যে তারা সোভিয়েট বা যুগোস্লাভ নাগরিক এবং তারা নতুন পরিচয় পেতে অত্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠল। এজন্য তারা হাতের কাছে পেল প্রাচীনকালের ধর্ম ও নৃগোষ্ঠীক অস্ত্র। কর্তৃত্বমূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া বক্তব্য, যেমন 'মর্তে বা স্বর্গে কোনো ঈশ্বর নেই', এমন বক্তব্য যা পাশ্চাত্যের উদারনীতির দ্বারা এগিয়ে নেয়া ধর্মনিরপেক্ষতা ও কম্যুনিস্ট মতাদর্শের বস্তুবাদী দর্শনের সারবস্তু গভীর সংকটে আপতিত হল। প্রকারান্তরে অনেকগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আমিত্ব প্রমাণের জন্য বিভিন্ন সভ্যতা সহিংসভাবে মেতে উঠল।

এই প্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রায়নের জন্য একটি প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করা যায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর, ক্ষমতাসীন নতুন এলিটগণ কিন্তু সেখানে জাতীয় নির্বাচনের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখালেন না। যদি তারা তা করতেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী বক্তব্যে নৃগোষ্ঠীক সমঝোতা আন্তঃসভ্যতার সমন্বয়মূলক বক্তব্য ও কর্মসূচি পেশ করতে হত, এতে করে হয়তো পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতেও পারত। হয়তো পার্লামেন্টে 'কোয়ালিশন' থাকত, বেরিয়ে আসত সমঝোতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু, তার বদলে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া নির্বাচন প্রজাতন্ত্রভিত্তিক সংগঠিত করা হল, এর ফলে রাজনৈতিক নেতারা দ্ব্যর্থহীনভাবে একটি কেন্দ্রমুখী (সমন্বিত) প্রচেষ্টার বিপরীতে স্থানিক ও সংকীর্ণ তথা কেন্দ্রবিমুখ জাতিগত, সংস্কৃতিগত, ধর্মগত বিষয়গুলো এগিয়ে আনলেন এবং স্বাধীনতার দাবিকে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় করে তুললেন। এমনকি বসনিয়াতেও ১৯৯০ সালে জনপ্রিয় নির্বাচনে ভোটারগণ সার্বিকভাবে নৃগোষ্ঠীক ধারাতেই ভোট প্রদান করেন। বহুধাবিভক্ত নৃগোষ্ঠীক সমন্বয় পার্টি (Multi Ethnic Reformist Party) এবং কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রত্যেকে শতকরা ১০ ভাগেরও কম ভোট লাভ করেন। মুসলিম পার্টি যা ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটির নামে চলছিল, তারা পায় শতকরা ৩৪ ভাগ ভোট, দি সার্বিয়ান ডিমোক্রাটিক পার্টি অর্জন করে শতকরা ৩০ ভাগ ভোট, ক্রোয়েশিয়ান ডিমোক্রাটিক ইউনিয়ন শতকরা ১৮ ভাগ পায়। মোটামুটিভাবে মুসলমান, সার্বিয় এবং ক্রোয়াটিকদের ভোটের আনুপাতিক হার ছিল জনসংখ্যার বন্টনের হারের অনুপাতের অনুরূপ।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়ায় প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত নির্বাচনে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে তারাই জয়লাভ করেন, যারা জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্দীপ্ত ছিলেন এবং সে লক্ষ্যে বিরোধী নৃগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করতে তারা ছিলেন বদ্ধপরিকর।

নির্বাচনের প্রচারাভিযান দ্বারা কার্যত জাতীয়তাবাদী ও নৃগোষ্ঠীক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে উস্‌কে দেয়া হয়, আর তার ফলে ফাটলরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর প্রকৃতপক্ষে সংঘাত বেড়ে যায়, যা প্রকারান্তরে ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধকেই এগিয়ে আনে। বোগদান ডেনিৎস্ বলেন, 'এথনস্ হয়ে ওঠে ডিমোস্ (Ethnos become demos)',[৩৪] অর্থাৎ নৃগোষ্ঠীক পরিচিতিতে সৃষ্টি হল রাষ্ট্র। ফলাফল হল, কার্যত যুদ্ধ আর সহিংসতা।

প্রশ্ন হল : বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কেন মুসলমানেরা অন্যান্য নৃগোষ্ঠীক ও সংস্কৃতিমনাদের চেয়ে অধিকভাবে সহিংস ও যুদ্ধপ্রবণ হয়ে উঠল? এটি কি সবসময়ের জন্যই সত্য ছিল বা আছে? অতীতে দেখা যায়, খ্রিস্টানরা তাদের অনুসারী খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে, আবার অন্যান্যদেরকেও ব্যাপকভাবে হত্যা করছে। অতএব, সহিংসতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হলে অতীত ইতিহাসে থেকে অদ্যাবধি ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কাজটি সম্ভবত অসম্ভব। মুসলমানদের সাম্প্রতিক সহিংস হয়ে ওঠার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে তা চিহ্নিত করা দরকার। কেননা, মুসলমানেরা সম্প্রতি অন্তঃমুসলমান ও মুসলমানদের বাইরে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত

হয়েছে অধিক মাত্রায়। এ সহিংসতার শেকড় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কিত বা সাম্প্রতিককালে তা কতটুকু এবং কেন দায়ী তাও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ৬টি সম্ভাব্য কারণ এ সম্পর্কে বলা যায় :

টেবিল ১০.৪

মুসলমানদের অসন্তোষ ও সহিংস হয়ে ওঠার সম্ভাব্য কারণ

	মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার সংঘাত	মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বহির্ভূত সংঘাত
ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক সংঘাত	সান্নিধ্য অপাচ্যতা, (গ্রহণে অনীহা)	সামরিকত্ব জনসংখ্যাগত দিক
সাম্প্রতিক সংঘাত	উপদ্রুতের পরিস্থিতি	কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতি

৬টির মধ্যে তিনটি মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতার কারণ ব্যাখ্যা করেছে, বাকি তিনটি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সহিংসতার কারণ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। তিনটি সাম্প্রতিক এবং বাকি তিনটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কারণ অনুসন্ধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। তবে, ঐতিহাসিকভাবে কোনো কারণের অস্তিত্ব রয়েছে কি না তা নিয়ে বির্তক ও সন্দেহ রয়েছে। যদি ঐতিহাসিক কারণ না থাকে, তবে তার ওপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সহিংসতার কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে চাওয়া ভুল হবে বলে মনে করা যায়। তা হলে বিংশ শতাব্দীর উপাত্ত ও প্রবণতার দ্বারা মুসলমানদের সহিংস হয়ে ওঠার কারণ নির্বাচনই অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত (টেবিল ১০.৪)।

প্রথমত, যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, ইসলাম শুরু হয়েছিল তরবারি দ্বারা পরিচালিত ধর্ম হিসেবে এবং সেজন্য তারা সামরিকত্বকে উৎসাহিত করে থাকে। ইসলামের উৎপত্তি হয়, 'যুদ্ধপ্রিয় বেদুইনদের উপজাতির ভেতর থেকে', এবং সেজন্য 'সহিংসতার সঙ্গে ইসলামের মূলগত সম্পর্ক বিরাজমান। হযরত মুহাম্মদ নিজে ছিলেন একজন শক্ত যোদ্ধা ও প্রখর সেনাধিপতি।'[৩৫] (কেউই জেসাস ক্রাইস্ট এবং বৌদ্ধ সম্পর্কে তেমন বলেন না)। ইসলামের মতবাদই হচ্ছে 'নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' যখন তাদের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হল, তখন তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। অর্থাৎ, 'জিহাদের' পরিবর্তে অতিদ্রুত মুসলমানদের মধ্যে 'ফিৎনা' বা অভ্যন্তরীণ বিবাদ অগ্রগণ্য হয়ে উঠল। কোরআন ও অন্যান্য ইসলামি ধারায় সহিংসতার আশ্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে; সেজন্য 'অহিংস অবস্থা' ইসলামে তত্ত্বে ও বাস্তবে 'অনুপস্থিত' বলেই ধরা যায়।

দ্বিতীয়ত, আরবে উৎপত্তি হলেও উত্তরআফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা, পরবর্তীতে সেন্ট্রালএশিয়া, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বলকান এলাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের অধীনে চলে আসে। ফলে, ইসলাম অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। অনেকে এ-ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতেও এ-ধারা অব্যাহত

থাকে। যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে অটোম্যান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে বলকান-অঞ্চলের দক্ষিণের শহুরে এলাকার অনেক স্লাভ এ-ধর্মে দীক্ষা নেয়, কিন্তু গ্রামীণ কৃষকেরা এতে তেমন সাড়া দেয়নি এবং এ কারণেই বসনিয়ার মুসলমান এবং অর্থোডক্স সার্বীয়দের ভেতর ধর্মীয় পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিপরীতভাবে, রুশসাম্রাজ্যের বলকান-এলাকার কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি, ককেসীয় এলাকায় তার উপস্থিতি এবং সেন্ট্রাল এশিয়া পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি কার্যত দুটি ধর্ম ও সংস্কৃতির (ইসলাম ও অর্থোডক্স) মধ্যে সংঘাত শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘায়িত করে রেখেছিল। ইসলাম তার ক্ষমতা ও শৌর্যবীর্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের বিশেষ আনুকূল্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি আবাসস্থল স্থাপিত করলে পরে তখন থেকেই আরব-ইহুদি সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। এভাবে ইউরেশিয়ার মুসলমান ও অমুসলমান অবস্থান একই স্থানে লাগালাগি হতে শুরু করে। অন্যদিকে, পশ্চিমে সমুদ্র থাকার কারণে অপাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের সীমানা সৃষ্টির কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, এটি হয়েছিল সর্বপ্রথম প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে পাশ্চাত্যের মানুষ বসতি শুরু করেছিল।

তৃতীয়ত, মুসলমান-অমুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ হতে পারে—যেমন কোনো একজন দেশদরদীর মতে ইসলাম স্বভাবতই একটি অসহিষ্ণু প্রকৃতির ধর্ম (অপাচ্যতা—indigestibility)। অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে অপাচ্যতার কারণে, মুসলমানেরা তাদের দেশে সংখ্যালঘুদের আপন করে নিতে ব্যর্থ হয়, যা অমুসলমান দেশ খুব সহজেই করতে পারে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ, তারা অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সহজেই মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়। খ্রিস্টধর্মের চেয়েও ইসলাম অধিকতর পরিপূর্ণ বিশ্বাসসমৃদ্ধ ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতিকে এক করে ফেলেছে। 'দারুল ইসলাম' এবং 'দারুল হার্ব'-এর মধ্যে কোনোপ্রকার সমঝোতার পথ নেই। কনফুসীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, পাশ্চাত্য খ্রিস্টান এবং অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের পক্ষে অন্যধর্মের মানুষকে গ্রহণ করা সহজ; তারা অন্যধর্মের মানুষের কাছে বসবাস করতেও তেমন দ্বিধাবোধ করেন না। এক্ষেত্রে মুসলমান পরিচয়ে কোনো পার্থক্য করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, নৃগোষ্ঠীক চীন সহজেই থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ক্যাথলিক ফিলিপাইনেও তাদের তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। নীতিগতভাবে সেসব সমাজে তেমন কোনো চীনা জনগোষ্ঠীবিরোধী তৎপরতা দেখা যায় না। কিন্তু বিপরীতভাবে মুসলমানদেশে চীনা জনগণবিরোধী সহিংস ঘটনা ঘটে চলেছে। এমনটি হতে দেখা যায় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায়। সেখানে চীনাদের ভূমিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল, কিন্তু থাইল্যান্ড বা ফিলিপাইনে বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ও সাবলীল।

সামরিকত্ব, অপাচ্যতা এবং অমুসলমান গোষ্ঠীর প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব ইসলামের সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য। এর জন্য ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মুসলমানগণ সবসময়ই সংঘাত ও দ্বন্দ্বমুখর থেকেছে। আরও তিনটি ক্ষণস্থায়ী উপাদান উল্লিখিত তিনটি মৌল উপাদানকে উৎসাহিত ও তীক্ষ্ণ করে তুলেছে, যার জন্য বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমানগণ এত মারমুখো হয়ে ওঠেন। মুসলমান-সমর্থক একটি চিন্তা থেকে বলা হয় যে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানসমাজকে পদানত করে রাখার ঘটনা

কার্যত মুসলমানদের সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার 'বহিঃপ্রকাশ' ঘটনা বলে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্য, অমুসলমান গোষ্ঠীসমূহ মুসলমানদেরকে একটি 'বিকল্প লক্ষ্যবস্তু'তে পরিণত করেছিল। ওই মতামত বলে যে, মুসলমানগণ অমুসলমানদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল; তাছাড়া সেখানে পাশ্চাত্য জগতের 'সিমেটিক' বিরোধী আক্রোশও যুক্ত হয়েছিল। এজন্য মুসলমানগোষ্ঠী প্যালেস্টাইন, কাশ্মীর, চেচনিয়াতে, রেড ইন্ডিয়ানদের মতো অপদস্থ, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উচ্ছেদকৃত হতে থাকে[৩৬] (সাকার আহম্মেদ)। তবে তিনি (সাকার আহম্মেদ), মুসলমানেরা যে নির্যাতনের শিকার তা উল্লেখ করলেও, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবস্থা কী-রূপ আকার ধারণ করে, সে-বিষয়ে কিছু বলেননি। উদাহরণস্বরূপ সুদান, ইরান, মিশর এবং ইন্দোনেশিয়ার নাম উল্লেখ করা যায়।

গভীরভাবে দেখলে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংঘাত সম্পর্কে বলা যায়, এটি হয়তো হত না যদি একটি 'মুসলমান কোররাষ্ট্র' থাকত। ইসলামের সমর্থকগণ সবসময়ই বলে থাকেন যে, পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা যেমন বলেন যে, একটি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত ষড়যন্ত্রমূলক পরিচালনাশক্তি রয়েছে যা মুসলমানদের সংগঠিত করে খুবই উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাশ্চাত্যে ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। যদি সমালোচকেরা এটি সত্য বলে ধরে নেন, তাহলে বলা যায়, তারা সত্যের সন্ধান পাননি। ইসলাম হল বিশ্বের অস্থিরতার অন্যতম উৎস। কারণ, সেখানে একক ও কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো শক্তি নেই। যে-সমস্ত দেশ, যেমন সৌদিআরব, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মুসলমানদের নেতৃত্ব বলে নিজেদের মনে করে থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে অনৈক্যের বেড়জালে আবদ্ধ। তারা একে অন্যকে 'ল্যাং মারতে চায়'। তাদের মধ্যে কেউই মুসলমানদের ভেতরকার অভ্যন্তরীণ বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদানের যোগ্যতা রাখে না; এবং সেসঙ্গে তাদের কেউই অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধী মীমাংসার জন্য কর্তৃত্বমূলক কোনো নির্দেশ দেবার পর্যায়ে নেই।

চূড়ান্তভাবে বলা যায়, মুসলমানসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিস্ফোরণ এবং তার সঙ্গে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, ১৫-৩০ বৎসর বয়সের যুবকদের সংখ্যাধিক্য, আসলে প্রাকৃতিক ও বাস্তব কারণ, যার জন্য মুসলমানদের অভ্যন্তরে ও অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব অহরহ লেগেই চলেছে। অন্যান্য কারণ যেভাবেই থাকুক বা কাজ করুক না কেন, এই বিষয়টি ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে মুসলমানদের মধ্যে এবং দ্বারা সৃষ্ট সহিংসতার একটি বিরাট উৎস বিশেষ। হয়তো একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসলমানদের সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে পারবে এবং এমনটি ঘটলে হয়তো মুসলমানদের মধ্যে সহিংস প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং কার্যত তা সাধারণভাবে ফাটলরেখা বরাবর সংঘাত ও দ্বন্দ্বকেও হ্রাস করবে।

অধ্যায়-১১

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি

পরিচয় : সভ্যতা সংক্রান্ত চেতনার উন্মেষ

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ যে-প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে তা তীব্র, সম্প্রসারণপ্রবণ, বিভাজ্য এবং অবরুদ্ধ চরিত্রের, সেসঙ্গে তা খুব সামান্যই সমাধানযোগ্য। এ প্রক্রিয়া ঘটনাক্রমে শুরু হয়ে থাকে, তবে তা যুগপৎভাবে হয় এবং প্রায়শই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের ন্যায় একবার ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ শুরু হলে তার জীবনবৃত্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে এবং 'ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া' ধারায় এগিয়ে যায়। এ-ধরনের যুদ্ধকে 'পরিচয় সংক্রান্ত' একটি শক্ত ধাঁচের বহুশাখাবিশিষ্ট যুদ্ধ বলা চলে।[১] সহিংসতা যত বাড়ে ততই যেন শুরুর বিষয়গুলো আরও নিবিড় আকার ধারণ করে এবং আরও অনন্যভাবে চলতে চায়, সেই পরিচয়-সংক্রান্ত একান্ত বাক্য 'আমাদের' বিপরীতে 'তাদের' এবং গোষ্ঠীগত সংহতি চেতনা প্রাণ পায় ও কর্ম-উদ্দীপনা হয় প্রগাঢ়। রাজনৈতিক নেতারা এমতাবস্থায় নৃগোষ্ঠীক ও ধর্মীয় এবং সভ্যতার ধারায় তাদের সমগোত্রীয় মানুষের নিকট সমর্থনের জন্য আবেদন জানিয়ে থাকেন। তা হলে দেখা যায়, ঘৃণার একটি গতিপ্রকৃতি ও মনোভাব দারুণভাবে এখানে কাজ করে থাকে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিরাপত্তা-সংক্রান্ত আবেদনের সাথে উভয়সংকটজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখানে যুক্ত হয় পরস্পরের প্রতি ভীতি, অবিশ্বাস, ঘৃণাবোধ ইত্যাদি।[২] উভয়পক্ষই নিজেদের কার্যক্রমকে যুক্তিসঙ্গত বলতে ও প্রতিপক্ষকে পাপাচারী বলে বারবার ঘোষণা দেয়। এভাবে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় ও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রুশবিপ্লবের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিকাশ, নরমপন্থী, গাইরোভিনস্ এবং মেনশেভিক প্রমুখ আমূল পরিবর্তনেচ্ছু জেকোবিন এবং বলশেভিকদের নিকট হেরে যায়। একই প্রক্রিয়া ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের বেলাতেও ঘটে থাকে। নরমপন্থীদের থাকে খুবই সীমিত লক্ষ্য ও দাবি, যেমন স্বাধীনতা নয় বরং স্বায়ত্তশাসন। তবে তাদের এ দাবি-দাওয়া কোনো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব হয় না, কেননা তা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়ে যায়। এবং এর যথার্থতা আমূল পরিবর্তনে, বৈপ্লবিকদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যারা কি-না দাবিগুলো উগ্রধারা ও সহিংসতার মাধ্যমে অর্জন করতে

তৎপর। ফিলিপাইনের বেলায় দেখা যায়, মোরো ফিলিপাইন সংঘাতে প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীগোষ্ঠী মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (নরমপন্থী), উগ্রপন্থী মোরো ইসলামি লিবারেশন ফ্রন্টের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়; তৎপর আবার তা আরও উগ্রপন্থী আবু সায়াক-এর অধীনস্থ হয়ে পড়ে। কেননা আবু সায়াক গোষ্ঠী অস্ত্রবিরতিকে প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮০-এর দশকে সুদানে অধিকতর ইসলামি উগ্রবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০-এর দশকে খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়, 'দি সাউদার্ন সুদান ইনডিপেনডেন্টস্ মুভমেন্ট', যারা স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে সরাসরি স্বাধীনতার দাবি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ইসরাইল এবং আরবের মধ্যে চলমান সংঘাতে প্রধান ভূমিকা পালনকারী 'প্যালেস্টইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (পিএলও) ইসরাইলি সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিয়ে যায়, কিন্তু পরে উগ্রপন্থী 'মুসলিম ব্রাদারহুড হামাস' পিএলও-এর কাজকর্মকে প্যালেস্টাইনি স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে।

অনুরূপভাবে প্রায় একই সঙ্গে ইসরাইলেও একটি উগ্রবাদী ইহুদি সংগঠন প্যালেস্টাইনিদের সঙ্গে সমঝোতার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার অভিযোগে ইসরাইলি সরকারকে দোষারোপ করতে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে চেচেনদের সংঘাতে দেখা যায় এটি ১৯৯২-৯৩ সালে খুবই তুঙ্গে উঠেছিল। দুদায়েভ সরকার এমতাবস্থায় মস্কোর সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে সবচেয়ে বিপ্লবী সংগঠন 'চেচেন জাতীয়তাবাদীদের' দ্বারা সমালোচিত হয়। তাজিকিস্তানেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটে। ১৯৯২ সালে সেখানে সংঘাত প্রচণ্ড রকমের গতি পেয়েছিল, 'তাজিক ন্যাশনালিস্ট'-ডেমোক্রাটিক গ্রুপ ধীরে ধীরে কর্তৃত্ব আরও শক্তিশালী করে এবং উগ্র ইসলামি গোষ্ঠীতে পরিণত হতে থাকে। যারা অধিক কৃতকার্যতার সঙ্গে গ্রামীণ ও শহুরে যুবকদের সংগঠিত করতে ক্ষমতা রাখে, তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। এসব যুবকদের হাতে সংগঠনটি আরও নিবিড়ভাবে ইসলামি চিন্তাচেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। তারা গতানুগতিক ও চাতুর্যপূর্ণ বিধান ও প্রক্রিয়াসমূহ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেন। একজন তাজিক নেতা বলেন, 'আমি কূটনৈতিক অভিধান ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, আমি যুদ্ধক্ষেত্রের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছি। এ ভাষাটিই আমার জন্মভূমির বিরুদ্ধে রুশদের অপকর্মের প্রতিকারের আসল ভাষা।'[৩] বসনিয়ার আলিজা ইজোগাভিক-এর নেতৃত্বাধীন চরম জাতীয়তাবাদীদের পরিচালিত দল মুসলিম পার্টি অব ডিমোক্র্যাটিক অ্যাকশন (এসডিএ) দল হারিস সিলাডজিক-এর নরম ও মধ্যমপন্থী দলকে হটিয়ে দেয়।[৪]

তবে একথা সত্য যে, চরমপন্থীদের বিজয় কোনো স্থায়ী বিজয় নয়। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধাবসানে চরমপন্থী সহিংসতার চেয়ে বরং নরমপন্থী (সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান) আরো বেশি কার্যকর ও কাঙ্ক্ষিত। মৃত্যু এবং ধ্বংসের সীমা বৃদ্ধির পরও যখন কোনোপ্রকার সমাধান আসে না, তখন চরমপন্থী কার্যকলাপকে বিবেক ও বুদ্ধিদ্বারা চালিত নয় বলে ধরা হয় এবং এমতাবস্থায় নরমপন্থীরা আবার সংগঠিত হয়ে কাজে অবতরণ করেন এবং কার্যত তখন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত ও যুদ্ধের অবসান করতে চাওয়া হয়ে থাকে।

যুদ্ধের দাপটে 'বহুধাভিত্তিক পরিচয়' ফিকে হয়ে যায়, তদস্থলে সংঘাতের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন পরিচয়সূত্র প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আর সেই পরিচয়টি হল সাধারণত 'ধর্ম'। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধর্ম 'ঈশ্বরবিহীন'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মানুষের কার্যক্রমকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে, অর্থাৎ এজাতীয় কার্যকলাপ ধর্ম দ্বারা সমর্থিত হয়। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ ভয়ভীতির মধ্যে থাকে। বাস্তবিকভাবে ধর্মীয় বা সভ্যতাভিত্তিক সম্প্রদায়ই আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত সংঘাতে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাদের প্রতি মানুষের সমর্থনও থাকে বেশি। যদি আফ্রিকার দুটি উপজাতির মধ্যে কোনো আঞ্চলিক যুদ্ধ বেঁধে যায়, এবং তা যদি মুসলমান ও খ্রিস্টান হিসেবে চিহ্নিত হয়; তাহলে মুসলমানেরা সৌদিআরব থেকে পায় অর্থ, আফগান মুজাহিদিন এবং ইরানের অস্ত্র, সামরিক উপদেশ ও কৌশল। অন্যদিকে খ্রিস্টানগণ পশ্চিমা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, তাদের নিকট থেকে অর্থনৈতিক, মানবিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য।

বসনিয়ায় গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটলে সেখানে মুসলমানেরা পশ্চিমা দুনিয়ার নিকট সাহায্য চাইবেন, কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা না ঘটলে তারা তাদের আত্মীয়তুল্য, সভ্যতার সঙ্গী অন্যান্য সভ্যতা ও মুসলমানগণের নিকট সাহায্যের আবেদন করবেন এবং বলাবাহুল্য, আশানুরূপ সাড়াও পাবেন। আর বাস্তব–সত্য ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটে চলেছে। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক যুদ্ধ। তবে, এতে অংশগ্রহণকারীরা বহিঃদুনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, এ অবস্থায় সভ্যতার পরিচয় অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের মূল চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত হয়।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কারণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সভ্যতাসম্পৃক্ত পরিচয়সূত্র আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়। তবে বলতে দ্বিধা নেই এটি বিশেষভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঘটে থাকে বেশি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পরিচয়সূত্র ইউ (U)-আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার দরুন ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ হতে উৎপত্তি পরিবার, গোত্র বা গোষ্ঠী যাই হোক না কেন, তা অতি দ্রুত বৃহৎ আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্পাদিত ও আবেদনময় হয়ে ওঠে। এরকম ঘটনা এমনকি সাদ্দাম হোসেনের মতো মৌলবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের বেলাতেও দেখা গিয়েছে।

এক পাশ্চাত্যপন্থী পণ্ডিত আজারবাইজান সম্পর্কে বলেন যে, 'আজারবাইজান সরকারও ইসলামের তুরুপের তাস' ব্যবহার করে থাকে। তাজাকিস্তানের যুদ্ধ, তাজাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক ইস্যু নিয়ে শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহীরা শীঘ্রই তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য 'ইসলামের নাম' ব্যবহার করতে শুরু করে দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর ককেসীয় ও রুশদের ভেতর যুদ্ধ হয়েছিল, ইসলামি নেতা সামিল নিজেকে একজন ইসলামপন্থী বলে দাবি করেন এবং প্রায় একডজন নৃগোষ্ঠী ও ভিন্ন ভাষাভাষিকে 'ইসলামধর্মের জন্য ও রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করেন।' ১৯৮০-এর দশকে গজিয়ে ওঠা চেতনাকে দুদায়েভ ইসলামি বিপ্লবের নামে ১৯৯০-এর দশকে জনগণকে উদ্দীপ্ত করেন, যারও উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও রাজনীতি। মুসলমান ইমামগণ ও ইসলামিদলগুলোকে তিনি সুসংগঠিত করেন, তিনি আর অফিসে

তাদেরকে পবিত্র কোরআন দ্বারা শপথ করান (মজার বিষয় হল ইয়েলৎসিনও অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন)। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রস্তাব করেন যে, চেচনিয়া হবে একটি ইসলামি রাষ্ট্র যা শরিয়া মোতাবেক শাসিত হবে।

চেচেন সৈন্যরা ইসলামি পবিত্র পোশাক পরিধানপূর্বক যুদ্ধে যাওয়ার মুহূর্তে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ্ মহান) ধ্বনি করে থাকে।[৫] কাশ্মীরের বেলাতেও তেমনই ঘটতে দেখা যায়। তারা দ্রুত আঞ্চলিক পরিচয় বা জাতীয় বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে পেছনে ফেলে তৃতীয় ধারার পরিচয়সূত্রের জালে আটকা পড়ে, যার মূল সুর হচ্ছে, কাশ্মীরে মুসলমানজাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে আন্তঃইসলামি সংযোগ ও এক ইসলামি জাতীয়তার দিকে তারা ধাবিত হয়ে যাবে, প্রথমত পাকিস্তানের অংশ হিসেবে বা বিশ্ব-মুসলমানদের অংশ হিসেবে। ১৯৮৯-এ তথায় পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় 'আপেক্ষিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ' গোষ্ঠীয় মাধ্যমেই কিন্তু কাশ্মীর বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। তারপর পাকিস্তানের সমর্থন দ্রুত সেখানকার ইসলামি মৌলবাদীদের দিকে পরিবর্তিত হয়, কার্যত বিদ্রোহের তারাই হল তখন থেকে মূল নিয়ন্ত্রক। অতএব বিদ্রোহীদের সূত্র বা 'কোর'-নেতারা ইসলামি জেহাদকেই তাদের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে ফেলে। অন্য একজন বিশ্লেষক বলেন যে, জাতীয়তাবোধ কার্যত ধর্মীয়বোধের উচ্চতায় তলিয়ে যায়, বিশ্বব্যাপী ইসলামি শক্তির সহিংস মনোভাব ও কাজকর্ম দ্বারা কাশ্মীরিরা উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, ফলে কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়।[৬]

মুসলমান-সম্পর্কিত পরিচয়ের বিষয়টি বসনিয়ার ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে বসনিয়ার সাম্প্রদায়িক পরিচয় ততবেশি শক্তসামর্থ ছিল না; সার্বীয়, ক্রোয়াট এবং মুসলমানেরা একে অপরে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে সুপ্রতিবেশীসুলভ বসবাস করে আসছিল; আন্তঃগোষ্ঠীক বিবাহ ছিল খুবই সাধারণ বিষয়; ধর্মীয় পরিচয় ছিল দুর্বল অবস্থানে। বলা হয়ে থাকে যে, বসনিয়ার মুসলমানেরা মসজিদে নামাজ আদায় করতে যেতেন না, ক্রোয়াটগণ ক্যাথেড্রালে যাতায়াত করতেন না, সার্বীয়রাও তেমনি অর্থোডক্স চার্চে যেতেন না। যখন যুগোস্লাভিয়া বৃহত্তর পরিচয়পর্বটি নস্যাৎ হয়ে গেল তখনই স্বল্প-অনুভূত ও সাদামাটাভাবে টিকে থাকা ধর্মীয় পরিচয় নতুন মাত্রা পেতে শুরু করে এবং তা চাঙা হয়ে যায় এবং সে সূত্র ধরেই যুদ্ধ বেঁধে যায়। প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের বৃহত্তর সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে রসদ সংগ্রহপূর্বক সে লক্ষ্যে পরিচয় পুনর্গঠিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এজন্য তারা ধর্মকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ধর্ম হয়ে ওঠে তাদের পরিচয়ের মূলসূত্র। বসনিয়ায় সার্বীয়রা চরম মাত্রায় সার্বীয় জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে, তারা বৃহত্তর সার্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় একাত্ম করে ফেলে, সার্বিয়ার অর্থোডক্স চার্চ ও অর্থোডক্স সম্প্রদায়ও সেমতো চিহ্নিত হতে থাকে। বসনিয়ায় ক্রোয়াটগণ জোরালোভাবে ক্রোয়েশীয় জাতীয়তাবাদী বনে যান। তারা নিজেদেরকে ক্রোয়েশিয়ার নাগরিক ভাবতে শুরু করেন; তারা তাদের ক্যাথলিকত্বের ওপর জোরারোপ করেন। অন্যান্য ক্রোয়েশীয়দের সঙ্গে তারা মিলেমিশে পশ্চিমের ক্রোয়েশীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে আগ্রহী হন।

মুসলমানদের সভ্যতার ধারায় চলে আসার বিষয়টি আরও উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ শুরুর আগে বসনিয়ার মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ও উদার দৃষ্টির মানুষ, তারা নিজেদেরকে ইউরোপীয় পরিচয়ে পরিচিত করতে চাইতেন। তারা বসনিয়ার রাষ্ট্রে ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুধারার সভ্যতার সুস্থ সম্মিলন হোক এমনটি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে এবং কার্যত যুগোস্লাভিয়া খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকে ক্রোয়াট ও সার্বীয়দের মতো মুসলমানেরাও বহুধা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে আর বসনিয়াকে মেনে নিতে চায়নি; তারই প্রতিফলন ভোটের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়ে ওঠে। কেননা সেখানে ইজেদভিচ-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ইসলামি 'দি মুসলিম পার্টি অফ দি ডিমোক্রাটিক অ্যাকশন (এসডিএ)। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কম্যুনিস্ট শাসনামলে ইসলামি তৎপরতার কারণে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে '*দি ইসলামিক ডিক্লারেশন*' পুস্তকে যুক্তি দেখানো হয় যে একটি অমুসলিম ব্যবস্থায় ইসলাম অসহায়। সেখানে না আছে শান্তি, না আছে এমন পরিবেশ যাতে মুসলমান ও অমুসলমান মিলেমিশে সমাজে ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় বাস করতে পারে। অতএব, ইসলামিশক্তিকে চাঙা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এমন নতুন দেশে 'মিডিয়া ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো ইসলামি আলোয় উদ্দীপ্ত নৈতিক দিক থেকে উৎকর্ষ এবং বুদ্ধির দিক থেকে স্বচ্ছ ব্যক্তিদের হাতে থাকা দরকার।'[৭]

স্বাধীন বসনীয়ায় ইজতোবগোভিচ একটি বহু নৃগোষ্ঠীক দেশ হিসেবে বসনিয়াকে দেখতে চান, যেখানে মুসলমানগণই থাকবেন প্রভাববিস্তারকারী গোষ্ঠী, যদিও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ছিল। অবশ্য একথা সত্য, তিনি দেশকে ইসলামের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায়ও বাধা প্রদান করেননি, যে লিগ্যাসি যুদ্ধের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। দেশকে ইসলামি দেশ বলে ঘোষণা দেয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর অনীহা প্রকৃতপক্ষে দেশের অমুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। যুদ্ধশেষে বসনিয়ার সার্বীয় ও ক্রোয়াটেরা বসনিয়ার সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এলাকা ত্যাগ করেন। যারা থেকে যান, তারা কাজকর্ম, চাকুরি এবং সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে ধীরে ধীরে বাদ পড়তে থাকেন। 'ইসলাম বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যে গুরুত্ব পেতে শুরু করে এবং ...একটি শক্তিশালী ইসলামি জাতীয় পরিচয় সামাজিক ও ধর্মীয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।'

বসনীয় বহুধাশাখাবিশিষ্ট সংস্কৃতির গর্ভে সৃষ্ট জাতীয়তাবোধ মুসলিম জাতীয়তাবোধ দ্বারা অপসারিত হতে থাকে। ইসলামধর্মীয় জাতীয়তাবোধ আসলে গণমাধ্যমে বারবার প্রচার পেতে থাকে। স্কুল, কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো হয় এবং তারা অটোম্যান শাসনের ইতিবাচক দিক গ্রহণ করে, নতুন পাঠ্যবই প্রণীত হয়। বসনীয় ভাষা থেকে সার্বীয় ক্রোয়াট ভাবধারা বাদ দিয়ে অধিকতরভাবে তুর্কি ও আরবি শব্দ সংযোজন করা হয়। সরকারিভাবে মিশ্রবিবাহ ও সার্বীয় গানবাজনার 'আগ্রাসী তৎপরতার' ওপর আক্রমণ হতে থাকে। সরকারিভাবে ইসলামধর্মকে এগিয়ে নেয়ার

কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়; আর মুসলমানদেরকে চাকুরির ও পদায়নের বেলায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, বসনিয়ার সেনাবাহিনীকে ইসলামিকরণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৯৫ ভাগ। সেনাবাহিনীর একের-পর-এক ইউনিট নিজেদেরকে ইসলামের সঙ্গে চিহ্নিত করতে থাকে। ইসলামি আচার-প্রথার বাস্তবায়ন করতে থাকে, তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতীক ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, সেনাবাহিনীর এলিট ইউনিট আগাগোড়া ইসলামিব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলে এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ইজেতোবগোভিচ-এর প্রেসিডেন্সির ৫ জন সদস্য আবেদন জানান (এর মধ্যে দুইজন ছিলেন ক্রোয়েশীয় এবং দুইজন ছিলেন সার্বীয়)। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তা নাকচ করে দেন। ১৯৯৫ সালে বহুসংস্কৃতির সমর্থক প্রধানমন্ত্রী হারিস সিলাজদজিক পদত্যাগ করেন।[৮]

রাজনৈতিকভাবে ইজেতোবগোভিচ-এর মুসলিম পার্টি (সিডা) বসনিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই দলটি 'সেনাবাহিনী, বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সরকারি এন্টারপ্রাইজ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।' যেসব মুসলমান এ দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না, 'অভিযোগ আছে তাদেরকে অমুসলমানদের মর্যাদায় রাখা হত। তাদের জন্য কাজ পাওয়াও ছিল খুবই দুষ্কর।' সমালোচকেরা বলতে থাকেন, উক্ত দল ইসলামি কর্তৃত্ববাদের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে থাকে, যা কম্যুনিস্ট সরকারের আচরণকেই মনে করিয়ে দেয়।'[৯] মোটের ওপর আরও একটি মূল্যায়ন হল এমন : মুসলমান জাতীয়তাবাদ দিনকে দিন আরও চরমপন্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি এখন অন্যান্যদের জাতীয় বিষয়গুলোকে আমলে নিতে চায় না। এটি যেন নতুন মুসলমান ধারায় জাতীয়তাবাদের সম্পত্তি, অগ্রাধিকার ও রাজনৈতিক হাতিয়ার বিশেষ ।

মুসলমান জাতীয়তাবাদের নতুন ধারার মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং লক্ষ্য হচ্ছে, সংস্কৃতির বহুত্ববাদিতাকে অস্বীকার করে তার একত্রীকরণ। ইসলামধর্মের মৌলবাদী ধারা যেন ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের একচ্ছত্র অধিপতি হতে যাচ্ছে।[১০] ধর্মীয় পরিচয়কে বড় ও প্রধান করে দেখার ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের কারণে নৃগোষ্ঠীক 'ক্লিনজিং' তৎপরতার প্রতি নেতৃত্বের অগ্রাধিকার এবং অন্যান্য মুসলমানরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হয়ে ধীরে অথচ পরিষ্কারভাবে বসনিয়া বলকানের সুইজারল্যান্ড থেকে ইরানের 'বলকানে' পরিণত হয়ে যায়।

ফাটলরেখা বরাবর আঞ্চলিক যুদ্ধে একটি পক্ষ যে শুধু তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ে যায় তাই নয়, সেসঙ্গে তারা একে অপরের সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অতএব, ভীতির গভীরতা থাকে ব্যাপক, কেননা এখানে প্রধান প্রধান সভ্যতার শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত থাকে। সেহেতু পরাজয়ের ফলাফল শুধুমাত্র যুদ্ধরত দেশের ওপর বর্তায় না, তা ওই দেশের ধারণকৃত বিশ্বব্যাপী সাযুজ্য রয়েছে এমন অন্যদের ওপরও বর্তায়। এ কারণে, সাধারণ বা মিল রয়েছে এমন বিষয় ও গোষ্ঠীগুলো সভ্যতাসমূহের বিশেষ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধরত সভ্যতার এক কাতারে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আঞ্চলিক

যুদ্ধ তখন ধর্মের যুদ্ধের আকার ধারণ করে সভ্যতার মধ্যে সংঘাত তখন সভ্যতার বিভিন্ন ধারার ভেতর ছড়িয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকে অর্থোডক্স ধর্ম ও অর্থোডক্স গির্জা পুনরায় রুশ-পরিচয়ের কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। ফলে, রাশিয়ার অন্য বিশ্বাসসমূহ সংকুচিত হয়ে পড়ে এক্ষেত্রে ইসলামের ওপর বেশি চাপ বর্তায়।'[১১] রুশগণ তাজিকিস্তানে তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং চেচনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে বৃহত্তর সংঘাতে ইসলামের হাত থেকে অর্থোডক্সদের রক্ষা করতেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের অপরপক্ষ হল প্রকৃতপক্ষে ইসলামি মৌলবাদ ও জেহাদি শক্তি এবং যারা ছিলেন ইসলামাবাদ, তেহরান, রিয়াদ এবং আঙ্কারার মদদপুষ্ট।

প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় ক্রোয়াটগণ দেখল যে, তারা অর্থোডক্স ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের মর্যাদা রক্ষার অকুতোভয় সৈনিক। সাধারণভাবে সার্বীয়রা তাদের শত্রুকে বসনিয়ায় ক্রোয়াট এবং মুসলমানদের মনে না করলেও, ভ্যাটিকানের প্রতি দুর্বল থাকে এবং মুসলমানদের দেখলে মৌলবাদী হিসেবে এবং 'কুখ্যাত তুর্কি' হিসেবে গালি দেয় এবং মনে করে এরাই খ্রিস্টধর্মকে শত শত বৎসর ভয়ভীতির ভেতর রেখেছিল।

কারাদ্দজিক নামে একজন পশ্চিমাঘেঁষা কুটনীতিক বসনিয়ার সার্বীয় নেতাকে বলেন যে, এ ঘটনাকে ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ হিসেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন যে, 'আমাদের উচিত হবে একটি মিলনসেতু তৈরি করা, যার কাজ হবে ইউরোপে তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলা।'[১২] অন্যদিকে, বসনিয়ার মুসলমানগণ তাদেরকে গণহত্যার শিকার বলে মনে করে। তারা আরও মনে করে যে, গণহত্যার বিষয়টি পশ্চিমাবিশ্ব তাদের মুসলমান-পরিচিতির কারণে মোটেও গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না। এমতাবস্থায়, তারা মুসলমানবিশ্বের সমর্থন পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। সুতরাং, সবাই এবং প্রায় সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা যায় যে, যুগোস্লাভ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় এবং নৃগোষ্ঠীক-ধর্মীয় যুদ্ধ বৈ কিছু নয়। মিশা গ্লেনি বলেন যে, যুগোস্লাভ সংঘাত ক্রমান্বয়ে একটি ধর্মীয় সংঘাতে রূপ নেয়, যা ইউরোপের তিনটি বৃহৎ বিশ্বাস–যেমন রোমান ক্যাথলিকত্ব, পূর্ব-ইউরোপীয় অর্থোডক্স এবং ইসলামের মধ্যে সংঘটিত ধর্মীয় যুদ্ধ, আর এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়েছে বসনিয়া।'[১৩]

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের ধারণা হল সভ্যতার সংঘাত স্বজাত, আর এটি নতুন প্রাণ পেয়েছে 'আলখাল্লা তত্ত্বের' মাধ্যমে, যা কি-না শীতলযুদ্ধকালীন বজায় ছিল। আর এখন সভ্যতার একটি প্রধান বিবেচনার বিষয়, যার মূল প্রতিপাদ্য হল কীভাবে স্থানীয় সংঘাতে নিজেদের পরাজয় এড়ানো যায়, কেননা তার সঙ্গে বাঁচামরার সম্পর্ক জড়িত থাকে। ভারত-সরকার কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, এজন্য যে, কাশ্মীরের বিদ্রোহীরা জয়ী হলে ভারতের অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, উপজাতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং ভারতের সংহতি শেষ করে দেবে। ভারত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। রাশিয়া যদি তাজিকিস্তানে রাজনৈতিক সহিংসতার অবসান ঘটাতে না পারে, তবে যেমনটি বিদেশমন্ত্রী কজুরেভ দুসিয়ানী উচ্চারণ করে বলেন, 'তাহলে তার পরিণতি হবে কিরগিস্তান এবং উজবেকিস্তানের

মতো।' যুক্তি দেখানো হয় যে, তাহলে রাশিয়ার মুসলমান প্রজাতন্ত্রগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 'প্রাণ পাবে' এবং কেউ কেউ বলেন, তাহলে সেদিন বেশিদূরে নেই যেদিন ইসলামি মৌলবাদীরা 'রেড স্কয়ার' দখল করে নেবে। এমতাবস্থায় ইয়েলৎসিন বলেন, 'আফগান-তাজিক সীমানায় রাশিয়া অকার্যকর।' অন্যদিকে, ইউরোপীয়রা চিন্তা করে যে, প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় একটি মুসলমানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হল ইউরোপে মুসলমান অভিবাসী এবং ইসলামি মৌলবাদের একটি ঘাঁটি তৈরি হতে দেয়া। এ অবস্থাকে জাকুইস সিরাক বলেছেন, তাহলে ইউরোপে ইসলামের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে।[১৪]

'ক্রোশিয়া সীমানায় ইউরোপ অকার্যকর।' ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ যত জোরদার হয়, উভয়পক্ষ ততই প্রতিপক্ষকে 'অপশক্তি' হিসেবে প্রমাণে তৎপর হয়ে পড়ে। প্রায়শই প্রতিপক্ষকে বলা হয় 'মানবেতর', সুতরাং তাদের হত্যা করা বৈধ। 'পাগলা কুকুরকে গুলি করতেই হয়', একথাটি চেচেন গেরিলাদের সম্পর্কে বলেছিলেন বরিস ইয়েলৎসিন। ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল ট্রাই সুত্রিশনো ১৯৯১ সালে, পূর্ব তিমুরের ধ্বংসযজ্ঞে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এই অসভ্য-জাত মানুষজনকে হত্যা করতেই হবে... এবং আমরা তাই করছি।' অতীতের শয়তান বর্তমানে আবার জেগে উঠছে : ক্রোয়াট উসতাসে (Ustashe) পরিণত হচ্ছে, মুসলমান 'তুর্কি' এবং 'সার্বীয়' চেতনিকস্‌দের ব্যাপক হত্যা, নিপীড়ন, ধর্ষণ এবং নির্দয়ভাবে বহিষ্কার করাকে এভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেয়া হয়। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুনরায় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়ে থাকে—এটিই সত্য। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় এবং মূল প্রতীকসমূহ এবং সংস্কৃতিকে তছনছ করাই হল মূল লক্ষ্য। সার্বিয়ায় পর্যায়ক্রমিক ও সুচারুভাবে মসজিদ, আশ্রম ধ্বংস করা হয়; অন্যদিকে ক্রোয়াটগণ অর্থোডক্স গির্জার উপর আঘাত হানে। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে জাদুঘর, লাইব্রেরির উপর আঘাত আনা হয়। সিংহলী নিরাপত্তা বাহিনী জাফনায় গণ-পাঠাগার জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তামিলদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ 'অ-মেরামতযোগ্যভাবে বিনাশ করেছিল।' সার্বীয় গোলন্দাজরা সাবায়েভোর জাতীয় জাদুঘর কামানের গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছিল। সার্বীয়রা বসনিয়ার জাভোরনিক শহর থেকে ৪০,০০০ মুসলমানকে পরিষ্কার করেছিল, অটোম্যান টাওয়ার ধ্বংস করেছিল, যা স্থাপিত হয়েছিল ১৪৬৩ সালে।[১৫] সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির যুদ্ধে সংস্কৃতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

সভ্যতার ধারায় সমাবেশ : জ্ঞাতিগোষ্ঠী পরিচিত রাষ্ট্র এবং নিজভূমি ছেড়ে বিদেশে অবস্থানরত জনগোষ্ঠী (ডায়াসপোরা)

শীতলযুদ্ধের চল্লিশ বছরে, সংঘাতের নিম্নগামী প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণও ছিল। বৃহৎশক্তিগুলো তাদের সমমনাদের নিয়েই গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল। তাদের ছিল অংশীদার, তারা প্রতিপক্ষ জোট ধ্বংস করত, তার রূপান্তর ঘটাত এবং তাদের জোটকে দুর্বল করত ও নিষ্কর্ম করতে যা যা প্রয়োজন তার কোনোপ্রকার কার্পণ্য করত না। এভাবেই বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কার্যকর থাকত। তৃতীয় বিশ্বের নতুন

এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকত কোন্ দেশ কোন্ বড় শক্তির নিকটবর্তী হয়ে কী সুবিধা সহজে আদায় করবে এবং কোন্ জোটের অন্তর্ভুক্ত হলে কে কতটা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে লাভবান হবে। শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতে কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তখনকার বৃহৎ শক্তির মধ্যে একক সংঘাত বহুধর্মী সাম্প্রদায়িক এবং বহুপাক্ষিক সংঘাতের দ্বারা প্রতিস্থাপিতও হল। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সীমিত সংঘাতকে পেছনে ফেলে বহুমুখী সভ্যতাভিত্তিক বহুসংখ্যক সংঘাত সামনের কাতারে চলে এল।

বিভিন্ন সভ্যতার বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হওয়া সাম্প্রদায়িক সংঘাত সবসময়ই প্রসারিত ও তীব্রতর হতে থাকে। যুদ্ধ ও সংঘাত যতই গভীর হতে থাকে, সংঘাতে লিপ্ত উভয় পক্ষই নিজ নিজ সভ্যতার আলোকে ও সম্পর্কিত অন্যান্য গোষ্ঠী, দেশ ও সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সমর্থন আদায় করতে থাকে। একের-পর-এক একটি সমর্থন প্রাতিষ্ঠানিক অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য, বস্তুগত, মানবিক,কূটনৈতিক, আর্থিক, প্রতীকী, অথবা সামরিক (সমর্থন) জ্ঞাতি, গোষ্ঠী বা সাযুজ্য সভ্যতাসম্পন্ন দেশ ও সম্প্রদায় থেকে আসতে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে জড়িত সভ্যতার জ্ঞাতি, গোষ্ঠীরা সমর্থনদানসহ মধ্যস্থাকারীর ভূমিকাও নিয়ে থাকে। ফলে এই ধরনের 'জ্ঞাতিগোষ্ঠী-রাষ্ট্র সিনড্রোম'সম্পন্ন ফাটলরেখাযুক্ত সংঘাত আন্তঃসভ্যতা সম্পর্কিত সংঘাতের চেয়ে বেশি শক্তি ও সামর্থ্যসম্পন্ন হয়ে থাকে। আন্তঃসভ্যতাসম্পন্ন দেশগুলো ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে ও সংঘাতে সহযোগিতা, বিরোধিতা এর সমাপ্তির ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। শীতলযুদ্ধের সময়ের মতো বহুপাক্ষিক সভ্যতার সভ্যতা সংঘাত উপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় না, বরং তা ক্ষুদ্রাবস্থায় নিচ থেকে উৎপন্ন হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে রাষ্ট্র এবং গোষ্ঠীর জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন মাত্রা ও স্তর রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংঘাতে তারা পরস্পরকে অতিমাত্রায় আক্রমণ করে ও একে অপরকে হত্যা করে থাকে। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ, ইসরায়েল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যুদ্ধে এরূপ ঘটে থাকে। সেসময়ে সেখানে কিছু আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, যা নিজে কোনো রাষ্ট্র নয়, এমনকি রাষ্ট্রের সেই অবস্থাতেও নেই। এরকম পরিস্থিতি বসনিয়া, নাগোরনো কারাবাকে আর্মেনিয়াদের বেলায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ-ধরনের সংঘাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরও অস্তিত্ব লক্ষণীয়। সাধারণত রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক পর্যায়েই সংঘাতে অংশ নেয়, যেমন ঘটেছিল প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়ায় সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া ও ককেসাসে আর্মেনীয় এবং আজারবাইজানের বেলায়।

এর পরও তৃতীয় পর্যায়ের কিছু শক্তি দূরত্বে অবস্থান করে অংশ নিয়ে থাকে। তারা যদিও যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু সভ্যতা-সংক্রান্ত যোগসূত্রের কারণে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন- জার্মানি, রাশিয়াসহ ইসলামি রাষ্ট্রগুলো প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ক্ষেত্রে এবং রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরান আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘাতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। বলাবহুল্য, তৃতীয় পর্যায়ের এ-সমস্ত দেশ কিন্তু

সভ্যতার কোররাষ্ট্র বিশেষ। প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীগণ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে একটি ভূমিকা রাখে। তারা তাদের স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র ও জনবল নিয়েই প্রাথমিক পর্যায়ে আপেক্ষিকভাবে অর্থের আকারে আসা বাহ্যিক সাহায্য, অস্ত্র অথবা স্বেচ্ছাসেবীসহ সংঘাতে অংশ নেয় এবং কার্যত যুদ্ধের ফলাফলের ওপর তা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

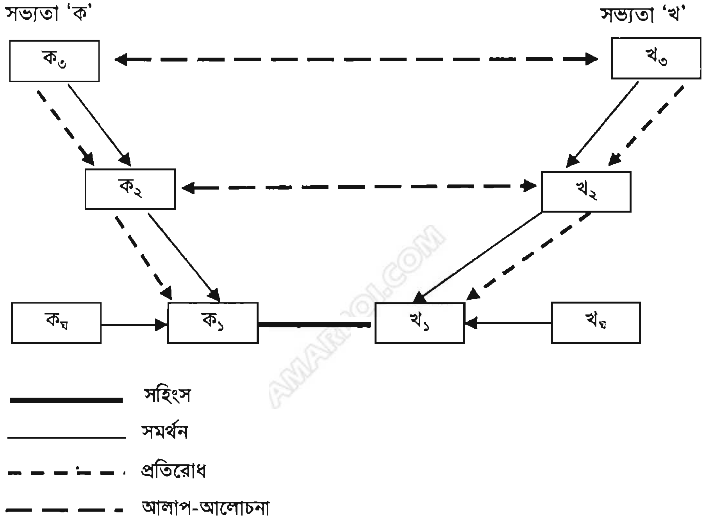
প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত অন্যান্যদের ভূমিকা সর্বতোভাবে একরূপ নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আত্মনিবেদিতপ্রাণ থাকে ওইসকল গোষ্ঠী, যারা নিজভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কারণ তাদের বুকে থাকে দগদগে ক্ষত। এ কারণে দূরদেশে অবস্থান করেও তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী হিসেবে তারা এ সংঘাতে মরিয়া হয়ে সমর্থন জোগায়। বলা যায়, এক্ষেত্রে ওইসব বিদেশে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকে অনেকটা 'পোপের চেয়ে বড় খ্রিস্টানদের মতো।' দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের সরকারগুলোর স্বার্থ ও ভূমিকা সাধারণত খুব জটিল হয়ে থাকে। তারা কার্যত প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারীদের সমর্থন জুগিয়ে থাকেন। এমনকি তারা যদি তা নাও করে থাকেন, তথাপিও তাদের বিরুদ্ধগোষ্ঠীর দ্বারা তারা সবসময়ই সন্দিহান থাকেন। আর এ-কারণেই সম্ভবত তাদের মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পক্ষে দাঁড়াবার তাগিদ সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সরকারসমূহ, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করার বদলে সাধারণত যুদ্ধপ্রতিরোধের দিকে বেশি নজর দিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের সমর্থন দিয়ে থাকেন, সেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের ওপর প্রভাববিস্তারের সূত্র ধরে তারা তাদের কার্যক্রমকে প্রয়োজনবোধে ঢিলেঢালা ও নমনীয় করতেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এমনকি সংঘাত বন্ধ করার বিষয়েও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। তারা কার্যত অনেক সময় বিরুদ্ধশক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে ফাটলরেখা বরাবর আঞ্চলিক যুদ্ধ ঠেকিয়ে রেখে প্রয়োজনবোধে কোররাষ্ট্রের অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে বৃহৎ যুদ্ধের লক্ষ্যমাত্রার দিকে অগ্রসর হতে পারে। ফিগার ১১.১-এ ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের রূপরেখা বিবৃত করা হল। এ সম্পর্কিত সকল যুদ্ধই একইভাবে চলে তা সঠিক নয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিত্রে বিবৃত ছকেই যুদ্ধ চলে, বিশেষ করে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া এবং ট্রান্সককেসীয়সহ প্রায় সকল ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধই সম্প্রসারিত হয়ে যায়, এবং তা প্রায় সকল স্তরের এবং পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে যুদ্ধের কবলে বন্দি করে ফেলে।

১৯৯০-এর দশকে যে-কোনোভাবেই হোক না কেন দেখা যায়, জ্ঞাতিগোষ্ঠীসম্পন্ন দেশ এবং নিজভূমি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী (ডায়াসপোরা) ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের ভেতর নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। প্রাথমিক গ্রুপ হিসেবে মুসলমানদেরকে এসব যুদ্ধে জড়িত থাকতে দেখা যায় বিধায় প্রায় সমুদয় মুসলমানদেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো প্রায়শই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে সৌদিআরব, পাকিস্তান, ইরান,

তুরস্ক এবং লিবিয়াকে সবচেয়ে সক্রিয় দেখা যায়। এসব দেশ সময়ে সময়ে কমবেশি মাত্রায় অন্যান্য মুসলমানদেশের সঙ্গে মিলেমিশে প্যালেস্টাইন, লেবানন, বসনিয়া, চেচনিয়া, ট্রান্সককেসীয়, তাজিকিস্তান, কাশ্মীর, সুদান এবং ফিলিপাইনে অমুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে হাত লাগিয়েছে।

ফিগার ১১.১

জটিল ধরনের ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের কাঠামো



সরকারি সমর্থনের পরও বিভিন্ন প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানগোষ্ঠী আফগানিস্তান যুদ্ধে অভিজ্ঞ 'ভাসমান ইসলামি আন্তর্জাতিক যোদ্ধারা' আলজেরিয়ায় অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ থেকে চেচনিয়ায় আর চেচনিয়া থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত ছুটে যায় যুদ্ধে অংশ নিতে। এই আন্তর্জাতিক ইসলামি যোদ্ধারা আফগানিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়ায় ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে এবং যেসব দেশ ইসলামি শাসনের বিপক্ষে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রোপাগান্ডা-যুদ্ধে অংশ নিতে নিজভূমি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়, যেখান থেকে অন্যত্র তা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে।[১৬] 'দি আরব লিগ' এবং 'দি অর্গানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স'-এর মতো সংগঠনও সভ্যতা-সংক্রান্ত সংঘাতে মুসলমানদের গোষ্ঠীগুলোকে শক্তি জোগায়।

আফগানিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল একটি প্রাথমিক স্তরের দেশ, আর শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে রাশিয়া চেচনিয়ার যুদ্ধে প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে, তাজিকিস্তানের যুদ্ধে দ্বিতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে, তৃতীয় স্তরের ভূমিকা পালন করে সাবেক যুগোস্লাভিয়া যুদ্ধে।

কাশ্মীরের যুদ্ধে ভারত প্রাথমিক স্তরের অংশগ্রহণকারী দেশ, আর শ্রীলংকায় ভারত পালন করে তৃতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে। পশ্চিমের প্রধান প্রধান দেশসমূহ যুগোস্লাভ যুদ্ধে তৃতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নিজভূমি উচ্ছেদিত অথবা অভিবাসনের জন্য গমনকৃত শক্তি (ডায়াসপোরা) ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে উভয়পক্ষে জোরালো ও প্রধান ভূমিকা পালন করে। সেইসঙ্গে তারা আর্মেনিয়া, ক্রোয়েট এবং চেচনীয় যুদ্ধে নিজ নিজ দৃষ্টিতে সমর্থন জানায়।

কাশ্মীরযুদ্ধে পাকিস্তান সকলপ্রকার কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন জোগায়, যার দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের সামরিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচুরসংখ্যক অর্থ ও অস্ত্র, সেসঙ্গে প্রশিক্ষণ সরবরাহ ব্যবস্থাসহ ধর্মীয় মন্ত্রণা প্রদান করা ইত্যাদি ধারায় সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিল। পাকিস্তান কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থনদানের জন্য অন্যান্য মুসলমানদেশে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ১২০০ মুজাহেদিন যোদ্ধা আফগানিস্তান তাজিকিস্তান থেকে যোগ দেয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

আফগানযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আমেরিকানদের দেয়া স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র পেয়ে যায় সুদান।[১৮] ফিলিপাইনের মরো বিদ্রোহীরা একসময় মালয়েশিয়ার অর্থ দ্বারা লাভবান হয়েছিল। তাছাড়া সৌদিআরব সরকারও তাদেরকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছিল। সেখানকার কয়েক হাজার বিদ্রোহী লিবিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানকার চরমপন্থী গোষ্ঠী আবু সায়াফ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মৌলবাদীদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।[১৯] আফ্রিকায় দেখা যায়, সুদান সবসময়ই মুসলমান ইথিওপিয়ায় যুদ্ধরত ইরিত্রিয় বিদ্রোহীযোদ্ধাদের সামরিক সমর্থন দিয়ে এসেছে, যার বিপরীতে ইথিয়পীয়রা সুদানে যুদ্ধরত 'খ্রিস্টান বিদ্রোহীদের সামরিক ও ধর্মীয়ভাবে' সমর্থন জুগিয়েছে। তারা সেসঙ্গে তাদের সঙ্গে খুবই শক্তিশালী ধর্মীয়, বর্ণগত এবং নৃগোষ্ঠীক সম্পর্কের কারণে উগান্ডার নিকট থেকেও সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছে।

সুদানি সরকার প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের চীনা অস্ত্র ইরান থেকে পেয়েছিল। সেসাথে ইরান থেকে তারা প্রশিক্ষণও লাভ করে, যার দরুন তারা ১৯৯২ সালে জোরালোভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পেরেছিল। বিচিত্র ধরনের পাশ্চাত্য খ্রিস্টীয় সংগঠনগুলো খ্রিস্টান বিদ্রোহীদেরকে খাদ্য, ঔষুধ, বিভিন্নরকমের সরবরাহ দেয়া, এমনকি সুদানি সরকারের অভিযোগে বলা হয়, সেসব সংগঠন বিদ্রোহীদের অস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে।[২০]

শ্রীলঙ্কায় হিন্দু তামিলবিদ্রোহীর সাথে বৌদ্ধ সিংহলীদের সরকারের মধ্যকার যুদ্ধে ভারত-সরকার শুরুতে বিদ্রোহীদের ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিল। ভারতের আনুকূল্যে বিদ্রোহীগণ প্রশিক্ষণ পায়, তাদেরকে অর্থ এবং অস্ত্রও সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে যখন শ্রীলঙ্কায় সরকার নির্দয়ভাবে তামিল বিদ্রোহীদের দমন করেছিল, তখন

ভারতের জনমত শ্রীলঙ্কা সরকারের 'গণহত্যার' বিরুদ্ধে ব্যাপক নিন্দাবাদ নিক্ষেপ করেছিল। ভারত-সরকার ওই সময় বিমানের মাধ্যমে তামিলদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করেছিল, যার দরুন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, ভারত ইচ্ছাপূর্বকভাবে বিদ্রোহী দমনে তাঁকে বাধা প্রদান করছে।[২১] অবশেষে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার সরকার একটি সমঝোতায় উপনীত হয়, যাতে বলা হয় যে, শ্রীলঙ্কান সরকার তামিলদের 'প্রয়োজনীয় স্বায়ত্তশাসন' প্রদান করবে আর তামিল বিদ্রোহীরা ভারতীয় বাহিনীর নিকট তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে। ভারত সেখানে তখন ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু তামিল টাইগারেরা অবশেষে অস্ত্রসমর্পণে রাজি হয়নি। এমতাবস্থায়, ভারতীয় সৈন্যরা তাদেরই সমর্থনে গড়ে ওঠা তামিল টাইগারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৮ সালে ভারত সেখান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৯১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিহত হন। ভারত মনে করে, তামিল বিদ্রোহীদের দ্বারাই তিনি নিহত হয়েছেন। এভাবে বিদ্রোহীদের প্রতি ভারত-সরকার ক্রমাগতভাবে বিরোধাত্মক হয়ে ওঠে। তারপরও ভারত-সরকার তামিল বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থনদান থেকে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ৫০ মিলিয়ন তামিলদের বিরত রাখতে পারেনি। জনমতকে গ্রাহ্য করে তামিলনাড়ুর সরকার দিল্লির রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ৫০০ মাইল মুক্তসমুদ্র তীরবর্তীব্যাপী স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র গঠনের ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া টাইগারদের অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্য অব্যাহত রাখে।[২২]

১৯৭৯ সালের শুরুতে সোভিয়েত এবং রুশগণ দক্ষিণে তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান তিনটি ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে অংশ নেয়, যথা: ১. আফগানিস্তান যুদ্ধ ১৯৭৯-৮৯, ২. এরই জের হিসেবে যথাক্রমে ১৯৯২ সালে তাজিকিস্তান যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ৩. ১৯৯৪ সালে চেচেন যুদ্ধ শুরু হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর তাজিকিস্তানে উত্তরাধিকার হিসেবে একটি কম্যুনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯২ সালের বসন্তকালে ওই সরকার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইসলামি উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আঞ্চলিক এবং নৃগোষ্ঠীক শক্তি একত্রিত হয়ে এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিল। আফগানিস্তানের অস্ত্র দ্বারা সে যুদ্ধ আরও গতি পেয়েছিল; এতে করে রুশপন্থী সরকারকে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানী দুসনবের দিকে হটিয়ে দেয়া হয়। ফলে রুশ এবং উজবেকিস্তান সরকার দারুণ রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর সঙ্গে ইসলামি মৌলবাদী শক্তির উত্থানে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, তাজিকিস্তানে অবস্থানরত রাশিয়ার ২০তম রাইফেল ডিভিশন সরকারপন্থীদের অস্ত্র সরবরাহ করে এবং তারা তাজিক-আফগান সীমানায় অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তানে সম্মিলিতভাবে রুশ এবং উজবেক বাহিনীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সময়ের সাথে রাশিয়ার অস্ত্র ও অর্থের বলে প্রাক্তন সরকার বাহিনী পুনরায় রাজধানী দুসনব পুর্নদখল করে এবং দেশের অধিকাংশ এলাকায় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। নৃগোষ্ঠী নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিরোধী সৈন্য ও মানুষজন আফগানিস্তানে উদ্বাস্তু হয়ে আসে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান সরকারগুলো তাজিকিস্তানে রাশিয়ার এহেন সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান উদীয়মান ইসলামি শক্তিকে অর্থ, অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দেয়। ১৯৯৩ সালে সেখানকার হাজার হাজার যোদ্ধা আফগান মুজাহিদিনের নিকট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় বলে একটি অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৩ সালের বসন্তকালে, তাজিক বিদ্রোহীরা আফগান সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এতে কিছু রুশ সীমান্তরক্ষী নিহত হয়। রাশিয়া তার প্রতিউত্তরে উক্ত এলাকায় আরও সৈন্য পাঠায়, একটি 'বিশাল অভিযান পরিচালনা করা হয়, এতে ভারী কামান এবং মর্টার যুক্ত করা হয়, সেসঙ্গে আফগান সীমান্ত বরাবর লক্ষ্যবস্তুর উপর বিমানহামলা চালানো হয়।'

আরব-সরকার বিদ্রোহীদের স্টিনজার ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের জন্য অর্থের যোগান দেয়। এ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহীরা বিমানহামলার মোকাবিলা করতে থাকে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে রুশরা প্রায় ২৫০০০ সৈন্য তাজিকিস্তানে মোতায়েন করেছিল। তাজিক সরকারের সমগ্র অর্থের অর্ধেক অর্থ রুশ-সরকার সরবরাহ করেছিল। অন্যদিকে, বিদ্রোহীরা আফগানিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমানদেশ দ্বারা ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে সমর্থন পায়। বার্নার্ড রুবিন বলেন যে, পশ্চিমাশক্তি সেসময় তাজিকিস্তান বা আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা দানে ব্যর্থ হয়, আর পশ্চিমা সংগঠনগুলোর এই ব্যর্থতাই তাজিকিস্তানকে রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে, আর বিদ্রোহীগণ ও আফগানিস্তান তাদের সভ্যতার জ্ঞাতিগোষ্ঠী 'ইসলামি শক্তির ওপর' নির্ভরশীল হয়ে যায়। যে-কোনো আফগান সেনাধ্যক্ষ যদি বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজনবোধ করেন, তাহলে তাকে সেজন্য আরব এবং পাকিস্তানের দিকে হাত পাততে হয়, যারা মধ্যদিয়ে এশিয়ায় 'জেহাদ' ছড়িয়ে দিতে হয় অথবা তাঁকে মাদকব্যবসায় জড়িয়ে পড়তে হয়।'[২৩]

রাশিয়ার তৃতীয় মুসলমানবিরোধী যুদ্ধ উত্তর-ককেসাসে চেচেনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ যুদ্ধ ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়েছিল প্রতিবেশী অর্থোডক্স এবং মুসলমান 'ইনগুয়িশ'দের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেচেন এবং মুসলমান ইনগুয়িশদের সেন্ট্রাল এশিয়ার দিকে বিতাড়িত করা হয়। অসেটিয়ানগণ ইনগুয়িশদের সম্পত্তি বেদখল করে নেয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিতাড়িতরা দেশে ফিরে আসে এবং সম্পত্তির ও ভূখণ্ডের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা বিরোধ ও বিতর্কের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে ইনগুয়িশগণ প্রাইগোরোন্ডি অঞ্চলে হামলা চালায়। প্রাইগোরোন্ডি এলাকা পূর্বে সোভিয়েটগণ অসেটিয়ানদের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। রুশবাহিনী কোজাক ইউনিটের মাধ্যমে অর্থোডক্স অসেটিয়ানদের সমর্থনে ও ইনগুইশদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেয়।

একজন মন্তব্যকারী মন্তব্য করেন যে, ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে ইনগুয়িশ গ্রামগুলোর উপর রুশবাহিনী ট্যাংক থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। এ ধ্বংস লীলায় অংশ নেয় অসেটিয়ান 'অমোন' (OMON) বিশেষ পুলিশবাহিনী। কিন্তু রুশবাহিনী শান্তিরক্ষার নামে তাদের জন্য সমর্থনবাহিনী প্রেরণ করে।[২৪] *দি ইকোনোমি* পত্রিকার মতে, 'এক সপ্তাহে অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা অত্র অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।' এটি ছিল রুশ ফেডারেশনে প্রথম নৃগোষ্ঠী নিধন অভিযান। রুশরা এ অভিযানকে ইনগুয়িশদের জন্য

গঠিত চেচেন জোটকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করে। এর ফলে চেচেনগণ কালবিলম্ব না করে 'কনফেডারেশন অফ দি পিপল অফ ককেসাস (কেএনকে)' নামে সংগঠিত হয়। কেএনকে রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে ৫০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবী প্রেরণের হুমকি প্রদান করে এবং তারা অবিলম্বে চেচনিয়া থেকে রুশবাহিনীর প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অবশেষে মস্কো অসেনটিয়ান-ইনগুইস দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আর ঘৃতাহুতি না-দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু ইতোমধ্যে সেখানে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা ঘটে যায়।[২৫]

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনেক শক্তি ও গতিসহ ধ্বংসযজ্ঞসম্পন্ন সংঘাত শুরু হয়ে যায়, যখন রুশবাহিনী তাদের সমগ্র ও সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি দ্বারা চেচনিয়া আক্রমণ করে। দুটি অর্থোডক্স রিপাবলিক জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ায় নেতৃত্ব চেচনিয়ার বিরুদ্ধে রুশ-অভিযান সমর্থন দেয়। অন্যদিকে, ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট 'কূটনৈতিক চাতুর্যর পরিচয় দেন, তিনি উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে আহ্বান জানান।' রুশ-আক্রমণ উত্তর-অসেটিয়ান অর্থোডক্স সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়। সেখানকার শতকরা ৫৫-৬০ ভাগ মানুষ রুশ হওয়ায় তারা আক্রমণের সমর্থক ছিল।[২৬] অন্যদিকে রুশ-ফেডারেশনের ভেতরে ও বাইরে মুসলমানগণ চেচনিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। আন্তর্জাতিক ইসলামি সংগঠন তৎক্ষণাৎ সেখানে আজারবাইজান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সুদানসহ অন্যান্য এলাকা থেকে যোদ্ধা প্রেরণ করে। তুরস্ক, ইরান, সেখানে অস্ত্র ও অন্যান্য মালামাল সরবরাহ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য মুসলমানদেশগুলো চেচনিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। অস্ত্রশস্ত্রের অবিচল ও নিরবিচ্ছিন্ন চালান আজারবাইজান থেকে চেচনিয়ায় প্রবেশ করতে থাকায় রাশিয়া ওই সীমানা বন্ধ করে দেয়। ফলে, সেখান থেকে চেচনিয়ায় চিকিৎসা ও সেবামূলক সাহায্যও হুমকির মুখে পড়ে যায়।[২৭]

চেচনিয়ার পক্ষে রুশ-ফেডারেশনের মুসলমানগণ দাঁড়িয়ে যায়। তবে, ককেসীয় এলাকায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে 'পবিত্র যুদ্ধের' ফলাফল তেমন আশাপ্রদ ছিল না। ভলগা-উড়াল অঞ্চলের ৬টি এলাকায় ৬টি প্রজাতন্ত্র অবিলম্বে চেচনিয়া থেকে রুশবাহিনীর প্রত্যাহার দাবি করে। ককেসীয় মুসলমান-অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্রের নেতারা রুশশাসনের বিরুদ্ধে বেসামরিক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। চুভাস প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। চেচনিয়ার দুটি প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্র ইনগুইস্তিয়া ও ডাজেস্তান 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।'

ইনগুইগণ চেচনিয়া যাবার পথে রুশবাহিনীকে আক্রমণ করে বসে। এ আক্রমণকে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী 'দৃশ্যত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা বলে গণ্য করে। অন্যদিকে, ডাজেস্তানেও রুশবাহিনীর উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। রুশবাহিনী এর প্রতিউত্তরে ইনগুইস এবং ডাজেস্তানের গ্রামে কামানের গোলাবর্ষণ করতে থাকে।[২৮] ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে চেচেনবাহিনী কিজসুয়ার এ অভিযান চালালে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে রুশবাহিনী পারভোমিশকোয়ে ধূলিসাৎ করে দেয়, এর ফলে ডাজেস্তানে রুশবিরোধী

চেতনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। চেচেনের দিকটি চেচেন থেকে উচ্ছেদকৃত জনগণ দ্বারাও ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককেসীয় পার্বত্য এলাকায় রুশবাহিনীর আক্রমণের ফলে ওইসব মানুষজন উচ্ছেদ হয়েছিল।

এইসব 'ডায়াসপোরা'গণ অর্থ সংগ্রহ করে অস্ত্র তৈরি করে এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকে চেচনিয়ায় রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠায়। বিশেষভাবে জর্ডান এবং তুরস্ক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়, তুরস্কের গ্রহণ করা সিদ্ধান্তের সঙ্গে জর্ডান ঐকমত্য প্রকাশ করে রুশ বিতাড়নে চেচনিয়াকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। ১৯৯৬ সালে যখন যুদ্ধ তুরস্কে ছড়িয়ে পড়ে তখন ডায়াসপোরা সদস্য কর্তৃক রুশ ফেরি জব্দ করা হয় এবং তারা কিছু রুশকে জিম্মি করে ফেলে। এর ফলে রাশিয়া ও তুরস্কের ভেতর সম্পর্কের অবনতি হয়। এটি পুনরুদ্ধারের জন্য তুরস্ক-সরকার পুনরায় তদ্রূপ ঘটনা না-ঘটার অভিপ্রায়ে রুশসরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়।

চেচেনদের ডাজেস্তানে আকস্মিক আক্রমণ রাশিয়ার দাঁতভাঙা জবাব এবং ফেরি ছিনতাই ১৯৯৬ সালে যুদ্ধটিকে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধের পর্যায় থেকে সাধারণ যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করার মালমশলা জোগায় যা সংঘটিত হয় রুশবাহিনী এবং পার্বত্য জনসাধারণের মধ্যে। আর এটি এখানে কোনো নতুন যুদ্ধ ছিল না, কেননা ওই রেখা বরাবর ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা গিয়েছে। 'উত্তর ককেসাস একটি স্ফুলিঙ্গের বাক্স'—এই বলে ১৯৯৫ সালে কিওনা হিল সতর্ক করে বলেন যে, 'যেখানে একটি প্রজাতন্ত্রের সংঘাত এমন শক্তি রাখে যে, তা খুব সহজে সীমানা ছাড়িয়ে স্ফুলিঙ্গের—মতো দ্রুত অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সে পরিস্থিতিতে জর্জিয়া, আজারবাইজান, তুরস্ক এবং ইরানসহ উত্তর ককেসাসের 'ডায়াসপোরা' সংযুক্ত হয়ে পড়ে। চেচেন এলাকায় যুদ্ধ শুরু হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় না ... কেননা, যুদ্ধ ও সংঘাত পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র অঞ্চল আতঙ্কিত হয়ে যায়।' একজন রুশ বিশ্লেষক যুক্তি দেন যে, একটি অ-প্রচলিত/অপ্রাতিষ্ঠানিক কোয়ালিশন সভ্যতার রেখা বরাবর তৈরি হয়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, নাগারনো-কারাবাক এবং উত্তর ওসেটিয়া মুসলমান আজারবাইজান, চেচনিয়া এবং ইনগুসিয়ার বিরুদ্ধে জেগে ওঠে।' ইতোমধ্যে তাজিকিস্তানে যুদ্ধ করে রাশিয়া বুঝতে পেরেছে যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষয়ক্ষতিপূর্ণ।[২৯]

প্রাথমিক হিসেবে অংশগ্রহণকারী দেশ আর্মেনিয়ার নাগারনো-কারাবাক এলাকা এবং আজারবাইজানের সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হল আরও একটি অর্থোডক্স মুসলমান ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ-এলাকা। নাগারনো-কারাবাক আজারবাইজান থেকে স্বাধীন হতে চায়। আর্মেনিয়া সরকার এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে এবং রাশিয়া, তুরস্ক, ইরান তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী দেশের ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু ,এক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার আর্মেনীয় 'ডায়াসপোরা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৮৮ সালে এ যুদ্ধের যখন আরম্ভ

তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন জীবিত ছিল; এ যুদ্ধ গতি পায় ১৯৯২-১৯৯৩ সালে এবং ১৯৯৪ সালে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তির মাধ্যমে এটি স্তিমিত করা হয়।

তুরস্কসহ অন্যান্য মুসলমান দেশ এ-যুদ্ধে আজারবাইজানকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে রাশিয়া আর্মেনীয়দের সমর্থন দেয় এবং তাদের ব্যবহার করে আজারবাইজানের ওপর তুরস্কের প্রভাব প্রশমিত করতে চেষ্টা চালায়। এ যুদ্ধ ছিল অত্র এলাকায় প্রায় সমরূপ ইস্যুতে চলে আসা যুদ্ধের সবচেয়ে সর্বাধুনিক পর্ব। কেননা, কয়েক শতাব্দীকাল থেকেই অত্র এলাকায় রুশসাম্রাজ্যের সঙ্গে অটোম্যান সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব চলছিল; বিশেষ করে কৃষ্ণসাগর ও ককেসীয় এলাকার দখল বজায় রাখা নিয়ে; এ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, যখন তুরস্ক কর্তৃক আর্মেনিয়া প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এ যুদ্ধে তুরস্ক ছিল সবসময়ই এবং অনবরত আজারবাইজানের সমর্থক। অ-বাল্টিক এলাকায় আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের দেশ হিসেবে তুরস্ক কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশ ছিল আজারবাইজান।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুরস্ক আজারবাইজানকে অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। ১৯৯১-১৯৯২ সালে যখন সংঘাত ও সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে, আর্মেনীয়রা আজারবাইজানের ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তুরস্কের জনমত ছিল তাদের নৃগোষ্ঠীকে ধর্মীয় জ্ঞানের অংশীদার আজারবাইজানীদের রক্ষা করার পক্ষে। এজন্য এ-কাজে তুরস্ক প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে থাকে। তুরস্কের জন্য এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ চাপ। তুরস্ক ভয় পেয়ে গিয়েছিল এজন্য যে, এর ফলে মুসলমান-খ্রিস্টান বিভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যার দরুন পাশ্চাত্য জগৎ আর্মেনিয়াকে সমর্থন জানাবে আর ন্যাটোজোট তুরস্কের ওপর রুষ্ট হয়ে উঠবে। এটি ছিল তুরস্কের জন্য একই কাজের জন্য পরস্পর বিপরীতমুখী তথা দ্বিমুখী এক ধ্রুপদী চাপ। তুরস্কের মতো ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে দ্বিতীয় স্তরের অংশগ্রহণকারী একটি দেশের জন্য পরিস্থিতি ছিল খুবই উভয় সংকটপূর্ণ। যাহোক, এর পরও তুরস্ক-সরকার আজারবাইজানকে সমর্থনদান অব্যাহত রাখে এবং আর্মেনিয়ার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তুরস্কের একজন কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন যে, 'এটি একেবারেই অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়ায়; যখন আপনার কোনো আত্মীয় বিপদে পড়ে আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, সাহায্যের জন্য এগুবেন না।' তিনি আরও বলেন যে, 'আমরা দ্বিমুখী চাপের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খবরের কাগজের পাতা ভর্তি নৃশংসতার ছবি ছাপা হচ্ছে... সম্ভবত আমরা আর্মেনিয়াকে বুঝাতে চাইব যে, অত্র এলাকায় অনেক তুর্কি রয়েছে।' প্রেসিডেন্ট তুরগত ওজাল রাজি হন এবং বলেন যে, 'তুরস্ক আর্মেনিয়াকে মোটেও পরোয়া করে না।' তুরস্ক ইরানের সাথে আর্মেনিয়দের সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে যে, তারা যেন সীমান্তে কোনোপ্রকার পরিবর্তন প্রত্যাশা না করে। ওজাল তুরস্কের ভেতর দিয়ে আর্মেনিয়ার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য পরিবহন বন্ধ করে দেন। ফলে ১৯৯২-১৯৯৩ সালের শীতে আর্মেনিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গণভোগান্তিও তাতে বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার মার্শাল ইয়েভগিনি সেপোসনিকভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, 'যদি তুরস্ক যুদ্ধে বেশি নাক গলায় তাহলে আমরা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করতে বাধ্য হব।' এর এক বৎসর পরও ওজাল যুদ্ধমান থেকেছেন। তিনি বলেন, 'আর্মেনীয়রা কী করতে পারে? যদি গোলাগুলি শুরু হয়... যদি তারা তুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। তবে তুরস্ক তার বিষদাঁত দেখিয়ে দেবে।'[৩০]

১৯৯৩ সালের গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে আর্মেনিয়া-আক্রমণ ইরানি সীমান্তের দিকে আসতে থাকলে ইরান ও তুরস্ক উভয়দেশই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে থাকে, কেননা উভয়দেশই আজারবাইজান এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার মুসলমানদেশগুলোতে তাদের প্রভাববলয় বজায় রাখতে চায়। তুরস্ক ঘোষণা দেয় যে, আর্মেনিয়া-আক্রমণ তুরস্কের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি বয়ে এনেছে। তাই তুরস্ক অবিলম্বে আজারবাইজান ভূখণ্ড থেকে আর্মেনীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায় এবং সেসঙ্গে তুরস্ক আর্মেনীয় সীমানায় অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করে। সেখানে রাশিয়া এবং তুরস্কের সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক গুলি বিনিময়ের মতো ঘটনাও ঘটে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তানসুসিলার বলেন, 'যদি আর্মেনীয় সৈন্যরা আজারবাইজান এলাকার নাখিচেভেন এলাকায় (যা তুর্কি সীমানা সংলগ্ন) প্রবেশ করে, তবে তিনি আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে বাধ্য হবেন। ইরানও আজারবাইজানের দিকে তার সৈন্য পাঠাতে শুরু করে এবং অভিযোগ রয়েছে ইরান আর্মেনীয়-আক্রমণের ফলে ইরানি ভূখণ্ডে উদ্বাস্তুদের জন্য উদ্বাস্তু শিবির খোলে।

ইরানের কার্যকলাপ তুরস্কের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল করে যে, রাশিয়াকে উত্তেজিত না করে তুরস্ককে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা, তুরস্ক মনে করে হয়তো তাকে আজারবাইজানের ওপর প্রভাব বজায় রাখতে ইরানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলাপূর্বক স্বস্তি আনার নিমিত্তে তুরস্ক, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতৃত্ব আলাপ-আলোচনায় মিলিত হন। অবশ্য, এখানে আর্মেনীয় সরকারের ওপর মার্কিন চাপ ছিল। আর আর্মেনীয় সরকার চাপ সৃষ্টি করে নাগারনো কারাবাগের আর্মেনীয়দের উপর।[৩১]

অতি ক্ষুদ্র জনসংখ্যা, ঘেরাটপযুক্ত সীমান্ত এবং অপ্রচুর সম্পদসম্পন্ন দেশ এবং শত্রুভাবাপন্ন তুরস্কের সঙ্গে সীমানা থাকার কারণে ঐতিহাসিকভাবেই আর্মেনীয়াকে তাদের নিরাপত্তার জন্য অর্থোডক্স আত্মীয়, জর্জিয়া এবং রাশিয়ার ওপর নির্ভর করেছে এবং তাদেরকে 'বড়ভাই'তুল্য মনে করছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর, নাগারনো কারাবাগের আর্মেনীয়রা স্বাধীনতার জন্য উশখুশ করতে থাকলে গর্বাচেভ সরকার তাদের দাবিকে উড়িয়ে দেন, এবং সেখানে রুশবাহিনী প্রেরণ করেন, যেখানে বাফুতে ছিল এমন একটি সরকার, যে সরকার ছিল কম্যুনিস্টদের অনুগত। সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আদর্শিক বিবেচনা বাতিল হয়ে সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সত্তাগুলো প্রথম কাতারে চলে আসে। আজারবাইজান রুশ-সরকারকে অভিযুক্ত করে যে, 'ওই সরকার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে এবং তারা আর্মেনিয়ায় খ্রিস্টান সরকারকে সক্রিয় সমর্থন দিচ্ছে।' আর্মেনিয়ায় রুশ সামরিক সহযোগিতা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর দ্বারাই শুরু হয়েছিল এবং এতে করে আর্মেনীয় বাহিনী মুসলমানবাহিনী থেকে আধুনিক বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হলে রুশবাহিনীর

৩৬৬তম 'মটরাইড রেজিমেন্ট', নাগারনো-কারাবাগে অবস্থান করতে বলা হয়। ওই বাহিনী আর্মেনিয়া কর্তৃক খোদজালি শহরে আক্রমণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। অভিযোগ রয়েছে এতে ১০০০ আজেরীয়কে নিঃশেষ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রুশ 'সভেটৎনেজ' বাহিনীও যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯৯২-৯৩ সালের শীতকালে, যখন আর্মেনিয়ায় তুরস্কের দেয়া অবরোধের কারণে নাজুক অবস্থায় ছিল তখন 'রুশ সরকার প্রায় বিলিয়ন রুবল ঋণ হিসেবে প্রদান করে আর্মেনিয়াকে যা তার অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।' বসন্তকালে রুশবাহিনী আর্মেনিয়ায় নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর্মেনিয়া নাগারনো-কারাবাকে একটি করিডোর খোলে। ১৯৯৩ সালে কারাবাক আক্রমণে বলা হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে ৪০টি ট্যাংক নিয়ে রুশবাহিনী অংশ গ্রহণ করেছিল।[৩২] হিল এবং জুয়েটের মতে, আর্মেনিয়া তার বদলে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রজোটে ঢুকে পড়ে। এই দেশটি কাঁচামালের জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল; বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তি, খাদ্যের জন্য এবং তার চিরশত্রু তুরস্ক ও আজারবাইজানের বিরুদ্ধে লড়তে বরাবরই রাশিয়াকে নির্ভর করেছে। আর্মেনিয়া সিআইএস-এর সামরিক ও আর্থিকসহ সকল চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তাছাড়া রুশবাহিনীকে তার ভূখণ্ডে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে এবং রাশিয়ার দাবির মুখে রাশিয়ার জন্য সম্পত্তি প্রদান করেছিল।'[৩৩]

আর্মেনিয়ায় রাশিয়ার সমর্থনের ফলে প্রকারান্তরে আজারাইজানের ওপর রাশিয়ার প্রভাব গতি পায়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আজারবাইজানের জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুলফেজ এল্‌চিয়েভ একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। তার স্থলে প্রাক্তন কম্যুনিস্ট রুশপন্থী গাইদার আলিয়েভ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। আলিয়েভ আর্মেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাশিয়ার মতামত মেনে নিয়ে রাশিয়াকে প্রসন্ন রাখার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি আজারবাইজানের পূর্বের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে আজারবাইজানকে সিআইএস-এর সদস্য করে নেন এবং রুশবাহিনীকে আজারবাইজানের ভূখণ্ডে অবস্থানের অনুমতি দেন। তিনি আজারবাইজানের তেলসম্পদ উন্নয়নের জন্য রাশিয়াকে একটি কনসোর্টিয়ামে যোগ দেবার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। বিনিময়ে রাশিয়া আজারবাইজানী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে, আর্মেনিয়াকে চাপ দেয়, যেন আর্মেনিয়া কারাবাককে আর সামরিক সমর্থন না দেয় এবং তারা যেন আজারবাইজানের ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এভাবে এক শক্তির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে রাশিয়া অন্য শক্তিকে সমর্থন দিয়ে কিছু অর্জন করতে চাইল। অর্থাৎ, আজারবাইজানের উপর তুরস্ক ও ইরানের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে চাইল। এভাবে রাশিয়ার কূটচালে ককেসার এলাকায় আর্মেনিয়ার চিরশত্রু এবং মুসলমান শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

রাশিয়া ব্যতীত আর্মেনিয়া বড়ধরনের সমর্থন পেয়েছিল পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত সম্পদশালী আর্মেনিয়া 'ডায়াসপোরা'দের নিকট থেকে। কমবেশি ১ মিলিয়ন আর্মেনীয় আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে ৪৫০,০০০ ডলার অর্থ প্রেরণ করেছিল। এই অর্থ দ্বারা আর্মেনিয়া তুরস্কের অবরোধ দ্বারা প্রণীত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল, তাছাড়া অর্থের একটি অংশ আর্মেনিয়ার কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর জন্যও ব্যয় করা

হয়। আর্মেনিয়ার সাহায্য তহবিলে আমেরিকায় ডায়াসপোরা সম্প্রদায় ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ১৯৯০-এর দশকে প্রদান করে। ডায়াসপোরীয়রা সেসঙ্গে তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশে আর্মেনিয়ার পক্ষে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতায়ও অংশ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রে সর্ববৃহৎ আর্মেনীয় সম্প্রদায় থাকেন ক্যালিফোর্নিয়া, ম্যাসাচুসেস্টস এবং নিউ জার্সিতে। তারা কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় যে, কোনো বিদেশী সাহায্য আজারবাইজানে যাবে না। অন্যদিকে আর্মেনিয়া মার্কিনসাহায্য প্রাপ্তির তালিকার শীর্ষে (তৃতীয়) অবস্থান পায়। আর্মেনিয়ার বেঁচে থাকার জন্য এ আর্থিক ও মানবিক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আর্মেনিয়া 'ককেসাসের ইসরাইল' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে।[৩৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ককেসাস এলাকায় রুশবাহিনীর আক্রমণে অনেক 'ডায়াসপোরা'র সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ডায়াসপোরীয়রা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেচেনদের সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দেয়। অন্যদিকে বিংশশতাব্দীর শুরুতে তুরস্ক কর্তৃক আর্মেনিয়া ধ্বংসলীলার কারণে যারা ডায়াসপোরা হলেন তারাই আবার তুরস্ককে প্রতিরোধ করলেন এবং আজারবাইজানকে পরাজিত করলেন।

১৯৯০-এর দশকে প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ছিল সবচেয়ে জটিল, বিভ্রান্তিকর এবং ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের সম্পূর্ণ ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ক্রোয়েশিয়ায় ক্রোয়েশীয় সরকার এবং ক্রোয়েটগণ। ক্রোয়েশীয়রা সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় বসনীয় সরকার বসনীয় সার্বদের বিরুদ্ধে এবং বসনীয় ক্রোয়াটদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এরা সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সার্বীয় সরকার বসনিয়া ও ক্রোয়েশিয়ায় সার্বদের সাহায্য করে কার্যত বৃহত্তর সার্বিয়া'র চেতনাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। ঠিক অনুরূপভাবে ক্রোয়েশীয় সরকার বসনিয়ায় ক্রোয়াটদের সাহায্য করে বৃহত্তর ক্রোয়েশিয়া প্রতিষ্ঠার দাবিকে উৎসাহিত করেছে। তৃতীয় পর্যায়ে, ব্যাপক সভ্যতা কাতারে এসে পড়ে; জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ভ্যাটিকান, অন্যান্য ইউরোপীয় ক্যাথলিক দেশ ও গোষ্ঠীসমূহ। এরপর ক্রোয়েশিয়ার সাহায্যে ছুটে আসে যুক্তরাষ্ট্র। সার্বিয়ার পেছনে চলে আসে রাশিয়া, গ্রিসসহ অন্যান্য অর্থোডক্স দেশসমূহ ও গোষ্ঠীবলয়। ইরান, সৌদিআরব, তুরস্ক, লিবিয়াসহ অন্যান্য ইসলামি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী এবং ইসলামি দেশসমূহ বসনিয়ার মুসলমানদের সমর্থনে চলে আসে। বসনিয়া অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পেয়েছিল। আর এটি ছিল সভ্যতার দলবহির্ভূত এবং গোলমেলে প্রকৃতির কার্যক্রম, কেননা ধারাটি এমন যে, সাধারণত সর্বজনীন প্রক্রিয়া হচ্ছে আত্মীয়ই কেবলমাত্র আত্মীয় কাছে এসে দাঁড়ায়। জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, তুরস্ক যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেসব ভূমিকার পেছনে ছিল ওইসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাপের ফসল এবং জনমতের প্রতিফলন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের সমর্থন যুদ্ধরত উভয়ের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ দুটির মাধ্যমে যুদ্ধের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ বন্ধ করার দিকগুলো এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধরত ক্রোয়াট ও সার্বীয়দের সাহায্যে ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয় সরকার অস্ত্র, খাদ্য, অন্যান্য সরবরাহ নিরাপত্তায় অর্থের যোগান দিয়েছে। সার্বীয়-

ক্রোয়েশীয় মুসলমানগণ সাবেক যুগোস্লাভিয়া বাইরে তাদের সভ্যতার আত্মীয়জনের নিকট থেকে অর্থ, অস্ত্র, সরবরাহ, স্বেচ্ছাসেবী, সামরিক প্রশিক্ষণসহ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন পেয়েছিল। বেসরকারি প্রাথমিক পর্যায়ের সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয়রা ছিল খুবই মারমুখো, তারা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের লক্ষ্য অর্জনে তারা ছিল নিরাপোষ। দ্বিতীয় স্তরের শক্তি হিসেবে ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয় সরকার প্রথমদিকে তাদের সভ্যতার আত্মীয়তুল্য ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয়দের জোরালো সমর্থন দিলেও তারা পরে তাদের নানারকমের হিসাবনিকাশ বিবেচনা করে পূর্বের অবস্থান থেকে সরে আসে এবং অনেকটা মধ্যস্থতাকারী এবং যুদ্ধ-প্রতিরোধের জন্য ভূমিকা রাখতে থাকে। একই দৃষ্টিতে তৃতীয় স্তরের শক্তি হিসেবে রাশিয়া, জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রকে চাপ দিতে থাকে যাতে করে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলা যায়।

১৯৯১ সালে যুগোস্লাভিয়া ভাঙন শুরু হয় যখন স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া তাদের স্বাধীনতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং পশ্চিমাবিশ্বের সমর্থন চেয়ে বসে। জার্মানি তার ক্যাথলিকত্বের কারণে দ্রুত সাড়া প্রদান করে। বন সরকার তাদের ক্যাথলিক জ্ঞাতিগোষ্ঠীর জন্য কিছু করতে জার্মানির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠনের নিকট থেকে চাপ প্রাপ্ত হয়; 'ক্রিশিয়ান সোশ্যাল পার্টি ইন বাভারিয়া' 'দি ফ্রাঙ্কফুর্টার এলিম্যান জুয়িটং' এবং অন্যান্য মাধ্যম বনকে প্রবল চাপে রাখে। বাভারিয়া মিডিয়া মূল ভূমিকা পালনপূর্বক জার্মানিতে জনমত গঠন করে যাতে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বাভারিয়া টিভির ভূমিকা নিয়ে ফ্লোরা লুইস বলেন, 'তারা প্রতিনিয়ত ক্রোয়েশীয়দের জন্য চাপ দিতে থাকে; তারা সবসময়ই সার্বীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রোয়েশীয়দের মনোবল ঠিক রাখার জন্য 'প্রোগ্রাম' প্রচার করতে থাকে; তবে ওইসব 'প্রোগ্রাম' ছিল খুবই একপেশে ।'

জার্মানি সরকার স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে ছিল খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত। কিন্তু জার্মান জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, তাই স্বীকৃতি ব্যতীত অন্যকোনো পথ খোলা ছিল না। জার্মানি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর স্লোভানিয়া ও ক্রোয়েশিয়াকে স্বীকৃতির চাপ দেয় এবং তা অর্জন করে। তারপর নিজের দিকে তা ঘুরিয়ে এনে ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেবার পূর্বেই ১৯৯১-এর ডিসেম্বর মাসে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৫ সালে একজন জার্মান বিশ্লেষক মন্তব্য করেন, 'সংঘাতের সমগ্র সময়, বন ক্রোয়েশিয়া ও তার নেতা ফ্রাঞ্জো তুজিম্যান ছিলেন জার্মানির বিদেশ নীতির লালিত্য সন্তান; তার উল্টাপাল্টা ব্যবহার ও বিরক্তিকর চরিত্রের পরও তিনি জার্মানির দৃঢ় সমর্থন নিয়ে এগিয়ে যান।'[৩৫]

অস্ট্রিয়া এবং ইতালি অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নতুন দুটি দেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। কাজটি এত দ্রুত ঘটেছিল যে অন্যান্য পশ্চিমাদেশগুলো পেছনে পড়ে থাকল, আর আমেরিকা এর পরই স্বীকৃতি দেয়। ভ্যাটিকানও এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। পোপ ঘোষণা করেন 'ক্রোয়েশিয়া হল পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রে ইউরোপের বর্ধনশীল দেশ।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি দেশের পরই দেশদুটিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[৩৬] তাই দেখা যায়, ভ্যাটিকান স্বয়ং এ সংঘাতে দলীয় আচরণ করেছে; ১৯৯৪ সালে উক্ত অঞ্চল ভ্রমণে গেলে এ সত্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা গেল। সার্বীয় অর্থোডক্স

সমর্থকেরা পোপের বেলগ্রেড যাওয়ার বিরোধিতা করে এবং সার্বীয়রা বলে যে, পোপ যদি সারায়েভো ভ্রমণ করতে আসেন, তবে তারা তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে অপারগ হবেন। তিনি জাগ্রেভে যান এবং সেখানে কাউন্সিল আলো জের্জেজি সেপটিনাক কর্তৃক তিনি খুবই সম্মানিত হন। তিনি আবার ফ্যাসিবাদী ক্রোয়েশীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুক্ত ছিলেন, যারা সক্রিয়ভাবে জিপসি এবং ইহুদি নিধনে ছিল সিদ্ধহস্ত।

পশ্চিমাশক্তির নিকট থেকে স্বীকৃতি নিশ্চিত করার পর, ক্রোয়েশিয়া তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করতে তৎপর হয়। যদিও ১৯৯১ সালে ইউ.এন.ও. যুগোস্লাভিয়া ওপর অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছিল। ক্রোয়েশিয়ায় ইউরোপের ক্যাথলিক দেশ, যেমন জার্মানি, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরি থেকে এবং সেসঙ্গে লাটিন আমেরিকার দেশ যেমন, পানামা, চিলি, বলিভিয়া থেকে অস্ত্র আসতে থাকে। ১৯৯৩ সালে ক্রোয়েশিয়া অনেকগুলো মিগ ২১এম জার্মানি ও পোল্যান্ড থেকে লাভ করে। 'ক্রোয়েশিয়ার প্রতিরক্ষায় হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী পশ্চিম-ইউরোপ থেকে যোগ দেয়, যারা ছিল 'ডায়াসপোরা'। তাছাড়া পূর্ব-ইউরোপের ক্যাথলিক দেশ থেকেও অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেয়। যারা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে এসেছিল তারা এই প্রতিজ্ঞা ধারণ করে যে, তারা একটি 'খ্রিস্টীয় ক্রুসেডে' যোগ দিতে এসেছে, যে ক্রুসেড 'সার্বীয় কম্যুনিজম' এবং 'মুসলমান মৌলবাদীদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমাবিশ্বের সামরিক বিশেষজ্ঞরা তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। সাংস্কৃতিক সাযুজ্য ও আত্মীয়তুল্য এসব দেশের সহায়তা পেয়ে ক্রোশীয়রা তাদের বাহিনীকে সার্বিয়ার আক্রমণের ভীতিমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়।[৩৭]

ক্রোয়েশীয়দের দ্বারা বিরোধী নৃগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্নকরণ প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়া, মানবাধিকার লঙ্ঘন, যুদ্ধের নিয়মনীতি না-মানা ইত্যাদি সম্পর্কে পাশ্চাত্যবিশ্ব তেমন উচ্চবাচ্য করেনি বরং ক্রোয়েশীয়দের প্রতি তাদের সমর্থনের মাত্রা এত গভীর ছিল যে, তারা এসব অপরাধকে দেখেও না-দেখার ভান করেছে, অথচ উল্লিখিত অপরাধমূলক কাজকর্মের তথ্য সার্বীয়রা সবসময়ই ফাঁস করে দিয়েছে।

১৯৯৫ সালে ক্রোয়েশীয় বাহিনী যখন সার্বিয়ার ক্রাজিনা আক্রমণ করে এবং সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তখনও পশ্চিমাবিশ্ব নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ওই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু বসনিয়া ও সার্বিয়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ক্রোয়েশিয়া তার বিপুল সংখ্যক 'ডায়াসপোরা' দ্বারাও উপকৃত হয়েছিল। সম্পদশালী ক্রোয়েশীয়রা পশ্চিম-ইউরোপীয় এবং উত্তরআমেরিকা থেকে প্রচুর অর্থসাহায্য হিসেবে পাঠায়, যা দিয়ে ক্রোয়াটগণ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করেছিল। আমেরিকায় ক্রোয়াটদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব ক্রোয়েশিয়া' কংগ্রেসে ও প্রেসিডেন্টের নিকট তাদের ফেলে আসা দেশের জন্য লবিং করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল এই যে জার্মানিতে প্রায় ৬০০,০০০ ক্রোয়েশীয় বসবাস করে, তাদের অনেকেই বেশ প্রভাবশালী। এখান থেকে শত শত স্বেচ্ছাসেবী ক্রোয়েশীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং জার্মানিতে বসবাসরত ক্রোয়াটগণ সম্পদ ও জনমত জড়ো করেছিল তাদের নতুন দেশের পুনর্গঠন ও অগ্রগতির জন্য।[৩৮]

১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রোয়েশীয় বাহিনীকে আধুনিক করতে এগিয়ে আসে। ক্রোয়েশীয়গণ কর্তৃক ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্যকরণ ইত্যাদি কার্যকলাপ উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্র ক্রোয়েশীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ঊর্ধ্বতন অবসরপ্রাপ্ত সেনা-কর্মকর্তাদের ক্রোয়েশিয়ার সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজে লাগায়। ১৯৯৫ সালে ক্রোয়েশীয় বাহিনী কর্তৃক ক্রাজিনাতে ধ্বংসাত্মক আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির সায় বা 'সবুজ সংকেত' ছিল। আমেরিকার সামরিক উপদেষ্টাগণ আমেরিকার ধারায় আক্রমণের পেছনে অবদান রেখেছিল। এমনকি আমেরিকায় গোয়েন্দা স্যাটেলাইটও এক্ষেত্রে কাজ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্রোয়েশিয়া সম্পর্কে বলে যে, 'দেশটি আমাদের ডি ফ্যাক্টো বন্ধুপ্রতিম'। আমেরিকার নিজস্ব হিসাব ছিল এমন যে, তারা মনে করে, চূড়ান্তভাবে এ এলাকাকে দুটি শক্তি শাসন করবে, যেমন একটি হল জাগ্রেভ; অন্যটি হল বেলগ্রেড। এর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে (ক্রোয়েশিয়া), আর অন্যটি স্লাভিক থেকে ঢুকে মস্কোর দিকে বাঁধা পড়ে রয়েছে।[৩৯]

যুগোস্লাভ যুদ্ধে সার্বিয়ার পেছনে দৃশ্যত সমগ্র অর্থোডক্স দেশগুলো জড়ো হয়েছিল। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদী, সামরিক শক্তি, আইনপ্রণেতাগণ, অর্থোডক্স গির্জার নেতৃত্ব সবাই সার্বিয়াকে সহায়তার জন্য দৃঢ়ভাবে সোচ্চার ছিল। তারা বসনিয়ার তুর্কিদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং অত্র এলাকায় পাশ্চাত্য এবং ন্যাটোর 'সাম্রাজ্যবাদী' ভূমিকার সমালোচনা করেছে। রাশিয়া এবং সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশ্চাত্যের 'নতুন বিশ্বব্যবস্থার' বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করেছে। দেখা যায় যে, রুশ-সরকারের মনোভাব ও রুশ-জনগণের মনোভাবের ভেতর কোনোপ্রকার পার্থক্য ছিল না। শতকরা ৬০ ভাগ মস্কোর অধিবাসী ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে ন্যাটোর বিমান-আক্রমণের প্রতি ধিক্কার জানায়। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদীরা 'স্লাভিক ভ্রাতৃত্ব' রক্ষার স্লোগান দিয়ে বহু স্বেচ্ছাসেবী জোগাড় করেছিল, যারা সার্বিয়ার হয়ে লড়েছে। বলা হয়ে থাকে, হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী রাশিয়া, রুমানিয়া, গ্রিস, সার্বীয় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ভাষায় 'ক্যাথলিক ফ্যাসিস্ট' এবং 'ইসলামি মৌলবাদীদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

১৯৯২ সালে 'ইউনিফর্ম পরিহিত কোজাক' ইউনিট রাশিয়া পাঠিয়েছিল, যারা বসনিয়ায় আক্রমণ চালিয়েছিল। রাশিয়া সার্বীয় এলিটবাহিনীর সঙ্গে ১৯৯৫ সালে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছে। জাতিসংঘের মতে, রুশ এবং গ্রিকবাহিনী জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নিরাপদ এলাকা জেপাতেও আক্রমণ চালিয়েছিল।[৪০] অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও অর্থোডক্স বন্ধুরা সার্বিয়াতে প্রয়োজনমতো অস্ত্র সরবরাহ করতে কার্পণ্য করেনি। ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার সামরিক ও গোয়েন্দা সংগঠন দৃশ্যত ৩০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র (যারমধ্যে টি-৫৫ ট্যাঙ্ক ছিল) এন্টিক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সার্বদের নিকট বিক্রি করে দেয়। রুশ সামরিক প্রযুক্তিবিদগণ সার্বিয়ায় ওইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও সার্বীয়দের তার ওপর প্রশিক্ষণ দিতে যায়। এতদ্ব্যতীত সার্বিয়া অন্যান্য অর্থোডক্স দেশ থেকেও সাহায্য ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছিল। এ দেশগুলোর ভেতর ছিল রুমানিয়া, বুলগেরিয়া,

ও ইউক্রেন। রাশিয়া তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সার্বিয়ায় প্রেরণ করেছিল যাতে সার্বিয়ায় জাতিসংঘের ত্রাণ ও অন্যসব জিনিস পৌঁছে যায়, কিন্তু তারাও সার্বীয়ার জন্য অস্ত্র সরবরাহ কাজে জড়িয়ে পড়ে।[৪১]

অর্থনৈতিক অবরোধ থাকা সত্ত্বেও সার্বিয়ার গায়ে তেমন কোনো আঁচড় লাগেনি, এর কারণ ছিল জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য পণ্যের ব্যাপক চোরাচালন। গ্রিক সরকার এ কাজটিতে হাত লাগিয়েছিলেন, আলবেনিয়াও সায় ছিল। তিমিসোয়ারা হতে এসব চোরাচালানি পণ্য ও জিনিসপত্র ইটালি ও গ্রিক কোম্পানির হয়ে এ-হাত ও-হাত হয়ে যেত। খাদ্য, রাসায়নিক পণ্য, কম্পিউটার ও অন্যান্য পণ্য গ্রিস থেকে মেসিডোনিয়া দিয়ে সার্বিয়ায় যেত এবং সমপরিমাণ পণ্য আবার একই পথ দিয়ে রপ্তানির জন্য গ্রিসে আসত।[৪২] এভাবে 'লিরা' ও ডলারের বিনিময় হার তৈরি হত জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্য রাষ্ট্রের জন্য। আর এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধ নিরর্থক হয়ে যায়।

যুগোস্লাভ যুদ্ধের বরাবর সময়ে গ্রিক সরকার অন্যান্য পাশ্চাত্যশক্তি ও ন্যাটোর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট ছিল। তারা ন্যাটো কর্তৃক বসনিয়ায় সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের বিরোধিতা করেছিল, জাতিসংঘ সার্বিয়ার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সার্বিয়া থেকে অবরোধ তুলে নিতে লবিং করেছিল। ১৯৯৪ সালে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী আঁন্দ্রে পাপানড্রু, সার্বিয়ার সঙ্গে অর্থোডক্স সম্পর্কের গুরুত্বের ওপর জোর দেন, খোলামেলাভাবে ভ্যাটিকানকে দোষারোপ করেন। জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়নও তার রোষানল হতে বাদ পড়েনি। কেননা, তার মতে, ওইসব সংগঠন ও শক্তি ১৯৯১ সালে শ্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেছিল।[৪৩] অন্যদিকে তৃতীয় মাত্রার দেশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের নেতৃত্বে সমাসীন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়েলৎসিন ছিলেন 'পরস্পরবিরোধী' চাপের মুখে। একদিকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক উত্তম রাখার চাপ, অন্যদিকে সার্বীয়াকে সমর্থন দান করে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তার চাপ। অবশেষে, সার্বিয়ার দাবিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। রাশিয়ার কূটনৈতিক সমর্থন সার্বিয়ার প্রতি ছিল চলমান। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫ সালে রুশ-সরকার তীব্রভাবে সার্বিয়ার প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধের বিরোধিতা করে। রুশ-আইনসভা সর্বসম্মতিক্রমে অবরোধ প্রত্যাহার সংক্রান্ত দাবির বিলে ভোট প্রদান করে। সেসঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে রাশিয়া ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে মুসলমানদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবি জানায়। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া সার্বিয়ার অর্থনৈতিক অবরোধ শিথিল করার অনুরোধ জানায় এবং শীতকালে সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু ওই প্রস্তাব ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্তৃক আটকা পড়ে।

১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে রাশিয়া আবারও বসনিয়া ও সার্বিয়ায় ন্যাটোর বিমানহামলার বিরোধিতা করে। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ার 'ডুমা'য় বোমাবর্ষণের ঘটনাকে সর্বসম্মতিক্রমে তীব্রভাষায় নিন্দা জানানো হয়। সেসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী কুজুরেভের পদত্যাগ চাওয়া হয়,

কেননা তারা মনে করে, কুজুরেভ বলকান-অঞ্চলে রাশিয়ার স্বার্থরক্ষায় পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ার সার্বিয়ার বিরুদ্ধে 'গণহত্যার' অভিযোগে ন্যাটোর বিরোধিতা করে। প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, বোমাবর্ষণ চলতে থাকলে পশ্চিমের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের দারুণ অবনতি হবে এবং ন্যাটোতে তার অংশগ্রহণ অসম্ভব করে তুলবে, ফলে শান্তিপ্রক্রিয়া সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। ন্যাটো যখন সার্বিয়ায় বোমাবর্ষণ করতে থাকে তখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কীভাবে এ অবস্থায় ন্যাটোর সঙ্গে সম্পর্ক ও কার্যক্রম ঠিক রাখতে পারি?'[৪৪] রাশিয়া সবসময়ই সাবেক যুগোস্লাভ রিপাবলিকগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর অবরোধের বিরোধিতা করে। অবরোধের ফলে বসনিয়ার মুসলমানগণ উপকৃত হচ্ছিল।

বিভিন্ন পন্থায় রাশিয়া জাতিসংঘে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে সার্বিয়ার স্বার্থরক্ষায় তৎপরতা চালিয়েছিল। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভেটোক্ষমতা প্রয়োগ করে। মুসলমানদেশের প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সার্বিয়া থেকে বসনিয়ায় ও ক্রোয়েশীয় সার্বদের নিকট জ্বালানি তেল চলাচল বন্ধ থাকবে। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়া জাতিসংঘের আরও একটি প্রস্তাব বাধা দেয় যেখানে নৃগোষ্ঠীক ক্লিনজিং-এর জন্য সার্বিয়াকে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছিল। রাশিয়া ন্যাটোভুক্ত দেশ থেকে গণহত্যার বিচার করার জন্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাধা দেয়। কেননা, রাশিয়া যুক্তি দেখায়, ন্যাটো যেহেতু নিজেই যুদ্ধে পক্ষ নিয়েছে, তাই তার সদস্যরাষ্ট্র গণহত্যার বিচারকের সামনে বসতে পারেন না। বসনিয়া সার্ব সামরিক কর্মকর্তা রেদকো ম্লাদিচের যুদ্ধাপরাধের বিচারপ্রক্রিয়াতেও রাশিয়া বাধা দেয় ও তাকে রাশিয়ার রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার প্রস্তাব দেয়।[৪৫]

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুগোস্লাভিয়ায় ১২০০০ শান্তিসৈন্য মোতায়েনের প্রস্তাব নবায়ন প্রক্রিয়াকে রাশিয়া বাধাগ্রস্ত করে রাখে। তবে, ১৯৯৫ সালে রাশিয়া ১২,০০০ সৈন্য জাতিসংঘের শান্তিমিশনে যুগোস্লাভিয়ায় প্রেরণকে আর বাধা না দিলেও সমালোচনা করে বলে যে ক্রোয়েশীয়রা যখন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ক্রাজুনায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তখন পাশ্চাত্যশক্তি ওই অপকর্মের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সবচেয়ে কার্যকর সভ্যতাসম্পৃক্ত জোট গঠিত হয়েছিল বসনিয়ার মুসলমানদের নিয়ে, মুসলমানবিশ্বে। বসনিয়ার বিষয়টি সর্বজনীনভাবে মুসলমানজগতে একটি জনপ্রিয় ইস্যুতে পরিণত হয়। বসনীয়দের সাহায্যার্থে মুসলমান দুনিয়ার সরকারি ও বেসরকারি উভয়দিক থেকেই উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদেশের সরকার, বিশেষ করে উল্লেখ্য ইরান এবং সৌদিআরব একে অপরকে পাল্লা দিয়ে বসনিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, উদ্দেশ্য ছিল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করা। সুন্নি এবং শিয়া, মৌলবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ, আরব, অ-আরব মুসলমান নির্বিশেষে সকল মুসলমানসমাজ মরক্কো থেকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত উক্ত জোটের সারিতে যোগ দেয়। বসনীয়ার মুসলমানদের সমর্থনের প্রকারভেদ ছিল কিছু মানবিক দিক (সৌদি আরব ৯০ মিলিয়ন ডলার ১৯৯৫ সালে

সাহায্য দেয়) কূটনৈতিক দিক এবং সামরিক সাহায্য, যার দ্বারা ব্যাপক আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা যায়। যেমন ১৯৯৩ সালে আলজেরিয়ার উগ্র মুসলমান গোষ্ঠী দ্বারা ১২ জন ক্রোয়েশীয়কে হত্যা করা হয়েছিল। বলা হয়, 'আর এটি ছিল আমাদের মুসলমান ভাইদের বসনীয়ায় গলা কেটে হত্যার বদলা।'[৪৬] মুসলমানদের এই সমাবেশ যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটির প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে রাষ্ট্র হিসেবে বসনিয়ায় জীবনরক্ষার জন্য। কেননা সার্বিয়রা বসনিয়ায় বিরাট ভূখণ্ড বেদখল করে নিয়েছিল। এসব সমাবেশের কারণেই মুসলমানেরা তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সমাবেশগুলো মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ফলে তারা সর্বত্র ইসলামিকরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলে বসনিয়ার ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে যায় এবং বসনীয়া একটি মুসলমানদেশ হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর্যায়ে চলে আসে। আর এভাবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বসনিয়া অপরাপর মুসলমানদেশের সারিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগলাভ করে।

মুসলমানদেশগুলো পৃথক পৃথকভাবে অপর সমসভ্যতার রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পুনঃপুন বলতে থাকে যে, বসনিয়ার মুসলমানেরা স্বাধীন, তাই তাদের সঙ্গে তারা একাত্ম প্রকাশ করছে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে চাচ্ছে। ১৯৯২ সালে ইরান নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে আসে, আর বলতে থাকে যে, এ যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ, যা বসনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বীয় খ্রিস্টানদের গণহত্যার ফলাফল। এ বিষয়টি মাথায় রেখে ফুয়াদ আজমি বলেন যে 'ইরান যেন একেবারে বসনিয়ার মুসলমানরাষ্ট্রের জন্য নগদমূল্য প্রদান করে ফেলে।' এবং সেসঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদেশগুলোর জন্য একটি 'মডেল' হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে, সৌদিআরব ও তুরস্ককে তার পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ইরান ওআইসি-তে বিষয়টি তোলে এবং জাতিসংঘে উত্থাপনের নিমিত্তে লবিং শুরু করে দেয়। ১৯৯২ সালে মুসলমান-নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গণহত্যার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। ওআইসি-এর পক্ষে তুরস্ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, জাতিসংঘের ঘোষণার আর্টিকেল-৭ এর অধীনে সামরিক অভিযানের দাবি জানানো হয়।

১৯৯৩ সালে মুসলমানদেশগুলো শুরুতে বসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষার জন্য পশ্চিমাবিশ্বকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে একটি সময়সীমা বেঁধে দেয় এবং বলে যে, ওই সময়সীমার মধ্যে পশ্চিমাবিশ্ব ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে তারা স্বাধীনভাবে নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ১৯৯৩ সালের মে মাসে ওআইসি পশ্চিমাজগৎ ও রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত মুসলমানদের রক্ষার জন্য শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ নয় বরং সীমান্তে সার্বীয়দের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা অস্ত্র-সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রস্তাব অস্বীকার করে। মুসলমানগণ বলে যে, অস্ত্র-সরবরাহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে, সার্বীয়ার দ্বারা ভারি অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, সার্বীয় সীমান্তে পাহারা ও নজরদারী জোরদার করতে হবে এবং মুসলমান দেশ থেকে শান্তিরক্ষা মিশনের সৈন্য

গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী মাসগুলোতে ওআইসি, পশ্চিমাবিশ্ব ও রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও জাতিসংঘের মানবাধিকার কংগ্রেসে সার্বীয় এবং ক্রোয়াটদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং তাদের আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেসঙ্গে আবারও অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে কিছু পাশ্চাত্য বিশ্বকে অপ্রস্তুত করেই ওআইসি জাতিসংঘের নিকট শান্তিমিশনে ১৮,০০০ সৈন্য নেয়ার প্রস্তাব দেয় সৈন্যরা আসে ইরান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, তিউনেশিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর ভেটো প্রদান করে, আর সার্বীয়রা জোরালোভাবে তুরস্কের সৈন্য বহালের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৯৪-১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ বাহিনীতে ২৫,০০০ সৈন্যের মধ্যে ৭,০০০ আসে তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশ থেকে। তুরস্কের বিদেশমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে ওআইসির একটি লবিং প্রতিনিধিদল বুট্রোস বুট্রোস ঘালি এবং ওয়ারেন ক্রিস্টোফারকে সার্বিয়া আক্রমণ করে দ্রুত এখানকার মুসলমানদের রক্ষা করতে বলে। পশ্চিমাবিশ্ব এ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিলে বলা হয়ে থাকে তুরস্কের সঙ্গে ন্যাটো-জোটের সম্পর্ক অত্যন্ত টানাপড়েনের মধ্যে নিপতিত হয়।[৪৭]

পরবর্তীতে তুরস্কের এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি সফরে নাটকীয়ভাবে সারায়েভোতে মুসলমানদের জন্য কিছু করতে যান। ইতোমধ্যে ওআইসি পুনরায় বারবার বসনিয়দের জন্য সামরিক সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানায়। ১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে যখন পাশ্চাত্যবিশ্ব সার্বীয়দের আক্রমণ থেকে 'নিরাপদ অঞ্চল' রক্ষার্থে ব্যর্থ হল, তখন তুরস্ক বসনিয়ার জন্য সামরিক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বসনিয়ার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মালয়েশিয়া বসনিয়ায় অস্ত্রবিক্রির অঙ্গীকার করে। আর এ অঙ্গীকার করা হল জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই। আমিরাত বসনিয়ায় মানবিক সাহায্যদানের ঘোষণা দেয়। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে ওআইসি-এর ৯জন বিদেশমন্ত্রী যুক্তভাবে ঘোষণা প্রদান করেন যে, অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। আর একই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ওআইসি-এর ৫২টি দেশ একযোগে বসনিয়ায় অস্ত্র এবং অর্থনৈতিক সাহায্যদানের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইসলামের নামে আবেদনের চাইতে অন্যকিছু তেমন সর্বসম্মত সমর্থন অর্জন করেনি। তবে, বসনিয়ার মুসলমানদের তুরস্কের প্রতি বিশেষ টান ছিল। বসনীয়া অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসিত হয়েছিল বাস্তবে ১৮৭৮ সাল অবধি। যদিও তত্ত্বগতভাবে তা ছিল ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এমতাবস্থায় বসনীয়ায় উদ্বাস্তু ও অভিবাসীসহ তুরস্কের জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। পশ্চিমাবিশ্ব কর্তৃক বসনিয়ার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যর্থতা কার্যত তুরস্কের জনগণের মধ্যে একধরনের মর্মবেদনা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া, সেখানে বিরোধী দল 'ইসলামি ওয়েল ফেয়ার পার্টি' এই ইস্যুটি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। অন্যদিকে, সরকারি কর্মকর্তারা বলকান এলাকার মুসলমানদের রক্ষার জন্য একটি দায়িত্ববোধ অনুভব করে। এ-কারণে সরকার প্রতিনিয়ত জাতিসংঘকে

বসনিয়ায় মুসলমানদের রক্ষার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপের দাবি জানাতে থাকে।[৪৮] মোটের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, মুসলমান উম্মা বসনিয়ায় সামরিক, আর্থিক, অস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং স্বেচ্ছাসেবী সরবরাহ করেছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বসনিয়া সরকার মুজাহিদিনদের আহ্বান জানায় এবং জানা যায় প্রায় ৪০০০ স্বেচ্ছাসেবী সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। এ সংখ্যা ছিল সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয়দের জন্য যুদ্ধ করতে আসা বিদেশীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এসব মুজাহিদিন এসেছিল মোটামুটিভাবে মুসলিম দেশ থেকে। এ দলে ইরানের রিপাবলিকান গার্ডরাও ছিল, আর তারা ছিল আফগানযুদ্ধে অভিজ্ঞ। এদের মধ্যে আরও ছিল পাকিস্তানি, তুর্কি, ইরানি, আলজেরীয়, সৌদি, মিশরীয়, সুদানি, আলবেনীয়, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আগত তুর্কি-সম্প্রদায়। সৌদি ধর্মীয় সংগঠন অনেক স্বেচ্ছাসেবী সরবরাহ করেছিল, ১৯৯২ সালের শুরুতে দুইডজন সৌদি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯২ সালের শরৎকালে লেবাননের শিয়াইট গেরিলা হিজবুল্লাহ আসে, তারাও বসনীয়দের প্রশিক্ষণদানে নিয়োজিত হয়। তবে, প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণের কাজ ইরানের রিপাবলিকান গার্ডরাই দিতে থাকে। ১৯৯৪ সালের বসন্তকালে একজন পশ্চিমা গোয়েন্দা বলেন যে, ইরানি রিপাবলিকান গার্ডইউনিট ৪০০ জন মানুষের একটি সন্ত্রাসীগোষ্ঠীকে গেরিলা প্রশিক্ষণ দেয়।

মার্কিন কর্মকর্তা জানান, 'ইরানিরা ভাবতে থাকে যে, এ পথেই তারা ইউরোপের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।' জাতিসংঘের হিসাব মতে, মুজাহিদিনরা প্রায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ বসনীয়কে বিশেষ ইসলামিবিগ্রেড হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বসনীয় সরকার মুজাহিদদেরকে 'সন্ত্রাসী, অবৈধ এবং নির্দয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে থাকে।' অবশ্য প্রায়শই এই ইউনিট স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নানাধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে, যা ছিল বসনীয় সরকারের জন্য বিব্রতকর। সব যোদ্ধা চলে যাবার পরও কিছু বিদেশী সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক কাজের নামে রেখে দেয়। তাদেরকে বসনীয় নাগরিকত্ব দেয়া হয়। বসনীয় সরকার তাদের নিকট ঋণী, বিশেষ করে ইরানিদের নিকট প্রচুর পরিমাণে তাদের ঋণ। একজন সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সার্বীয় সরকার তাদের বিতাড়নে অক্ষম হয় তবে অনেক মুজাহিদিন থেকে যাবে।'[৪৯]

মুসলমান উম্মার সম্পদশালী দেশসমূহ সৌদিআরব ও ইরানের নেতৃত্বে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বসনিয়ায় প্রেরণ করে। ১৯৯২ সালে যুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকের দিনগুলোতে সৌদি সরকার ও বেসরকারি উপায় থেকে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ বসনিয়ায় প্রেরণ করেছিল। যদিও সেসব অর্থ মানবিক সাহায্য হিসেবে দেয়া হত, কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, তা সামরিক উদ্দেশ্যে খরচ করা হত। বলা হয় যুদ্ধের প্রায় দুইবছরে বসনিয়া অস্ত্র কেনার জন্য ১৬০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে তারা ৩০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত পেয়েছিল সৌদি আরব থেকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য, আর ৫০০ মিলিয়ন ডলার লাভ করে মানবিক সাহায্য হিসেবে। ইরান ছিল বসনীয়দের অর্থের অন্যতম প্রধান উৎস, যে-অর্থ দিয়ে তারা তাদের সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত করেছিল। ইরান বসনিয়ার সামরিক খাতের জন্য শত শত মিলিয়ন

ডলার খরচ করেছিল বলে একজন আমেরিকান কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। আর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ২ বিলিয়ন ডলারের প্রায় শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ অর্থই প্রথমপর্যায়ে, বসনিয়ায় মুসলমানদের হাতে যায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের খরচ হিসেবে। এসব অর্থ দিয়ে বসনীয় মুসলমানেরা হাজার হাজার এবং হরেক রকমের অস্ত্রশস্ত্র কিনতে সক্ষম হয়েছিল। দেখা যায় সেখানে একটি চালানে ৪০০০ রাইফেল ও প্রচুর পরিমাণে গুলি কেনা হয়। দ্বিতীয় চালানে ১১০০০ রাইফেল, ৩০টি মর্টার এবং ৭৫০,০০০টি গুলিগোলা কেনা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে কেনা হয় ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট, গুলি, জিপ, পিস্তল। এসব চালান আসত ইরান থেকে। তাই বলা যায়, ইরানই ছিল বসনিয়ার অস্ত্রের প্রধান ভান্ডার। সেসঙ্গে তুরস্ক এবং মালয়েশিয়াও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। কিছু অস্ত্র সরাসরি বসনিয়ায় বিমানে আসত; বেশিরভাগই আসত ক্রোয়েশিয়া হয়ে। আর এ-পথ বিমান ও ভূমি উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হত। ক্রোয়াটদের এই বদান্যতার প্রতিদান হিসেবে ক্রোয়েশিয়া চালানের একটি সঙ্গে পেতে।[৫০]

অর্থ, মানুষ, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ইরান, সৌদিআরব, তুরস্কসহ অন্যান্য মুসলমানদেশ থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল বলেই বসনিয় বাহিনী মোটামুটিভাবে সুসজ্জিত হতে পেরেছিল। ১৯৯৪ সালের শীতকালে বসনিয়ায় সামরিক শক্তির সংহতি ও যোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।[৫১] এসব শক্তির বলে বসনিয়রা অস্ত্রবিরতি অমান্য করে প্রথমে ক্রোয়েশীয় মিলিশিয়া এবং তৎপর সার্বীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের শরৎকালে বসনীয় বাহিনী জাতিসংঘের নিরাপদ এলাকা দিয়ে এসে সার্বীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে, এ যুদ্ধে বসনীয়ার সবচেয়ে বড় বিজয় ঘটেছিল এবং এর মাধ্যমে তারা সার্বীয়ায় দখলকৃত বিপুল ভূখণ্ড উদ্ধার করতে পেরেছিল। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে আবার বিধি ভঙ্গ করে তারা তুজলার সন্নিকটে এবং সারায়েভোর কাছাকাছি এক আক্রমণ পরিচালনা করে। আর এভাবে বসনিয়ায় একটি সামরিক ভারসাম্য আনতে সক্ষম হয়। এজন্য অবশ্য তাদের ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠীক, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্যদের সহায়তার প্রদত্ত সাহায্য-সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়।

বসনীয়ায় যুদ্ধ ছিল সভ্যতার যুদ্ধ। তিনটি প্রাথমিক অংশগ্রহণকারী পক্ষই ছিল তিন ধরনের সভ্যতার প্রতিনিধি এবং তাদের ধর্মও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। একটি আংশিক ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতিও ছিল পূর্বানুরূপ সভ্যতার মডেল বিশেষ। মুসলমান রাষ্ট্র ও সংগঠনগুলো সর্বজনীনভাবে বসনিয়ার মুসলমানদের জন্য সমবেত হয়েছিল এবং তারা ক্রোয়েট ও সার্বদের বিরোধিতা করেছিল। অর্থোডক্স দেশ এবং সংগঠনগুলো সর্বজনীনভাবে সার্বীয়দের সমর্থন দিয়েছিল, আর এজন্য তারা মুসলমান এবং ক্রোয়াটদের বিরোধিতা করেছিল। পাশ্চাত্য এলিটগণ ক্রোয়াটদের সমর্থন জানিয়েছিল, সার্বীয়দের শত্রু ভেবেছিল, আর মুসলমানদের প্রতি উদাসীন কিংবা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। যুদ্ধে দেখা গিয়েছে ঘৃণা এবং সংঘাত পরিমাপ হয়েছে ধর্ম ও সভ্যতার পরিচয় দিয়ে। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য একথাটি খুব বেশিমাত্রায় প্রযোজ্য। মোটের ওপর বসনীয় যুদ্ধ থেকে যে দিকগুলো বেরিয়ে আসে তা হল :

প্রথমত, ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে প্রাথমিক অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সভ্যতার জ্ঞাতি, গোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্যদের নিকট থেকেই সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে থাকে।
দ্বিতীয়ত, এ-ধরনের সাহায্য যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।
তৃতীয়ত, সরকার এবং জনগণ সভ্যতাবহির্ভূত কারও নিকট থেকে রক্ত এবং অর্থ প্রত্যাশা করতে পারে না যারা কিনা ফাটলরেখাযুক্ত স্থানে যুদ্ধরত রয়েছে।

সভ্যতার এই যুদ্ধে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার নেতৃত্ব অন্তত গলাবাজির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়- মুসলমানদের সহায়তা করেছিল। বাস্তবে অবশ্য মার্কিন-সমর্থন ছিল খুবই সীমিত। ক্লিনটন-প্রশাসন জাতিসংঘের মুক্তএলাকায় তার বিমান ব্যবহার করার অনুমতি দিলেও সমতলে সৈন্য ব্যবহারের কোনো অনুমতি দেয়নি। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবির প্রতিও ছিল সহানুভূতিশীল। অবশ্য, একথা সত্য, আমেরিকা সর্বান্তকরণে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী ছিল না। কেননা তারা তাদের মিত্রদের ওপর এজন্য কোনোপ্রকার চাপ দেয়নি, তাছাড়া তারা নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও ইরান ও সৌদি অস্ত্র বসনিয়ায় চালান করা নিয়ে তেমন জোরালো উচ্চবাক্য করেনি।[৫২] এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা তার ওপর খুব খুশি ছিল না। আর বলা যায় এ-কারণে ন্যাটোর অভ্যন্তরে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। ডায়টন চুক্তির পর সৌদিআরব ও অন্যান্য মুসলমানদেশের সঙ্গে আমেরিকা ঐকমত্যে আসে যে, তারা বসনিয়ায় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের কাজে অংশ নেবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একমাত্র দেশ হিসেবে সভ্যতাবহির্ভূতভাবে বসনিয়ার পক্ষে কাজ করল? যুক্তরাষ্ট্রের এ-ধরনের বৈসাদৃশ্যমূলক কাজের ব্যাখ্যাই বা কী ?

এমনও হতে পারে, এটি মোটেও কোনোপ্রকার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কাজ ছিল না। বস্তুত, এটি সভ্যতার বাস্তবসম্মত কার্যক্রমের অংশবিশেষ। বসনিয়ার পক্ষ নিয়ে এবং অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র হয়তো প্রকারান্তরে বসনীয়ার ওপর থেকে সৌদিআরব, ইরানসহ অন্যান্য মুসলমানদেশের প্রাধান্য হ্রাস করে মূলত বসনিয়াকে ইসলামি মৌলবাদীর খপ্পরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কেননা, বসনিয়ার ঐতিহ্য হল ইউরোপ-ভাবাপন্ন ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই যুক্তরাষ্ট্রের বসনিয়া নীতিতে প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। যদি তাই সত্য হয়ে থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্র কেন সৌদি ও ইরানির সাহায্যে সায় প্রদান করল এবং কেন তারা অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য জোরালো ভূমিকায় গেল না। কেননা, অস্ত্র-প্রত্যাহারে গেলে পাশ্চাত্য সাহায্যে বৈধতা অর্জন করত।

কেন আমেরিকার কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বলকান এলাকায় ইসলামি মৌলবাদ সম্প্রসারণের ভীতিকর দিক তুলে ধরতে ব্যর্থ হল? এসব বিষয়ে আমেরিকার তরফ থেকে একটি বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা হল : আমেরিকার সরকার তার মুসলমান

বন্ধুদেশের নিকট থেকে একটি চাপের মুখে ছিল। এক্ষেত্রে তুরস্ক ও সৌদিআরব ছিল পয়লা নম্বরে। তাই তাদের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতেই আমেরিকার বসনিয়া নীতি যে রূপ দেখা গিয়েছে, সে রূপ ছিল। ঐসব মুসলমানদেশের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল বসনিয়া-ইস্যু-বহির্ভূত এবং উভয়ের আদর্শ মিলিয়ে নেবার পথের সন্ধানের সম্পর্ক বিশেষ। আর এ-পথের অগ্রগতির মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেত, যদি আমেরিকা বসনীয়দের সাহায্যে এগিয়ে না আসত। তদুপরি এ-ধরনের ব্যাখ্যা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে না যে-কেন আমেরিকা অন্য ফ্রন্টে সদাসর্বদা ইরানকে চ্যালেঞ্জ জানালেও বসনিয়ায় তার অস্ত্রপ্রেরণকে মেনে নিল। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হল বসনিয়ার ওপর প্রভাববিস্তারের লক্ষ্যে সৌদিআরব ও ইরানের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল।

আমেরিকার এই বাস্তব রাজনৈতিক কূটচাল হয়তো আমেরিকার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাবেরই প্রতিফলন। তাই এখানে অন্যান্য বিষয় তত মুখ্য নয়। আমেরিকা তার বিদেশনীতির অংশ হিসেবে সংঘাতে রত দুটি শক্তির মধ্যে উত্তম ও অধম সূত্রটি মনে রেখে উত্তমের অনুসারী হতে চায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, শুরুতে সার্বীয়দের বেপরোয়া কার্যক্রম আমেরিকার মনে এ-ধারণা জন্মায় যে, তারা যেন 'খারাপ মানুষ', কেননা তারা বিপুলসংখ্যক নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছিল এবং গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল; অন্যদিকে বসনিয়া এ-ধরনের একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা সহায়হীন এবং অন্যায়ের শিকার। যুদ্ধের সারা সময় আমেরিকার মিডিয়া বসনিয়া বাহিনীর ক্রোয়াট ও মুসলমানদের নৃগোষ্ঠীর নিশ্চিহ্নকরণ, যুদ্ধাপরাধ অথবা জাতিসংঘের ঘোষিত মুক্ত এলাকা লঙ্ঘন ইত্যাদির খুব কম খবরই প্রকাশ করেছে। বসনিয়া সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে রেবেকা ওয়েস্ট বলেন, 'বলকানের পোষা মানুষগুলো তাদের অন্তর এমনভাবে তৈরি করেছে যে, তা যেন নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হয়েও নির্যাতন ভোগ করবে, ধ্বংস যেন জীবনসাথি, তবুও তাদের ধ্বংস নেই।'[৫৩]

আমেরিকার এলিটগণও বসনিয়ার প্রতি নমনীয় ও সহানুভূতিপ্রবণ ছিলেন, কেননা তারা নীতিগত ও বাস্তবভাবেই বহুধা কৃষ্টির সভ্যতার পরস্পর সমাহার ও সহাবস্থানে বিশ্বাস করে। বলাবাহুল্য, যুদ্ধের শুরুতে বসনিয়া এই ধারাকে মনেপ্রাণে ধারণ করেই এগিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সমগ্র সময় আমেরিকা বসনীয়াকে একটি বহুসাংস্কৃতিক জাতি হিসেবে এগিয়ে নিতে চেয়েছে। ক্রোয়াট ও সার্বীয়রা কেউই ওই রাস্তায় হাঁটতে চায়নি বরং তারা তার বিরোধিতা করেছে। গণহত্যা এবং নৃগোষ্ঠীর বিতাড়নের ভেতর দিয়ে বহুধা সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। এসব কারণে আমেরিকার সরকার ও জনগণ বসনীয়দের প্রতি সমর্থনের হাত সম্প্রসারিত করেছিল। আমেরিকার আদর্শবাদ, রীতিনীতি, স্বভাবজাত মানবিক আবেদনময়ী মনোজগৎ, সাদাসিধে ও ছলাকলাহীন কথাবার্তা এবং বলকান সম্পর্কে অজ্ঞতা কার্যত

তাদেরকে বসনীয়মুখী ও সার্বীয়বিরোধী করে তুলেছিল। সেইসঙ্গে বসনিয়ার সঙ্গে আমেরিকার তাৎক্ষণিক কোনো নিরাপত্তাসংক্রান্ত বা অন্যান্য স্বার্থের সম্পৃক্ততা ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র না-থাকার দরুন আমেরিকার সরকার বসনীয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার কোনো কারণ ও তাগিদ অনুভব করেনি। শুধুমাত্র তারা ইরান ও সৌদি থেকে অস্ত্রের চালান আসার বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। যুদ্ধে আমেরিকার মিত্ররা যেভাবে দেখতে চেয়েছে, আমেরিকার সেভাবে না-দেখতে চাওয়ায় মিত্রদের সঙ্গে আমেরিকার দুরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বাস্তবে আমেরিকা মিত্রদের কাছ থেকে ছিটকেও পড়েছিল। যুদ্ধ দীর্ঘায়িতকরণে এবং বলকানে একটি মুসলমানরাষ্ট্র গড়ে তোলার বিষয়ে ইরানের ভূমিকা ও প্রভাব ছিল অগ্রগণ্য। তবে শেষের দিকে বসনীয়রা আমেরিকার প্রতি তিক্ত মনোভাবই পোষণ করে। অবশ্য এ মনোভাব তারা যতটা না প্রকাশ করেছে, অন্তরের অন্তস্থলে পোষণ করত তার চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে বসনিয়া তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয়তুল্য সভ্যতার অংশীদার মুসলমানদেশসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ; কেননা তাদের অস্ত্র, অর্থ, স্বেচ্ছাসেবক পেয়ে কার্যত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে এবং অবশেষে সামরিকভাবে জয়ের মুখ দেখতে পেরেছিল।

'বসনিয়া হল আমাদের স্পেন', বার্নার্ড হেনরি লেভি এমন মন্তব্য করেছেন। একজন সৌদি সম্পাদক যুক্তি দেখান যে, 'আবেগের দিক বিবেচনা করলে বলতে হয়, বসনিয়া হার্জেগোভিনার যুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ ও স্পেনের গৃহযুদ্ধের সমতুল্য। যারা স্বগোত্রীয় মুসলমানদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা জাতীয় বীর বা শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন আত্মদানের জন্য। এই তুলনা অবশ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। সভ্যতার এই যুগে বলা যায়, বসনিয়া সকলের জন্য স্পেন বৈকি! স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং মতাদর্শের যুদ্ধ। আর বসনিয়ার যুদ্ধ ছিল সভ্যতা ও ধর্মের যুদ্ধ। গণতন্ত্রী, কম্যুনিস্ট এবং ফ্যাসিবাদী সকলেই তাদের মনোভাবাপন্নদের স্বাচ্ছন্দ্য করতে স্পেনে ছুটে গিয়েছিল। সেখানে গণতান্ত্রিক, কম্যুনিস্ট, এমনকি ফ্যাসিবাদী সরকারও সাহায্য করেছিল। একইভাবে দেখা যায়, যুগোস্লাভ যুদ্ধে বহির্সমর্থন এসেছিল পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্ম-সমর্থকদের নিকট থেকে। অর্থোডক্স খ্রিস্টান, মুসলমান সবাই তাদের নিজ নিজ সভ্যতার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাহয্যে এগিয়ে এসেছিল। অর্থোডক্স, ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সবাই সেখানে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। চার বৎসর যুদ্ধের পর স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়ের মধ্যদিয়ে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছিল। আর বলকানে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতর সংঘটিত যুদ্ধ হয়তো সাময়িকভাবে মিটে যাবে, কিন্তু কোনোপক্ষেরই সুনিশ্চিত জয় আসবে না। কোনো জয়ই সেখানে শেষ কথা হবে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপক্রমণিকা স্বরূপ। অন্যদিকে বসনিয়ার যুদ্ধ হল সভ্যতার সংঘাতের এক রক্তাক্ত উপাখ্যান।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ নিবৃত্তিকরণ

'প্রত্যেক যুদ্ধেরই শেষ রয়েছে—' এটিই হচ্ছে প্রচলিত এবং জ্ঞানোচিত ধারণা। তবে এটি কি ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের ক্ষেত্রে সত্য? উত্তর হবে : 'হ্যাঁ' এবং 'না'। ফাটলরেখা

বরাবর সহিংসতা হয়তো একটি সময়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়, কিন্তু তা কি চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা যায়? ফাটলরেখা যুদ্ধে বারবার যুদ্ধবিরতি, অস্ত্রবিরতি চুক্তি ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে, কিন্তু সেখানে বিস্তারিত কোনো শান্তিচুক্তি হয় না, যার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ইস্যুর অবসান ঘটাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে মুছে ফেলা যায়। এ-ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়, বন্ধ হয়, আবার শুরু হয় জাতীয় নিয়মে চলে। কেননা এর কারণসমূহ ফাটলের গভীরে প্রোথিত, যা বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার মধ্যে পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়। এ-ধরনের সংঘাত ভৌগোলিকনৈকট্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য, ভিন্নধর্মী সমাজকাঠামো এবং ঐতিহাসিক বিবদমান গোষ্ঠী ও সমাজগুলোর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন ও উন্নতিনির্ভর। হয়তো শতাব্দীর-পর-শতাব্দী পরে সময়ের আবর্তে এ দ্বন্দ্বের কারণসমূহ দূরীভূত হতে পারে, যদি একটি গোষ্ঠী নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যদি তার কোনোটিই না ঘটে, তবে যুদ্ধ ও সংঘাত চলমান থাকে এবং সময়ের আবর্তে আবার সংঘঠিত হয়ে থাকে। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ পুনঃপুন ঘটে। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ হল অন্তহীন যুদ্ধ।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ সাময়িকভাবে থেমে যাওয়াও কিন্তু দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের ক্লান্তি। যদি মৃত্যুসংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে যায়, হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়, চারিদিকে শুধু কান্নার রোল পড়ে, তাহলে স্পেন শহর— বৈরুত, গ্রজনি, ভোকুভার জনসাধারণের কান্নার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। 'যদি পাগলামি যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, এই রব ওঠে, তাহলে উভয়দিকের উগ্রপন্থীরা আর যুদ্ধের পক্ষে মানুষ এবং সম্পদ জড়ো করতে পারেন না, তখন দীর্ঘদিন থেকে অবহেলায়, পড়ে থাকা আলাপ-আলোচনা শুরু করার প্রয়োজন পড়ে। এ অবস্থায় নরমপন্থীরা গাঝাড়া দিয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা আনতে চেষ্টা করে এবং এ অবস্থায় যুদ্ধ সাময়িকভাবে থেমে যায়।

১৯৯৪ সালের বসন্তকালে ৬ বৎসরকাল যুদ্ধ চলার পর নাগারনো-কারাবাকে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং উভয়পক্ষ তথা আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানিরা একটি চুক্তিতে আসেন। ১৯৯৫ সালের শরৎকালে বসনিয়াতেও তেমন অবস্থা হওয়ার দরুন 'অর্থাৎ উভয়পক্ষই ক্লান্ত' তাই ডাইটন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব করে তোলে।[৫৫] তবে এ-ধরনের বিরতি নিতান্তই স্ব-সীমিত। তারা এটি রক্ষা করে চলতেও পারে, আবার নাও পারে। যখন একপক্ষ মনে করে যে, যুদ্ধ শুরু করলে তারা লাভবান হবেন, তারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ নবায়নপূর্বক শুরু করেছেন। সাময়িকভাবে শান্ত থাকাটা আরও একটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, দ্বিতীয় এই কারণটি হল : অ-প্রাথমিক সদস্য ও অংশীদারদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত। কেননা, তারা তাদের স্বার্থে সৈন্য একত্রীকরণ বা প্রত্যাহারও করতে পারেন। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ কখনও প্রাথমিক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা সরাসরি আলোচনার ফলে থেমে যায় না। এ-ধরনের যুদ্ধ থেমে যাওয়াটি কদাচিৎ অসম্পৃক্ত এবং স্বার্থহীন দেশের মধ্যস্থতার মাধ্যমে ঘটে থাকে। সাংস্কৃতিক দূরত্ব, গভীর ঘৃণা, পারস্পরিক সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে,

তারা একত্রে বসে আলাপ-আলোচনার পর্যায়েও থাকে না। চলমান রাজনৈতিক ইস্যু যেমন কে, কেন, কতটুকু ভূমি দখলে রাখবে বা কেন কেউ অন্যের ওপর প্রভাব বজায় রাখবে— এসব বিষয় সামনের কাতারে চলে আসার জন্য মীমাংসা-প্রক্রিয়া জটিল আকার ধারণ করে এবং এজন্য খুবই সীমিত সুযোগ অবশিষ্ট থাকে।

একই সংস্কৃতিসম্পন্ন পরস্পর বিবদমান দুইটি দেশের ভেতরকার সংঘাতে স্বার্থসম্পৃক্ত নয়–এমন তৃতীয় শক্তির মধ্যস্থতায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ-মেটানো সম্ভব। শুধু এক্ষেত্রে ওই সংস্কৃতির বৈধতা থাকতে হয় এবং মধ্যস্থতাকারী দেশের ওপর উভয়ের সম্মতি, আস্থা ও বিশ্বাসভাজন দরকার পড়ে। এক্ষেত্রে সুবিধা হল এই যে, বিবাদমান দেশদুটির সংস্কৃতি ও সভ্যতার শেকড় এক এবং অভিন্ন। এই কারণে পোপ খুবই সার্থকভাবে আর্জেন্টাইন-চিলির সীমানা-সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করতে পেরেছিলেন। অথচ দুটি ভিন্ন সভ্যতার বিবাদ মীমাংসার জন্য স্বার্থহীন তৃতীয় দেশ পাওয়া দুষ্কর। এ-কাজে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অথবা দুই বিবদমান দেশ কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়। এক্ষেত্রে উভয়ের আস্থা আর বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই; যা খুবই কঠিন। পোপকে চেচেন এবং রুশ-বিরোধ মীমাংসার জন্য ডাকা হয়নি, অথবা তামিল সিংহলি বিরোধের ক্ষেত্রেও পোপের কিছু করণীয় নেই। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো সেক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ তারা উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার মতো মূল্য দিতে পারে না, বা উভয়ের বিশ্বাস ও আস্থাও অর্জনের অবস্থানে থাকে না।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য স্বার্থবহির্ভূত তৃতীয় ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন দ্বারা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে অ-স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের বা তৃতীয় স্তরের দেশ যারা তাদের স্ব-গোত্রীয় ও নৃগোষ্ঠীক আত্মীয়তুল্য বিবদমান দেশের জন্য সমবেত হয়েছে, তারা উক্ত দেশ এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে পারে। এর আর একটি সুবিধা হল, এক্ষেত্রে আত্মীয়তুল্য দেশ নির্ভরতার কারণে হয়তো তার প্রস্তাব ফেলে দিতে পারে না। তবে, যুদ্ধ যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে, তখন নানা কারণে আর যুদ্ধনিবৃত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের দেশের সমাবেশ আর করতে না চাইলে তখন প্রাথমিক দেশ বাধ্য হয়ে তার বা তাদের কথা মান্য করে নিয়ন্ত্রণের সীমার মধ্যে চলে আসতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের দেশের চেয়েও বহুপ্রকার স্বার্থ থাকে, এক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের গরজেই উদ্যোগী হতে পারে। এ-কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের দেশ নিজেরা বসে সমাধান খুঁজে বের করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে যুদ্ধ বন্ধ করা যায়। এভাবে পরিশেষে সমাবেশ 'নিরোধকের' ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে।

শুধুমাত্র প্রাথমিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ সীমিত থাকলে সে-যুদ্ধ থামানো কষ্টকর এবং কার্যত তা দীর্ঘায়িত ও সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। কেননা, এক্ষেত্রে খবরদারি ও পরিচালনা করার মতো কোনো সভ্যতার সাযুজ্য 'কোররাষ্ট্র' থাকে না। তাই দেখা যায়, সভ্যতার কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতি এবং সমাবেশবিহীন ফাটলরেখাযুক্ত যুদ্ধ বরাবর বিবাদমান দেশের মধ্যে খুবই জটিল ও সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে। তাছাড়া যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে

বিদ্রোহীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হলে বিপক্ষ বা সরকার তা মানতে আগের চাইতে আরও না-রাজি হয়ে থাকে। ফলে সামাধানের পথ হয়ে ওঠে কন্টকাকীর্ণ। সরকার সাধারণত চায় বিদ্রোহীরা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে যুদ্ধ থামিয়ে দিক, যা বিদ্রোহীরা কখনও মানেন না। সরকার তারপর যা করে তা হল কঠোর হাতে দমন করতে গিয়ে নৃশংসতার আশ্রয় নেয়, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণহত্যার মতো ঘটনাও ঘটে চলে। কিন্তু সরকার এ সমস্যাকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে চালিয়ে নিতে চায় এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় বহিঃশক্তির নাকগলানোকে পছন্দ করে না। এ কারণে, অনেক নিরপেক্ষ দেশ তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। চেচনিয়ার বেলায় পাশ্চাত্যের ভূমিকা তেমনি ঘটেছিল।

কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সভ্যতার যুদ্ধ জটিল হয়ে ওঠে। সুদানের যুদ্ধকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করলে দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে সেখানে যুদ্ধ শুরু হলেও ১৯৭২ সালে যুদ্ধ থেমে যায়। এর কারণ ছিল এই যে, উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যুদ্ধ চালিয়ে নেবার মতো ছিল না। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল, 'দি ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অব চার্চেস' এবং 'দি অল আফ্রিকান কাউন্সিল অব চার্চেস' দৃশ্যত বেসরকারিভাবে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আদ্দিস আবাবার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যে-চুক্তির দ্বারা দক্ষিণ সুদানের জন্য স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। এর এক দশক পরে, সরকার ওই চুক্তি বাতিল করে দেয়। যুদ্ধ পুনরুজ্জীবিত হল, বিদ্রোহীরা তাদের লক্ষ্য পুনঃনির্ধারিত করলেন, সরকারের অবস্থান নাজুক হয়ে পড়ল, আর সে-অবস্থায় যুদ্ধ থামাবার সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। আরববিশ্ব বা আফ্রিকা কারও কোনোপ্রকার 'কোররাষ্ট্র' না-থাকার দরুন তারা কেউই যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগে ব্যর্থ হল। জিমি কার্টার ও কিছু আফ্রিকীয় নেতা শান্তিপ্রক্রিয়ার জন্য কাজ করেও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। কেনিয়া, ইরিত্রিয়া, উগান্ডা এবং ইথিওপিয়াকে নিয়ে 'কমিটি অব ইস্ট আফ্রিকান স্টেটস্'ও কোনো প্রকার সমাধান দিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুদানের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। তাই তার পক্ষে সার্থক কোনো ভূমিকা পালন করা সম্ভব হল না। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব কমতে কমতে সৌদিআরবের ওপর এসে সীমিত হল, কিন্তু সুদানের ওপর সৌদিপ্রভাবও ছিল নিতান্তই তুচ্ছ।[৫৬]

সাধারণভাবে অস্ত্রবিরতির জন্য আলাপ-আলোচনা এগিয়ে যায় তখন, যখন বিবদমান উভয়পক্ষের সমান তালে এবং সমপর্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের দেশ উদ্যোগী হয়। এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র কোররাষ্ট্র একাই যুদ্ধ নিবৃত্তকরণের জন্য যথার্থ হতে পারে। ১৯৯২ সালে 'দি কনফারেন্স অন সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ' আজারবাইজান-আর্মেনীয় যুদ্ধে মধ্যস্থতা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

'মিনস্ গ্রুপ' নামে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্র নিয়ে, যাতে নাগারনো-কারাবাক, আর্মেনীয়, আজারবাইজান, রাশিয়া ও তুরস্কের অংশগ্রহণ ছিল, সেইসঙ্গে ছিল ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সুইডেন, চেকপ্রজাতন্ত্র, বেলারুশ

এবং যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন ও ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আর্মেনিয় 'ডায়াসপোরা' ব্যতীত অন্যান্য দেশের কেউই যুদ্ধ থামার জন্য উদ্যোগ নেয়নি, বা তাদের হয়তো তেমন ক্ষমতাও ছিল না। যখন দুটি তৃতীয় পর্যায়ের দেশ, যেমন রাশিয়া ও তুরস্ক এবং তাদের সাথে আমেরিকা একটি পরিকল্পনায় ঐক্যমত পোষণ করল, তখন দেখা গেল নাগারনো-কারাবাকের আর্মেনীয় কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হল। এ অবস্থায় রাশিয়া স্বাধীনভাবে একাই নিজের উদ্যোগে মস্কোতে আর্মেনীয় এবং আজারবাইজানের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার উদ্যোগের সূত্রপাত করেছিল। কিন্তু তা'ছিল আসলে 'মিনস্ গ্রুপের বিকল্প' এবং তা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট অর্থহীন বলে প্রতীয়মান হল।[৫৭] পরিশেষে যখন প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন রাশিয়া ইরানের সহায়তায় আলাপ-আলোচনা এগিয়ে নিল এবং তা একটি অস্ত্রবিরতির মতো ঘটনার জন্ম দিল। দ্বিতীয় অংশীদার হিসেবে রাশিয়া ও ইরান যৌথভাবে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি অস্ত্রবিরতির ব্যবস্থা তাজিকিস্তানেও করতে পারল।

ট্রান্সককেসীয় এলাকায় রাশিয়া তার উপস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী এবং চলমান রাখতে পারে। কেননা, এ এলাকায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিবৃত্তকরণে ও অস্ত্রবিরতির মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণযোগ্য। এটি বসনিয়ায় আমেরিকার ভূমিকার ঠিক বিপরীত। ডায়টন চুক্তিটি কিন্তু প্রস্তাব-আকারে এসেছিল সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠী, যেমন জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকার নিকট থেকে, কিন্তু কোনো একটি তৃতীয় স্তরের রাষ্ট্রই সেখানে তাৎক্ষণিক কোনো চূড়ান্ত 'চুক্তি' দেখাতে পারেনি। যুদ্ধরত প্রাথমিক গোষ্ঠীর তিনটির মধ্যে দুটি অংশগ্রহণকারী দেশের ভেতর নিষ্পত্তি প্রায় দোড়গোড়ায় এসেছিল। উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়েছিল আমেরিকাপ্রভাবিত ন্যাটোবাহিনীর ওপর। যদি আমেরিকা বসনিয়া থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করত, তবে ইউরোপীয় শক্তি বা রাশিয়া কেউই ওই চুক্তি এগিয়ে নেয়ার ও বাস্তবায়ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করত না। বসনীয়, সার্বীয়, ক্রোয়েশীয় সবাই যুদ্ধ পুনরায় শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর সার্বীয় ও ক্রোয়েশীয় উভয়ই তাদের জন্য 'বৃহত্তর সার্বীয়া' অথবা 'বৃহত্তর ক্রোয়েশীয়ার' স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছিল না।

রবার্ট পুটনাম বলেছেন, 'যেভাবে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, তা ছিল 'দুই স্তরের খেলা' যেখানে কূটনীতিকরা আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তারা তাদের দেশস্থ প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা চালিয়েছে, আবার বিদেশী প্রতিপক্ষের সাথেও আলোচনা করেছে। প্রায় সমরূপ বিশ্লেষণে আমি (হান্টিংটন) দেখিয়েছি যে, কীভাবে একটি কর্তৃত্ববাদী সরকারের সংস্কারবাদীরা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা চালিয়েছে বিরোধীপক্ষের নরমপন্থীদের সাথে, আবার কীভাবে চরমপন্থীদের সাথে আলোচনা অথবা তাদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা চালিয়েছে— আর এসবই হয়েছে একই ধারায় ও একই সাথে।'[৫৮] দুইস্তরের এই খেলা চলেছে কমপক্ষে ৪টি অংশীদারের মধ্যে এবং এখানে তাদের ভেতর নিদেনপক্ষে ৩ অথবা ৪ ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ কার্যত একটি জটিল যুদ্ধ। তিনটি স্তরের খেলা যেখানে জড়িত

হয়, কম করে হলেও সেখানে থাকে ৬টি অংশীদার এবং তাতে সৃষ্টি হয় কমপক্ষে ৭ ধরনের সম্পর্ক (দেখুন ফিগার নং- ১১.১)।

ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধে সমান্তরাল-সম্পর্ক থাকে প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের অংশীদারদের মধ্যে। অন্যদিকে উলম্ব-সম্পর্ক থাকে প্রত্যেক সভ্যতাসম্পন্ন দেশের বিভিন্ন স্তরের অংশীদারদের মধ্যে। এমতাবস্থায়, একটি 'সম্পূর্ণ মডেল প্রচেষ্টা' দ্বারা যুদ্ধে নিবৃত্তি অর্জন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দরকার :

- দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অংশীদারদের সক্রিয় ভূমিকা;
- তৃতীয় স্তরের পর্যায়ের অংশীদারদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার দ্বার উন্মোচন করা, যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ রাখা যায়;
- তৃতীয় স্তরের অংশীদারদের হাতে একই সঙ্গে 'ভাতের থালা ও লাঠি' দুটোই রাখতে হবে। প্রয়োজনে দ্বিতীয় ও প্রাথমিক অংশীদারদের সিদ্ধান্ত মানতে চাপ প্রয়োগ ও তা মানতে বাধ্য করা;
- দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশীদার প্রয়োজনে প্রাথমিক অংশীদারদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে এবং এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার মতো কাজ করার প্রয়োজন হলে করা যাবে;
- এসব চাপের ফলে, প্রাথমিক পর্যায়ের অংশীদার তা গ্রহণ করবে এবং অবশ্যই তারা করবে, কেননা তারা তখন অন্য কোনো উপায় খুঁজে পাবে না।

বসনিয়ার শান্তিপ্রক্রিয়ায় উপরের সবকিছুই সংযুক্ত ছিল। ব্যক্তির ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রত্যেকেই উল্লেখযোগ্যভাবে চুক্তিতে আসতে সাফল্যের মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল। পাশ্চাত্যদেশগুলো শান্তিপ্রক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে পরিপূর্ণভাবে রাশিয়াকে গ্রহণ করতে চায়নি। রাশিয়া কিন্তু জোরালোভাবে তাদের এ মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাশিয়া বলতে চেয়েছে ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া সার্বীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাছাড়া বলকান এলাকায় রাশিয়ার সবসময়ই প্রত্যক্ষ কিছু স্বার্থের সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা হয়তো অন্যকোনো বৃহৎ শক্তির নেই। অতএব, রাশিয়া মনে করে যে, শান্তি প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ থাকা জরুরি এবং রাশিয়া এ-সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাবকে একটি কর্তৃত্বমূলক মনোভাব বলে আখ্যায়িত করে। ১৯৯৪ সালে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুভূত হয় যে, শান্তি প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা না করে ন্যাটো বসনিয়ায় সার্বীয়দের হুমকি প্রদান করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তারা সারায়েভো থেকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র না সড়িয়ে নেয়, তবে তাদেরকে বিমানহামলার মুখোমুখি হতে হবে। সার্বীয়রা এ নির্দেশ অমান্য করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং ন্যাটোর সঙ্গে একটি সহিংস পরিস্থিতির দিকে উভয়পক্ষ যেতে শুরু করে। ইয়েলৎসিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'কেউ কেউ রাশিয়াকে বাদ দিয়ে বসনিয়া বিষয়ে শান্তিপ্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, এ অবস্থা আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।' রাশিয়া তখন সার্বীয়দের বলে যে, রাশিয়া যদি শান্তিমিশনের মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়, তাহলে যেন তারা

সারায়েভো থেকে ভারী অস্ত্র প্রত্যাহার করে নেয়। এই 'কূটনৈতিক অভ্যুত্থান' বস্তুত সহিংসতাকে থামাতে কাজ দিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে রাশিয়া পশ্চিমাবিশ্বকে এক হাত দেখিয়ে দিল যে, রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সার্বিয়ার সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়। অন্যদিকে, এর ভেতর দিয়ে রুশবাহিনীকে বিবাদের মূল কেন্দ্রস্থলে বসনিয়ার মুসলমান এবং সার্বীয়দের মধ্যমণিতে বসিয়ে দিল।[৫৯] এ তৎপরতার ভেতর দিয়ে রাশিয়ার দাবি তথা পাশ্চাত্যের সঙ্গে বসনিয়া প্রশ্নে 'সমতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব' বাস্তব ভিত্তি পেল।

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা না-করেই সার্বীয় অবস্থানের ওপর বিমানহামলা অনুমোদন করে। এ ঘটনা রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া ও দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইয়েলৎসিনের জাতীয়তাবাদী বিরোধীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর পরপরই সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পর্যায়ের শক্তি হিসেবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি যোগাযোগ গোষ্ঠী গঠন করে, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে এ-সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যায়।

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে ওই গোষ্ঠী একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যাতে বলা হয় মুসলমান ক্রোয়াট ফেডারেশনে শতকরা ৫১ ভাগ বসনীয় মুসলমান এবং শতকরা ৪৯ ভাগ বসনীয় সার্বরা থাকবে। এটি ছিল পরবর্তীতে ডায়টন চুক্তির পূর্বসুরী। পরবর্তী বৎসরে একটি চুক্তিতে আসার চেষ্টা করা হয় যে, কীভাবে রুশবাহিনী ডায়টন চুক্তি বাস্তবায়নের কাজে হাত লাগাতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের চুক্তিটি দ্বিতীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের গলাঃধকরণ করানো হয়। রাশিয়ার কূটনীতিক ভিটালি চুরকিন বলেন, 'মার্কিনীরা যেন বসনিয়া-অধ্যায় থেকে শিক্ষা নেয়, জার্মানরা যেন ক্রোয়াট অধ্যায় থেকে শিক্ষা নেয়, আর রুশরা শিক্ষা নেবে সার্বীয়দের নিকট থেকে।'[৬০]

যুগোস্লাভ-যুদ্ধে প্রথমদিকে রাশিয়া সার্বীয়দের বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখে, কিন্তু তারা তো ছাড় দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। একটি গোষ্ঠীভুক্ত ও আত্মীয়তুল্য দেশ হিসেবে রাশিয়ার পক্ষে সার্বীয়দের নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং সংকট মোকাবেলার জন্য প্রণীত প্রস্তাব মেনে নিতেও চাপ সৃষ্টি করেছিল। এভাবে, রাশিয়া চাপ সৃষ্টি না করলে হয়তো তারা শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালে রাশিয়া গ্রিসের সঙ্গে সার্বীয়দের মধ্যস্থতায় ডেনমার্কের শান্তিমিশন কর্মীকে জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। বসনিয়ায় সার্বীয়রা রাশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত চাপের ফলে চুক্তি মেনে নিয়েছিল; যদিও তাদের হাতে তখনও খেলার মতো 'তাস' অবশিষ্ট ছিল। তারা আত্মীয়গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়াকে অপদস্থ করতে চায়নি। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়া বসনীয়ায় সার্বীয়দের নিকট থেকে নিশ্চয়তা আদায় করে এই শর্তে যে, তারা আর গোরাজদে শহরে আক্রমণ করবে না; কিন্তু সার্বীয়রা তাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেছিল। এতে রাশিয়া খুব রাগান্বিত হয়ে ওঠে। একজন রুশ ঘোষণা দেন যে, 'বসনিয়ায় সার্বীয়দের যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে দাও।' ইয়েলৎসিন চাপাচাপি করেন যে, সার্বিয়ার নেতৃত্বকে রাশিয়ার ওপর প্রদেয় দায়দায়িত্ব পালনের অধিকার পরিপূর্ণ করতে দিতে হবে।' তা না হলে রাশিয়া ন্যাটোর বিমানহামলার ওপর থেকে প্রদেয় আপত্তি তুলে নেবে।[৬১]

ক্রোয়েশিয়াকে সমর্থন দিতে গিয়ে জার্মানি এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ, ক্রোয়েশিয়ার আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। প্রেসিডেন্ট তুজমেন তার ক্যাথলিক-অধ্যুষিত দেশটিকে ইউরোপের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে এবং ইউরোপীয় সংগঠনসমূহের অন্তর্ভুক্ত হতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন এবং এ-বিষয়ে ছিলেন যারপরনেই উদ্বিগ্ন। ইউরোপীয় দেশগুলো তুজমেনের এই মনোভাবকে কাজে লাগায় এবং কূটনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক সহায়তার ভেতর দিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্রোয়েশিয়াকে 'ধমক দেয়া যায়'। তাই দেখা যায়, 'ক্লাবের' সদস্যপদ পাওয়ার জন্য লালায়িত ক্রোয়েশিয়াকে তারা বিভিন্ন সময় 'মিটমাট করার' পরিস্থিতির দিকে টেনে নেয়। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে তুজমেনকে বলা হল, "তুমি যদি পশ্চিমের অংশ হতে চাও, তবে তোমাকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সৈন্যবাহিনীকে ক্রাজিনাতে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" একজন কূটনীতিক বলেন, 'পশ্চিমের সঙ্গে যোগদান' তুজমেনের-এর নিকট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোনোভাবেই রুশ একাকী সার্বীয়দের সঙ্গে থাকতে চাইছিল না। তাকে নৃগোষ্ঠীক নিশ্চিহ্নকরণের বিষয়েও সতর্ক করে দেয়া হল। বিশেষ করে তার দ্বারা বিজিত ক্রুজনা পূর্ব-স্লোভেনিয়া এবং অন্যান্য স্থানে কোনোপ্রকার বারাবাড়ি না-করতেও বলা হল। আরও বলা হল, ক্রোয়েশিয়া যদি মুসলমানদের সঙ্গে ফেডারেশনে যোগ না দেয় তবে, 'পশ্চিমের দরজা তার ক্ষেত্রে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে'[৬২] (কথাটি একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন)।

প্রধান দাতাদেশ হিসেবে জার্মানি একটি শক্ত অবস্থানে থেকে ক্রোয়েশিয়ার আচার আচরণের ওপর প্রভাব রাখতে থাকে। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রোয়েশিয়ার আন্তরিক সম্পর্ক এক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল। রাশিয়া এবং জার্মানির ন্যায় বসনিয়ার সঙ্গে আমেরিকার সাংস্কৃতিক কোনো মিল না-থাকার দরুন তার অবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল, এজন্য মিটমাট করার বিষয়ে মুসলমানদের ওপর পর্যাপ্ত চাপ সৃষ্টি করতে তার অসুবিধা ছিল। উপরন্তু, গলাবাজির বাইরেও যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র বসনিয়াকে অস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইরান ও অন্যান্য মুসলমানদেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় ও সংগ্রহ করার বিষয়ে সহায়তা করেছিল। এজন্য, বসনিয়ায় মুসলমানদের ভেতর কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত হতে থাকে এবং তারা ধীরে ধীরে বৃহত্তর মুসলমান-পরিচয়ের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে শুরু করে। সেসঙ্গে অবশ্য বসনীয় মুসলমানগণ 'আমেরিকার দ্বৈতনীতির' বিরুদ্ধেও ফুঁসে ওঠে, এবং কুয়েতের ন্যায় মার্কিন আগ্রাসন যাতে না ঘটে, সেজন্য সতর্ক থাকে। তাছাড়া অতি-নির্যাতনের ফলে বসনীয় মুসলমানদের মনে যে ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছিল, তা প্রশমিত না-হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'অন্যান্য কিছু আত্মস্থ' করার প্রস্তাব দেয়াও ছিল অসুবিধাজনক। অতএব, বসনিয়া শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। এজন্য তারা তাদের মুসলমানবন্ধুদের সাহায্য নেয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে তারা হারানো ভূখণ্ডের একটি বিরাট অংশ পুনরুদ্ধার করে ফেলে।

যুদ্ধের প্রাথমিক অংশীদারদের মধ্যে প্রতিরোধ এবং মিটমাটের মনোভাব একত্রে চলতে থাকে। দেখা যায়, ট্রান্সককেসীয় যুদ্ধে উগ্র বা অতি-জাতীয়তাবাদী আর্মেনীয় বিপ্লবী ফেডারেশন (ডাসনাক) যা ছিল আর্মেনীয় ডায়াসপোরাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং নাগারনো-কারাবাক ছিল তারই নিয়ন্ত্রণাধীন, ১৯৯৩ সালে তারা তুর্কি-রুশ-আমেরিকান শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সে-প্রস্তাব অবশ্যও আর্মেনীয় ও আজারবাইজানিরা মেনে নিয়েছিল। এই গোষ্ঠী নিজেরা সামরিক-আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং গণহত্যা ও নৃগোষ্ঠীক নিশ্চিহ্নকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। এভাবে তারা আরও বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চায়। আর সেজন্য, তুলনামূলক নরমপন্থী আর্মেনীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়। নাগারনো কারাবাকে সামরিক সাফল্য আর্মেনিয়াদের জন্য সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হতে থাকে। সেজন্য তারা তুরস্ক এবং ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে তৎপর হয়ে ওঠে। কেননা, তুরস্ক কর্তৃক অবরোধ আরোপের ফলে সেখানে খাদ্য ও জ্বালানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। 'কারাবাকে যুদ্ধের প্রশ্নে যত ভালো খবর ছিল তার সবই ছিল ইরেভেনের জন্য দুঃসংবাদ', একজন পাশ্চাত্য কূটনীতিক এমন মন্তব্য করেছেন।[৬৩] আর্মেনিয়ার প্রেসিডেন্ট লিভন টার পেট্রোসিয়ন প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে, ভারসাম্য আনতে ব্যস্ত থাকতেন। অবশেষে, ১৯৯৪ সালে তার সরকার আর্মেনিয়ায় ডাসনাক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নাগারনো-কারাবাকে আর্মেনীয়দের মতো বসনিয়ার সার্বীয় ও ক্রোয়াটগণ চরমপন্থা গ্রহণ করেছিল, যার ফলে ক্রোয়েশীয় ও সার্বীয় সরকার শান্তিপ্রস্তাব এগিয়ে নিতে চাপের মুখে পড়ে যায়। তাছাড়া বসনিয়ার অবস্থানরত তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীয় সাথে সম্পর্কে দেখা দেয় টানাপড়েন। ক্রোয়েশিয়ার জন্য এ সমস্যা তত প্রকট ছিল না, কেননা বসনীয় ক্রোয়াটগণ মুসলমানদের সঙ্গে ফেডারেশনে যোগ দিতে অনাপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও এ-ধরনের সংযুক্তি বাস্তবে ছিল না।

ব্যক্তিগত বিরোধ ও বিদ্বেষ সার্বীয় নেতা রাদোভান কারাদজিক এবং বসনীয় সার্বীয় নেতা মিলোসোভিচের মধ্যে গোলমেলেভাবে চলতে থাকে। ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে মিলোসোভিচ কর্তৃক অনুমোদিত শান্তি পরিকল্পনা কারাদজিক প্রত্যাখ্যান করেন। সার্বীয় সরকার অবরোধের সমাপ্তি চাচ্ছিল, এবং এ-বিষয়ে ছিলেন উদ্বিগ্ন। সরকার ঘোষণা দেয় যে, তারা বসনীয় সার্বদের সঙ্গে খাদ্য ও ঔষধ বাদে সকলপ্রকার বাণিজ্যসম্পর্ক বাতিল করবে। এর বদলে জাতিসংঘ সার্বীয়ার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল ও সহজ করে দেয়। পরের বৎসর মিলোসোভিচ ক্রোয়েশীয় বাহিনীকে ক্রাজিনা থেকে বহিষ্কার করার অনুমতি দেন এবং উত্তরপশ্চিম বসনিয়ায় তাদের তাড়িয়ে দিতে মুসলমান-বসনিয়াকে সায় দেন। তুজমিনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন যে, সার্বীয়দের দ্বারা দখলকৃত পূর্বস্লোভানিয়া ক্রমান্বয়ে ক্রোয়েশিয়ার নিয়ন্ত্রণের নিকট ফেরত দেয়া হবে। বৃহৎ শক্তিগুলোর অনুমোদনান্তে 'ডায়টন বোঝাপড়া' বসনীয় সার্বদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

মিলোসোভিচ-এর কার্যক্রমের ফলে জাতিসংঘ সার্বিয়ার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। তারা তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহে নিয়ে আসার পথও প্রশস্ত করে দেয়। জাতীয়তাবাদী, উগ্র ও মারমুখো, নৃগোষ্ঠীক নিশ্চিহ্নকরণকারী মিলোসোভিচ, ১৯৯২ সালের গ্রিক-সার্বীয় যুদ্ধবাজ কার্যত ১৯৯৫ সালে শান্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হন। তবে তিনি অনেক সার্বীয়দের নিকট ছিলেন একজন চলমান আতঙ্ক। সার্বীয় জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা তিনি বেলগ্রেডে নিষিদ্ধ ঘোষিত হন, অর্থোডক্স চার্চও তার জন্য অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেয়, তিনি ক্রাজিনাতে বসনীয় সার্বদের দ্বারাও নিন্দিত হন। এসবই পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য পিএলও-এর নেতার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে দুঃসম্পর্কের বাস্তবতা ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধের এটি আর এক উল্লেখযোগ্য দিক।

যুদ্ধের বোঝা বহনের ক্লান্তি ও তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের যুদ্ধ বন্ধের প্রণোদনা ও চাপের মুখে দ্বিতীয় ও প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীরা অনেককিছু মেনে নিতে বাধ্য হয়। নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের বদলিয়ে ক্ষমতায় থাকে বা উল্টোভাবে চরমপন্থীরা নরমপন্থী বনে যান, যেমন হয়েছিলেন মিলোসোভিচ। তারা দেখেন যে, নরমপন্থী হওয়াটাই লাভজনক। তারা তাই হয়ে থাকেন, যদিও সেখানেও থাকে নানা ধরনের ঝুঁকি। কেননা, এক্ষেত্রে তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হতেও পারেন। আর এর জ্বালা শত্রুর ঘৃণার চেয়ে বুকের পাঁজরে বেশি বিদ্ধ হয়। কাশ্মীর, চেচেন এবং শ্রীলঙ্কার সিংহলি নেতাদের নিজ লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভাগ্য হয়তো সাদাত, রবিন প্রমুখের মতো রয়েছে। এরা সবাই সংকট উত্তরণের জন্য বিরোধীদের সঙ্গে মীমাংসার পথ ধরেছিলেন, কিন্তু নৃগোষ্ঠীক ও স্বজাতীয়রা তাদের কার্যক্রমকে মেনে নিতে পারেনি। ১৯১৪ সালে একজন সার্বীয় জাতীয়তাবাদী নেতা অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। 'ডায়টন' সমাপ্তির পরে হয়তো উক্ত পরিণতির প্রধান ও প্রথম বলি হবেন স্লোদোভান মিলনোভিচ।

থেমে থেমে অনুষ্ঠিত হওয়া ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে 'চুক্তি' সাফল্য আনেত পারে। অবশ্য, তা হতে পারে খুবই ক্ষণস্থায়ী। আর এটি হল একধরনের ভারসাম্য ব্যবস্থা, যা অর্জিত হয় প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। ১৯৯৪ সালে বসনিয়া সমস্যার সমাধানে শতকরা ৫১ ভাগ এবং শতকরা ৪৯ ভাগ 'ফর্মুলা' স্থায়িত্ব পায়নি। ১৯৯৪ সালে সার্বীয়রা ৭০ ভাগ ভূমি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এটি তখনই স্থায়িত্ব পায়, যখন ক্রোয়েশিয়া এবং মুসলমানেরা শত্রুতা হ্রাস করে এনে সার্বিয়ায় নিয়ন্ত্রণের শক্তিকে অর্ধেক নামিয়ে আনে। নৃগোষ্ঠীক নিশ্চিহ্নকরণ কার্যক্রমও শান্তিপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে আনে। কেননা তাতে করে ক্রোয়েশিয়ায় সার্বীয়দের সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পায় এবং এর ফলে তিনটি গোষ্ঠী পরস্পরের নিকট থেকে শক্তি প্রয়োগের ফলে, বা স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উপরন্তু, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে প্রায়শই তৃতীয় পর্যায়ের দেশগুলো সভ্যতার 'কোররাষ্ট্র' হিসেবে

পরিচিত দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই একটি যুদ্ধে নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা নেয় এবং স্থায়ী সমাধান খুঁজতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের চেষ্টায় ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ থামানো সম্ভব নয়। কোররাষ্ট্রগুলোর প্রচেষ্টাতেই কেবল এসব যুদ্ধকে বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি বা বৃহত্তর বিশ্বযুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনা থেকে থামিয়ে আনা সম্ভব। তাই কোররাষ্ট্র ও পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলোর দায়িত্বের ভাগ অনেক বেশি। ফাটলরেখা বরাবর যুদ্ধ নিচে থেকে শুরু হয়ে থাকে। আর ফাটলরেখা বরাবর শান্তি উপর থেকে নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হয়।

(ঙ)

সভ্যতার ভবিষ্যৎ

অধ্যায় - ১২

পাশ্চাত্য সভ্যতা, সভ্যতাসমূহ এবং সামগ্রিক সভ্যতা

পাশ্চাত্যের নবায়ন?

সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসেরই অন্তত একবার বা প্রায়শই পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে। সভ্যতা যখন সর্বজনীনভাবে উদয় হয়, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন বিবেকশূন্যভাবে মনে করে যে, যেন তাদের এ সভ্যতার ক্ষয় নেই, (টয়েনবি যাকে বলেছেন— 'অমরত্বের বাসনার মরীচিকার ঘোর')। তারা আরও মনে করে যে, তাদের সভ্যতাই চূড়ান্ত— এটিই মানবসমাজের জন্য অমর ও চূড়ান্ত সভ্যতা। এ ধারণা রোমান সভ্যতার ক্ষেত্রেও পোষণ করা হত। পরবর্তীতে এটি আব্বাসীয় খেলাফত, মোঘল সাম্রাজ্য, এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যেও বেলাতেও প্রযোজ্য ছিল। এ-ধরনের সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন একটি নির্মম সত্যকে অবজ্ঞা করে থাকে। তারা আগ্রহী থাকে, এমন নয় যে, তা তাদের অন্ধকারের আলো বিশেষ, বা জনমানবহীন প্রান্তরে নিশিযাপনের আশ্রয়স্থল; আসলে তারা এটিকে একটি মিশন মনে করে থাকে, যা মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতিশ্রুত জগৎ অর্জনের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে কাজ করে। প্যাক্স ব্রিটানিকার সর্বোচ্চ সময়ে এর কিছুটা সত্যে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজ মধ্যবিত্তরা ১৮৯৭ সালে দেখল যে, 'তাদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে এজন্য তাদের পরস্পরকে আলিঙ্গন করার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা তারা তাদের ইতিহাসের পরিসমাপ্তির ঘটনাকে পরমতৃপ্তির বিষয় মনে করল।'[১] সমাজ মনে করে যে, তাদের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে; আসলে কিন্তু তা সাধারণত পরিসমাপ্তি নয়, বরং বলা চলে তাদের ইতিহাসের অবনতি বা পতনের মতো পরিস্থিতি। পশ্চিমা দুনিয়া কি এ প্রক্রিয়া বা ধারার বাইরে? এ সম্পর্কে মেল্‌কো দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন :

প্রথমত, পাশ্চাত্য সভ্যতা কি একটি বিশেষ ধরনের প্রজাতি, নিজেই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি, যা অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনাবিহীন?

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্তি কি বিশ্বেও অন্যান্য সভ্যতার অগ্রগতি, উত্থান এবং স্থায়িত্বের জন্য হুমকি হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে?[২]

পশ্চিমের প্রতি অনুরক্তরা স্বভাবই দুটি প্রশ্নের 'ইতিবাচক' উত্তর দিয়ে থাকেন। সম্ভবত তারা সঠিকই বলেন। অতীতে অন্যান্য সভ্যতার মানুষও তেমনিভাবেই চিন্তা করতেন, এবং তাদের চিন্তা নির্ভুল ছিল না। স্পষ্টতই পাশ্চাত্য সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার

চেয়ে নিজেকে পৃথক করেছে, আর এ সভ্যতা বিগত ১৫০০ সাল থেকে অন্যান্য সভ্যতার ওপর প্রভাব রেখে চলেছে, একথাও সত্য। পাশ্চাত্য সভ্যতা আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেছে। এ দুটি বিষয় আজ বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয়েছে, ফলে অন্যান্য সভ্যতাভুক্ত সমাজগুলো পাশ্চাত্য অনুসৃত ধারার মাধ্যমে সম্পদ ও আধুনিক জীবন পেতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য কি এ-অর্থ বোঝায় যে, তাদের সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও গতিশীল মূলগতভাবে অন্যান্য সভ্যতার ধারার চেয়ে সম্পূর্ণভাবে পৃথক?

ইতিহাসের পদচিহ্নসমূহ এবং তুলনামূলক সভ্যতার ইতিহাসের বিশ্লেষক বিজ্ঞজনেরা কিন্তু অন্যসুরে কথা বলেন। পাশ্চাত্যের সভ্যতার অদ্যাবধি অগ্রগতির ধারা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারেনি। অর্থাৎ, এ ধারাটি পৃথিবীর সকল সময়ে সকল সভ্যতার ইতিহাসের একটি 'সাধারণ ধারা'।

ইসলামি পুনঃজাগরণতৎপরতা এবং এশিয়ার অর্থনৈতিক গতিশীলতার মধ্যে যে সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে চলেছে, এবং সেসঙ্গে অন্যান্য স্থানে চলমান রয়েছে, সে সকল সভ্যতা আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য সম্ভাবনাত্মক ও ভীতিকর বটে। পাশ্চাত্যের সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার 'কোররাষ্ট্রের' একটি যুদ্ধ খুব প্রয়োজনীয় নয়। তবে এটি ঘটেও যেতে পারে। বিকল্পভাবে, পাশ্চাত্যে সভ্যতার ক্রমাগত এবং অনিয়মিত অবনতিশীলতা, যা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আরম্ভ হয়েছে, তা চলমান থাকবে দশকের-পর-দশক এবং পতনপ্রক্রিয়া সম্ভবত পরবর্তী শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে। অথবা, পশ্চিমা সভ্যতা পুনঃজাগরণ একটি প্রক্রিয়া অতিক্রম করে তার ধ্বংসকে ঠেকিয়ে স্বর্ণযুগ পুনরুদ্ধার করে এগিয়ে যাবে, যার ভেতর দিয়ে আবার বিশ্বনেতৃত্বে একক আধিপত্য বিস্তার করবে। এবং অন্যান্য সভ্যতা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ ও অনুকরণ করবে।

ইতিহাসে সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যবহারযোগ্য একটি প্যাটার্ন ক্যারল কুইগলি উপস্থাপন করেছেন[৩] (অধ্যায়-২ দ্রষ্টব্য)। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ধীরে ধীরে ৩৭০ এ.ডি. থেকে ৭৫০ এ.ডি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একটি 'আকার' অর্জন করে। এ দীর্ঘপথ পরিক্রমায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্রুপদী পর্যায় থেকে শুরু করে তৎকালীন চলমান বিভিন্ন সভ্যতাকে নিজেদের মতো করে তাদের সভ্যতার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটায়। এ প্রক্রিয়ায় সিমেটিক সভ্যতা স্যারাসিন এবং বাববারীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ছিল। এই সভ্যতার গর্ভধারণকাল ৮ম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১০ শতাব্দীর শেষ অবধিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ সময়টি সোজাসাপ্টা ছিল না। এখানে ছিল সংঘাত, নড়াচড়া, সভ্যতাগুলোর মধ্যে অসঙ্গতির অবস্থা, সম্প্রসারণ, সামনে গমন কিংবা পশ্চাদপসরণ। কুইগলির ভাষায়, 'যেহেতু অন্যান্য সভ্যতা সম্মুখে এসে পড়েছে তাই পাশ্চাত্য সভ্যতা তার সংঘাতকাল অতিক্রম করছে।'

পাশ্চাত্য সভ্যতার এলাকা হল একটি নিরাপত্তাসংক্রান্ত এলাকা, পাশ্চাত্যের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধ অবশ্য একটি সাময়িক শীতলযুদ্ধ ব্যতীত ছিল অচিন্তনীয়। পাশ্চাত্য (অধ্যায়-২-এ আলোচিত) সামনে এগিয়ে যাচ্ছে; পাশ্চাত্যের সর্বজনীনতা, যা রাজনৈতিক দিক থেকে জটিল ধরনের মিত্রসংঘ, চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমাজ যুক্ত হয়ে একটি সভ্যতার ধারা

তৈরি করেছে— যে সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী রাজনীতি।' পাশ্চাত্যের সমাজ এমন একটি সাবালক পর্যায়ে পৌছেছে, যেখানে থেকে পরবর্তী প্রজন্ম সভ্যতাকে পৌনঃপুনিক হিসেবে চিহ্নিত করবে। কেননা কুইগলি মনে করেন, বর্তমান সময়টিতে পাশ্চাত্য আর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছে না, বা কোনো বহিঃবিশ্বেও যুদ্ধরত নেই। সুতরাং, এ সময়টি শান্তির কাল বৈ কিছু নয়। উপরন্তু, এ সময়কাল প্রগতি, উন্নতি ও অগ্রগতির যুগ— এজন্য যে, তা অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক শক্তিকে জাগতে দিচ্ছে না, নিজেদের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের শর্ত তুলে নিচ্ছে, পরিমাপকের জন্য সাধারণত মানদণ্ড ব্যবহার করছে। মাপকাঠি, মুদ্রা এবং সকল সরকার মিলেমিশে এমন একটি সরকারব্যবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যা পাশ্চাত্যকে একটি সর্বজনীন সাম্রাজ্যে রূপ দিতে চলেছে।'

পূর্বের সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' এবং তার অমরত্বের বিষয়গুলো সমাপ্ত হয়েছে নাটকীয় ও দ্রুততালে। বাহ্যিক অন্য সভ্যতার আক্রমণ ও জয়ের মাধ্যমে অথবা ধীরে ধীরে ওই সভ্যতার বেদনাদায়ক অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অসংহতির কারণে। যখন কোনো সভ্যতা বাহ্যিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজে তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম থাকে এবং অভ্যন্তরীণ কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তার ফলাফল প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। ১৯৬১ সালে কুইগলি বলেন যে, 'সভ্যতা বেড়ে ওঠে, কেননা সভ্যতার সম্প্রসারিত হওয়ার মতো শক্তি থাকে (হাতিয়ার),' আর তা হল সামরিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অথবা অর্থনৈতিক শক্তি, যা উদ্বৃত্ত ও উৎপাদনশীল আবিষ্কার বা বিনিয়োগসম্পর্কিত হয়ে থাকে। সভ্যতা পতনোন্মুখ হয় তখন, যখন তারা তাদের উদ্বৃত্ত নতুনভাবে বিনিয়োগ করতে রাস্তা খুঁজে না পায়। আধুনিককালে দেখা যায়, বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। এটি ঘটে চলেছে, কারণ সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ এখন উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ করছে এবং একটি কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি সেই উদ্বৃত্ত অনুৎপাদনশীল খাতে অহং ও লালসা নিবৃত্ত করতে যত্রতত্র খরচ করে চলেছে, ... যা কি-না ভোগে যত ব্যয় হচ্ছে, বিনিয়োগে তত নয়। এমতাবস্থায় জনগণ তাদের পুঁজি হারাচ্ছে, বিনিয়োগ হচ্ছে না, আর সভ্যতা একটি সর্বজনীন ধ্বংসের নিমিত্তে পঙ্কিলতা ও বদ্ধতার গর্তে পতিত হয়ে পড়েছে। এ সময়টি হল : তীব্র অর্থনৈতিক বিষাদগ্রস্ততা, যা মানুষের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নগামী করে তুলছে। বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের মধ্যে যেন গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে। সমাজ ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। নিষ্ফল কাজকর্ম থামাতে বৃথাই আইনকানুন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু মোটেরওপর কথা হল পতনের নিম্নগতি বেড়েই চলেছে। ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তরে সমাজ ক্রমান্বয়ে মেধাহীন হয়ে পড়ছে, জনগণের বিশ্বস্ততার মানও কমছে। সমাজকে এগিয়ে নিতে নতুন ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করতে হবে। সমাজকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধে সৈনিক হতে মানুষের মধ্যে দারুণ অনীহা কাজ করছে। এমনকি মানুষ কর পর্যন্ত দিয়ে আজ সমাজকে সমর্থন দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

সমাজের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি অন্যের দ্বারা সমাজ দখল হয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে থাকে। যখন সভ্যতা আর নিজেকে সংরক্ষণ করতে পারে না, বা নিজেকে সংরক্ষণ করতেও চায় না, তখন সমাজ ও সভ্যতা অন্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। বারবারিয়ান বহিঃআক্রমণকারীরা তখন চলে আসে, যারা প্রায়শই আসে অন্য

সভ্যতা থেকে, আসে যুবশক্তি নিয়ে, এবং আসে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী সভ্যতা নিয়ে।'[৪] ইতিহাসে বারবার ঘটা এমন বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হল এই যে, মনে হয় অনেককিছুই এখানে সম্ভাবনাময় থাকে, যদিও কিছুই অত্যাবশকীয় নয়। সভ্যতা নিজেই নিজেকে সংশোধিত, পরিমার্জিত করে, নবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে।

পশ্চিমাবিশ্বের জন্য কেন্দ্রীয় ইস্যু হচ্ছে, তা কি সর্বতোভাবে যে-কোনো বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ ছাড়াই সভ্যতার অভ্যন্তরীণ ক্ষয়প্রবণতা হ্রাস করে তাকে মেরামতপূর্বক পুনরায় গাত্রোত্থান করতে সক্ষম? পশ্চিমা সভ্যতা কি নিজেকে নবায়ন করে নিজেকে দীর্ঘস্থায়ী করতে অভ্যন্তরীণ অপশক্তি দমন করে ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেবে, নাকি তা অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে বাইরের কোনো গতিশীল সভ্যতার অধীনস্থ হয়ে পড়ছে?*

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমাবিশ্বের সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা কুইগলি চিহ্নিত করেছেন, তেমন একটি পরিপূর্ণ স্বাভাবিক সভ্যতা ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিমাবিশ্ব এখনও অন্যান্য সভ্যতার চাইতে যোজন যোজন গুণ অগ্রবর্তী বা ধনবানের পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিম্নগামী; সঞ্চয়, বিনিয়োগের হার বিশেষ করে পূর্বএশিয়ার তুলনায় নিচে। সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত ভোগের মাত্রা সর্বাগ্রে বিবেচিত হচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও সামরিক উন্নতির জন্য পুঁজির সংকট দেখা দেবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নগামী, বিশেষ করে মুসলমানবিশ্বের তুলনায়। অবশ্য এসব সমস্যার যে-কোনোটিই কিন্তু অবশ্যাম্ভাবীভাবে পশ্চিমা সভ্যতাকে আকস্মিক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারবে না। পাশ্চাত্যের অর্থনীতি এখনও বিকাশমান, কমবেশি পাশ্চাত্যের মানুষ এখনও ধনবান হচ্ছেন। পশ্চিমাবিশ্ব এখনও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও গবেষণায় নেতৃত্ব দিচ্ছে।

নিম্ন-জন্মহার সরকারিভাবে সংশোধন করা সম্ভব নয়। অভিবাসন মূলত দুটি চাহিদা পূরণ করছে : প্রথমত, অভিবাসন গ্রহণকারী দেশ তার চাহিদা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী, পরিশ্রমী জনশক্তি লাভ করতে পারে। দ্বিতীয়ত ভালো হয়, যদি অভিবাসিত মানুষ ও তার সন্তানের আত্তীকৃত হয়ে যান। তাহলে সাংস্কৃতিক সমস্যা অনুভূত হবে না। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম শর্তটি পূরণের বেলায় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আর ইউরোপীয় দেশগুলো দ্বিতীয় শর্তপূরণে বেলায় সমস্যার মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। তবে, সুসমন্বিত নীতির দ্বারা

* হয়তো ভবিষ্যদ্বাণীটি যথার্থ, কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব উপাত্ত ও তত্ত্ব এ-বক্তব্যকে সমর্থন করে না। কুইগলি বলেন, পশ্চিমা সভ্যতা ৫০০ এডিতে অস্তিত্বহীন ছিল, এই সভ্যতাটি ১৫০০ এডি থেকে পুনঃবিকশিত ফুলের মতো জাগ্রত ছিল, এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বর্তমানের সংকট কাটিয়ে এ সভ্যতা সামনে এগিয়ে যাবে, সম্ভবত এ অগ্রগতি এডি ২৫০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।" নতুন সভ্যতার প্রতিনিধি চীন ও ভারতীয় সভ্যতা পশ্চিমাসভ্যতাকে হটিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করবে, অথচ পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা উক্ত দুটি সভ্যতাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, এই দুটি সভ্যতা কালক্রমে পশ্চিমা সভ্যতা ও অর্থোডক্স সভ্যতা দুটিকেই ধ্বংস করে দেবে। (Karroll Quigley, *the Evolution of civilizations : an introduction to Histroical Analysis* (Indianapolics library press 1979, 1st pub. Macmillan in 1961 pp127, 164-66.

উৎস, বৈশিষ্ট্য, এবং আত্তীকরণের সুষ্ঠু নীতিমালা প্রয়োগ করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সরকারগুলো প্রয়োজন মেটাতে পারে।

অর্থনৈতিক এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যার চেয়েও আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নৈতিক অবক্ষয়জনিত সমস্যা। 'সাংস্কৃতিক আত্মহত্যা' রাজনৈতিক অনৈক্য আজ পাশ্চাত্যের নৈমিত্তিক ঘটনা। নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়টি নিম্নরূপ :

১. সমাজবিরোধী শক্তির আশঙ্কাজনক উত্থান; যেমন মাদকাশক্তি ব্যবহার, সাধারণ সহিংসতা বৃদ্ধি;
২. পারিবারিক বিপর্যয় ও পারিবারিক বন্ধনের অবক্ষয়; বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, অবৈধ যৌনসম্পর্কের ঘটনা বেড়ে যাওয়া, কিশোরী মাতৃত্ব এবং এক-সন্তান-সম্পন্ন পরিবারের হার বেড়ে যাওয়া;
৩. অন্ততঃপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, 'সামাজিক পুঁজির' অভাব অনুভূত হচ্ছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্রমাবনতির লক্ষণ। আর এসবই কুলক্ষণ।
৪. কর্মক্ষেত্রে; কর্মনীতির ক্ষেত্রে, সাধারণ কর্মনীতির দুর্বলতা ও অভাব এবং ব্যক্তিপুঁজির সংখ্যা ও ব্যক্তিক প্রভাবে প্রভাবিত।
৫. মেধা, মনন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান এবং বিদ্যার প্রতি অবহেলা ও তা অর্জনে অবহেলা। যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানোচিত অর্জনের মাত্রা হ্রাস পেতে বসেছে।

পশ্চিমাজগতের ভবিষ্যতের চেহারা এবং অন্যান্য সমাজ ও সভ্যতার ওপর তার প্রভাব অনেকাংশেই নির্ভর করবে পাশ্চাত্যবিশ্ব কীভাবে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান করে তার ওপর। বিশেষ করে মনে থাকা প্রয়োজন যে, নৈতিক বিচারে মুসলমান ও এশীয়রা পাশ্চাত্যের ওপরে অবস্থান করছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যথেকেই চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর একটি দিক হল অভিবাসন-সংক্রান্ত। অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আসা অভিবাসীরা আত্তীকৃতির প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, এবং তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচার-অভ্যাস বদলাতে চায় না। এই সত্যটি অধুনা ইউরোপের মুসলমান অভিবাসীদের ভেতর অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যদিও তারা এখনও একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালগিষ্ঠ গোষ্ঠী।

একথা মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকায় হিস্পানিক সম্প্রদায়ই হল বেশিসংখ্যক অভিবাসী। যদি তাদের বেলায় আত্তীকরণ কাজ না করে বা তা ব্যর্থ হয়, তবে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র একটি চিড়সম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এবং অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইউরোপে পাশ্চাত্য সভ্যতা তোপের মুখে পড়বে, যদি সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রীয় ও মৌল উপাদান খ্রিস্টধর্ম দুর্বল হয়ে যায়। কেননা, ইউরোপে ধর্মপালনের বিভিন্ন দিকের... প্রতি অনীহা লক্ষ্য করার মতো।[৫] তবে, এটি কিন্তু ধর্মের প্রতি যতটা না বৈরি মনোভাব থেকে উৎসারিত, তার চেয়ে বেশি হল ধর্ম ও ধর্মপালনের প্রতি উদাসীনতা। বলাবাহুল্য, খ্রিস্টীয় ধর্ম, বিশ্বাস, এর ধারণা, মূল্যবোধ এবং বাস্তবায়ন ইত্যাদি হল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্তম্ভস্বরূপ। 'সুইডিসীয়রা সম্ভবত ইউরোপের সবচেয়ে ধর্মে কম-পরিমাণে বিশ্বাসী মানুষ, কিন্তু তোমাদের জানা উচিত যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানাদি,

সামাজিক কার্যকারিতা, পরিবার, রাজনীতি এবং জীবনযাপন পদ্ধতি এসবই কিন্তু মৌলভাবে লুথারের চিন্তার দ্বারা পরিণতি লাভ করেছে।' তাই বলা চলে, আমরা লুথারীয় ঐতিহ্য ধারণ করে রয়েছি'— এমনটি বলেন একজন সুইডিশ বুদ্ধিজীবী। ইউরোপীয়দের তুলনায় আমেরিকানরা অধিকমাত্রায় ও সংখ্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, যারা ধার্মিক মানুষ, তারা ব্যাপভাবে গির্জায় প্রার্থনার নিমিত্তে অংশ নেয়। তবে, ১৯৮০-এর দশকে আমেরিকায় কোনো ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তার পরবর্তী দশকে ধর্মীয় কার্যক্রমের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়।[৬] খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনীহার মনোভাব প্রকারন্তরে ইউরোপের সভ্যতার স্বচ্ছতার ওপর একটি ভীতি ও ক্ষত সৃষ্টি করবে।

আমেরিকার জন্য তাৎক্ষণিক এবং সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকার জাতীয় পরিচয় পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। আর রাজনৈতিকভাবে অধিকাংশ আমেরিকান যা ধারণ করে বা যার প্রতি তাদের আগ্রহ, এবং যা তারা লালনপালন বা রক্ষা করতে চায়, তা হল : উদারতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আইনের চোখে সকলের সমতা, সাংবিধানিকতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বিংশ শতাব্দীর শেষের পর্যায়ে এই উভয় দিকই খুব কম করে হলেও ক্ষুদ্র; কিন্তু ক্ষমতাশীল বৃদ্ধিজীবীগোষ্ঠীর দ্বারা চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত হয়েছিল। 'বহুধা সংস্কৃতির' নামে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের পরিচয়ের ওপর আক্রমণ করেছিল। এ-কাজের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা আমেরিকায় 'আমেরিকীয় সাধারণ সংস্কৃতি'কে অস্বীকার করেছিল, এবং এতে করে বর্ণবাদ, নৃগোষ্ঠীক চেতনা, এবং অন্যান্য উপজাতীয় উপাদানগুলো চাঙা হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিল। তারা ইউরো-আমেরিকার সংস্কৃতির প্রতি পর্যায়ক্রমিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা আরও বলেন যে, শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে ইউরোপ-আমেরিকার একক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করছে। এই বহুধাসংস্কৃতিপন্থীরা, যেমন আর্থার এম. স্পেসিংগার জুনিয়ার বলেন, 'এরা নৃগোষ্ঠীভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী, যারা পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য খুবই কম দেখতে পায়। তারা শুধু পাশ্চাত্যের অপরাধজগৎকেই বড় করে দেখে। তাদের মনোভাব পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ক্ষতিকর ও অশুভ।'[৭]

বহুসাংস্কৃতিক প্রবণতা বিভিন্ন আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০-এর দশকের 'সিভিল রাইটস্ অ্যাক্ট' এবং ১৯৯০-এর দশকের ক্লিনটন-প্রশাসন কর্তৃক 'বহুত্বকরণ নীতি' এর উদাহরণ। অতীতের সঙ্গে বৈপরীত্য সত্যিই বিস্ময়কর। জাতির পিতাও বিষয়টির বাস্তবতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এ সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে : এটি 'কমিটি অব দি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের' মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল যেখানে ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস জেফারসন এবং জন এডামস্। পরবর্তীতে অনেক রাজনৈতিক নেতাই বর্ণবাদ, সংকীর্ণতাবাদ, নৃগোষ্ঠীক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বকরণ (যা বাস্তবে ১৪১৫ এবং ১৯১৪ সালে বৃহত্তর যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছিল) নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন এবং তারা 'সবাইকে একত্রীকরণের' নীতির প্রতি সাড়া দেন, আর জাতীয় ঐক্যকে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। থিওডোর রুজভেল্ট সতর্ক দিয়ে বলেছিলেন যে, 'এ জাতির ধ্বংসের একটি একক শক্তিশালী কারণ হতে পারে সেই পথে, যে-পথে জাতীয়বোধকে এগিয়ে নেবার চলাচলপ্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করা হয় এবং জটপাকানো ও ঝগড়াটে পরিস্থিতির মধ্যে জাতীয়তাবোধকে নিক্ষেপ করা

হয়।'[৮] ১৯৯০-এর দশকে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নেতৃত্বশাসিত জনের মধ্যে 'ঐক্যের' বদলে 'বহুত্বকে' শুধুমাত্র স্বীকার করেই নিলেন না, সেসঙ্গে তাকে নিষ্ঠার সাথে এগিয়েও নিতে উদ্যোগী হলেন।

অন্যান্য দেশের নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, তারা তাদের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য অস্বীকার করে নিজেদের দেশের পরিচয় একটি সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত এ-ধরনের কার্যকলাপ দ্বারা কেউই সফল হতে পারেনি বরং তারা তাদের দেশকে একটি 'ছিন্নরাষ্ট্রে' পরিণত করেছেন। আমেরিকার বহুত্বসংস্কৃতির পক্ষের নেতারা একইভাবে স্বদেশী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন। আমেরিকার সংস্কৃতির বদলে তারা অন্য সভ্যতার কথা বলছেন, যার দ্বারা তারা দেশটিকে বিভিন্ন সভ্যতার দেশে পরিণত করতে চাইছেন। যাকে বলা যায়, সেই ধরনের দেশ বানাতে চায়; যে দেশ প্রকৃতপক্ষে কোনো সভ্যতার ধারক ও বাহক হবে না, এবং এর 'কোর চরিত্র' আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইতিহাস বলে যে, কোনো দেশই দীর্ঘদিন একটি সুসংবদ্ধ সমাজ হিসেবে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না। বহুসভ্যতাবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আর 'যুক্তরাষ্ট্র থাকবে না' এবং 'সম্মিলিত জাতিসংঘে' পরিণত হবে।

বহুত্ব সংস্কৃতিবাদীরা আমেরিকানদেরসংশ্লিষ্ট অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় 'ধর্মীয় বিশ্বাস' পরিবর্তনেরও কথা বলেন। আর একথা বলেন ওই সূত্রটিকে ব্যবহার করে যেখানে বলা হয়, ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠন করার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার রাখে যা বর্ণ, নৃগোষ্ঠীক পরিচয়, লৈঙ্গিক এবং যৌনসাথি বেছে নেয়ার অধিকারবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে ১৯৪০-এর দশকে গুনার মিরডেল বলেন, যা তিনি একজন বিদেশী পরিদর্শক হিসেবে হেক্টর সেন্ট জোন ডি ক্রিভেকিউর এবং এলেক্সি ডি টকভিল পর্যন্ত সময় ধরে বলেছিলেন, 'এই মহান জাতীয় জীবনের ধর্ম গাঁথুনিতে সিমেন্টের মত' রিচার্ড হবস্টার যুক্তি দেখান যে, 'এটি আমাদের জাতীর ভাগ্যস্বরূপ...'।[৯] যদি এই মতাদর্শকে জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'অস্বীকার করে' বসে তখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে? সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাগ্যের কি পুনরাবৃত্তি হবে? মার্কসবাদের ব্যর্থতার সামগ্রিক ভাগ্যে ... এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের নাটকীয় পতন। ইত্যাদি বিষয়ে জাপানের দার্শনিক তাকেসি উমেহারা উপদেশ দেন যে, 'এ অবস্থা পাশ্চাত্যের উদারতাবাদ ও আধুনিকতাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে, আর বর্তমান কার্যকলাপ সেই ইঙ্গিত বহন করছে। বলা যায়, মার্কসীয় দর্শনের পতনের পর এর বিকল্প হিসেবে নয় বরং এর পরের লক্ষ্য হচ্ছে প্রভাবশালী মতাদর্শ হিসেবে ইতিহাসের সমাপনীপর্বে উদারনীতিবাদ পতনের পালা।'[১০] এটি এমন একটি সময়, যখন মানুষ সর্বত্র নিজেদেরকে সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পরিচিত করতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, একটি 'কোর সংস্কৃতি' ব্যতীত শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজ কতদূর এগিয়ে যাবে? রাজনৈতিক নীতিসমূহ দ্রুত পরিবর্তনশীল। এজন্য স্থায়ী ও সুদৃঢ় সমাজ গঠনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। বহুসভ্যতাবিশিষ্ট বিশ্বপরিমণ্ডলে সংস্কৃতিকে গণনা করা হচ্ছে, আর যুক্তরাষ্ট্র হবে সম্ভবত সর্বশেষ, যে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিবর্ণ পাশ্চাত্যের মধ্যথেকে মতাদর্শ ধরে রাখতে চাইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রত্যাখ্যান করার আর এক অর্থ হল, যুক্তরাষ্ট্রের সমাপ্তি—এটি জানা কথা। আরও বলা যায়, এর অর্থ এভাবেও মনে করা যায় আর তা হল, পাশ্চাত্য সভ্যতার সমাপ্তি। যদি যুক্তরাষ্ট্র অপাশ্চাত্যে পরিণত হয়, তাহলে পাশ্চাত্য শুধুমাত্র ইউরোপের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়বে এবং এর মধ্যে সংযুক্ত থাকবে যৎসামান্য কিছু মানুষ যারা অন্য সভ্যতা থেকে ইউরোপে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত পাশ্চাত্য হয়ে পড়বে অতিক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আর ক্ষয়িষ্ণু, হয়ে পড়বে গুরুত্বহীন একটি ভূমি মাত্র।

বহুসংস্কৃতির নেতৃত্ব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারার রক্ষকগণের মধ্যে সংঘাত ও আমেরিকার মনোভাব, যেমন কুর্দ-এর প্রবচনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, তিনি বলেন, 'এটি একটি সত্যিকার সংঘাত', যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আমেরিকার অংশে ঘটে চলেছে।[১১] আমেরিকানরা এ ইস্যুটিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা কি পাশ্চাত্যের অধিবাসী, না অন্য কোনো জায়গার অধিবাসী? আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমেরিকার পাশ্চাত্য সভ্যতা সংরক্ষণের প্রত্যয় ও পুনর্জাগরণের দৃঢ় মনোভাবের ওপর। অভ্যন্তরীণভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় বহুত্বসংস্কৃতিবাদীদের দাবি নাকচ করে দেয়া। আর আন্তর্জাতিকভাবে এর অর্থ হল একটি অলীক ভাবনা ও উদ্ভট আহ্বান,– যে আহ্বানের মাধ্যমে আমেরিকাকে এশিয়ার মধ্যে এক করে 'পরিচিত করতে' চাওয়া হয়। উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, তাদের মধ্যেকার মৌল সাংস্কৃতিক প্রভেদ উভয়ের সম্মিলিত সমাজ মিলেমিশে একটি 'সাধারণ' বাসস্থান গঠনের চিন্তা অবাস্তব। আমেরিকানরা সাংস্কৃতিকভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিবারভুক্ত। বহুত্বসংস্কৃতিবাদী চিন্তা সেই সম্পর্কের ক্ষতি, এমনকি তা ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু তারা কখনও তার পরিপূরক বা প্রতিস্থাপক হতে পারবেন না। আমেরিকানগণ যখন তাদের সংস্কৃতির শেকড়ের সন্ধান করে, তখন তারা তার গোড়া ইউরোপের মাটির মধ্যে খুঁজে পান।

১৯৯০-এর দশকে পাশ্চাত্যের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন নতুন আলোচনার সূত্রপাত হতে দেখা যায়, যেখান থেকে এই স্বীকৃতি আসে যে, বিশ্বব্যবস্থা আগের নিয়ম বজায় রেখেই ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে। এই অংশটিতে অবশ্য পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান ন্যাটোর বলিষ্ঠ ভূমিকা ও সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়। এজন্য ন্যাটোর পূর্ব-ইউরোপের সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সাংঘাতিক ও বিপজ্জনকভাবে বিভক্ত এবং ভেঙে যাওয়া যুগোস্লাভিয়া নিয়ে ভাবতে হবে। সেসঙ্গে সোভিয়েটবিহীন বিশ্বে পাশ্চাত্যের ঐক্য নিয়ে উদ্বিগ্নতাও দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে ইউরোপ নিয়ে আমেরিকার প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন হতে হবে। যেহেতু ক্রমবর্ধিষ্ণু ও শক্তিশালী অপাশ্চাত্য দেশ ও সভ্যতাসমূহের সঙ্গে পাশ্চাত্যকে প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেহেতু পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাধারণ ও কোর-বিষয়গুলো এগিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বলিষ্ঠ করতে হবে।

আটলান্টিকের উভয়পাড়ের নেতাদের নবতেজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে হবে এবং আটলান্টিক কমিউনিটিকে জাগ্রত করতে হবে। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৫-এর সময়ে জার্মানি ও ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ হেনরি কিসিঞ্জার এবং অন্যান্য নেতাগণ এই ইস্যুটি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যালকম রিফকিন্ড বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেন যে, 'আটলান্টিক কমিউনিটি ৪টি স্তম্ভের উপর দাঁড়াবে',

যেমন : প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা যা ন্যাটোর ওপর বর্তাবে; অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনের শাসন এবং সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা; উদারনৈতিক ধনতন্ত্র, মুক্ত বাণিজ্য; এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যা গ্রিস থেকে রোম; রেনেসাঁ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ, বিশ্বাসাবলি ও আমাদের বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতার মূলমন্ত্র।'[১২]

১৯৯৫ সালে ইউরোপীয় কমিশন, ট্রান্সআটলান্টিক সম্পর্ক নবায়ন করতে একটি প্রকল্প হাতে নেয়, যা ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বিস্তারিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর্যায়ে চলে আসে। একই সঙ্গে অনেক ইউরোপীয় রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক নেতৃত্ব ট্রান্সআটলান্টিক মুক্তবাণিজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যদিও এএফএল-সিআইও (AFL-CIO) নাফটা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক উদারীকরণ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। কিন্তু তারপরও তার প্রধান নেতৃত্ব ট্রান্সআটলান্টিক মুক্তবাণিজ্যচুক্তিকে জোরালোভাবে সমর্থন দেন এবং এটি সেসঙ্গে রক্ষণশীল ইউরোপীয় মার্গারেট থেচার এবং আমেরিকান (নেট গিনগ্রিস) ও কানাডীয় ও ব্রিটিশ নেতারা সমর্থন দেন।

অধ্যায়-২-এ পাশ্চাত্য সম্পর্কে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, পাশ্চাত্য প্রথমে ইউরোপীয় পর্যায়ে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, তৎপর বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ যদি তাদের নৈতিক জীবনে উন্নয়ন ঘটাতে পারে, যদি তাদের সংস্কৃতির সাযুজ্যকে 'সাধারণ রূপ' দিতে পারে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি জোরদার করে তা ন্যাটো জোটের পরিপূরক পর্যায়ে আনতে পারে, তাহলে তারা তৃতীয় পর্যায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, যা হবে পাশ্চাত্যের তথা ইউরো-আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সচ্ছলতার একটি সফল পর্যায়। অর্থবহ রাজনৈতিক সংহতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য তার সম্ভাব্য অবনতিশীল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় পাশ্চাত্যের জনসংখ্যা হ্রাসপ্রবণতা রোধ করার কিছু পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য সভ্যতায় ও সমাজের নিকট পাশ্চাত্যের শক্তিকে তুলে ধরতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, পাশ্চাত্য তাদের ফলপ্রসূ বাণিজ্যিক ক্ষমতার দ্বারা (ইউ-নাফটা কনফেডারেশন) বাদবাকি বিশ্বকে খবরদারি করতে চায়।'[১৩]

পাশ্চাত্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতে পারবে কি-না এবং তারা পাশ্চাত্যসভ্যতার প্রতিনিধি ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে কি-না তার ওপর।

বিশ্বে পাশ্চাত্যের অবস্থান

পৃথিবীতে এখন সাংস্কৃতিক, নৃগোষ্ঠীক, জাতীয়, ধর্মীয়, সভ্যতা-সংক্রান্ত পরিচয়ই মূল কেন্দ্রীয় ইস্যু হয়ে দেখা দিয়েছে। সাংস্কৃতিক মিল এবং পার্থক্যের ওপর নির্ভর করেই বিভিন্ন সংঘ, জোট, সংঘাত, শত্রুতা, মিত্রতা, এবং রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ

অবস্থায় তিনটি বড় আকারের বিষয় সাধারণভাবে পাশ্চাত্য ও বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

প্রথমত, দেশদরদী নেতৃত্ব গঠনমূলকভাবে কিছু বাস্তব বিষয়ে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, যদি তারা সঠিকভাবে তা চিহ্নিত ও আত্মস্থ করতে সক্ষম হন। সদ্য আবির্ভূত রাজনীতিক সংস্কৃতি, অপাশ্চাত্য সভ্যতার দ্রুত বিকাশ, এবং ব্যাপকভাবে অপাশ্চাত্য সমাজে নবউত্থিত সভ্যতার গ্রহণযোগ্যতা ও তা সামনে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়— এসবই সাম্প্রতিক বাস্তবতা। ইউরোপীয় নেতৃত্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, সাংস্কৃতিক শক্তিই মানুষকে একত্রিত করে ও মানুষকে অন্যান্যদের থেকে পৃথকদিকে চালিত করে থাকে। আমেরিকার এলিট, বিপরীতভাবে এই বাস্তবতা বুঝতে সময় নিচ্ছেন অথবা বুঝতেই চাইছেন না। বুশ এবং ক্লিনটন প্রশাসন বহুধাবিভক্ত সভ্যতাসম্পন্ন সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া, বসনিয়া এবং রাশিয়ার ঐক্য মেনে নিয়েছিলেন— এই ভেবে যে, তার দ্বারা শক্তিশালী নৃগোষ্ঠীক ও সাংস্কৃতিক শক্তির মাধ্যমে চালিত অনৈক্যকে ঠেকানো সম্ভব হবে— কিন্তু বলাবাহুল্য, এ ধারণা ছিল অরণ্যে রোদনের মতো। কেননা, তা কোনো সুফল বয়ে আনেনি।

তারা বহুসভ্যতাবিশিষ্ট অর্থনৈতিক সংহতির পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা উৎসাহিত করেছিলেন, যা ছিল নিরর্থক; যেমন এপিইসি (APEC)-এর ভাগ্যে ঘটেছিল। অথবা, অপ্রত্যাশিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্য গুনতে হয়েছে, যা নাফটা ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। আমেরিকানরা বিশ্বের অন্য সভ্যতার কোররাষ্ট্রসমূহ যেমন রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে যথাক্রমে 'বৈশ্বিক অংশীদার' এবং 'গঠনমূলক কার্যক্রমে' প্রত্যাশার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তখন, যখন সেখানে প্রকৃতিগতভাবে উভয়শক্তির সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অথচ, একই সময়ে ক্লিনটন-প্রশাসন বসনিয়ায় শান্তি খুঁজতে গিয়ে রাশিয়ার আন্তরিক কোনো সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে অকৃতকার্য হয়। বিপরীতভাবে রাশিয়া অর্থোডক্স রক্ষামুখী সংকীর্ণ চিন্তা থেকে কোররাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে এগিয়েছিল।

বুঝে না-বুঝে ক্লিনটন-প্রশাসন অর্থহীন দানবরূপী বহুধাসংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়ার সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল। তাছাড়া ওই নীতি গ্রহণ করার ফলে ইরান বলকান-এলাকায় একদলীয় ইসলামিক অংশীদারিত্বে পরিণত হয়েছিল। একই ধারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অর্থোডক্সদের নিকট মুসলমানদের অধীনস্থ করার মতো অন্যায় কাজও সমর্থন ছিল তখন, যখন বলা হল 'প্রশ্নাতীতভাবে চেচনিয়া রুশ ফেডারেশনের অংশ।'[১৪]

যদিও ইউরোপীয়রা সর্বজনীনভাবে স্বীকার করে যে, পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব একদিকে, আর অন্যদিকে অর্থোডক্স ও ইসলাম—এভাবে ভাগ করে দেখার কিছু মৌল বাস্তবতা ও গুরুত্ব রয়েছে, তবে এ-বিষয়ে আমেরিকা অন্যভাবে চিন্তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেক্রেটারি অব স্টেট' বলেন যে, তারা ইউরোপ অংশে ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও ইসলামের মধ্যে কোনোপ্রকার মৌল ভাগাভাগির স্বীকৃতি দেয় না; যারা তা মানেন না তারা ভাগ্যনির্ধারিত হতাশায় পতিত হবেন। ক্লিনটন-প্রশাসন শুরুতে স্পষ্টত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং

পূর্বএশিয়ার মধ্যে একটি পরিবর্তনমুখী ভারসাম্য পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলেন, কিন্তু সময়-খেয়ায় বিভিন্ন ইস্যু, যেমন বাণিজ্য, মানবাধিকার, পরমাণুবিস্তারসহ অন্যান্য বিষয়ে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসার কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মোটের ওপর যুক্তরাষ্ট্র সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতার জোয়ার-ভাটার কিনারে দাঁড়িয়ে বৈশ্বিক রাজনীতির খেলায় দাবার গুটি চালতে গিয়ে নানাধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার বিদেশ নীতিনির্ধারণী চিন্তায় শীতলযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির নানা জটিলতা দেখা দিচ্ছে। কী রাখতে হবে, কী বদলাতে হবে, কোন্‌টি বাতিল করতে হবে– এসবই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করার বিষয়ে তারা কিছুটা হলেও উদাসীন বলে মনে হয়। তারা এখনও মনে করে যে, পুনর্জাগরিত (যদি হয়) সোভিয়েট ইউনিয়ন আবার তাদের জন্য হুমকি বয়ে আনবে। জনগণ এখনও শীতলযুদ্ধকালীন চুক্তি, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, জোট, ইত্যাদি পবিত্র জ্ঞানপূর্বক বজায় রাখার পক্ষপাতী। ন্যাটোকে শীতলযুদ্ধাবস্থার মতোই থাকতে হবে। জাপান-আমেরিকার নিরাপত্তা চুক্তিটি পূর্বএশিয়ার নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এবিএম (ABM) চুক্তিটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। সিএফই চুক্তিটি চোখে চোখে রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। স্পষ্টত শীতলযুদ্ধকালীন কোনো লিগ্যাসিই হালকাভাবে বাদ দেয়া যাবে না।

তবে, আমেরিকা বা ইউরোপের জন্য তার কোনোটিই পুরোনো ধারায় চালানো বা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা যাবে না। বহুধা সভ্যতার ধারায় বিভক্ত বিশ্ব বলে দেয় যে, ন্যাটোর সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তাই অপরাপর ইউরোপীয় দেশের মধ্যে ন্যাটোর সদস্যপদ বণ্টন করা দরকার। এক্ষেত্রে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ও সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত এমন দুটি দেশের ক্ষেত্রে উভয়কেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। এবিএম চুক্তি শীতলযুদ্ধকালীন এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাতে করে সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা উভয়েই বিপদজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। অর্থাৎ, এর দ্বারা উভয় দেশকে পরমাণুযুদ্ধে যেতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ চুক্তির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজ নিজেদেরকে কোনো সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর দ্বারা হঠাৎ পরমাণু-আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও কোনো অযৌক্তিক স্বৈরশাসনের খামখেয়ালিপনা থেকে নিজেদের রক্ষা করার প্রশ্নে বাধা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জাপান-আমেরিকার নিরাপত্তাচুক্তিটি কার্যত সোভিয়েট আগ্রাসন থেকে জাপানকে রক্ষা করার জন্য প্রণীত হয়েছিল।

তবে শীতলযুদ্ধোত্তর সময়ে তা এখন কী উদ্দেশ্য মিটাবে বলে মনে হয়? তা কি চীনকে প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করার জন্য রাখা হবে? তা কি জাপান ও উদীয়মান চীনের সম্পর্ক উন্নয়নের ও সহযোগিতার সম্ভাবনাকে ধীরগতিসম্পন্ন করার জন্য বজায় রাখা হবে? তা কি জাপানের পুনরায় সামরিকীকরণের সম্ভাবনাকে গলাটিপে ধরার অভিপ্রায়ে বজায় থাকবে? জাপানে আমেরিকার সৈন্যসমাবেশ নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে, সেসঙ্গে মার্কিনিদের জাপানের নিরাপত্তা আক্রান্ত হলে পাশে দাঁড়াবার প্রত্যয়েরও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেন্ট্রাল ইউরোপের স্বার্থে ইউরোপে ন্যাটো এবং ওয়ার্শ চুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তবে, এতে করে দক্ষিণের মুসলমানদের আক্রমণের শঙ্কা রাশিয়াকে ভাবিত করে তুলছে।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতার বহুমুখিতা প্রকারান্তরে পাশ্চাত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। বিশেষ করে এ আঘাত আমেরিকার গায়ে বেশি লেগেছে। কেননা, এতে করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বজনীন দিকগুলো সম্পর্কে আমেরিকার বিশ্বাসের ওপর গুড়েবালি পড়েছে। তাদের এই বিশ্বাসসমূহ বর্ণনায় এবং ভাবগত—এ দুইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণনায় এটি প্রত্যাশা করে যে, অন্যান্য সমস্ত সমাজে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রায়োগিক দিক গ্রহণ করুক ও নিজেদের দেশে খাপ খাইয়ে নিক। যদি তারা তা না করে, তাদের নিজেদের সভ্যতা নিজস্ব সংস্কৃতিমুখী হয়, তবে বলতে হবে যে, তারা 'মিথ্যা সচেতনতার শিকার', যেমন মার্কস সেইসব প্রোলেতারিয়েটদের ভাবতেন 'বোকা' যারা ধনতন্ত্রকে সমর্থন জানাতেন। আর ভাবগত দিক থেকে এজন্য যে, পশ্চিমাবিশ্ব মনে করে তাদের মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি সর্ব্বোচ এবং আলোকিত; সবচেয়ে বেশি উদার, সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক, সবচেয়ে বেশি আধুনিক, সবচেয়ে বেশি 'সভ্য' যা মানবসন্তান চিন্তায় ও ভাবনায় পোষণ করে থাকে।

সদ্যআবির্ভূত বিশ্বে নৃগোষ্ঠীক এবং সভ্যতাভিত্তিক সংঘাত এবং পাশ্চাত্যের বিশ্বাস যে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিই কেবলমাত্র সর্বজনীন–এ চেতনা তিনটি রোগে রোগাক্রান্ত : এটি ভ্রান্ত, এটি অমর, এবং এটি সাংঘাতিক বিষয়। এই পুস্তকের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ই মিথ্যা হয়ে যায়; সেই প্রত্যয় যা মাইকেল হাওয়ার্ড কর্তৃক সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। তা হল পাশ্চাত্যের সাধারণ ধারণা হল এই যে, 'সাংস্কৃতিক ভিন্নতা একটি ঐতিহাসিক আবেগাপ্লুত আগ্রহ যা দ্রুতক্ষয় হয় মূলত পাশ্চাত্যমুখী, অ্যাংলোফোনি বিশ্বসভ্যতা, যা আমাদের মৌল স্তরের মূল্যবোধ... তা মোটেই সাবলীলভাবে সত্য নয়।'[১৫] পাঠক এখনও স্যার মাইকেল হাওয়ার্ড–এর বক্তব্য দ্বারা যারা এখনও সন্তুষ্ট হতে পারেনি, সেই সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন বইতে এবং যেগুলো দূর করা খুব কঠিনও বটে।

অপাশ্চাত্যের মানুষ পাশ্চাত্যের যেসব বিষয় নিজেদের জন্য গ্রহণপূর্বক খাপ খাওয়াতে পারে, তা হল : মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানাদি এবং সংস্কৃতি—এ সবই অমর, কারণ এগুলো তাই, যা সবসময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ইউরোপ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবিস্তার ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বোচ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীর শেষে আমেরিকা কর্তৃক বিশ্বের সর্বত্র প্রভাববলয় স্থাপন; মূলত পাশ্চাত্যসভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। ইউরোপের বৈশ্বিকরণ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই। আমেরিকার আধিপত্য এখন ক্রমহ্রাসমান, এজন্য যে সোভিয়েট ইউনিয়নের হাত থেকে আর তাকে বাঁচাবার তাগিদ নেই; শীতলযুদ্ধ চলাকালে যে তাগিদ প্রতিয়িনত অনুভূত হত। এখন সোভিয়েটে তার ভীতিও নেই, প্রতিক্রিয়ার আধিপত্যও নেই। আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে, সংস্কৃতি সবসময়ই ক্ষমতার অনুগামী। যদি অপাশ্চাত্য সমাজ পুনরায় আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা আকারপ্রাপ্ত হয় তবে তা হবে সম্প্রসারণ, সৈন্যসমাবেশকরণ এবং পাশ্চাত্য ক্ষমতার দৌড় দেখানোর মতো বিষয়। সাম্রাজ্যবাদ হল সার্বজনীনতার যৌক্তিক কার্যকর ফলাফল বিশেষ। তদুপরি, একটি বয়োবৃদ্ধ সভ্যতা হিসেবে পাশ্চাত্যের আর জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষুরধার নেই, যা অন্য সমাজে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেবার আসল হাতিয়ার। অবশ্য, বিষয়দুটো আবার পাশ্চাত্য মূল্যবোধের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক–গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের

ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু এশীয় ও মুসলমান সভ্যতা অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় নিজেদের প্রদর্শন ও দাবি করা শুরু করেছে যে, তাদের সংস্কৃতির সর্বজনীনতা রয়েছে; সেহেতু এ পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যকে অধিকতরভাবে সর্বজনীন ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে।

পাশ্চাত্যের সর্বজনীনতা বিশ্বের জন্য বিপদজ্জনক। কারণ, এটি প্রধান প্রধান আন্তঃসভ্যতার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে, কোররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। এ অবস্থা ইউরোপের জন্যও সাংঘাতিক বিপজ্জনক। কেননা, এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের পরাজয়ের ঝুঁকি থাকবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর পাশ্চাত্যবিশ্ব ভেবেছিল এখন থেকে তাদের সভ্যতাই সবকিছু এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং একই সময়ে তারা ভেবেছিল এশিয়া দুর্বল হয়ে যাবে। মুসলমানেরাসহ অন্যান্য সমাজ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায়, তারা ব্রুটাসের সেই পরিচিত এবং শক্তিশালী যুক্তি প্রয়োগ করতে পারবে :

আমাদের সৈন্য সংখ্যা কানায় কানায় পূর্ণ
আমাদের গতি—সেও পরিপক্ব।
আমাদের শত্রু নিয়ত বর্ধিষ্ণু
আমরা অবস্থান করছি উঁচু স্থানে,
কিন্তু, পতনের জন্যও প্রস্তুত।
মানুষের জীবনপ্রবাহে থাকে জোয়ার-ভাটা;
যা তাকে টেনে নেয় প্লাবনের পানে:
নিয়ে যায় ভাগ্যের পরিণতির প্রান্তে;
বিরত রাখে জীবনের অজানা সমুদ্রযাত্রা।
বাধ্য করে অগভীরবোধ আর মর্মপীড়ায় ডুবে যেতে।
আমরা তেমনি টইটুম্বুর সমুদ্রে ভাসমান,
আগত স্রোতকে করতেই হবে বরণ–
যখন তা আমাদের পানে আসে ধেয়ে;
অথবা আমাদের সাহস যাবে খোয়া।

এই যুক্তির ফলাফল কিন্তু ব্রুটাসের ভাগ্যে ফিলিপির যুদ্ধে পরাজয় ডেকে এনেছিল। আর পাশ্চাত্যের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে—এর অর্থ যেন না হয় যে, ক্ষমতার বদল ঘটাতে হবে, বরং শিখতে হবে কীভাবে অগভীরবোধকে অস্বীকার ও অমান্য করতে হয়, এককভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। কর্মপন্থাকে নরম ও সহনশীল করতে হয় এবং কীভাবে সংস্কৃতিকে শঙ্কামুক্ত রাখতে হয়।

প্রত্যেক সভ্যতাকেই প্রায় একই ধরনের প্রক্রিয়ায় আবির্ভূত, বর্ধিত ও পতনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তবে, পাশ্চাত্য অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে ভিন্ন। এজন্য নয় যে, এটি কীভাবে গড়ে উঠেছে, বরং মূল পার্থক্য হল, অন্যান্য সভ্যতা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বতন্ত্র চরিত্র, অর্থাৎ এর মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে যা আছে তা হল : খ্রিস্টধর্ম, বহুত্ববাদিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আইনের শাসন, যা পাশ্চাত্যকে সম্ভব করে তুলেছে আধুনিক হতে। সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা এবং অন্যান্য সমাজের

জন্য বার্তাবহ হতে। বলাবাহুল্য, এসব বৈশিষ্ট্যই একমাত্র পশ্চিমের সম্পত্তি এবং তা পাশ্চাত্যবিশ্বকে বিশেষ সাজে সজ্জিত করে তুলেছে। আর্থার এম স্কেলসিংগার জুনিয়ার বলেছেন যে, 'এর উৎস হল অদ্বিতীয়, যা ধারণ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ... । এসবই ইউরোপীয় ধারণা, এশীয় নয়, নয় তা আফ্রিকার ধারণা, এমনকি এগুলো মধ্যপ্রাচ্যেরও নয়, তারা এটি গ্রহণপূর্বক নিজেদের সমাজে প্রয়োগ করতে পারে।'[১৬] তারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অদ্বিতীয় করে তুলেছে। পাশ্চাত্যসভ্যতা অমূল্য এজন্য নয় যে, তা সর্বজনীন, আসলে তা অমূল্য, কারণ এটি 'অদ্বিতীয়'। পাশ্চাত্যের নেতাদের প্রধান দায়িত্ব হল অন্য সভ্যতাকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আকার প্রদান করা, যা তাদের ক্রমক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতার বাইরে, বরং তারা তাদের সভ্যতা সংরক্ষণ, ধারণ এবং নবায়নপূর্বক অদ্বিতীয়ত্বকে রক্ষা করতে পারে। এটিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কেননা, পাশ্চাত্যের খুবই শক্তিশালী দেশ হিসেবে দায়দায়িত্বের সিংহভাগ বর্তায় যুক্তরাষ্ট্রের কাঁধে। পাশ্চাত্যের পতনের যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের মূল কাজ হবে :

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সংহতি ও সমন্বয় জোরদার করতে হবে; যাতে করে অন্যসব রাষ্ট্র তাদের মধ্যেকার পার্থক্যের কারণে কোনো সুযোগ নিতে না পারে;
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো-জোটে সেন্ট্রাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে একাত্ম করে নিতে হবে, যেমন বাল্টিক রিপাবলিকসমূহ, শ্লোভাকিয়া এবং ক্রোয়াশিয়া;
- লাটিন আমেরিকায় 'পাশ্চাত্যকরণকে' জনপ্রিয় করে তুলতে হবে এবং মানুষকে পাশ্চাত্যমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে হবে। লাটিন আমেরিকার সঙ্গে আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াতে হবে;
- জাপানের পাশ্চাত্য বিমুখতার প্রবণতাকে ধীরগতিসম্পন্ন করতে হবে এবং চীনের সঙ্গে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে;
- অর্থোডক্স রাষ্ট্রগুলোর ওপর একটি 'কোররাষ্ট্র' হিসেবে রাশিয়ার কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে এবং দক্ষিণে রাশিয়ার নিরাপত্তাসংক্রান্ত বৈধতার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে;
- অন্যান্য সভ্যতার ওপর পশ্চিমাজগতের সামরিক ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বজায় রাখতে হবে;
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, বহুধাবিশিষ্ট বর্তমান সভ্যতার জগতে অন্যান্য সভ্যতার ওপর পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপ সম্ভবত বর্তমান বিশ্বের সংঘাতের অন্যতম মূল উৎস। বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

শীতলযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র তার বিদেশনীতির প্রতি সাড়া দিয়ে প্রচুর ধার কর্জ করে ফেলেছে। আজকালকার বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বিশ্বকে পদানত করার বা বিশ্বব্যবস্থা থেকে দূরে যাবার কোনোটিই করতে পারে না। আন্তর্জাতিকতাবাদ কিংবা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, বহুপাক্ষিকত্ব অথবা একপক্ষীয়ত্ব—এর কোনোটিই আজ আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না।

সভ্যতার যুদ্ধ এবং এর সুবিন্যস্ততা

বিশ্বের 'কোররাষ্ট্রসমূহের' মধ্যে সভ্যতার যুদ্ধ শুরু হওয়ার বিষয়টি অভাবনীয় হলেও অসম্ভব—একথা বলা চলে না। আমরা আগেই আলোচনা করছি, এ-ধরনের যুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে বিভিন্ন সভ্যতার ফাটলরেখা বরাবর থেকে। এটি মুসলমান এবং অ-মুসলমানদের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। আর এক্ষেত্রে ফাটলরেখা বরাবর অবশিষ্ট কোররাষ্ট্র, মুসলমান, তাদের যুদ্ধবাজ সমধর্মাবলম্বীদের সমর্থনে শুরু করতে পারে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলোরও যুদ্ধে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে থাকবে না, তা বলা যায় না। সবচেয়ে বিপদজনক দিক হচ্ছে এই যে, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বহুসভ্যতাসম্পন্ন দেশের যুদ্ধে শক্তির ভারসাম্যের ব্যাপক অদলবদল ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এতে কোররাষ্ট্র ও সভ্যতাসমূহের ভেতর নতুনভাবে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে। যদি এ-ধরনের যুদ্ধ চলতে থাকে, 'বিশ্বের ইতিহাসে রাজনীতির খেলায় সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়' হিসেবে চীন আবির্ভূত হয়ে আন্তর্জাতিক সুস্থিরতার ক্ষেত্রে ওলটপালট ঘটিয়ে দিতে পারে। আর এটি একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে পূর্বএশিয়ার আবির্ভাব আমেরিকার স্বার্থের জন্য বিপরীতমুখী হবে। কেননা ঐতিহাসিকভাবেই দেশদুটি বিপরীত স্বার্থমুখী।[১৭]

আমেরিকার স্বার্থকে মনে রেখে প্রশ্ন করা যায়, তাহলে কীভাবে চীনের সঙ্গে তার যুদ্ধমঞ্চে আগমন হবে? ২০১০ সাল ধরে নিয়ে কল্পনা করা যায়, আমেরিকার সৈন্যবাহিনী কোরিয়া থেকে বের হয়ে এসেছে, ধরা যাক দুই কোরিয়া একত্রিত হয়েছে; অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জাপানেও হ্রাস পেয়েছে। তাইওয়ান ও মূলভূমি চীনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তাইওয়ান একটি 'ডি ফ্যাক্টো' স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বহাল থাকল, কিন্তু সর্বতোভাবে চীনের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব তাইওয়ানের ওপর বজায় থাকল। চীনের দায়দায়িত্বে তাইওয়ান জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করল, যেমন করে অর্জন করেছিল ১৯৪৬ সালে ইউক্রেন এবং বেলারুশ। দক্ষিণ চীনের সমুদ্রে তেলসম্পদ দ্রুত উত্তোলনের ব্যবস্থা নেয়া হল, আর এটি হল প্রধানত চীনের কর্তৃত্বে। তবে, সেখানে ভিয়েতনামের অংশে আমেরিকার কোম্পানি কাজ পেল। এমতাবস্থায়, চীন তার আত্মবিশ্বাস থেকে ঘোষণা দিয়ে বসল যে, সমগ্র দক্ষিণ-সমুদ্রের তেল-এলাকা সে একা নিয়ন্ত্রণ করবে, যেমনটি সে বরাবরই দাবি করে আসছিল। এ অবস্থায় ভিয়েতনাম ছাড় দেবে না, উভয় দেশের মধ্যে সমুদ্রে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। চীন ১৯৭৯ সালে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল; ভিয়েতনাম জয় করতে চাইল। ভিয়েতনাম আমেরিকার সহায়তা চেয়ে বসল। চীন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবলয়ের বাইরে অবস্থানের সতর্কবার্তা পাঠাল। জাপানসহ অন্যান্য এশীয় দেশগুলো থাকল ভীত-সন্ত্রস্ত, অথবা দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলল যে, চীন কর্তৃক ভিয়েতনাম-অভিযান সে মেনে নেবে না। অতএব, চীনের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ নেমে এল এবং সেসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র কর্মীবাহিনী প্রেরণ করে তা দক্ষিণ-চীন সমুদ্র এলাকায় পাঠিয়ে দিল। চীন বলল, এটি আমেরিকা কর্তৃক তার জলসীমা লঙ্ঘন। অতএব, সে কর্মীবাহিনীর ওপর বিমানহামলা শুরু করল। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়

যুদ্ধবিরতি চুক্তি আনা গেল না; কার্যত পূর্বএশিয়ার সর্বত্র যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হল। জাপান তার দেশে মার্কিন ঘাঁটি ব্যবহার করে চীনের সঙ্গে মার্কিনীদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিল না। যুক্তরাষ্ট্র উক্ত সিদ্ধান্ত 'থোরাই কেয়ার করল'। জাপান নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দিল এবং জাপানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আলাদা করে ফেলল।

চীনের সাবমেরিনগুলো এবং ভূমিবাহিনী মূল চীন ও তাইওয়ানের মাটি ব্যবহার করে আমেরিকান সৈন্যদের ওপর তুমুল আঘাত হানল। এতে আমেরিকার জাহাজ ও অন্যান্য সামগ্রীর অপরিমিত ক্ষতি হল। ইতিমধ্যে চীনে ভূবাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে তা নিজেদের দখলে নিয়ে এল, সেসঙ্গে ভিয়েতনামের বিরাট অংশ দখল করে বসল। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের হাতেই পরমাণুঅস্ত্র বহনে সক্ষম এমন ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। তবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হল না। এই ধরনের আক্রমণের ভীতি উভয় সমাজের মধ্যে দেখা দিলেও, যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে উক্ত ভীতির পরিমাণ স্বভাবতই বেশি দেখা দিল। এ অবস্থায় অনেক মার্কিনীর নিকট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল; তারা কেন এ-ধরনের ভয়ভীতিকর পরিস্থিতির শিকার হতে যাবে? যদি চীন দক্ষিণচীনের সমগ্র এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে তাহলে আমেরিকার ক্ষেত্রে তার কী এমন বাড়তি প্রভাব পড়বে? দক্ষিণ পূর্বএশিয়ার উপরই বা তার কী প্রভাব পড়তে পারে?

যুদ্ধের বিরুদ্ধে হিস্পনিক-অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকাতে বেশি আতঙ্ক ও অবস্থান দেখা দিল। জনগণ এবং সরকার (আঞ্চলিক) বলতে লাগল যে, 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়' এবং ১৯১২ সালের নিউ ইংল্যান্ডের (মডেল) পদাঙ্ক অনুসরণের প্রস্তুতি নিল। চীন প্রাথমিকভাবে তার জয় সুনিশ্চিত করার পর মার্কিন মুল্লুকের আদলে ১৯৪২ সালের জনমতের ধারায় এগুতে লাগল। আধিপত্যকারী একটি দেশের জন্য পরাজয়ের গ্লানি ও মূল্য গগনস্পর্শী। তাহলে এখন একটি পারস্পরিক সমঝোতায় আসা যাক! ততক্ষণে, বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ অথবা 'এই নকল যুদ্ধ' পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান সভ্যতার অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর এই যুদ্ধের একটি প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্তাতে শুরু করে দিয়েছে। যেহেতু চীন ব্যস্ত ও ক্লান্ত; ভারত এ সুযোগে তার চিরশত্রু পাকিস্তানের উপর আক্রমণের মরণকামড় বসাল এবং সেক্ষেত্রে দেশটির পরমাণু ও প্রচলিত সামরিক শক্তি সর্বোচ্চ প্রয়োগের সংকল্প নিল। প্রাথমিকভাবে এ প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখলেও পাকিস্তান, ইরান ও চীনের মধ্যে স্থাপিত জোট নড়েচড়ে বসল এবং চাঙা হয়ে ইরান সর্বাগ্রে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে হাজির হল। এ অবস্থায় ভারত হঠাৎ করেই যেন প্যাঁকের মধ্যে আটকে গেল। ইরানি বাহিনী ও পাকিস্তানের গেরিলা বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী থেকে এসে পাকিস্তানের হাতকে শক্তিশালী করে তুলল। পাকিস্তান ও ভারত উভয় শক্তিই তখন আরবরাষ্ট্রগুলোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। ভারত উপমহাদেশে ইরানের আধিপত্যের সম্ভাব্য বিপদজনক দিক তুলে ধরল। অন্যদিকে, প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে চীনের সাফল্য মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্যবিরোধী মনোভাব আরও শক্ত করল। এ অবস্থায় একের-পর-এক মার্কিনপন্থী আবর দেশ ও তুরস্কে ইসলামি শক্তি জাগ্রত হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করে দিল এবং এ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করল উচ্চ জন্মহার জনিত জমে ওঠা যুবশক্তি (রিজার্ভ আর্মি)।

ইসলামপন্থীদের কোপানলে পড়ে ও তাড়নায় আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলে একটি 'মরণকামড়' আক্রমণ করে বসল। এ অবস্থায় ইতিমধ্যে সীমিতভাবে ৬ষ্ঠ মার্কিন রণতরীকে অভিযান থেকে ঠেকানো গেল না। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই তাদের সমর্থনে প্রধান দেশগুলোর মধ্যে সমাবেশ ও জোট গঠনে তৎপর হল। যেহেতু চীন সামরিক সাফল্য বয়ে আনতে পেরেছে, সেহেতু জাপান ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চীনের লেজুড়বৃত্তি শুরু করে দিল। জাপানের পরিবর্তিত এই পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রচলিত নিরপেক্ষতা থেকে চীনপন্থী হওয়ার দরুন জাপানকে সহযোদ্ধা হিসেবে পাওয়ার জন্য চীন প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। জাপানি সৈন্যরা জাপানে মার্কিন ঘাঁটি দখল করে বসলো এবং যুক্তরাষ্ট্র রাগান্বিতভাবে তার সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে নিল। যুক্তরাষ্ট্র তখন জাপানের উপর অবরোধ আরোপ করল। আর জাপানি ও আমেরিকান জাহাজগুলো পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসগরে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হল। যুদ্ধের প্রারম্ভে চীন রাশিয়ার সঙ্গে একটি পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল (তা যেন হিটলার-স্টালিন চুক্তির কথাই মনে করিয়ে দেয়)। চীনের সাফল্য রাশিয়ার নিকট উল্টোভাবে আসল, যা তারা জাপানের ক্ষেত্রে করেছিল। চীনের সম্ভাব্য বিজয় এবং কার্যত পরবর্তীতে পূর্বএশিয়ার একক অধিপত্য বিস্তারে ভাবনা প্রকৃতপক্ষে মস্কোকে আতঙ্কিত করে তুলল। রাশিয়া তার সৈন্যদের চীনের বিরুদ্ধে সমাবেশের চিন্তা থেকে সাইবেরিয়ায় সৈন্য মোতায়েন করল। চীন তখন সেখানে তার স্বজাতিদের রক্ষার্থে সৈন্য পাঠাল এবং ভালদিভোস্টক দখল করে ফেলল। এ ছাড়া আমুর নদীর পাদদেশসহ সাইবেরিয়ার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকা চীনের দখলে চলে এল। চীন-রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে চীনের সৈন্যরা মধ্য-সাইবেরিয়ায় গেল। এমতাবস্থায় মঙ্গোলিয়ায় গণবিদ্রোহ সৃষ্টি হল, এটি ছিল পূর্বে চীনের একটি আশ্রিত রাষ্ট্র।

তেলক্ষেত্র দখল ও তা সংরক্ষণ করাই ছিল যুদ্ধরত দেশগুলোর মূল লক্ষ্য। জ্বালানির জন্য পরমাণুশক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হলেও জাপান এখনও প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। এজন্য আমদানি-উৎস হিসেবে তাকে পারস্য উপসাগর, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণচীনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। যুদ্ধের সময় আরবদেশগুলো যেমন ইসলামি উগ্র শক্তির দখলে চলে যায়, সেহেতু ইসলামি দেশসমূহ থেকে পশ্চিমা দেশে তেলরপ্তানি হ্রাস পাওয়ার দরুন পশ্চিমাবিশ্ব তেলের জন্য রাশিয়ার দিকে ঝুকে পড়তে বাধ্য হয়। এজন্য রাশিয়াকে সমর্থন দান করা পশ্চিমের জন্য একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল, যাতে রাশিয়া দক্ষিণদিকে মুসলমান এলাকায় তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ উদ্যেমে তার ইউরোপীয় মিত্রদের সমর্থন পেতে চাইল। অবশ্য, ইউরোপ আমেরিকাকে কূটনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতা দিতে চাইলেও সামরিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হল না। চীন এবং ইরান উভয় দেশই ভীত ছিল এই ভেবে যে, ইউরোপীয় শক্তিগুলো বুঝি আমেরিকার পেছনে জড়ো হয়ে যায়; কেননা, যুক্তরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত বিগত দুটি মহাযুদ্ধে ইউরোপের মূল দুটি শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এজন্য বসনিয়া এবং আলজেরিয়ায় চীন ও ইরান গোপনে পরমাণুঅস্ত্র সরবরাহ করে ইউরোপকে চাপে রাখল এবং যুদ্ধে না জড়াতে সতর্ক করে দিল। কিন্তু বিধি ছিল বাম, তাই চীন যা চাইল, হল ঠিক তার উল্টো। ন্যাটো-জোটের

গোয়েন্দা মারফত তারা গোপন তৎপরতা জেনে গেল এবং অবিলম্বে পরমাণুশক্তিবাহী ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিল। এই অবস্থায় সার্বিয়া তুর্কিদের হাত থেকে খ্রিস্টত্বকে রক্ষা করার তার ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ থেকে বসনিয়া দখল করে ফেলল। ক্রোয়েশিয়াও এ অভিযানে যোগদান করল। আর দুটি দেশ মিলে বসনিয়া ভাগ করে নিল। তারা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো দখলে নিয়ে নিল এবং ১৯৯০-এর দশকে শুরু হওয়া অসমাপ্ত নৃগোষ্ঠীক নিশ্চিহ্নকরণ কার্যক্রম পূর্ণউদ্যেমে শুরু করল। আলবেনিয়া ও তুরস্ক বসনিয়াকে সাহায্য করতে সক্রিয় হল। গ্রিস ও বুলগেরিয়া তুরস্কের ইউরোপিয় অংশ আক্রমণ করে বসল। ইস্তাম্বুলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং তুর্কীরা বসফরাস প্রণালী দিয়ে সরে গেল। ইতোমধ্যে পরমাণুঅস্ত্রবাহী একটি ক্ষেপণাস্ত্র আলজেরিয়া ব্যবহার করে বসল যা মারসেইলিস-এর বাইরে বিস্ফোরিত হল। আর ন্যাটো বিভৎস এক বিমান হামলা চালাল উত্তরআফ্রিকার লক্ষ্যবস্তুর উপর।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, রাশিয়া এবং ভারত, সত্যিকারভাবে চীন, জাপান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। কীভাবে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল ? উভয়পক্ষের নিকট ছিল পরমাণুঅস্ত্র। যদি তারা খুব কম মাত্রাতেও তা ব্যবহার করত তা হলে উভয় পক্ষের প্রধান শক্তি ধ্বংস হয়ে যেত। যদিও আলাপ-আলোচনায় মাধ্যমেও সমাধান এগুলো না, যা ঘটল তা হল, পূর্বএশিয়ায় চীনের আধিপত্যের মৌল অবসান ঘটল না। বিকল্পভাবে পশ্চিমাবিশ্ব গতানুগতিক অস্ত্র ব্যবহার করে চীনকে পরাস্ত করতে চেষ্টা করে। চীনের সঙ্গে জাপানের জোটবদ্ধতা চীনকে আমেরিকার নৌসেনাদের হাত থেকে চীনের মধ্যভাগে ও সমুদ্রপাড়ে অবস্থিত জনগণ ও শিল্প এলাকাকে রক্ষা করতে সাহায্য করল। তা যেন ইনস্যুলার কার্বন সেনিটারির মতো কাজ করল। আরও একটি বিকল্প হল চীনের প্রতি পাশ্চাত্যের এগিয়ে যাওয়া। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে ন্যাটো রাশিয়াকে জোটের একজন সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে সাধুবাদ জানিয়ে দেয়। এবং ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করে, যাতে রাশিয়া মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত সেন্ট্রাল এশিয়ার তেল ও গ্যাস এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তারা একত্রে তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও ইউগহার্স-এ চীনাশাসন অবসানের লক্ষ্যে সেখানে কাজ করার কথা বলে। এতদ্ব্যতীত, পাশ্চাত্য ও রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী সাইবেরিয়ায় সমাবেশ ঘটাতে চাওয়া হয়, যাতে করে চীনের গ্রেট প্রাচীর ভেদ করে বেজিং মাঞ্চুরিয়ায় ও হান হার্টল্যান্ডে যাওয়া যায়।

বিশ্বব্যাপী সভ্যতার এই যুদ্ধের যে কলাকৌশল আসুক না কেন, রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের সম্মিলিত সামর্থ্যে তারা তিয়ানআনমেন স্কোয়ারে যাবে কি-না তার চেয়েও বড় কথা হল, যুদ্ধের ফলে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের অর্থনীতি, সামরিক ও জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। ফলে, এ যাবৎকালে কেন্দ্র পরিবর্তিত হয়ে বৈশ্বিক ক্ষমতার যা শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে গিয়েছে, তা এখন নতুন মোড় নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়েছে। এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় লাভবান হচ্ছে তারাই যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। পাশ্চাত্য, রাশিয়া, জাপান, চীন কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভারতের জন্য রাস্তা এখন পর্যন্ত খোলা থাকল—যদি তারা একটি

অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিল, যদি তারা ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়, তবে তারা হিন্দুধারায় বিশ্ব পুনঃনির্মাণে মুনশিআনা দেখাতে সমর্থ হবে।

আমেরিকার জনগণের একটি বড় অংশ, যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার জন্য তাকে দোষারোপ করল, বিশেষ করে সংকীর্ণভাবে প্রণোদিত ওআএসপি-এর এলিট সম্প্রদায়। হিস্পানিক নেতৃত্বে হয়তো 'মার্শাল পরিকল্পনার' আদলে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে। তাছাড়া লাটিন আমেরিকার অর্থনীতি অত্যন্ত চাঙা হয়ে উঠবে, কেননা যুদ্ধে অংশ না নেয়ার জন্য তাদের কোনোপ্রকার ক্ষতি হয়নি। আফ্রিকার পক্ষে ইউরোপের পুনঃনির্মাণে তেমন কিছু দেবার নেই, তারা বরং 'যাযাবরত্ব ও শিকার' নিয়েই থাকবে। এশিয়ার চীন, জাপান এবং কোরিয়া যদি যুদ্ধের দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে ক্ষমতার কেন্দ্র দক্ষিণদিকে হেলে যাবে। হয়তো ইন্দোনেশিয়া (নিরপেক্ষ ছিল) হবে প্রভাববিস্তারকারী দেশ, তা হবে অস্ট্রেলিয়ার পরামর্শে ও নেতৃত্বে, সে অবস্থায় নিউজিল্যান্ড থেকে পশ্চিমে মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কা উত্তরে ভিয়েতনাম পর্যন্ত এর প্রভাববলয় বিস্তৃত হবে। যা হবে, তা হল, চীনের সঙ্গে ভারতে পুরাতন শত্রু সম্পর্ক আবার জেগে উঠবে।

যেভাবেই হোক না কেন, বিশ্বের পরবর্তী নেতৃত্ব ও রাজনীতি হবে দক্ষিণমুখী। যদি এই দৃশ্যাবলি পাঠকের নিকট বন্য ও আবেগপ্রবণ কল্পকাহিনী বলে মনে হয়, তাহলে সেই ভালো তা বলতে হবে। তাহলে আসুন আমরা প্রত্যাশা করি, এর চাইতে যেন বেশি বন্য-আবেগপ্রবণ সভ্যতার যুদ্ধ পৃথিবীতে না হয়। তবে, এ দৃশ্যাবলির সবচেয়ে জ্বালাময় সত্য-প্রতিম হল, যুদ্ধে কোনো সভ্যতার কোররাষ্ট্রের (আমেরিকা) 'হস্তক্ষেপ', যখন অন্য কোনো সভ্যতার কোররাষ্ট্রের সঙ্গে (চীন) একই সভ্যতার অন্যরাষ্ট্রের (ভিয়েতনাম) যুদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ-যুদ্ধে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়, কেননা এতে করে আন্তর্জাতিক আইন রক্ষা করা যায়, এর ভেতর দিয়ে আগ্রাসী মনোভাব ও কর্মকাণ্ড ভাগিয়ে দেয়া যায়, সমুদ্রসীমার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, দক্ষিণচীনের তেলক্ষেত্রের অংশীদারদের অংশীদারিত্ব রক্ষা করা যায়, এবং সবচেয়ে বড় কথা পূর্বএশিয়ায় একক শক্তির আধিপত্য প্রতিরোধ করা যায়। চীনের দৃষ্টিতে এই হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে অসহনীয়। কেননা এ যুদ্ধ মূলত চীনবিরোধীদের চীনের বৈধতার প্রতি কর্তৃত্ব প্রকাশ করার ওপর হস্তক্ষেপকে উৎসাহিতকরণ এবং বৈশ্বিক রাজনীতি বিষয়ে চীনের ভূমিকাকে অস্বীকারকরণ।

সামনের দিনগুলোতে প্রধান প্রধান আন্তঃসভ্যতাসংক্রান্ত যুদ্ধ এড়াতে হলে কোর দেশগুলোকে অন্য সভ্যতার যুদ্ধের মধ্যে নাকগলানো থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্য এই সত্যটি গ্রহণ করতে অনেক রাষ্ট্র, বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মেনে নেয়া খুবই কঠিন। এই বর্জনীয় আইন; অর্থাৎ কোররাষ্ট্রকে অবশ্যই অন্য সভ্যতার মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে নাকগলানো চলবে না। প্রকৃতপক্ষে, এই বহুধাবিভক্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং বহুঅক্ষবিশিষ্ট বিশ্বে বড় ধরনের যুদ্ধ ও সংঘাত এড়াবার প্রথম ও প্রধান শর্ত। দ্বিতীয় কাঙ্ক্ষিত শর্ত হচ্ছে, যুক্ত মধ্যস্থতাকারী আইন প্রয়োগ করা, অর্থাৎ কোররাষ্ট্রগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফাটলরেখা বরাবর অন্য সভ্যতার রাষ্ট্র ও তাদের সভ্যতার যুদ্ধ থামানো যায়। এই আইনগুলো মেনে নিয়ে সভ্যতাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া পাশ্চাত্য কিংবা অন্যান্য সভ্যতার জন্য খুব সহজ কাজ নয়। কেননা, পাশ্চাত্য যেমন মনে করে, অন্যান্য সভ্যতার প্রতি তার দায়িত্ব

ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি অন্যান্য সভ্যতারও পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বমূলক মনোভাবকে সুনজরে দেখে না। কোররাষ্ট্রগুলো মনে করে থাকে যে, বর্তমান বিশ্বে পরমাণুঅস্ত্র রাখা তার অধিকার এবং তারা আরও মনে করে যে, অত্র সভ্যতার অধীন অন্য কোনো সদস্যরাষ্ট্রের পরমাণুঅস্ত্র রাখা চলবে না। উদাহরণস্বরূপ পেছনে ফিরে দেখা যায়, পাকিস্তানের সম্পূর্ণ পরমাণু অস্ত্র অর্জনের সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো এভাবে তখন তার কার্যক্রমকে সিদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি বলেন, 'আমরা জানি ইসরায়েল ও দক্ষিণ-আফ্রিকার পরিপূর্ণ পরিমাণ পরমাণুঅস্ত্রের সঙ্গতি আছে। খ্রিস্টান, ইহুদি এবং হিন্দু সকল সভ্যতাই যে ক্ষমতা অর্জন করেছে শুধুমাত্র ইসলামি সভ্যতার হাতে সে ক্ষমতা নেই; সুতরাং, এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।'[১৮]

একটি সভ্যতার মধ্যে কোনো কোররাষ্ট্রের অনুপস্থিতির কারণ হলো নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতা, এবং পরমাণুঅস্ত্রের জন্যও তা প্রতিযোগিতা তৈরি করতে পারে। খুব উত্তম সম্পর্ক থাকার পরও পাকিস্তান পরমাণুঅস্ত্র অর্জনের পর ইরান পরিষ্কারভাবে অনুভব করে যে, পাকিস্তানের যদি থাকতে পারে তার কেন পরমাণুঅস্ত্র থাকবে না। অন্যদিকে, দেখা যায়, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা এ লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণআফ্রিকা তার পরমাণু শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশ্য, এটি সত্য, যদি নাইজেরিয়া পরমাণুঅস্ত্র লাভ করতে উদগ্রীব হয় কিংবা অর্জন করে ফেলে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা আবার তার পরমাণুশক্তি ফিরিয়ে আনতে সময় নেবে না। পরমাণুঅস্ত্রের সম্প্রসারণ একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। স্কট সাগান এবং অন্যান্যরা যেভাবে বলেন, 'যদি বিশ্বে মাত্র একটি বা দুটি কোররাষ্ট্রের হাতে পরমাণুঅস্ত্র স্থির থাকত, তাহলে সেই বিশ্ব থাকত যৌক্তিকভাবে সুস্থিত বা সুস্থির।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে অদ্যাবধি অধিকাংশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পাশ্চাত্য দেশের চাহিদা ও ইচ্ছামাফিক কাজ করছে। তারা পশ্চিমা স্বার্থ, মূল্যবোধ এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যখন পাশ্চাত্যশক্তি অন্যান্য সভ্যতার আপেক্ষিক শক্তির বিচারে নিম্নগতিসম্পন্ন হবে, তখন স্বভাবতই ওইসব প্রতিষ্ঠানকে খাপখাওয়ানোর মতো করে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ, সেসব প্রতিষ্ঠানকে তখন উঠতি সভ্যতাসমূহের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। খুবই স্পষ্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত খুবই বিতর্কিত ইস্যু হল : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ নিয়ে চলা বিতর্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওই পদগুলো বিজয়ীপক্ষের নেতৃত্বের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা হয়েছিল এবং বর্তমান বিশ্বে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুন নতুন বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে তা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যার আবর্তে হয় সদস্যপদে পরিবর্তন ঘটাতে হবে, নতুবা অন্যান্য কম-প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রথাসিদ্ধ প্রক্রিয়া বের করতে হবে, যাতে করে নতুন নতুন নিরাপত্তা-ইস্যু নিয়ে কাজ করা যায়। যেমন জি-৭ সংগঠন বিশ্বের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করে থাকে।

বহুধাবিভক্ত সভ্যতাসম্পন্ন বর্তমান বিশ্বে আদর্শিক দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি প্রধান সভ্যতার একটি স্থায়ী আসন নিরাপত্তা পরিষদে থাকা দরকার। বর্তমানে এ দৃষ্টিতে মাত্র তিনটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র নিজে জাপান এবং জার্মানির সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য কাজ করতে পারে। তবে, একথা সত্য, তাদের জন্য সদস্যপদ দিতে হলে অন্য কিছু দেশকেও তা দেয়ার

পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। ব্রাজিল ৫টি নতুন সদস্যপদ প্রদানের কথা জানিয়েছে (যদিও তাদের হাতে কোনো ভেটোক্ষমতা দিতে বলা হয়নি), যথা- জার্মানি, জাপান, ভারত, নাইজেরিয়া এবং ব্রাজিলের নিজের জন্য। যদি এমনটি হয়, তবে বিশ্বে ১ বিলিয়ন মুসলমান জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রতিনিধিহীন থাকবে— যদি সেক্ষেত্রে নাইজেরিয়া ওই দায়িত্ব বহন করতে পারে, তবে তা অংশত মিটে যাবে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিষ্কারভাবে জাপান এবং ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া উচিত এবং আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও মুসলমান বিশ্বের স্থায়ী আসন থাকা দরকার। তবে, এটি রেশনিং বা পর্যায়ক্রমে দেয়া যায়। এ বিষয়ে ওআইসি, ওএইউ এবং আমেরিকাবিহীন অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস থেকে প্রস্তাব ও চক্র-দায়িত্বের রুটিন আসতে পারে। এমনটি হলে সেক্ষেত্রে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের আসনকে এক করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নামে আসন সৃষ্টি করে রেশনিং-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তা বণ্টিত হতে পারে। তাহলে, ৭টি সভ্যতার মধ্যে দেখা যাবে পাশ্চাত্যবিশ্ব পাবে ২টি, আর অন্যান্যরা পাবে ১টি করে। আর বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বৃহত্তর জনসংখ্যা, সম্পদের ভিত্তিতে ক্ষমতার বণ্টন নিশ্চিত করতে পারা সম্ভব হবে।

সভ্যতার সাধারণ বা এজমালি দিকসমূহ (Commonalities)

কিছু আমেরিকান নিজদেশে বহুধাসংস্কৃতি প্রসারে কাজ করছে; কেউ বা বিদেশে সর্বজনীন বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। আবার কেউ কেউ দুটো কাজ একত্রে করে যাচ্ছে। পূর্বে আলোচনা করে দেখা গেছে, বহুধাসংস্কৃতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়া যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের জন্য সুফল বয়ে আনবে না, বরং তা শঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে। অন্যদিকে, সর্বজনীনতাও বিদেশে বিশ্ব ও পশ্চিমাদের জন্য ভীতিকর পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। কেননা, উভয়ই পশ্চিমাবিশ্বের সংস্কৃতির অদ্বিতীয়ত্বকে অস্বীকার করে। সারা বিশ্বের জন্য এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির কথা বলেন তারা, যারা আসলে বিশ্বকে আমেরিকার মতো বানাতে চান। অন্যদিকে, আমেরিকার অভ্যন্তরে যারা বহুধাসভ্যতা ও সংস্কৃতি ডেকে আনতে চান, তারা আসলে চান যে, আমেরিকা বিশ্বের মতো হোক। বহুধাসংস্কৃতিসম্পন্ন আমেরিকা সম্ভব নয়, কারণ অপাশ্চাত্য আমেরিকা মোটেও আমেরিকা নয়। একটি বহুধাসংস্কৃতিবিশিষ্ট বিশ্ব এড়ানো সম্ভব নয়। কেননা 'বৈশ্বিক সাম্রাজ্য' অসম্ভব ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্রকে ও পশ্চিমাবিশ্বকে রক্ষা করার নিমিত্তে প্রয়োজন উভয়ের পরিচয়ের 'নবায়ন'। বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য বৈশ্বিক বহুধাসংস্কৃতিকে মেনে নেয়া ব্যতীত অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

পাশ্চাত্যের সর্বজনীনতার শূন্যগর্ভ এবং বিশ্বের সংস্কৃতির বহুধাবিভক্ততার বাস্তবতা কি অত্যাবশ্যকীয় এবং অবশ্যাম্ভাবীভাবে বিশ্বে নৈতিক ও সংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ বয়ে নিয়ে আসছে? যদি সর্বজনীনতা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদকে বৈধতা প্রদান করে, তাহলে আপেক্ষিকতাবাদ কি অত্যাচার ও নিপীড়নকে বৈধতা দেয়? এ প্রশ্নসমূহের উত্তর হবে 'হাঁ' অথবা 'না'।

সংস্কৃতি নিজেই একটি আপেক্ষিক ধারণা, তবে নৈতিকতা সম্পূর্ণ বা অবিমিশ্র। মাইকেল ওয়ালজার যুক্তি দেখান যে, সংস্কৃতি হল নিবিড় ও প্রশস্ত। একটি সমাজে

সংস্কৃতি মানুষ ও প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধারায় চলতে বা আচরণের ধারা নির্দেশ করে। বিশেষ করে সমাজ-উপযোগী পরিশুদ্ধ রাস্তাই সংস্কৃতি প্রদর্শন করে থাকে। 'অধিকতর' 'পেরিয়ে' এবং মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে বেড়ে ওঠা নৈতিকতা প্রকৃত প্রস্তাবে 'সংকীর্ণ বা সরু' ন্যূনতম নৈতিকতাপন্থীদের মত প্রকাশ, পূর্ণব্যক্তকৃত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশেষ নিবিড় বা প্রশস্ত বা সর্বোচ্চ স্তরের 'নৈতিকতা'। সত্য এবং ন্যায়বিচারসম্পন্ন ন্যূনতম নৈতিকতার ধারণা প্রায় সকল নিবিড় বা প্রশস্ত নৈতিকতার মধ্যে বজায় থাকে এবং তাকে বাদ দেয়া যায় না। ন্যূনতম নৈতিকতা হল, সেসঙ্গে কর্তৃপক্ষীয় নেতিবাচক আদেশ, যেমন খুনের বিরুদ্ধে আইন, কপটতা, অত্যাচার-নিপীড়ন, নির্যাতন এবং স্বৈর বা জুলুমবাজ শাসন, যা মানুষের জন্য সাধারণ সংস্কৃতিবোধে ও তার বাস্তবায়নের আজ্ঞার চাইতে শত্রু সম্পর্কে সাধারণবোধ (শয়তান) অনেক বেশি কার্যকর। মানবসমাজ সর্বজনীন, কারণ তা মানুষের দ্বারা গঠিত; বিশেষভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এটি 'সমাজ'। একসময়ে আমরা অন্যের সঙ্গে ছুটে যাই, তখন আসলে আমরা একাই ছুটে যাই।[১৯] তবুও 'সংকীর্ণ বা সরু' ন্যূনতম নৈতিকতা মানুষের সাধারণ অবস্থা থেকে ব্যুৎপত্তি বা অবয়ব লাভ করে থাকে এবং 'সর্বজনীন বিন্যাস' সকল সংস্কৃতির ভেতরই দৃশ্যমান।[২০] কোনো সভ্যতা ধরে নেয়া বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রসারতার চিন্তার চাইতে বরং সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের চাহিদা পূরণ করা বাঞ্ছনীয়, আর এজন্য চাই সকলপ্রকার সংস্কৃতির মধ্যে 'সাধারণ দিকগুলো' সফলভাবে উন্মোচিত করে তার প্রসার ঘটানো। বহুমুখীসংস্কৃতিসম্পন্ন ধরাধামে গঠনমূলক কাজ হবে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীনতাকে পরিত্যাগপূর্বক তা ভিন্নতাকে গ্রহণ করা এবং ভিন্নতার মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলো বের করে এনে তা চর্চা করা ও তার মধ্যে একত্রীকরণ বা সাধারণবোধের উন্মেষ ঘটানো, অর্থাৎ 'ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য' আনা।

সাংস্কৃতিক সাধারণত্বের পরিচয় পাওয়ার প্রকৃত কার্যক্রম ১৯৯০-এর দশকে সিঙ্গাপুরে ক্ষুদ্রস্থানে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ হল চীনাবংশোদ্ভূত, শতকরা ১৫ ভাগ মালয় এবং মুসলমান; আর শতকরা ৬ ভাগ ভারতীয় হিন্দু ও শিখ। অতীতে সরকার সেখানে 'কনফুসীয় মূল্যবোধ' প্রয়োগ করতে চেয়েছিল, সেসঙ্গে সবাইকে শিক্ষিত ও ইংরেজিভাষায় দক্ষ করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট উই কিম উইই পার্লামেন্টে তাঁর এক ভাষণে বলেন যে, সিঙ্গাপুরের ২.৭ মিলিয়ন মানুষকে বাইরের সংস্কৃতির প্রভাব, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ভালোদিক গ্রহণ করতে হবে। কেননা সেখান থেকে নতুন প্রযুক্তির ধারণা ও জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, ওই সংস্কৃতি আমাদের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধকে বিদেশী করে দিতে পারে। আমাদের এশীয়ঐতিহ্য আমাদের এমন নৈতিকতা শিক্ষা দেয় যা কর্মমুখর এবং এমন এক সমাজকে নির্দেশ করে, যে সমাজ আমাদেরকে অতীত থেকে এখানে নিয়ে এসেছে।' তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'অধিকতর পাশ্চাত্যের হাওয়া ঢুকবার রাস্তা ছেড়ে দিলে তা হবে সমাজকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করা' এবং 'স্বার্থমুখী' এক জীবনপদ্ধতিকে বরণ করে নেয়া।' তাই আমাদের উচিত হবে, সিঙ্গাপুরের সংস্কৃতির 'কোর'-মূল্যবোধসমূহ বের করে আনা, যে মূল্যবোধগুলো হল সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মূল্যবোধের মধ্যে 'সাধারণ দিকসম্পন্ন মূল্যবোধ'-এর রক্ষণ ও প্রতিপালন। আর এভাবেই আমরা সিঙ্গাপুরের মূল ঐক্যের সুর খুঁজে পাব।'

প্রেসিডেন্ট উই চারটি মূল্যবোধ নির্দেশ করেছেন, অর্থাৎ 'সমাজ' কে 'আত্ম'-এর উপর স্থান দেয়া; 'পরিবারকে' সমাজের মৌলকাঠামোর ভিত্তি হিসেবে উপরে তুলে ধরতে হবে; ঐকমতের ভিত্তিতে প্রধান ইস্যুসমূহের সমাধান খুঁজে নিতে হবে, এক্ষেত্রে প্রতিরোধ যেন গুরুত্ব না পায়; ধর্মীয় ও বর্ণবাদী চিন্তাচেতনার মধ্যে সহনশীলতা এবং ঐকতান আনতে হবে।

তাঁর বক্তব্যে তিনি সিঙ্গাপুরের মূল্যবোধ তুলে ধরেন সঠিকভাবে। এর দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্ট-এর বক্তব্য শ্বেতপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে সরকারের অবস্থান জানানো হয়। উক্ত শ্বেতপত্রে প্রেসিডেন্টের সমগ্র ৪টি নির্দেশ গ্রহণ করা হয় এবং তার সঙ্গে ৫ম আর একটি বিষয়যুক্ত করা হয়, যা ব্যক্তিকে সমর্থন করে রচিত। মূলত এটি করা হয়েছিল ব্যক্তির মেধাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করার নিমিত্তে। আর তা ছিল নিঃসন্দেহে কনফুসীয় মূল্যবোধসম্বলিত পদসোপান সম্বলিত পারিবারিক মূল্যবোধের বিপরীত। কেননা, উক্ত ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবোধ সেখানে স্বজনপ্রীতির জন্ম দিয়েছিল। শ্বেতপত্রে সিঙ্গাপুরের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শুনতে পাওয়া যায় : জাতি (নৃগোষ্ঠীক), সম্প্রদায় ও সমাজআত্ম বা নিজের উপরে স্থান পাবে; পরিবার হবে সমাজের মূল ভিত্তি; সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যক্তিকে সমর্থন প্রদান করবে; প্রতিরোধ নয়, ঐকমত্য হবে সংঘাত এড়ানোর উপায়; বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সহিষ্ণু মনোভাবের বিস্তার, সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা এবং সরকারের সক্ষমতা নীতি গ্রহণ করতে যেয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মূল্যবোধের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর প্রয়োজনে রাজনৈতিক মূল্যবোধ অংশত বর্জন করা হয়।

সরকার ঘোষণা দেয় যে, 'সিঙ্গাপুর এশীয় সমাজের ভেতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। এবং এটি ধরে রাখতে হবে। সিঙ্গাপুরীয়গণ আমেরিকান বা এ্যাংলোস্যাক্সন নয়, যদিও আমরা ইংরেজিতে কথা বলি ও পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করি। যদি আমরা আমেরিকান, ব্রিটিশ অথবা অস্ট্রেলিয়দের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করতে না পারি, তবে আমরা খারাপ পরিস্থিতিতে নিপতিত হব। কেননা তা হবে নিছক নকলবাজি এবং মতভেদও সৃষ্টি হবে (আর তা হল একটি ছিন্নরাষ্ট্র)। পাশ্চাত্যের সমাজ থেকে আমাদের 'নিজেদের সীমানা' ধরে রাখতে হবে, ... এভাবে আমরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব।'[২১]

সিঙ্গাপুর-প্রকল্পটি উচ্চাশাসম্পন্ন এবং সেসঙ্গে তা আলোকিত প্রচেষ্টা, যা সিঙ্গাপুরের সংস্কৃতিক পরিচয়, এর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় আনার ডাক দেয়। অবশ্যই এ প্রচেষ্টা তাদেরকে পাশ্চাত্য থেকে আলাদা করে। পাশ্চাত্য বা বিশেষ করে আমেরিকার মূল্যবোধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। ওই সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে 'ব্যক্তির অধিকার' সম্প্রদায়সমূহের অনেক উঁচুতে মনে করা হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে প্রকৃত নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ এবং আইনের শাসন কিন্তু প্রকারান্তরে 'বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ও দায়িত্বশীল শাসনকর্তার ধারণাকে' নাকচ করে দেয়। অর্থাৎ প্রথমটি গণতান্ত্রিক আর শেষের ধারণা হচ্ছে এলিটসুলভ। যাই হোক, তারা সিঙ্গাপুরের মূল্যবোধকেই উর্ধ্বে স্থান দেয় এবং পাশ্চাত্য মূল্যবোধকে নিম্নে স্থান দেয়।

কিছুসংখ্যক পশ্চিমা চিন্তাবিদ প্রজ্ঞাসুলভ নয়, বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করে বসেন। মোটের ওপর কমপক্ষে মৌল, সংকীর্ণ বা সরু নৈতিকতার স্তরের হলেও পশ্চিমা মূল্যবোধ ও এশীয় মূল্যবোধের ভেতর কিছু বিষয় রয়েছে নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান (সাধারণ)। উপরন্তু, অনেকেই দেখান যে, মানবতাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভক্ত করা, যেমন বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর দ্বারা তা করা হয়েছে। (পাশ্চাত্যের) খ্রিস্টধর্ম, অর্থোডক্স, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম, কনফুসীয়, টইজম, ইহুদিবাদ ইত্যাদির মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নির্বিশেষে সব ধর্মের মধ্যে সমানভাবে রয়েছে— এটি হল 'সাধারণ'। যদি মানুষ কোনোদিন সত্যিকারভাবে সর্বজনীন সভ্যতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়, তবে তা আসবে মূলত ওইসব মতভেদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া সাধারণ বা এজমালি বিষয়গুলোকে ভিত্তি করেই। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন মেধা ও মনন দিয়ে বিভেদের ভেতর থেকে সাধারণ বিষয়গুলো টেনে নিয়ে এসে সেমতো মানুষকে আলোকিত করা।

এভাবে 'বর্জন শাসন' এবং 'যৌথ মধ্যস্থতার শাসন'-এর বাইরে তৃতীয় ধারায় সংঘাত এড়িয়ে 'শান্তিমুখী শাসন' হচ্ছে বহুধাবিভক্ত সংঘাতময় সংস্কৃতির যুগে সাধারণত্বের শাসন (Commonalities rule)। রাষ্ট্র-সমাজের সকল নাগরিক খুঁজে নেবেন এবং ধারণা করবেন বর্ধিষ্ণু সেই মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান এবং তা বাস্তবায়নের কলাকৌশল যা তাদের বিভিন্ন সভ্যতার ভেতর 'সাধারণ' হয়ে অবস্থান করছে। এই ধারায় এগিয়ে গেলে, তা যে শুধু বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংঘাতকে সীমিত করবে তাই নয়, তার সাথে তা সভ্যতার একমুখীকরণ প্রক্রিয়াকেও এগিয়ে নেবে। এই একমুখী সভ্যতা হল প্রকৃতপক্ষে একটি 'মিশ্র অবস্থা' যা উচ্চতর মানসিকতা, নৈতিকতা, ধর্মীয়, শিক্ষাপ্রক্রিয়া, কলাকৌশল, দর্শন, প্রযুক্তি, বস্তুগত উন্নতি এবং সম্ভবত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও চেতনাসম্পৃক্ত। এ-ধরনের অবস্থা একটি থেকে অন্যটিকে কোনোভাবেই পৃথক করার সুযোগ পাবে না। পণ্ডিতজনেরা সহজেই সভ্যতার স্তর ও ধরন সম্পর্কে সভ্যতার ইতিহাসে এর ভেতর থেকে 'উচ্চমাত্রিকতা' এবং 'নিম্নমাত্রিকতা' সম্পর্কে নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।

এখন প্রশ্ন আসে : কীভাবে একটি তালিকার মাধ্যমে সভ্যতার ক্ষেত্রে মানবতার উত্থান-পতনের অবস্থা প্রদর্শন করা যায়? সেখানে কি কোনো সাধারণ, ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতা ইত্যাদি বিশেষ সভ্যতাকে উতরিয়ে গিয়ে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য উচ্চস্তরের সভ্যতা নিয়ে আসবে? যদি সেখানে এ-ধরনের কোনো প্রবণতা কাজ করে, তবে তা কি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলাফলের মাধ্যমে ঘটবে— কেননা, আধুনিকতা মানুষের মধ্যে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যা তাদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চপর্যায়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বস্তুগত সামগ্রীর প্রসারের ভেতর দিয়ে জীবনে প্রাচুর্য বয়ে আনতে সক্ষম করে। বর্তমান সময়ে উচ্চমাত্রিক আধুনিকতার মাধ্যমে কি উচ্চমাত্রিক সভ্যতা অর্জন করা যায়? অর্থাৎ উচ্চমাত্রিক আধুনিকতা কি উচ্চমাত্রিক সভ্যতার পূর্বশর্ত? অথবা বিশেষ সভ্যতা কি সভ্যতার ইতিহাসে প্রাথমিকভাবে একটি থেকে অন্যটি পৃথক করে? এই ইস্যুটি আরও একটি বিতর্কিত ইস্যু, যা ইতিহাসে রৈখিক বা চক্রাকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত উচ্চতর আধুনিকতা এবং মানুষের নৈতিক উন্নয়ন উচ্চতর শিক্ষা, সচেতনতা এবং মানবসমাজ সম্পর্কে ধারণা একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ উপহার দেয়, যার

ভেতর দিয়ে উচ্চতর সভ্যতার দিকে ছুটে যাওয়া সম্ভব হয়। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, সভ্যতার স্তর আসলে সভ্যতার বিবর্তনের প্রক্রিয়ার পর্যায়েরই প্রতিফলন বিশেষ।

যখন সভ্যতা প্রথম অবির্ভূত হয়েছিল, তখন তার মানুষ ছিল তেজস্বী, গতিশীল, নৃশংস, চলমান এবং সম্প্রসারণবাদী। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে তারা ছিল "অসভ্য"। সভ্যতা যত এগিয়ে যেতে শুরু করল, মানুষ ততই স্থায়ী হতে থাকল এবং এমন কিছু করতে থাকল, যার মাধ্যমে তারা কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা লাভ করে তাকে আরও সামনে নিয়ে যেতে লাগল। যখন সভ্যতার মধ্যে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটবে তখন সর্বজনীন রাষ্ট্রের উদয়ের ফলে নাগরিকেরা সর্বোচ্চ মাত্রায় সভ্যতার সন্ধান পাবে, যাকে 'সভ্যতার স্বর্ণযুগ' বলা যাবে, যার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে নৈতিকতা, কলা, সাহিত্য, দর্শন, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতি, আর রাজনৈতিক সক্ষমতা। যদি এটি একটি সভ্যতা হিসেবে নিম্নগামী হতে থাকে, তবে তা ধ্বংসের দিকেই যাবে, এবং হবে নিশ্চিহ্ন, আর তার স্থলে আসবে নিম্নস্তরের সভ্যতা।

আধুনিকতা সাধারণভাবে সভ্যতার বস্তুগত চাওয়া-পাওয়াকে এগিয়ে নেয়। কিন্তু আধুনিকতা কি সভ্যতার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি আনতে পারে? কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ঘটতে পারে। দাসত্ব, অত্যাচার, মানুষের ওপর বিবিধ নির্যাতন ও অপব্যবহার, বর্তমান বিশ্বে ক্রমাগতভাবে কম-গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এটি কি সাদামাটাভাবে অন্য সভ্যতার ওপর পাশ্চাত্যসভ্যতার ফলাফল হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে? তা হলে কি বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা শক্তিহীন হয়ে পড়লে পৃথিবীব্যাপী নৈতিকতাও সংকটে পড়বে? ১৯৯০-এর দশকে অনেক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে বিশ্বব্যবস্থায় ছিল 'ডাহা অরাজকতা'। বিশ্বব্যাপী আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ব্যর্থ রাষ্ট্রের আধিক্য, নৈরাজ্যজনক অবস্থার অগ্রায়ন, বিশ্বব্যাপী অপরাধের ব্যাপকমাত্রায় জাগরণ, আন্তর্জাতিক মাফিয়া-চক্রের তৎপরতা, মাদকদ্রব্যের অবৈধ লেনদেন, মাদকাশক্তির আশঙ্কাজনক বিস্তার, পরিবারের দুর্বলাবস্থা, সমাজে বিশ্বাস, আস্থা এবং সামাজিক বোধের অভাব, নৃগোষ্ঠীক, ধর্মীয় এবং সভ্যতাসম্পৃক্ত সহিংসতা, এবং বন্দুকের শাসনের ক্রমবর্ধমানতা এখন বিশ্বকে ঘিরে ধরেছে। শহরের পর শহর, যেমন মস্কো, রাও দি জানেরিও, ব্যাংকক, সাংহাই, লন্ডন, রোম, ওয়ার্শ, টকিও, জুহান্সবার্গ, দিল্লি, করাচি, শিকাগো, বোগটা, ওয়াশিংটনে অপরাধচক্র যেন সভ্যতাকে গলাটিপে ধরেছে। মানুষ সর্বত্র 'সুশাসনের অভাব' ও 'সংকটের কথা' বলতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন অর্থনৈতিক ও ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদন করছে, সেসঙ্গে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র মাফিয়া আকারেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংগঠিত অপরাধ, মাদক দ্রব্য প্রভৃতি প্রতিনিয়ত মানুষকে বিব্রত ও অপমানিত করে চলেছে। আইন ও শৃঙ্খলা হল সভ্যতার প্রধান শর্ত, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা, সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন, দক্ষিণএশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, প্রভৃতি যেন দিনের-পর-দিন বাষ্পীভূত হয়ে চলেছে। চীন, জাপান এবং পশ্চিমা জগৎ আজ অপমানগ্রস্ত। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী সভ্যতা যেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্বরতা, নজিরবিহীন অরাজকতা, মাদক যুগের সূত্রপাত করে চলেছে। আর এসবই মানবতাকে ধ্বংসের গহ্বরে টেনে নামাচ্ছে।

১৯৫০-এর দশকে লেসটার পার্সন সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ এমন একটি যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ পাশাপাশি দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে বসবাস করবে, একে অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা নেবে, একে অন্যের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, একে অপরের মধ্যে আদর্শ, মূল্যবোধ সংস্কৃতির আদান-প্রদান করবে, আর এভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট থেকে লেনদেনের ভিত্তিতে জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলবে। আর এর বিকল্প হবে ধ্বংসাত্মক, ভুল-বোঝাবুঝি, অস্থিরতা, সংঘাত এবং সর্বধ্বংসমুখিনতা।'[২২] শান্তি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ দুটিই নির্ভর করছে বোঝাপড়া, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আত্মিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য, এবং সভ্যতাগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতাগণের সমন্বয়ের ওপর। সভ্যতার সংঘাত, ইউরোপ এবং আমেরিকায় একত্রে ঝুলে রয়েছে বা পৃথকভাবে ঝুলে রয়েছে। বৃহত্তর সংঘাত, বিশ্বব্যাপী যা ঘটে তা হল প্রকৃত সংঘাত। আর তা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, সম্ভবত 'সভ্যতা' ও 'বর্বরতার' মধ্যে পৃথিবীর বৃহৎ সভ্যতাসমূহ তাদের উন্নতমানের ধর্ম, কলা, শিল্পকর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নৈতিকতা এবং করুণা নিয়ে ঝুলে থাকবে একত্রে বা আলাদা আলাদাভাবে। আজ ভয়-ভীতি ও আবির্ভূত দিনগুলোতে সভ্যতার সংঘাত বিশ্বশান্তির প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বিপদ। অথচ সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিয়মানুবর্তিতাই হল বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ।

Notes

Chapter 1

1. Henry A. Kissinger, *Diplomacy* (New York: Simon & Schuster, 1994), pp. 23-24.

2. H. D. S. Greenway's phrase, *Boston Globe*, 3 December 1992, p. 19.

3. Vaclav Havel, "The New Measure of Man," *New York Times*, 8 July 1994, p. A27; Jacques Delors, "Questions Concerning European Security," Address, International Institute for Strategic Studies, Brussels, 10 September 1993, p. 2.

4. Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago: University of Chicago Press, 1962), pp. 17–18.

5. John Lewis Gaddis, "Toward the Post-Cold War World." *Foreign Affairs*, 70 (Spring 1991), 101; Judith Goldstein and Robert O. Keohane, "Ideas and Foreign Policy: An Analytical Framework," in Goldstein and Keohane, eds., *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1993), pp. 8–17.

6. Francis Fukuyama, "The End of History," *The National Interest*, 16 (Summer 1989), 4 18.

7. "Address to the Congress Reporting on the Yalta Conference," 1 March 1945, in Samuel I. Rosenman, ed., *Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt* (New York: Russell and Russell, 1969), XIII, 586.

8. See Max Singer and Aaron Wildavsky, *The Real World Order: Zones of Peace, Zones of Turmoil* (Chatham, NJ: Chatham House, 1993); Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Introduction: The End of the Cold War in Europe," in Keohane, Nye, and Stanley Hoffmann, eds., *After the Cold War: International Institutions and State Strategies in Europe, 1989–1991* (Cambridge: Harvard University Press, 1993), p. 6; and James M. Goldgeier and Michael McFaul, "A Tale of Two Worlds: Core and Periphery in the Post-Cold War Era," International Organization, 46 (Spring 1992), 467-491.

9. See F. S. C. Northrop, *The Meeting of East and West: An Inquiry Concerning World Understanding* (New York: Macmillan, 1946).

10. Edward W. Said, *Orientalism* (New York: Pantheon Books, 1978), pp. 43–44.

11. See Kenneth N. Waltz, "The Emerging Structure of International Politics," *International Security*, 18 (Fall 1993), 44–79; John J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War," *International Security*, 15 (Summer 1990), 5–56.

12. Stephen D. Krasner questions the importance of Westphalia as a dividing point. See his "Westphalia and All That," in Goldstein and Keohane, eds., *Ideas and Foreign Policy*, pp. 235–264.

13. Zbigniew Brzezinski, *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-first Century* (New York: Scribner, 1993); Daniel Patrick Moynihan, *Pandaemonium:*

Ethnicity in International Politics (Oxford: Oxford University Press, 1993); see also Robert Kaplan, "The Coming Anarchy," *Atlantic Monthly*, 273 (Feb. 1994), 44–76.

14. See *New York Times*, 7 February 1993, pp. 1, 14; and Gabriel Schoenfeld, "Outer Limits," *Post-Soviet Prospects*, 17 (Jan. 1993), 3, citing figures from the Russian Ministry of Defense.

15. See Gaddis, "Toward the Post–Cold War World"; Benjamin R. Barber, "Jihad vs. McWorld," *Atlantic Monthly*, 269 (March 1992), 53–63, and *Jihad vs. McWorld* (New York: Times Books, 1995); Hans Mark, "After Victory in the Cold War: The Global Village or Tribal Warfare," in J. J. Lee and Walter Korter, eds., *Europe in Transition: Political, Economic, and Security Prospects for the 1990s* (LBJ School of Public Affairs, University of Texas at Austin, March 1990), pp. 19–27.

16. John J. Mearsheimer, "The Case for a Nuclear Deterrent," *Foreign Affairs*, 72 (Summer 1993), 54.

17. Lester B. Pearson, *Democracy in World Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1955), pp. 82–83.

18. Quite independently Johan Galtung developed an analysis that closely parallels mine on the salience to world politics of the seven or eight major civilizations and their core states. See his "The Emerging Conflict Formations," in Katharine and Majid Tehranian, eds., *Restructuring for World Peace: On the Threshold of the Twenty-First Century* (Cresskill NJ: Hampton Press, 1992), pp. 23–24. Galtung sees seven regional-cultural groupings emerging dominated by hegemons: the United States, European Community, Japan, China, Russia, India, and an "Islamic core." Other authors who in the early 1990s advanced similar arguments concerning civilizations include: Michael Lind, "American as an Ordinary Country," *American Enterprise*, 1 (Sept./Oct. 1990), 19–23; Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century," *International Affairs*, 67 (1991), 441, 448–449; Robert Gilpin, "The Cycle of Great Powers: Has It Finally Been Broken?" (Princeton University, unpublished paper, 19 May 1993), pp. 6ff.; William S. Lind, "North-South Relations: Returning to a World of Cultures in Conflict," *Current World Leaders*, 35 (Dec. 1992), 1073–1080, and "Defending Western Culture," *Foreign Policy*, 84 (Fall 1994), 40–50; "Looking Back from 2992: A World History, chap. 13: The Disastrous 21st Century," *Economist*, 26 December 1992–8 January 1993, pp. 17–19; "The New World Order: Back to the Future," *Economist*, 8 January 1994, pp. 21–23; "A Survey of Defence and the Democracies," *Economist*, 1 September 1990; Zsolt Rostovanyi, "Clash of Civilizations and Cultures: Unity and Disunity of World Order," (unpublished paper, 29 March 1993); Michael Vlahos, "Culture and Foreign Policy," *Foreign Policy*, 82 (Spring 1991), 59–78; Donald J. Puchala, "The History of the Future of International Relations," *Ethics and International Affairs*, 8 (1994), 177–202; Mahdi Elmandjra, "Cultural Diversity: Key to Survival in the Future," (Paper presented to First Mexican Congress on Future Studies, Mexico City, September 1994). In 1991 Elmandjra published in Arabic a book which appeared in French the following year entitled *Premiere Guerre Civilisationnelle* (Casablanca: Ed. Toubkal, 1982, 1994).

19. Fernand Braudel, *On History* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), pp. 210–211.

Chapter 2

1. "World history is the history of large cultures." Oswald Spengler, *Decline of the West* (New York: A. A. Knopf, 1926–1928), II, 170. The major works by these scholars analyzing the nature and dynamics of civilizations include: Max Weber, *The Sociology*

of Religion (Boston: Beacon Press, trans. Ephraim Fischoff, 1968); Emile Durkheim and Marcel Mauss, "Note on the Notion of Civilization," *Social Research*, 38 (1971), 808–813; Oswald Spengler, *Decline of the West*; Pitirim Sorokin, *Social and Cultural Dynamics* (New York: American Book Co., 4 vols., 1937–1985); Arnold Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 12 vols., 1934–1961); Alfred Weber, *Kulturgeschichte als Kultursoziologie* (Leiden: A. W. Sijthoff's Uitgerversmaatschappij N.V., 1935); A. L. Kroeber, *Configurations of Culture Growth* (Berkeley: University of California Press, 1944), and *Style and Civilizations* (Westport, CT: Greenwood Press, 1973); Philip Bagby, *Culture and History: Prolegomena to the Comparative Study of Civilizations* (London: Longmans, Green, 1958); Carroll Quigley, *The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis* (New York: Macmillan, 1961); Rushton Coulborn, *The Origin of Civilized Societies* (Princeton: Princeton University Press, 1959); S. N. Eisenstadt, "Cultural Traditions and Political Dynamics: The Origins and Modes of Ideological Politics," *British Journal of Sociology*, 32 (June 1981), 155–181; Fernand Braudel, *History of Civilizations* (New York: Allen Lane—Penguin Press, 1994) and *On History* (Chicago: University of Chicago Press, 1980); William H. McNeill, *the Rise of the West: A History of the Human Community* (Chicago: University of Chicago Press, 1963); Adda B. Bozeman, "Civilizations Under Stress," *Virginia Quarterly Review*, 51 (Winter 1975), 1–18, *Strategic Intelligence and Statecraft* (Washington: Brassey's (US), 1992), and *Politics and Culture in International History: From the Ancient Near East to the Opening of the Modern Age* (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994); Christopher Dawson, *Dynamics of World History* (LaSalle, IL: Sherwood Sugden Co., 1978), and *The Movement of World Revolution* (New York: Sheed and Ward, 1959); Immanuel Wallerstein, *Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-system* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992); Felipe Fernández-Armesto, *Millennium: A History of the Last Thousand Years* (New York: Scribners, 1995). To these works could be added the last, tragically marked work of Louis Hartz, *A Synthesis of World History* (Zurich: Humanity Press, 1983), which "with remarkable prescience," as Samuel Beer commented, "foresees a division of mankind very much like the present pattern of the post–Cold War world" into five great "culture areas": Christian, Muslim, Hindu, Confucian, and African. Memorial Minute, Louis Hartz, *Harvard University Gazette*, 89 (May 27, 1994). An indispensable summary overview and introduction to the analysis of civilizations is Matthew Melko, *The Nature of Civilizations* (Boston: Porter Sargent, 1969). I am also indebted for useful suggestions to the critical paper on my *Foreign Affairs* article by Hayward W. Alker, Jr., "If Not Huntington's 'Civilizations,' Then Whose?" (unpublished paper, Massachusetts Insitute of Technology, 25 March 1994).

2. Braudel, *On History*, pp. 177–181, 212–214, and *History of Civilizations*, pp. 4–5; Gerrit W. Gong, *The Standard of "Civilization" in International Society* (Oxford: Clarendon Press, 1984), 81ff., 97–100; Wallerstein, *Geopolitics and Geoculture*, pp. 160ff. and 215ff.; Arnold J. Toynbee, *Study of History*, X, 274–275, and *Civilization on Trial* (New York: Oxford University Press, 1948), p. 24.

3. Braudel, *On History*, p. 205. For an extended review of definitions of culture and civilization, especially the German distinction, see A. L. Kroeber and Clyde Kluckhohn, *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions* (Cambridge: Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. XLVII, No. 1, 1952), passim but esp. pp. 15–29.

4. Bozeman, "Civilizations Under Stress," p. 1.

5. Durkheim and Mauss, "Notion of Civilization," p. 811; Braudel, *On History*,

pp. 177, 202; Melko, *Nature of Civilizations*, p. 8; Wallerstein, *Geopolitics and Geoculture*, p. 215; Dawson, *Dynamics of World History*, pp. 51, 402; Spengler, *Decline of the West*, I, p. 31. Interestingly, the *International Encyclopedia of the Social Sciences* (New York: Macmillan and Free Press, ed. David L. Sills, 17 vols., 1968) contains no primary article on "civilization" or "civilizations." The "concept of civilization" (singular) is treated in a subsection of the article called "Urban Revolution," while civilizations (plural) receive passing mention in an article called "Culture."

6. Herodotus, *The Persian Wars* (Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972), pp. 543–544.

7. Edward A. Tiryakian, "Reflections on the Sociology of Civilizations, "*Sociological Analysis*, 35 (Summer 1974), 125.

8. Toynbee, *Study of History*, I, 455, quoted in Melko, *Nature of Civilizations*, pp. 8–9; and Braudel, *On History*, p. 202.

9. Braudel, *History of Civilizations*, p. 35, and *On History*, pp. 209–210.

10. Bozeman, *Strategic Intelligence and Statecraft*, p. 26.

11. Quigley, *Evolution of Civilizations*, pp. 146ff.; Melko, *Nature of Civilizations*, pp. 101ff. See D. C. Somervell, "Argument" in his abridgment of Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, vols. I–VI (Oxford: Oxford University Press, 1946), pp. 569ff.

12. Lucian W. Pye, "China: Erratic State, Frustrated Society," *Foreign Affairs*, 69 (Fall 1990), 58.

13. See Quigley, *Evolution of Civilizations*, chap. 3, esp. pp. 77, 84; Max Weber, "The Social Psychology of the World Religions," in *From Max Weber: Essays in Sociology* (London: Routledge, trans. and ed. H. H. Gerth and C. Wright Mills, 1991), p. 267; Bagby, *Culture and History*, pp. 165–174; Spengler, *Decline of the West*, II, 31ff; Toynbee, *Study of History*, I, 133; XII, 546–547; Braudel, *History of Civilizations*, passim; McNeill, *The Rise of the West*, passim; and Rostovanyi, "Clash of Civilizations," pp. 8–9.

14. Melko, *Nature of Civilizations*, p. 133.

15. Braudel, *On History*, p. 226.

16. For a major 1990s addition to this literature by one who knows both cultures well, see Claudio Veliz, *The New World of the Gothic Fox* (Berkeley: University of California Press, 1994).

17. See Charles A. and Mary R. Beard, *The Rise of American Civilization* (New York: Macmillan, 2 vols., 1927) and Max Lerner, *America as a Civilization* (New York: Simon & Schuster, 1957). With patriotic boosterism, Lerner argues that "For good or ill, America is what it is—a culture in its own right, with many characteristic lines of power and meaning of its own, ranking with Greece and Rome as one of the great distinctive civilizations of history." Yet he also admits, "Almost without exception the great theories of history find no room for any concept of America as a civilization in its own right" (pp. 58–59).

18. On the role of fragments of European civilization creating new societies in North America, Latin America, South Africa, and Australia, see Louis Hartz, *The Founding of New Societies: Studies in the History of the United States, Latin America, South Africa, Canada, and Australia* (New York: Harcourt, Brace & World, 1964).

19. Dawson, *Dynamics of World History*, p. 128. See also Mary C. Bateson, "Beyond Sovereignty: An Emerging Global Civilization," in R. B. J. Walker and Saul H. Mendlovitz, eds., *Contending Sovereignties: Redefining Political Community* (Boulder: Lynne Rienner, 1990), pp. 148–149.

20. Toynbee classifies both Therevada and Lamaist Buddhism as fossil civilizations, *Study of History*, I, 35, 91–92.

21. See, for example, Bernard Lewis, *Islam and the West* (New York: Oxford University Press, 1993); Toynbee, *Study of History*, chap. IX, "Contacts between Civilizations in Space (Encounters between Contemporaries)," VIII, 88ff; Benjamin Nelson, "Civilizational Complexes and Intercivilizational Encounters," *Sociological Analysis*, 34 (Summer 1973), 79–105.

22. S. N. Eisenstadt, "Cultural Traditions and Political Dynamics: The Origins and Modes of Ideological Politics," *British Journal of Sociology*, 32 (June 1981), 157, and "The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics," *Archives Europeennes de Sociologie*, 22 (No. 1, 1982), 298. See also Benjamin I. Schwartz, "The Age of Transcendence in Wisdom, Revolution, and Doubt: Perspectives on the First Millennium B.C.," *Daedalus*, 104 (Spring 1975), 3. The concept of the Axial Age derives from Karl Jaspers, *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte* (Zurich: Artemisverlag, 1949).

23. Toynbee, *Civilization on Trial*, p. 69. Cf. William H. McNeill, *The Rise of the West*, pp. 295–298, who emphasizes the extent to which by the advent of the Christian era, "Organized trade routes, both by land and by sea, . . . linked the four great cultures of the continent."

24. Braudel, *On History*, p. 14: ". . . cultural influence came in small doses, delayed by the length and slowness of the journeys they had to make. If historians are to be believed, the Chinese fashions of the T'ang period [618–907] travelled so slowly that they did not reach the island of Cyprus and the brilliant court of Lusignan until the fifteenth century. From there they spread, at the quicker speed of Mediterranean trade, to France and the eccentric court of Charles VI, where hennins and shoes with long pointed toes became immensely popular, the heritage of a long vanished world — much as light still reaches us from stars already extinct."

25. See Toynbee, *Study of History*, VIII, 347–348.

26. McNeill, *Rise of the West*, p. 547.

27. D. K. Fieldhouse, *Economics and Empire, 1830–1914* (London: Macmillan, 1984), p. 3; F. J. C. Hearnshaw, *Sea Power and Empire* (London: George Harrap and Co, 1940), p. 179.

28. Geoffrey Parker, *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 4; Michael Howard, "The Military Factor in European Expansion," in Hedley Bull and Adam Watson, eds., *The Expansion of International Society* (Oxford: Clarendon Press, 1984), pp. 33ff.

29. A. G. Kenwood and A. L. Lougheed, *The Growth of the International Economy 1820–1990* (London: Routledge, 1992), pp. 78–79; Angus Maddison, *Dynamic Forces in Capitalist Development* (New York: Oxford University Press, 1991), pp. 326–27; Alan S. Blinder, reported in the *New York Times*, 12 March 1995, p. 5E. See also Simon Kuznets, "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations—X. Level and Structure of Foreign Trade: Long-term Trends," *Economic Development and Cultural Change*, 15 (Jan. 1967, part II), pp. 2–10.

30. Charles Tilly, "Reflections on the History of European State-making," in Tilly, ed., *The Formation of National States in Western Europe* (Princeton: Princeton University Press, 1975), p. 18.

31. R. R. Palmer, "Frederick the Great, Guibert, Bulow: From Dynastic to National War," in Peter Paret, ed., *Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age* (Princeton: Princeton University Press, 1986), p. 119.

32. Edward Mortimer, "Christianity and Islam," *International Affairs*, 67 (Jan. 1991), 7.

33. Hedley Bull, *The Anarchical Society* (New York: Columbia University Press,

1977), pp. 9–13. See also Adam Watson, *The Evolution of International Society* (London: Routledge, 1992), and Barry Buzan, "From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School," *International Organization*, 47 (Summer 1993), 327–352, who distinguishes between "civilizational" and "functional" models of international society and concludes that "civilizational international societies have dominated the historical record" and that there "appear to be no pure cases of functional international societies." (p. 336).

34. Spengler, *Decline of the West*, I, 93–94.

35. Toynbee, *Study of History*, I, 149ff, 154, 157ff

36. Braudel, *On History*, p. xxxiii.

Chapter 3

1. V. S. Naipaul, "Our Universal Civilization," The 1990 Wriston Lecture, The Manhattan Institute, *New York Review of Books*, 30 October 1990, p. 20.

2. See James Q. Wilson, *The Moral Sense* (New York: Free Press, 1993); Michael Walzer, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994), esp. chaps. 1 and 4; and for a brief overview, Frances V. Harbour, "Basic Moral Values: A Shared Core," *Ethics and International Affairs*, 9 (1995), 155–170.

3. Vaclav Havel, "Civilization's Thin Veneer," *Harvard Magazine*, 97 (July–August 1995), 32.

4. Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1977), p. 317.

5. John Rockwell, "The New Colossus: American Culture as Power Export," and several authors, "Channel-Surfing Through U.S. Culture in 20 Lands," *New York Times*, 30 January 1994, sec. 2, pp. 1ff; David Rieff, "A Global Culture," *World Policy Journal*, 10 (Winter 1993–94), 73–81.

6. Michael Vlahos, "Culture and Foreign Policy," *Foreign Policy*, 82 (Spring 1991), 69; Kishore Mahbubani, "The Dangers of Decadence: What the Rest Can Teach the West," *Foreign Affairs*, 72 (Sept./Oct. 1993), 12.

7. Aaron L. Friedberg, "The Future of American Power," *Political Science Quarterly*, 109 (Spring 1994), 15.

8. Richard Parker, "The Myth of Global News," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Winter 1994), 41–44; Michael Gurevitch, Mark R. Levy, and Itzhak Roeh, "The Global Newsroom: convergences and diversities in the globalization of television news," in Peter Dahlgren and Colin Sparks, eds., *Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere in the New Media* (London: Routledge, 1991), p. 215.

9. Ronald Dore, "Unity and Diversity in World Culture," in Hedley Bull and Adam Watson, eds., *The Expansion of International Society* (Oxford: Oxford University Press, 1984), p. 423.

10. Robert L. Bartley, "The Case for Optimism — The West Should Believe in Itself," *Foreign Affairs*, 72 (Sept./Oct. 1993), 16.

11. See Joshua A. Fishman, "The Spread of English as a New Perspective for the Study of Language Maintenance and Language Shift," in Joshua A. Fishman, Robert L. Cooper, and Andrew W. Conrad, *The Spread of English: The Sociology of English as an Additional Language* (Rowley, MA: Newbury House, 1977), pp. 108ff.

12. Fishman, "Spread of English as a New Perspective," pp. 118–119.

13. Randolf Quirk, in Braj B. Kachru, *The Indianization of English* (Delhi: Oxford, 1983), p. ii; R. S. Gupta and Kapil Kapoor eds., *English in India — Issues and Problems*

(Delhi: Academic Foundation, 1991), p. 21. Cf. Sarvepalli Gopal, "The English Language in India," *Encounter*, 73 (July/Aug. 1989), 16, who estimates 35 million Indians "speak and write English of some type or other." World Bank, *World Development Report 1985, 1991* (New York: Oxford University Press), table 1.

14. Kapoor and Gupta, "Introduction," in Gupta and Kapoor, eds., *English in India* p. 21· Gopal, "English Language," p. 16.

15. Fishman, "Spread of English as a New Perspective," p. 115.

16. See *Newsweek*, 19 July 1993, p. 22.

17. Quoted by R. N. Srivastava and V. P. Sharma, "Indian English Today," in Gupta and Kapoor, eds., *English in India*, p. 191; Gopal, "English Language." p. 17.

18. *New York Times*, 16 July 1993, p. A9; *Boston Globe*, 15 July 1993, p. 13.

19. In addition to the projections in the *World Christian Encyclopedia*, see also those of Jean Bourgeois-Pichat, "Le nombre des hommes: État et prospective," in Albert Jacquard et al., *Les Scientifiques Parlent* (Paris: Hachette, 1987), pp. 140, 143, 151, 154–156.

20. Edward Said on V. S. Naipaul, quoted by Brent Staples, "Con Men and Conquerors," *New York Times Book Review*, 22 May 1994, p. 42.

21. A. G. Kenwood and A. L. Lougheed, *The Growth of the International Economy 1820–1990* (London: Routledge, 3rd ed., 1992), pp. 78–79; Angus Maddison, *Dynamic Forces in Capitalist Development* (New York: Oxford University Press, 1991), pp. 326–327; Alan S. Blinder, *New York Times*, 12 March 1995, p. 5E.

22. David M. Rowe, "The Trade and Security Paradox in International Politics," (unpublished manuscript, Ohio State University, 15 Sept. 1994), p. 16.

23. Dale C. Copeland, "Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations," *International Security* 20 (Spring 1996), 25.

24. William J. McGuire and Claire V. McGuire, "Content and Process in the Experience of Self," *Advances in Experimental Social Psychology*, 21 (1988), 102.

25. Donald L. Horowitz, "Ethnic Conflict Management for Policy-Makers," in Joseph V. Montville and Hans Binnendijk, eds., *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies* (Lexington, MA: Lexington Books, 1990), p. 121.

26. Roland Robertson,"Globalization Theory and Civilizational Analysis," *Comparative Civilizations Review*, 17 (Fall 1987), 22; Jeffery A. Shad, Jr., "Globalization and Islamic Resurgence," *Comparative Civilizations Review*, 19 (Fall 1988), 67.

27. See Cyril E. Black, *The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History* (New York: Harper & Row, 1966), pp. 1–34; Reinhard Bendix, "Tradition and Modernity Reconsidered," *Comparative Studies in Society and History*, 9 (April 1967), 292–293.

28. Fernand Braudel, *On History* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), p. 213.

29. The literature on the distinctive characteristics of Western civilization is, of course, immense. See, among others, William H. McNeill, *Rise of the West: A History of the Human Community* (Chicago: University of Chicago Press, 1963); Braudel, *On History* and earlier works; Immanuel Wallerstein, *Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Karl W. Deutsch has produced a comprehensive, succinct, and highly suggestive comparison of the West and nine other civilizations in terms of twenty-one geographical, cultural, economic, technological, social, and political factors, emphasizing the extent to which the West differs from the others. See Karl W. Deutsch, "On Nationalism, World Regions, and the Nature of the West," in Per Torsvik, ed., *Mobilization, Center-*

Periphery Structures, and Nation-building: A Volume in Commemoration of Stein Rokkan (Bergen: Universitetsforlaget, 1981), pp. 51-93. For a succinct summary of the salient and distinctive features of Western civilization in 1500, see Charles Tilly, "Reflections on the History of European State-making," in Tilly, ed., *The Formation of National States in Western Europe* (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 18ff.

30. Deutsch, "Nationalism, World Regions, and the West," p. 77.

31. See Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), p. 121ff.

32. Deutsch, "Nationalism, World Regions, and the West," p. 78. See also Stein Rokkan, "Dimensions of State Formation and Nation-building: A Possible Paradigm for Research on Variations within Europe," in Charles Tilly, *The Formation of National States in Western Europe* (Princeton: Princeton University Press, 1975), p. 576, and Putnam, *Making Democracy Work,* pp. 124-127.

33. Geert Hofstede, "National Cultures in Four Dimensions: A Research-based Theory of Cultural Differences among Nations," *International Studies of Management and Organization,* 13 (1983), 52.

34. Harry C. Triandis, "Cross-Cultural Studies of Individualism and Collectivism," in *Nebraska Symposium on Motivation 1989* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1990), 44-133, and *New York Times,* 25 December 1990, p. 41. See also George C. Lodge and Ezra F. Vogel, eds., *Ideology and National Competitiveness: An Analysis of Nine Countries* (Boston: Harvard Business School Press 1987), passim.

35. Discussions of the interaction of civilizations almost inevitably come up with some variation of this response typology. See Arnold J. Toynbee, *Study of History* (London: Oxford University Press, 1935-61), II, 187ff., VIII, 152-153, 214; John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 53-62; Daniel Pipes, *In the Path of God: Islam and Political Power* (New York: Basic Books, 1983), pp. 105-142.

36. Pipes, *Path of God,* p. 349.

37. William Pfaff, "Reflections: Economic Development," *New Yorker,* 25 December 1978, p. 47.

38. Pipes, *Path of God,* pp. 197-198.

39. Ali Al-Amin Mazrui, *Cultural Forces in World Politics* (London: James Currey, 1990), pp. 4-5.

40. Esposito, *Islamic Threat,* p. 55; See generally, pp. 55-62; and Pipes, *Path of God,* pp. 114-120.

41. Rainer C. Baum, "Authority and Identity—The Invariance Hypothesis II," *Zeitschrift für Soziologie,* 6 (Oct. 1977), 368-369. See also Rainer C. Baum, "Authority Codes: The Invariance Hypothesis," *Zeitschrift für Soziologie,* 6 (Jan. 1977), 5-28.

42. See Adda B. Bozeman, "Civilizations Under Stress," *Virginia Quarterly Review,* 51 (Winter 1975), 5ff.; Leo Frobenius, *Paideuma: Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre* (Munich: C.H. Beck, 1921), pp. 11ff; Oswald Spengler, *The Decline of the West* (New York: Alfred A. Knopf, 2 vols., 1926, 1928), II, 57ff.

43. Bozeman, "Civilizations Under Stress, p. 7.

44. William E. Naff, "Reflections on the Question of 'East and West' from the Point of View of Japan," *Comparative Civilizations Review,* 13/14 (Fall 1985 & Spring 1986), 222.

45. David E. Apter, "The Role of Traditionalism in the Political Modernization of Ghana and Uganda," *World Politics,* 13 (Oct. 1960), 47-68.

46. S. N. Eisenstadt, "Transformation of Social, Political, and Cultural Orders in Modernization," *American Sociological Review*, 30 (Oct. 1965), 659–673.

47. Pipes, *Path of God*, pp. 107, 191.

48. Braudel, *On History*, pp. 212–213.

Chapter 4

1. Jeffery R. Barnett, "Exclusion as National Security Policy," *Parameters*, 24 (Spring 1994), 54.

2. Aaron L. Friedberg, "The Future of American Power," *Political Science Quarterly*, 109 (Spring 1994), 20–21.

3. Hedley Bull, "The Revolt Against the West," in Hedley Bull and Adam Watson, eds., *Expansion of International Society* (Oxford: Oxford University Press, 1984), p. 219.

4. Barry G. Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century," *International Affairs*, 67 (July 1991), 451.

5. *Project* 2025, (draft) 20 September 1991, p. 7; World Bank, *World Development Report 1990* (Oxford: Oxford University Press, 1990), pp. 229, 244; *The World Almanac and Book of Facts 1990* (Mahwah, NJ: Funk & Wagnalls, 1989), p. 539.

6. United Nations Development Program, *Human Development Report 1994* (New York: Oxford University Press, 1994), pp. 136–137, 207–211; World Bank, "World Development Indicators," *World Development Report 1984, 1986, 1990, 1994*; Bruce Russett et al., *World Handbook of Political and Social Indicators* (New Haven: Yale University Press, 1994), pp. 222–226.

7. Paul Bairoch, "International Industrialization Levels from 1750 to 1980," *Journal of European Economic History*, 11 (Fall 1982), 296, 304.

8. *Economist*, 15 May 1993, p. 83, citing International Monetary Fund, *World Economic Outlook*; "The Global Economy," *Economist*, 1 October 1994, pp. 3–9; *Wall Street Journal*, 17 May 1993, p. A12; Nicholas D. Kristof, "The Rise of China," *Foreign Affairs*, 72 (Nov./Dec. 1993), 61; Kishore Mahbubani, "The Pacific Way," *Foreign Affairs*, 74 (Jan./Feb. 1995), 100–103.

9. International Institute for Strategic Studies, "Tables and Analyses," *The Military Balance 1994–95* (London: Brassey's, 1994).

10. *Project 2025*, p. 13; Richard A. Bitzinger, *The Globalization of Arms Production: Defense Markets in Transition* (Washington, D.C.: Defense Budget Project, 1993), passim.

11. Joseph S. Nye, Jr., "The Changing Nature of World Power," *Political Science Quarterly*, 105 (Summer 1990), 181–182.

12. William H. McNeill, *The Rise of the West: A History of the Human Community* (Chicago: University of Chicago Press, 1963), p. 545.

13. Ronald Dore, "Unity and Diversity in Contemporary World Culture," in Bull and Watson, eds., *Expansion of International Society*, pp. 420–421.

14. William E. Naff, "Reflections on the Question of 'East and West' from the Point of View of Japan," *Comparative Civilizations Review*, 13/14 (Fall 1985 and Spring 1986), 219; Arata Isozaki, "Escaping the Cycle of Eternal Resources," *New Perspectives Quarterly*, 9 (Spring 1992), 18.

15. Richard Sission, "Culture and Democratization in India," in Larry Diamond, *Political Culture and Democracy in Developing Countries* (Boulder: Lynne Rienner, 1993), pp. 55–61.

16. Graham E. Fuller, "The Appeal of Iran," *National Interest*, 37 (Fall 1994), 95.

17. Eisuke Sakakibara, "The End of Progressivism: A Search for New Goals," *Foreign Affairs*, 74 (Sept./Oct. 1995), 8–14.

18. T. S. Eliot, *Idea of a Christian Society* (New York: Harcourt, Brace and Company, 1940), p. 64.

19. Gilles Kepel, *Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World* (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, trans. Alan Braley 1994), p. 2.

20 George Weigel, "Religion and Peace. An Argument Complexified," *Washington Quarterly*, 14 (Spring 1991), 27.

21. James H. Billington, "The Case for Orthodoxy," *New Republic*, 30 May 1994, p. 26; Suzanne Massie, "Back to the Future," *Boston Globe*, 28 March 1993, p. 72.

22. *Economist*, 8 January 1993, p. 46; James Rupert, "Dateline Tashkent: Post-Soviet Central Asia; *Foreign Policy*, 87 (Summer 1992), 180.

23. Fareed Zakaria, "Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew," *Foreign Affairs*, 73, (Mar./Apr. 1994), 118.

24. Hassan Al-Turabi, "The Islamic Awakening's Second Wave," *New Perspectives Quarterly*, 9 (Summer 1992), 52–55; Ted G. Jelen, *The Political Mobilization of Religious Belief* (New York: Praeger, 1991), pp. 55ff.

25. Bernard Lewis, "Islamic Revolution," *New York Review of Books*, 21 January 1988, p. 47; Kepel, *Revenge of God*, p. 82.

26. Sudhir Kakar, "The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion, and Conflict" (Unpublished manuscript), chap. 6, "A New Hindu Identity," p. 11.

27. Suzanne Massie, "Back to the Future," p. 72; Rupert, "Dateline Tashkent," p. 180.

28. Rosemary Radford Ruther, "A World on Fire with Faith," *New York Times Book Review*, 26 January 1992, p. 10; William H. McNeill, "Fundamentalism and the World of the 1990s," in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., *Fundamentalisms and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 561.

29. *New York Times*, 15 January 1993, p. A9; Henry Clement Moore, *Images of Development: Egyptian Engineers in Search of Industry* (Cambridge: M.I.T. Press, 1980), pp. 227–228.

30. Henry Scott Stokes, "Korea's Church Militant," *New York Times Magazine*, 28 November 1972, p. 68.

31. Rev. Edward J. Dougherty, S. J., *New York Times* 4 July 1993, p. 10; Timothy Goodman, "Latin America's Reformation," *American Enterprise*, 2 (July–August 1991), 43; *New York Times*, 11 July 1993, p. 1; *Time*, 21 January 1991, p. 69.

32. *Economist*, 6 May 1989, p. 23; 11 November 1989, p. 41; *Times* (London), 12 April 1990, p. 12; *Observer*, 27 May 1990, p. 18.

33. *New York Times*, 16 July 1993, p. A9; *Boston Globe*, 15 July 1993, p. 13.

34. See Mark Juergensmeyer, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (Berkeley: University of California Press, 1993).

35. Zakaria, "Conversation with Lee Kuan Yew," p. 118; Al-Turabi, "Islamic Awakening's Second Wave," p. 53. See Terrance Carroll, "Secularization and States of Modernity," *World Politics*, 36 (April 1984), 362–382.

36. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992), p. 10.

37. Régis Debray, "God and the Political Planet," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Spring 1994), 15.

38. Esposito, *Islamic Threat*, p. 10; Gilles Kepel quoted in Sophie Lannes, "La revanche de Dieu—Interview with Gilles Kepel," *Geopolitique*, 33 (Spring 1991), 14; Moore, *Images of Development*, pp. 214–216.

39. Juergensmeyer, *The New Cold War*, p. 71; Edward A. Gargan, "Hindu Rage Against Muslims Transforming Indian Politics," *New York Times*, 17 September 1993, p. A1; Khushwaht Singh, "India, the Hindu State," *New York Times*, 3 August 1993, p. A17.

40. Dore in Bull and Watson, eds., *Expansion of International Society*, p. 411; McNeill in Marty and Appleby, eds., *Fundamentalisms and Society*, p. 569.

Chapter 5

1. Kishore Mahbubani, "The Pacific Way," *Foreign Affairs*, 74 (Jan./Feb. 1995), 100–103; IMD Executive Opinion Survey, *Economist*, 6 May 1995, p. 5; World Bank, *Global Economic Prospects and the Developing Countries 1993* (Washington: 1993) pp. 66–67.

2. Tommy Koh, *America's Role in Asia: Asian Views* (Asia Foundation, Center for Asian Pacific Affairs, Report No. 13, November 1993), p. 1.

3. Alex Kerr, *Japan Times*, 6 November 1994, p. 10.

4. Yasheng Huang, "Why China Will Not Collapse," *Foreign Policy*, 95 (Summer 1995), 57.

5. *Cable News Network*, 10 May 1994; Edward Friedman, "A Failed Chinese Modernity," *Daedalus*, 122 (Spring 1993), 5; Perry Link, "China's 'Core' Problem," ibid., pp. 201–204.

6. *Economist*, 21 January 1995, pp. 38–39; William Theodore de Bary, "The New Confucianism in Beijing," *American Scholar*, 64 (Spring 1995), 175ff.; Benjamin L. Self, "Changing Role for Confucianism in China," *Woodrow Wilson Center Report*, 7 (September 1995), 4–5; *New York Times*, 26 August 1991, A19.

7. Lee Teng-hui, "Chinese Culture and Political Renewal," *Journal of Democracy*, 6 (October 1995), 6–8.

8. Alex Kerr, *Japan Times*, 6 November 1994, p. 10; Kazuhiko Ozawa, "Ambivalence in Asia," *Japan Update*, 44 (May 1995), 18–19.

9. For some of these problems, see Ivan P. Hall, "Japan's Asia Card," *National Interest*, 38 (Winter 1994–95), 19ff.

10. Casimir Yost, "America's Role in Asia: One Year Later," (Asia Foundation, Center for Asian Pacific Affairs, Report No. 15, February 1994), p. 4; Yoichi Funabashi, "The Asianization of Asia," *Foreign Affairs*, 72 (Nov./Dec. 1993), 78; Anwar Ibrahim, *International Herald Tribune*, 31 January 1994, p. 6.

11. Kishore Mahbubani, "Asia and a United States in Decline," *Washington Quarterly*, 17 (Spring 1994), 5–23; For a counteroffensive, see Eric Jones, "Asia's Fate: A Response to the Singapore School," *National Interest*, 35 (Spring 1994), 18–28.

12. Mahathir bin Mohamad, *Mare jirenma* (The Malay Dilemma) (Tokyo: Imura Bunka Jigyo, trans. Takata Masayoshi, 1983), p. 267, quoted in Ogura Kazuo, "A Call for a New Concept of Asia," *Japan Echo*, 20 (Autumn 1993), 40.

13. Li Xiangiu, "A Post-Cold War Alternative from East Asia," *Straits Times*, 10 February 1992, p. 24.

14. Yotaro Kobayashi, "Re-Asianize Japan," *New Perspectives Quarterly*, 9 (Winter 1992), 20; Funabashi, "The Asianization of Asia," pp. 75ff; George Yong-Soon Yee, "New East Asia in a Multicultural World," *International Herald Tribune*, 15 July 1992, p. 8.

15. Yoichi Funabashi, "Globalize Asia," *New Perspectives Quarterly*, 9 (Winter 1992), 23–24; Kishore M. Mahbubani, "The West and the Rest," *National Interest*, 28 (Summer 1992), 7; Hazuo, "New Concept of Asia," p. 41.

16. *Economist*, 9 March 1996, p. 33.

17. Bandar bin Sultan, *New York Times*, 10 July 1994, p. 20.

18. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992), p. 12; Ali E. Hillal Dessouki, "The Islamic Resurgence," in Ali E. Hillal Dessouki, ed., *Islamic Resurgence in the Arab World* (New York: Praeger, 1982), pp. 9–13.

19. Thomas Case, quoted in Michael Walzer, *The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics* (Cambridge: Harvard University Press, 1965), pp. 10–11; Hassan Al-Turabi, "The Islamic Awakening's Second Wave," *New Perspectives Quarterly*, 9 (Summer 1992), 52. The single most useful volume for understanding the character, appeal, limitations, and historical role of late-twentieth-century Islamic fundamentalism may well be Walzer's study of sixteenth- and seventeenth-century English Calvinist Puritanism.

20. Donald K. Emerson, "Islam and Regime in Indonesia: Who's Coopting Whom?" (unpublished paper, 1989), p. 16; M. Nasir Tamara, *Indonesia in the Wake of Islam, 1965–1985* (Kuala Lumpur: Institute of Strategic and International Studies Malaysia, 1986), p. 28; *Economist*, 14 December 1985, pp. 35–36; Henry Tanner, "Islam Challenges Secular Society," *International Herald Tribune*, 27 June 1987, pp. 7–8; Sabri Sayari, "Politicization of Islamic Re-traditionalism: Some Preliminary Notes," in Metin Heper and Raphael Israeli, eds., *Islam and Politics in the Modern Middle East* (London: Croom Helm, 1984), p. 125; *New York Times*, 26 March 1989, p. 14; 2 March 1995, p. A8. See, for example, reports on these countries in *New York Times*, 17 November 1985, p. 2E; 15 November 1987, p. 13; 6 March 1991, p. A11; 20 October 1990, p. 4; 26 December 1992, p. 1; 8 March 1994, p. A15; and *Economist*, 15 June 1985, pp. 36–37 and 18 September 1992, pp. 23–25.

21. *New York Times*, 4 October 1993, p. A8; 29 November 1994, p. A4; 3 February 1994, p.1; 26 December 1992, p.5; Erika G. Alin, "Dynamics of the Palestinian Uprising: An Assessment of Causes, Character, and Consequences," *Comparative Politics*, 26 (July 1994), 494; *New York Times*, 8 March 1994, p. A15; James Peacock, "The Impact of Islam," *Wilson Quarterly*, 5 (Spring 1981), 142; Tamara, *Indonesia in the Wake of Islam*, p. 22.

22. Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (London: Tauris, 1994), p. 49ff; *New York Times*, 19 January 1992, p. E3; *Washington Post*, 21 November 1990, p. A1. See Gilles Keppel, *The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity, and Judaism in the Modern World* (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1994), p. 32; Farida Faouzia Charfi, "When Galileo Meets Allah," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Spring 1994), 30; Esposito, *Islamic Threat*, p. 10.

23. Mahnaz Ispahani, "Varieties of Muslim Experience,' *Wilson Quarterly*, 13 (Autumn 1989), 72.

24. Saad Eddin Ibhrahim, "Appeal of Islamic Fundamentalism," (Paper presented to the Conference on Islam and Politics in the Contemporary Muslim World, Harvard University, 15–16 October 1985), pp. 9–10, and "Islamic Militancy as a Social Movement: The Case of Two Groups in Egypt," in Dessouki, ed., *Islamic Resurgence*, pp. 128–131.

25. *Washington Post*, 26 October 1980, p. 23; Peacock, "Impact of Islam," p. 140; Ilkay Sunar and Binnaz Toprak, "Islam in Politics: The Case of Turkey," *Government*

and Opposition, 18 (Autumn 1983), 436; Richard W. Bulliet, "The Israeli-PLO Accord: The Future of the Islamic Movement," *Foreign Affairs*, 72 (Nov/Dec. 1993), 42.

26. Ernest Gellner, "Up from Imperialism," *New Republic*, 22 May 1989, p. 35; John Murray Brown, "Tansu Ciller and the Question of Turkish Identity," *World Policy Journal*, 11 (Fall 1994), 58; Roy, *Failure of Political Islam*, p. 53.

27. Fouad Ajami, "The Impossible Life of Muslim Liberalism," *New Republic*, 2 June 1986, p. 27.

28. Clement Moore Henry, "The Mediterranean Debt Crescent," (Unpublished manuscript) p. 346; Mark N. Katz, "Emerging Patterns in the International Relations of Central Asia," *Central Asian Monitor*, (No. 2, 1994), 27; Mehrdad Haghayeghi, "Islamic Revival in the Central Asian Republics," *Central Asian Survey*, 13 (No. 2, 1994), 255.

29. *New York Times*, 10 April 1989, p. A3; 22 December 1992, p. 5; *Economist*, 10 October 1992, p. 41.

30. *Economist*, 20 July 1991, p. 35; 21 December 1991–3 January 1992, p. 40; Mahfulzul Hoque Choudhury, "Nationalism, Religion and Politics in Bangladesh," in Rafiuddin Ahmed, ed., *Bangladesh: Society, Religion and Politics* (Chittagong: South Asia Studies Group, 1985), p. 68; *New York Times*, 30 November 1994, p. A14; *Wall Street Journal*, 1 March 1995, pp. 1, A6.

31. Donald L. Horowitz, "The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change," *American Journal of Comparative Law*, 42 (Spring and Summer, 1994), 234ff.

32. Dessouki, "Islamic Resurgence," p. 23.

33. Daniel Pipes, *In the Path of God: Islam and Political Power* (New York: Basic Books, 1983), pp. 282–283, 290–292; John Barrett Kelly, *Arabia, the Gulf and the West* (New York: Basic Books, 1980), pp. 261, 423, as quoted in Pipes, *Path of God*, p. 291.

34. United Nations Population Division, *World Population Prospects: The 1992 Revision* (New York: United Nations, 1993), table A18; World Bank, *World Development Report 1995* (New York: Oxford University Press, 1995), table 25; Jean Bourgeois-Pichat, "Le Nombre des Hommes: Etat et Prospective," in Albert Jacquard, ed., *Les Scientifiques Parlent* (Paris: Hachette, 1987), pp. 154, 156.

35. Jack A. Goldstone, *Revolution and Rebellion in the Early Modern World* (Berkeley: University of California Press, 1991), passim, but esp. 24–39.

36. Herbert Moeller, "Youth as a Force in the Modern World,' *Comparative Studies in Society and History*, 10 (April 1968), 237–260; Lewis S. Feuer, "Generations and the Theory of Revolution," *Survey*, 18 (Summer 1972), pp. 161–188.

37. Peter W. Wilson and Douglas F. Graham, *Saudi Arabia: The Coming Storm* (Armonk NY: M. E. Sharpe, 1994), pp. 28–29.

38. Philippe Fargues, "Demographic Explosion or Social Upheaval," in Ghassen Salame, ed., *Democracy Without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World* (London: I. B. Tauris, 1994), pp. 158–162, 175–177.

39. *Economist*, 29 August 1981, p. 40; Denis Dragounski, "Threshold of Violence," *Freedom Review*, 26 (March/April 1995), 11.

Chapter 6

1. Andreas Papandreou, "Europe Turns Left," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Winter 1994), 53; Vuk Draskovic, quoted in Janice A. Broun, "Islam in the Balkans,' *Freedom Review*, 22 (Nov./Dec. 1991), 31; F. Stephen Larrabee, "Instability and

Change in the Balkans," *Survival*, 34 (Summer 1992), 43; Misha Glenny, "Heading Off War in the Southern Balkans," *Foreign Affairs*, 74 (May/June 1995), 102–103.

2. Ali Al-Amin Mazrui, *Cultural Forces in World Politics* (London: James Currey, 1990), p. 13.

3. See e.g., *Economist*, 16 November 1991, p. 45, 6 May 1995, p. 36.

4. Ronald B. Palmer and Thomas J. Reckford, *Building ASEAN: 20 Years of Southeast Asian Cooperation* (New York: Praeger, 1987), p. 109; *Economist*, 23 July 1994, pp. 31–32.

5. Barry Buzan and Gerald Segal, "Rethinking East Asian Security," *Survival*, 36 (Summer 1994), 16.

6. *Far Eastern Economic Review*, 11 August 1994, p. 34.

7. An interview between Datuk Seri Mahathir bin Mohamad of Malaysia and Kenichi Ohmae, pp. 3, 7; Rafidah Azia, *New York Times*, 12 February 1991, p. D6.

8. *Japan Times*, 7 November 1994, p. 19; *Economist*, 19 November 1994, p. 37.

9. Murray Weidenbaum, "Greater China: A New Economic Colossus?" *Washington Quarterly*, 16 (Autumn 1993), 78–80.

10. *Wall Street Journal*, 30 September 1994, p. A8; *New York Times*, 17 February 1995, p. A6.

11. *Economist*, 8 October 1994, p. 44; Andres Serbin, "Towards an Association of Caribbean States: Raising Some Awkward Questions," *Journal of Interamerican Studies*, 36 (Winter 1994), 61–90.

12. *Far Eastern Economic Review*, 5 July 1990, pp. 24–25, 5 September 1991, pp. 26–27; *New York Times*, 16 February 1992, p. 16; *Economist*, 15 January 1994, p. 38; Robert D. Hormats, "Making Regionalism Safe," *Foreign Affairs*, 73 (March/April 1994), 102–103; *Economist*, 10 June 1994, pp. 47–48; *Boston Globe*, 5 February 1994, p. 7. On Mercosur, see Luigi Manzetti, "The Political Economy of MERCOSUR," *Journal of Interamerican Studies*, 35 (Winter 1993/94), 101–141, and Felix Pena, "New Approaches to Economic Integration in the Southern Cone," *Washington Quarterly*, 18 (Summer 1995), 113–122.

13. *New York Times*, 8 April 1994, p. A3, 13 June 1994, pp. D1, D5, 4 January 1995, p. A8; Mahathir Interview with Ohmae, pp. 2, 5; "Asian Trade New Directions," *AMEX Bank Review*, 20 (22 March 1993), 1–7.

14. See Brian Pollins, "Does Trade Still Follow the Flag?" *American Political Science Review*, 83 (June 1989), 465–480; Joanne Gowa and Edward D. Mansfield, "Power Politics and International Trade," *American Political Science Review*, 87 (June 1993), 408–421; and David M. Rowe, "Trade and Security in International Relations," (unpublished paper, Ohio State University, 15 September 1994), passim.

15. Sidney W. Mintz, "Can Haiti Change?" *Foreign Affairs*, 75 (Jan./Feb. 1995), 73; Ernesto Perez Balladares and Joycelyn McCalla quoted in "Haiti's Traditions of Isolation Makes U.S. Task Harder," *Washington Post*, 25 July 1995, p. A1.

16. *Economist*, 23 October 1993, p. 53.

17. *Boston Globe*, 21 March 1993, pp. 1, 16, 17; *Economist*, 19 November 1994, p. 23, 11 June 1994, p. 90. The similarity between Turkey and Mexico in this respect has been pointed out by Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century," *International Affairs*, 67 (July 1991), 449, and Jagdish Bhagwati, *The World Trading System at Risk* (Princeton: Princeton University Press, 1991), p. 72.

18. See Marquis de Custine, *Empire of the Czar: A Journey Through Eternal Russia* (New York: Doubleday, 1989; originally published in Paris in 1844), passim.

19. P. Ya. Chaadayev, *Articles and Letters [Statyi i pisma]* (Moscow: 1989), p. 178 and N. Ya. Danilevskiy, *Russia and Europe [Rossiya i Yevropa]* (Moscow: 1991), pp.

267–268, quoted in Sergei Vladislavovich Chugrov, "Russia Between East and West," in Steve Hirsch, ed., *MEMO 3: In Search of Answers in the Post-Soviet Era* (Washington, D.C.: Bureau of National Affairs, 1992), p. 138.

20. See Leon Aron, "The Battle for the Soul of Russian Foreign Policy," *The American Enterprise,* 3 (Nov/Dec. 1992), 10ff; Alexei G. Arbatov, "Russia's Foreign Policy Alternatives," *International Security,* 18 (Fall 1993), 5ff.

21. Sergei Stankevich, "Russia in Search of Itself," *National Interest,* 28 (Summer 1992), 48–49.

22. Albert Motivans, " 'Openness to the West' in European Russia," *RFE/RL Research Report,* 1 (27 November 1992), 60–62. Scholars have calculated the allocation of votes in different ways with minor differences in results. I have relied on the analysis by Sergei Chugrov, "Political Tendencies in Russia's Regions: Evidence from the 1993 Parliamentary Elections" (Unpublished paper, Harvard University, 1994).

23. Chugrov, "Russia Between," p. 140.

24. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), pp. 350–351.

25. Duygo Bazoglu Sezer, "Turkey's Grand Strategy Facing a Dilemma," *International Spectator,* 27 (Jan./Mar. 1992), 24.

26. Clyde Haberman, "On Iraq's Other Front," *New York Times Magazine,* 18 November 1990, p. 42; Bruce R. Kuniholm, "Turkey and the West," *Foreign Affairs,* 70 (Spring 1991), 35–36.

27. Ian Lesser, "Turkey and the West after the Gulf War," *International Spectator,* 27 (Jan./Mar. 1992), 33.

28. *Financial Times,* 9 March 1992, p. 2; *New York Times,* 5 April 1992, p. E3; Tansu Ciller, "The Role of Turkey in 'the New World,' " *Strategic Review,* 22 (Winter 1994), p. 9; Haberman, "Iraq's Other Front," p. 44; John Murray Brown, "Tansu Ciller and the Question of Turkish Identity," *World Policy Journal,* 11 (Fall 1994), 58.

29. Sezer, "Turkey's Grand Strategy," p. 27; *Washington Post,* 22 March 1992; *New York Times,* 19 June 1994, p. 4.

30. *New York Times,* 4 August 1993, p. A3; 19 June 1994, p. 4; Philip Robins, "Between Sentiment and Self-Interest: Turkey's Policy toward Azerbaijan and the Central Asian States," *Middle East Journal,* 47 (Autumn 1993), 593–610; *Economist,* 17 June 1995, pp. 38–39.

31. Bahri Yilmaz, "Turkey's new Role in International Politics," *Aussenpolitik,* 45 (January 1994), 94.

32. Eric Rouleau, "The Challenges to Turkey," *Foreign Affairs,* 72 (Nov./Dec. 1993), 119.

33. Rouleau, "Challenges," pp. 120–121; *New York Times,* 26 March 1989, p. 14.

34. Ibid.

35. Brown, "Question of Turkish Identity," p. 58.

36. Sezer, "Turkey's Grand Strategy," pp. 29–30.

37. Ciller, "Turkey in 'the New World,' " p. 9; Brown, "Question of Turkish Identity," p. 56; Tansu Ciller, "Turkey and NATO: Stability in the Vortex of Change," *NATO Review,* 42 (April 1994), 6; Suleyman Demirel, *BBC Summary of World Broadcasts,* 2 February 1994. For other uses of the bridge metaphor, see Bruce R. Kuniholm, "Turkey and the West," *Foreign Affairs,* 70 (Spring 1991), 39; Lesser, "Turkey and the West," p. 33.

38. Octavio Paz, "The Border of Time," interview with Nathan Gardels, *New Perspectives Quarterly,* 8 (Winter 1991), 36.

39. For an expression of this last concern, see Daniel Patrick Moynihan, "Free Trade

with an Unfree Society: A Commitment and its Consequences," *National Interest,* (Summer 1995), 28–33.

40. *Financial Times,* 11–12 September 1993, p. 4; *New York Times,* 16 August 1992, p. 3.

41. *Economist,* 23 July 1994, p. 35; Irene Moss, Human Rights Commissioner (Australia), *New York Times,* 16 August 1992, p. 3; *Economist,* 23 July 1994, p. 35; *Boston Globe,* 7 July 1993, p. 2; *Cable News Network,* News Report, 16 December 1993 Richard Higgott, "Closing a Branch Office of Empire: Australian Foreign Policy and the UK at Century's End," *International Affairs,* 70 (January 1994), 58.

42. Jat Sujamiko, *The Australian,* 5 May 1993, p. 18 quoted in Higgott, "Closing a Branch," p. 62; Higgott, "Closing a Branch," p. 63; *Economist,* 12 December 1993, p. 34.

43. Transcript, Interview with Keniche Ohmae, 24 October 1994, pp. 5–6. See also *Japan Times,* 7 November 1994, p. 19.

44. Former Ambassador Richard Woolcott (Australia), *New York Times,* 16 August 1992, p. 3.

45. Paul Kelly, "Reinventing Australia," *National Interest,* 30 (Winter 1992), 66; *Economist,* 11 December 1993, p. 34; Higgott, "Closing a Branch," p. 58.

46. Lee Kuan Yew quoted in Higgott, "Closing a Branch," p. 49.

Chapter 7

1. *Economist,* 14 January 1995, p. 45; 26 November 1994, p. 56, summarizing Juppé article in *Le Monde,* 18 November 1994; *New York Times,* 4 September 1994, p. 11.

2. Michael Howard, "Lessons of the Cold War," *Survival,* 36 (Winter 1994), 102–103; Pierre Behar, "Central Europe: The New Lines of Fracture," *Geopolitique,* 39 (English ed., August 1992), 42; Max Jakobson, "Collective Security in Europe Today," *Washington Quarterly,* 18 (Spring 1995), 69; Max Beloff, "Fault Lines and Steeples: The Divided Loyalties of Europe," *National Interest,* 23 (Spring 1991), 78.

3. Andreas Oplatka, "Vienna and the Mirror of History," *Geopolitique,* 35 (English ed., Autumn 1991), 25; Vytautas Landsbergis, "The Choice," *Geopolitique,* 35 (English ed., Autumn 1991), 3; *New York Times,* 23 April 1995, p. 5E.

4. Carl Bildt, "The Baltic Litmus Test," *Foreign Affairs,* 73 (Sept./Oct. 1994), 84.

5. *New York Times,* 15 June 1995, p. A10.

6. *RFE/RL Research Bulletin,* 10 (16 March 1993), 1, 6.

7. William D. Jackson, "Imperial Temptations: Ethnics Abroad," *Orbis,* 38 (Winter 1994), 5.

8. Ian Brzezinski, *New York Times,* 13 July 1994, p. A8.

9. John F. Mearsheimer, "The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent: Debate," *Foreign Affairs,* 72 (Summer 1993), 50–66.

10. *New York Times,* 31 January 1994, p. A8.

11. Quoted in Ola Tunander, "New European Dividing Lines?" in Valter Angell, ed., *Norway Facing a Changing Europe: Perspectives and Options* (Oslo: Norwegian Foreign Policy Studies No. 79, Fridtjof Nansen Institute et al., 1992), p. 55.

12. John Morrison, "Pereyaslav and After: The Russian-Ukrainian Relationship," *International Affairs,* 69 (October 1993), 677.

13. John King Fairbank, ed., *The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1968), pp. 2–3.

14. Perry Link, "The Old Man's New China," *New York Review of Books,* 9 June 1994, p. 32.

15. Perry Link, "China's 'Core' Problem," *Daedalus,* 122 (Spring 1993), 205; Wei-

ming Tu, "Cultural China: The Periphery as the Center," *Daedalus*, 120 (Spring 1991), 22; *Economist*, 8 July 1995, pp. 31–32.

16. *Economist*, 27 November 1993, p. 33; 17 July 1993, p. 61.

17. *Economist*, 27 November 1993, p. 33; Yoichi Funabashi, "The Asianization of Asia," *Foreign Affairs*, 72 (Nov./Dec. 1993), 80. See in general Murray Weidenbaum and Samuel Hughes, *The Bamboo Network* (New York: Free Press, 1996).

18. Christopher Gray, quoted in *Washington Post*, 1 December 1992, p. A30; Lee Kuan Yew, quoted in Maggie Farley, "The Bamboo Network," *Boston Globe Magazine*, 17 April 1994, p. 38; *International Herald Tribune*, 23 November 1993.

19. *International Herald Tribune*, 23 November 1993; George Hicks and J.A.C. Mackie, "A Question of Identity: Despite Media Hype, They Are Firmly Settled in Southeast Asia," *Far Eastern Economic Review*, 14 July 1994, p. 47.

20. *Economist*, 16 April 1994, p. 71; Nicholas D. Kristof, "The Rise of China," *Foreign Affairs*, 72 (Nov./Dec. 1993), 48; Gerrit W. Gong, "China's Fourth Revolution," *Washington Quarterly*, 17 (Winter 1994), 37; *Wall Street Journal*, 17 May 1993, p. A7A; Murray L. Weidenbaum, *Greater China: The Next Economic Superpower?* (St. Louis: Washington University Center for the Study of American Business, Contemporary Issues Series 57, February 1993), pp. 2–3.

21. Steven Mufson, *Washington Post*, 14 August 1994, p. A30; *Newsweek*, 19 July 1993, p. 24; *Economist*, 7 May 1993, p. 35.

22. See Walter C. Clemens, Jr. and Jun Zhan, "Chiang Ching-Kuo's Role in the ROC-PRC Reconciliation," *American Asian Review*, 12 (Spring 1994), 151–154.

23. Koo Chen Foo, quoted in *Economist*, 1 May 1993, p. 31; Link, "Old Man's New China," p. 32. See "Cross-Strait Relations: Historical Lessons," *Free China Review*, 44 (October 1994), 42–52. Gong, "China's Fourth Revolution," p. 39; *Economist*, 2 July 1994, p. 18; Gerald Segal, "China's Changing Shape: The Muddle Kingdom?" *Foreign Affairs*, 73 (May/June 1994), 49; Ross H. Munro, "Giving Taipei a Place at the Table," *Foreign Affairs*, 73 (Nov./Dec. 1994), 115; *Wall Street Journal*, 17 May 1993, p. A7A; *Free China Journal*, 29 July 1994, p. 1.

24. *Economist*, 10 July 1993, pp. 28–29; 2 April 1994, pp. 34–35; *International Herald Tribune*, 23 November 1993; *Wall Street Journal*, 17 May 1993, p. A7A.

25. Ira M. Lapidus, *History of Islamic Societies* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988), p. 3.

26. Mohamed Zahi Mogherbi, "Tribalism, Religion and the Challenge of Political Participation: The Case of Libya," (Paper presented to Conference on Democratic Challenges in the Arab World, Center for Political and International Development Studies, Cairo, 22–27 September 1992, pp. 1, 9; *Economist*, (Survey of the Arab East), 6 February 1988, p. 7; Adlan A. El-Hardallo, "Sufism and Tribalism: The Case of Sudan," (Paper prepared for Conference on Democratic Challenges in the Arab World, Center for Political and International Development Studies, Cairo, 22–27 September 1992), p. 2; *Economist*, 30 October 1987, p. 45; John Duke Anthony, "Saudi Arabia: From Tribal Society to Nation-State," in Ragaei El Mellakh and Dorothea H. El Mellakh, eds., *Saudi Arabia. Energy, Developmental Planning, and Industrialization* (Lexington, MA: Lexington, 1982), pp. 93–94.

27. Yalman Onaran, "Economics and Nationalism: The Case of Muslim Central Asia," *Central Asian Survey*, 13 (No. 4, 1994), 493; Denis Dragounski, "Threshold of Violence," *Freedom Review*, 26 (Mar./April 1995), 12.

28. Barbara Daly Metcalf, "The Comparative Study of Muslim Societies," *Items*, 40 (March 1986), 3.

29. Metcalf, "Muslim Societies," p. 3.

30. *Boston Globe*, 2 April 1995, p. 2. On PAIC generally, see "The Popular Arab and Islamic Conference (PAIC): A New 'Islamist International'?" *TransState Islam*, 1 (Spring 1995), 12–16.

31. Bernard Schechterman and Bradford R. McGuinn, "Linkages Between Sunni and Shi'i Radical Fundamentalist Organizations: A New Variable in Middle Eastern Politics?" *The Political Chronicle*, 1 (February 1989), 22–34; *New York Times*, 6 December 1994, p. 5.

Chapter 8

1. Georgi Arbatov, "Neo-Bolsheviks of the I.M.F.," *New York Times*, 7 May 1992, p. A27.

2. North Korean views summed up by a senior U.S. analyst, *Washington Post*, 12 June 1994, p. C1; Indian general quoted in Les Aspin, "From Deterrence to Denuking: Dealing with Proliferation in the 1990's," Memorandum, 18 February 1992, p. 6.

3. Lawrence Freedman, "Great Powers, Vital Interests and Nuclear Weapons," *Survival*, 36 (Winter 1994), 37; Les Aspin, Remarks, National Academy of Sciences, Committee on International Security and Arms Control, 7 December 1993, p. 3.

4. Stanley Norris quoted, *Boston Globe*, 25 November 1995, pp. 1, 7; Alastair Iain Johnston, "China's New 'Old Thinking': The Concept of Limited Deterrence," *International Security*, 20 (Winter 1995–96), 21–23.

5. Philip L. Ritcheson, "Iranian Military Resurgence: Scope, Motivations, and Implications for Regional Security," *Armed Forces and Society*, 21 (Summer 1995), 575–576. Warren Christopher Address, Kennedy School of Government, 20 January 1995; *Time*, 16 December 1991, p. 47; Ali Al-Amin Mazrui, *Cultural Forces in World Politics* (London: J. Currey, 1990), pp. 220, 224.

6. *New York Times*, 15 November 1991, p. A1; *New York Times*, 21 February 1992, p. A9; 12 December 1993, p. 1; Jane Teufel Dreyer, "U.S./China Military Relations: Sanctions or Rapprochement?" *In Depth*, 1 (Spring 1991), 17–18; *Time*, 16 December 1991, p. 48; *Boston Globe*, 5 February 1994, p. 2; Monte R. Bullard, "U.S.-China Relations: The Strategic Calculus," *Parameters*, 23 (Summer 1993), 88.

7. Quoted in Karl W. Eikenberry, *Explaining and Influencing Chinese Arms Transfers* (Washington, D.C.: National Defense University, Institute for National Strategic Studies, McNair Paper No. 36, February 1995), p. 37; Pakistani government statement, *Boston Globe*, 5 December 1993, p. 19; R. Bates Gill, "Curbing Beijing's Arms Sales," *Orbis*, 36 (Summer 1992), p. 386; Chong-pin Lin, "Red Army," *New Republic*, 20 November 1995, p. 28; *New York Times*, 8 May 1992, p. 31.

8. Richard A. Bitzinger, "Arms to Go: Chinese Arms Sales to the Third World," *International Security*, 17 (Fall 1992), p. 87; Philip Ritcheson, "Iranian Military Resurgence," pp. 576, 578; *Washington Post*, 31 October 1991, pp. A1, A24; *Time*, 16 December 1991, p. 47; *New York Times*, 18 April 1995, p. A8; 28 September 1995, p. 1; 30 September 1995, p. 4; Monte Bullard, "U.S.-China Relations," p. 88, *New York Times*, 22 June 1995, p. 1; Gill, "Curbing Beijing's Arms," p. 388; *New York Times*, 8 April 1993, p. A9; 20 June 1993, p. 6.

9. John E. Reilly, "The Public Mood at Mid-Decade," *Foreign Policy*, 98 (Spring 1995), p. 83; *Executive Order 12930*, 29 September 1994; *Executive Order 12938*, 14 November 1994. These expanded on *Executive Order* 12735, 16 November 1990, issued by President Bush declaring a national emergency with respect to chemical and biological weapons.

10. James Fallows, "The Panic Gap: Reactions to North Korea's Bomb," *National Interest*, 38 (Winter 1994), 40–45; David Sanger, *New York Times*, 12 June 1994, pp. 1, 16.

11. *New York Times*, 26 December 1993, p. 1.

12. *Washington Post*, 12 May 1995, p. 1.

13. Bilahari Kausikan, "Asia's Different Standard," *Foreign Policy*, 92 (Fall 1993), 28–29.

14. *Economist*, 30 July 1994, p. 31; 5 March 1994, p. 35; 27 August 1994, p. 51; Yash Ghai, "Human Rights and Governance: The Asian Debate," (Asia Foundation Center for Asian Pacific Affairs, Occasional Paper No. 4, November 1994), p. 14.

15. Richard M. Nixon, *Beyond Peace* (New York: Random House, 1994), pp. 127–128.

16. *Economist*, 4 February 1995, p. 30.

17. Charles J. Brown, "In the Trenches: The Battle Over Rights," *Freedom Review*, 24 (Sept./Oct. 1993), 9; Douglas W. Payne, "Showdown in Vienna," ibid., pp. 6–7.

18. Charles Norchi, "The Ayatollah and the Author: Rethinking Human Rights," *Yale Journal of World Affairs*, 1 (Summer 1989), 16; Kausikan, "Asia's Different Standard," p. 32.

19. Richard Cohen, *The Earth Times*, 2 August 1993, p. 14.

20. *New York Times*, 19 September 1993, p. 4E; 24 September 1993, pp. 1, B9; B16; 9 September 1994, p. A26; *Economist*, 21 September 1993, p. 75; 18 September 1993, pp. 37–38; *Financial Times*, 25–26 September 1993, p. 11; *Straits Times*, 14 October 1993, p. 1.

21. Figures and quotes are from Myron Weiner, *Global Migration Crisis* (New York: HarperCollins, 1995), pp. 21–28.

22. Weiner, *Global Migration Crisis*, p. 2.

23. Stanley Hoffmann, "The Case for Leadership," *Foreign Policy*, 81 (Winter 1990–91), 30.

24. See B. A. Roberson, "Islam and Europe: An Enigma or a Myth?" *Middle East Journal*, 48 (Spring 1994), p. 302; *New York Times*, 5 December 1993, p. 1; 5 May 1995, p. 1; Joel Klotkin and Andries van Agt, "Bedouins: Tribes That Have Made it," *New Perspectives Quarterly*, 8 (Fall 1991), p. 51; Judith Miller, "Strangers at the Gate," *New York Times Magazine*, 15 September 1991, p. 49

25. *International Herald Tribune*, 29 May 1990, p. 5; *New York Times*, 15 September 1994, p. A21. The French poll was sponsored by the French government, the German poll by the American Jewish Committee.

26. See Hans-George Betz, "The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe," *Comparative Politics*, 25 (July 1993), 413–427.

27. *International Herald Tribune*, 28 June 1993, p. 3; *Wall Street Journal*, 23 May 1994; p. B1; Lawrence H. Fuchs, "The Immigration Debate: Little Room for Big Reforms," *American Experiment*, 2 (Winter 1994), 6.

28. James C. Clad, "Slowing the Wave," *Foreign Policy*, 95 (Summer 1994), 143; Rita J. Simon and Susan H. Alexander, *The Ambivalent Welcome: Print Media, Public Opinion and Immigration* (Westport, CT: Praeger, 1993), p. 46.

29. *New York Times*, 11 June 1995, p. E14.

30. Jean Raspail, *The Camp of the Saints* (New York: Scribner, 1975) and Jean-Claude Chesnais, *Le Crepuscule de l'Occident: Demographie et Politique* (Paris: Robert Laffont, 1995); Pierre Lellouche, quoted in Miller, "Strangers at the Gate," p. 80.

31. Philippe Fargues, "Demographic Explosion or Social Upheaval?" in Ghassan Salame, ed., *Democracy Without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World* (London: I.B. Taurus, 1994), pp. 157ff.

Chapter 9

1. Adda B. Bozeman, *Strategic Intelligence and Statecraft: Selected Essays* (Washington: Brassey's (US), 1992), p. 50; Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century," *International Affairs*, 67 (July 1991), 448–449.

2. John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992), p. 46.

3. Bernard Lewis, *Islam and the West* (New York: Oxford University Press, 1993), p. 13.

4. Esposito, *Islamic Threat*, p. 44.

5. Daniel Pipes, *In the Path of God: Islam and Political Power* (New York: Basic Books, 1983), 102–103, 169–173; Lewis F. Richardson, *Statistics of Deadly Quarrels* (Pittsburgh: Boxwood Press, 1960), pp. 235–237.

6. Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 41–42; Princess Anna Comnena, quoted in Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World* (New York: Doubleday-Anchor, 1991), pp. 3–4 and in Arnold J. Toynbee, *Study of History* (London: Oxford University Press, 1954), VIII, p. 390.

7. Barry Buzan, "New Patterns," pp. 448–449; Bernard Lewis, "The Roots of Muslim Rage: Why So Many Muslims Deeply Resent the West and Why Their Bitterness Will Not Be Easily Mollified," *Atlantic Monthly*, 266 (September 1990), 60.

8. Mohamed Sid-Ahmed, "Cybernetic Colonialism and the Moral Search," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Spring 1994), 19; M. J. Akbar, quoted *Time*, 15 June 1992, p. 24; Abdelwahab Belwahl, quoted ibid., p. 26.

9. William H. McNeill, "Epilogue: Fundamentalism and the World of the 1990's," in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., *Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Sciences, the Family, and Education* (Chicago: University of Chicago Press), p. 569.

10. Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1992).

11. For a selection of such reports, see *Economist*, 1 August 1992, pp. 34–35.

12. John E. Reilly, ed., *American Public Opinion and U. S. Foreign Policy 1995* (Chicago: Chicago Council on Foreign Relations, 1995), p. 21; *Le Monde*, 20 September 1991, p. 12, cited in Margaret Blunden, "Insecurity on Europe's Southern Flank," *Survival*, 36 (Summer 1994), 138; Richard Morin, *Washington Post* (National Weekly Ed.), 8–14 November 1993, p. 37; Foreign Policy Association, National Opinion Ballot Report, November 1994, p. 5.

13. *Boston Globe*, 3 June 1994, p. 18; John L. Esposito, "Symposium: Resurgent Islam in the Middle East," *Middle East Policy* 3 (No. 2, 1994), 9; *International Herald Tribune*, 10 May 1994, pp. 1, 4; *Christian Science Monitor*, 24 February 1995, p. 1.

14. Robert Ellsworth, *Wall Street Journal*, 1 March 1995, p. 15; William T. Johnsen, *NATO's New Front Line: The Growing Importance of the Southern Tier* (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1992), p. vii; Robbin Laird, *French Security Policy in Transition: Dynamics of Continuity and Change* (Washington, D.C.: Institute for National Strategic Studies, McNair paper 38, March 1995), pp. 50–52.

15. Ayatollah Ruhollah Khomeini, *Islam and Revolution* (Berkeley, CA: Mizan Press, 1981), p. 305.

16. *Economist*, 23 November 1991, p. 15.

17. Barry Buzan and Gerald Segal, "Rethinking East Asian Security," *Survival*, 36 (Summer 1994), 15.

18 *Can China's Armed Forces Win the Next War?*, excerpts translated and published in Ross H. Munro, "Eavesdropping on the Chinese Military: Where It Expects War—Where It Doesn't," *Orbis*, 38 (Summer 1994), 365. The authors of this document went on to say that the use of military force against Taiwan "would be a really unwise decision."

19. Buzan and Segal, "Rethinking East Asian Security," p. 7; Richard K. Betts, "Wealth, Power and Instability: East Asia and the United States After the Cold War," *International Security*, 18 (Winter 1993/94), 34–77; Aaron L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in Multipolar Asia," *International Security*, 18 (Winter 1993/94), 5–33.

20. *Can China's Armed Forces Win the Next War?* excerpts translated in Munro, "Eavesdropping on the Chinese," pp. 355ff.; *New York Times*, 16 November 1993, p. A6; Friedberg, "Ripe for Rivalry," p. 7.

21. Desmond Ball, "Arms and Affluence: Military Acquisitions in the Asia-Pacific Region," *International Security*, 18 (Winter 1993/94), 95–111; Michael T. Klare, "The Next Great Arms Race," *Foreign Affairs*, 72 (Summer 1993), 137ff.; Buzan and Segal, "Rethinking East Asian Security," pp. 8–11; Gerald Segal, "Managing New Arms Races in the Asia/Pacific," *Washington Quarterly*, 15 (Summer 1992), 83–102; *Economist*, 20 February 1993, pp. 19–22.

22. See, e.g., *Economist*, 26 June 1993, p. 75; 24 July 1995, p. 25; *Time*, 3 July 1995, pp. 30–31; and on China, Jacob Heilbrunn, "The Next Cold War," *New Republic*, 20 November 1995, pp. 27ff.

23. For discussion of the varieties of trade wars and when they may lead to military wars, see David Rowe, *Trade Wars and International Security: The Political Economy of International Economic Conflict* (Working paper no. 6, Project on the Changing Security Environment and American National Interests, John M. Olin Institute for Strategic Studies, Harvard University, July 1994), pp. 7ff.

24. *New York Times*, 6 July 1993, p. A1, A6; *Time*, 10 February 1992, pp. 16ff.; *Economist*, 17 February 1990, pp. 21–24; *Boston Globe*, 25 November 1991, pp. 1, 8; Dan Oberdorfer, *Washington Post*, 1 March 1992, p. A1.

25. Quoted *New York Times*, 21 April 1992, p. A10; *New York Times*, 22 September 1991, p. E2; 21 April 1992, p. A1; 19 September 1991, p. A7; 1 August 1995, p. A2; *International Herald Tribune*, 24 August 1995, p. 4; *China Post (Taipei)*, 26 August 1995, p. 2; *New York Times*, 1 August 1995, p. A2, citing David Shambaugh report on interviews in Beijing.

26. Donald Zagoria, American Foreign Policy Newsletter, October 1993, p. 3; *Can China's Armed Forces Win the Next War?*, in Munro, "Eavesdropping on the Chinese Military," pp. 355ff.

27. Roger C. Altman, "Why Pressure Tokyo? The US-Japan Rift," *Foreign Affairs*, 73 (May-June 1994), p. 3; Jeffrey Garten, "The Clinton Asia Policy," *International Economy*, 8 (March-April 1994), 18.

28. Edward J. Lincoln, *Japan's Unequal Trade*, (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1990), pp. 2–3. See C. Fred Bergsten and Marcus Noland, *Reconcilable Differences? United States-Japan Economic Conflict* (Washington: Institute for International Economics, 1993); Eisuke Sakakibara, "Less Like You," *International Economy*, (April-May 1990), 36, who distinguishes the American capitalistic market economy from the Japanese noncapitalistic market economy; Marie Anchordoguy, "Japanese-American

Trade Conflict and Supercomputers," *Political Science Quarterly*, 109 (Spring 1994), 36, citing Rudiger Dornbush, Paul Krugman, Edward J. Lincoln, and Mordechai E. Kreinin; Eamonn Fingleton, "Japan's Invisible Leviathan," *Foreign Affairs*, 74 (Mar./April 1995), p. 70.

29. For a good summary of differences in culture, values, social relations, and attitudes, see Seymour Martin Lipset, *American Exceptionalism: A Double-Edged Sword* (New York: W. W. Norton, 1996), chapter 7, "American Exceptionalism — Japanese Uniqueness."

30. *Washington Post*, 5 May 1994, p. A38; *Daily Telegraph*, 6 May 1994, p. 16; *Boston Globe*, 6 May 1994, p. 11; *New York Times*, 13 February 1994, p. 10; Karl D. Jackson, "How to Rebuild America's Stature in Asia," *Orbis*, 39 (Winter 1995), 14; Yohei Kono, quoted in Chalmers Johnson and E. B. Keehn, "The Pentagon's Ossified Strategy," *Foreign Affairs*, 74 (July-August 1995), 106

31. *New York Times*, 2 May 1994, p. A10.

32. Barry Buzan and Gerald Segal, "Asia: Skepticism About Optimism," *National Interest*, 39 (Spring 1995), 83–84; Arthur Waldron, "Deterring China," *Commentary*, 100 (October 1995), 18; Nicholas D. Kristof, "The Rise of China," *Foreign Affairs*, 72 (Nov./Dec. 1993), 74.

33. Stephen P. Walt, "Alliance Formation in Southwest Asia: Balancing and Bandwagoning in Cold War Competition," in Robert Jervis and Jack Snyder, eds., *Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Competition in the Eurasian Rimland* (New York: Oxford University Press, 1991), pp. 53, 69.

34. Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," *International Security*, 19 (Summer 1994), 72ff.

35. Lucian W. Pye, *Dynamics of Factions and Consensus in Chinese Politics: A Model and Some Propositions* (Santa Monica, CA: Rand, 1980), p. 120; Arthur Waldron, *From War to Nationalism: China's Turning Point, 1924–1925* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp. 48–49, 212; Avery Goldstein, *From Bandwagon to Balance-of-Power Politics: Structured Constraints in Politics in China, 1949–1978* (Stanford, CA: Stanford University Press: 1991), pp. 5–6, 35ff. See also, Lucian W. Pye, "Social Science Theories in Search of Chinese Realities," *China Quarterly*, 132 (December 1992), 1161–1171.

36. Samuel S. Kim and Lowell Dittmer, "Whither China's Quest for National Identity," in Lowell Dittmer and Samuel S. Kim, eds., *China's Quest for National Identity* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), p. 240; Paul Dibb, *Towards a New Balance of Power in Asia* (London: International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper 295, 1995), pp. 10–16; Roderick MacFarquhar, "The Post-Confucian Challenge," *Economist*, 9 February 1980, pp. 67–72; Kishore Mahbubani, " 'The Pacific Impulse,' " *Survival*, 37 (Spring 1995), 117; James L. Richardson, "Asia-Pacific: The Case for Geopolitical Optimism," *National Interest*, 38 (Winter 1994–95), 32; Paul Dibb, "Towards a New Balance," p. 13. See Nicola Baker and Leonard C. Sebastian, "The Problem with Parachuting: Strategic Studies and Security in the Asia/Pacific Region," *Journal of Strategic Studies*, 18 (September 1995), 15ff. for an extended discussion of the inapplicability to Asia of European-based concepts, such as the balance of power and the security dilemma.

37. *Economist*, 23 December 1995; 5 January 1996, pp. 39–40.

38. Richard K. Betts, "Vietnam's Strategic Predicament," *Survival*, 37 (Autumn 1995), 61ff, 76.

39. *New York Times*, 12 November 1994, p. 6; 24 November 1994, p. A12; *Interna-*

tional Herald Tribune, 8 November 1994, p. 1; Michel Oksenberg, *Washington Post*, 3 September 1995, p. C1.

40. Jitsuo Tsuchiyama, "The End of the Alliance? Dilemmas in the U.S.—Japan Relations," (Unpublished paper, Harvard University, John M. Olin Institute for Strategic Studies, 1994), pp. 18–19.

41. Ivan P. Hall, "Japan's Asia Card," *National Interest*, 38 (Winter 1994–95), 26; Kishore Mahbubani, "The Pacific Impulse," p. 117.

42. Mike M. Mochizuki, "Japan and the Strategic Quadrangle," in Michael Mandelbaum, ed., *The Strategic Quadrangle: Russia, China, Japan, and the United States in East Asia* (New York: Council on Foreign Relations, 1995), pp. 130–139; *Asahi Shimbon* poll reported in *Christian Science Monitor*, 10 January 1995, p. 7.

43. *Financial Times*, 10 September 1992, p. 6; Samina Yasmeen, "Pakistan's Cautious Foreign Policy," *Survival*, 36 (Summer 1994), p. 121, 127–128; Bruce Vaughn, "Shifting Geopolitical Realities Between South, Southwest and Central Asia," *Central Asian Survey*, 13 (No. 2, 1994), 313; Editorial, *Hamshahri*, 30 August 1994, pp. 1, 4, in *FBIS-NES-94-173*, 2 September 1994, p. 77.

44. Graham E. Fuller, "The Appeal of Iran," *National Interest*, 37 (Fall 1994), p. 95; Mu'ammar al-Qadhdhafi, Sermon, Tripoli, Libya, 13 March 1994, in *FBIS-NES-94-049*, 14 March 1994, p. 21.

45. Fereidun Fesharaki, East-West Center, Hawaii, quoted in *New York Times*, 3 April 1994, p. E3.

46. Stephen J. Blank, *Challenging the New World Order: The Arms Transfer Policies of the Russian Republic* (Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 1993), pp. 53–60.

47. *International Herald Tribune*, 25 August 1995, p. 5.

48. J. Mohan Malik, "India Copes with the Kremlin's Fall," *Orbis*, 37 (Winter 1993), 75.

Chapter 10

1. Mahdi Elmandjra, *Der Spiegel*, 11 February 1991, cited in Elmandjra, "Cultural Diversity: Key to Survival in the Future," (First Mexican Congress on Future Studies, Mexico City, 26–27 September 1994), pp. 3, 11.

2. David C. Rapoport, "Comparing Militant Fundamentalist Groups," in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., *Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Militance*, (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 445.

3. Ted Galen Carpenter, "The Unintended Consequences of Afghanistan," *World Policy Journal*, 11 (Spring 1994), 78–79, 81, 82; Anthony Hyman, "Arab Involvement in the Afghan War," *Beirut Review*, 7 (Spring 1994), 78, 82; Mary Anne Weaver, "Letter from Pakistan: Children of the Jihad," *New Yorker*, 12 June 1995, pp. 44–45; *Washington Post*, 24 July 1995, p. A1; *New York Times*, 20 March 1995, p. 1; 28 March 1993, p. 14.

4. Tim Weiner, "Blowback from the Afghan Battlefield," *New York Times Magazine*, 13 March 1994, p. 54.

5. Harrison J. Goldin, *New York Times*, 28 August 1992, p. A25.

6. James Piscatori, "Religion and Realpolitik: Islamic Responses to the Gulf War," in James Piscatori, ed., *Islamic Fundamentalisms and the Gulf Crisis* (Chicago: Fundamentalism Project, American Academy of Arts and Sciences, 1991), pp. 1, 6–7. See also Fatima Mernissi, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World* (Reading, MA: Addison-Wesley), pp. 16–17.

7. Rami G. Khouri, "Collage of Comment: The Gulf War and the Mideast Peace; The Appeal of Saddam Hussein," *New Perspectives Quarterly*, 8 (Spring 1991), 56.

8. Ann Mosely Lesch, "Contrasting Reactions to the Persian Gulf Crisis: Egypt, Syria, Jordan, and the Palestinians," *Middle East Journal*, 45 (Winter 1991), p. 43; *Time*, 3 December 1990, p. 70; Kanan Makiya, *Cruelty and Silence: War, Tyranny, Uprising and the Arab World* (New York: W. W. Norton, 1993), pp. 242ff.

9. Eric Evans, "Arab Nationalism and the Persian Gulf War," *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*, 1 (February 1994), p. 28; Sari Nusselbeh, quoted *Time*, 15 October 1990, pp. 54–55.

10. Karin Haggag, "One Year After the Storm," *Civil Society* (Cairo), 5 (May 1992), 12.

11. *Boston Globe*, 19 February 1991, p. 7; Safar al-Hawali, quoted by Mamoun Fandy, *New York Times*, 24 November 1990, p. 21; King Hussein, quoted by David S. Landes, "Islam Dunk: the Wars of Muslim Resentment," *New Republic*, 8 April 1991, pp. 15–16; Fatima Mernissi, *Islam and Democracy*, p. 102.

12. Safar Al-Hawali, "Infidels, Without, and Within," *New Perspectives Quarterly*, 8 (Spring 1991), 51.

13. *New York Times*, 1 February 1991, p. A7; *Economist*, 2 February 1991, p. 32.

14. *Washington Post*, 29 January 1991, p. A10; 24 February 1991, p. B1; *New York Times*, 20 October 1990, p. 4.

15. Quoted in *Saturday Star* (Johannesburg), 19 January 1991, p. 3; *Economist*, 26 January 1991, pp. 31–33.

16. Sohail H. Hasmi, review of Mohammed Haikal, "Illusions of Triumph," *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*, 1 (February 1994), 107; Mernissi, *Islam and Democracy*, p. 102.

17. Shibley Telhami, "Arab Public Opinion and the Gulf War," *Political Science Quarterly*, 108 (Fall 1993), 451.

18. *International Herald Tribune*, 28 June 1993, p. 10.

19. Roy Licklider, "The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945–93," *American Political Science Review*, 89 (September 1995), 685, who defines communal wars as "identity wars," and Samuel P. Huntington, "Civil Violence and the Process of Development," in *Civil Violence and the International System* (London: International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper No. 83, December 1971), 12–14, who cites as the five major characteristics of communal wars a high degree of polarization, ideological ambivalence, particularism, large amounts of violence, and protracted duration.

20. These estimates come from newspaper accounts and Ted Robert Gurr and Barbara Harff, *Ethnic Conflict in World Politics* (Boulder: Westview Press, 1994), pp. 160–165.

21. Richard H. Shultz, Jr. and William J. Olson, *Ethnic and Religious Conflict: Emerging Threat to U.S. Security* (Washington, D.C.: National Strategy Information Center), pp. 17ff.; H. D. S. Greenway, *Boston Globe*, 3 December 1992, p. 19.

22. Roy Licklider, "Settlements in Civil Wars," p. 685; Gurr and Harff, *Ethnic Conflict*, p. 11; Trent N. Thomas, "Global Assessment of Current and Future Trends in Ethnic and Religious Conflict," in Robert L. Pfaltzgraff, Jr. and Richard H. Shultz, Jr., eds., *Ethnic Conflict and Regional Instability: Implications for U.S. Policy and Army Roles and Missions* (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1994), p. 36.

23. See Shultz and Olson, *Ethnic and Religious Conflict*, pp. 3–9; Sugata Bose,

"Factors Causing the Proliferation of Ethnic and Religious Conflict," in Pfaltzgraff and Shultz, *Ethnic Conflict and Regional Instability*, pp. 43–49; Michael E. Brown, "Causes and Implications of Ethnic Conflict," in Michael E. Brown, ed., *Ethnic Conflict and International Security* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), pp. 3–26. For a counterargument that ethnic conflict has not increased since the end of the Cold War, see Thomas, "Global Assessment of Current and Future Trends in Ethnic and Religious Conflict," pp. 33–41.

24. Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditures 1993* (Washington, D.C.: World Priorities, Inc., 1993), pp. 20–22.

25. James L. Payne, *Why Nations Arm* (Oxford: B. Blackwell, 1989), p. 124.

26. Christopher B. Stone, "Westphalia and Hudaybiyya: A Survey of Islamic Perspectives on the Use of Force as Conflict Management Technique" (unpublished paper, Harvard University), pp. 27–31, and Jonathan Wilkenfeld, Michael Brecher, and Sheila Moser, eds., *Crises in the Twentieth Century* (Oxford: Pergamon Press, 1988–89), II, 15, 161.

27. Gary Fuller, " The Demographic Backdrop to Ethnic Conflict: A Geographic Overview," in Central Intelligence Agency, *The Challenge of Ethnic Conflict to National and International Order in the 1990's: Geographic Perspectives* (Washington, D.C.: Central Intelligence Agency, RTT 95-10039, October 1995), pp. 151–154.

28. *New York Times*, 16 October 1994, p. 3; *Economist*, 5 August 1995, p. 32.

29. United Nations Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, Population Division, *World Population Prospects: The 1994 Revision* (New York: United Nations, 1995), pp. 29, 51; Denis Dragounski, "Threshold of Violence," *Freedom Review*, 26 (March-April 1995), 11.

30. Susan Woodward, *Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1995), pp. 32–35; Branka Magas, *The Destruction of Yugoslavia: Tracking the Breakup 1980–92* (London: Verso, 1993), pp. 6, 19.

31. Paul Mojzes, *Yugoslavian Inferno: Ethnoreligious Warfare in the Balkans* (New York: Continuum, 1994), pp. 95–96; Magas, *Destruction of Yugoslavia*, pp. 49–73; Aryeh Neier, "Kosovo Survives," *New York Review of Books*, 3 February 1994, p. 26.

32. Aleksa Djilas, "A Profile of Slobodan Milosevic," *Foreign Affairs*, 72 (Summer 1993), 83.

33. Woodward, *Balkan Tragedy*, pp. 33–35, figures derived from Yugoslav censuses and other sources; William T. Johnsen, *Deciphering the Balkan Enigma: Using History to Inform Policy* (Carlisle Barracks: Strategic Studies Institute, 1993), p. 25, citing *Washington Post*, 6 December 1992, p. C2; *New York Times*, 4 November 1995, p. 6.

34. Bogdan Denis Denitch, *Ethnic Nationalism: The Tragic Death of Yugoslavia* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 108–109.

35. Payne, *Why Nations Arm*, pp. 125, 127.

36. *Middle East International*, 20 January, 1995, p. 2.

Chapter 11

1. Roy Licklider, "The Consequences of Negotiated Settlements in Civil Wars, 1945–93," *American Political Science Review*, 89 (September 1995), 685.

2. See Barry R. Posen, "The Security Dilemma and Ethnic Conflict," in Michael E. Brown, ed., *Ethnic Conflict and International Security* (Princeton: Princeton University Press, 1993), pp. 103–124.

3. Roland Dannreuther, *Creating New States in Central Asia* (International Institute

for Strategic Studies/Brassey's, Adelphi Paper No. 288, March 1994), pp. 30–31; Dodjoni Atovullo, quoted in Urzula Doroszewska, "The Forgotten War: What Really Happened in Tajikistan," *Uncaptive Minds*, 6 (Fall 1993), 33.

4. *Economist*, 26 August 1995, p. 43; 20 January 1996, p. 21.

5. *Boston Globe*, 8 November 1993, p. 2; Brian Murray, "Peace in the Caucasus: Multi-Ethnic Stability in Dagestan," *Central Asian Survey*, 13 (No. 4, 1994), 514–515; *New York Times*, 11 November 1991, p. A7; 17 December 1994, p. 7; *Boston Globe*, 7 September 1994, p. 16; 17 December 1994, pp. 1ff.

6. Raju G. C. Thomas, "Secessionist Movements in South Asia," *Survival*, 36 (Summer 1994), 99–101, 109; Stefan Wagstyl, "Kashmiri Conflict Destroys a 'Paradise,'" *Financial Times*, 23–24 October 1993, p. 3.

7. Alija Izetbegovic, *The Islamic Declaration* (1991), pp. 23, 33.

8. *New York Times*, 4 February 1995, p. 4; 15 June 1995, p. A12; 16 June 1995, p. A12.

9. *Economist*, 20 January 1996, p. 21; *New York Times*, 4 February 1995, p. 4.

10. Stojan Obradovic, "Tuzla: The Last Oasis," *Uncaptive Minds*, 7 (Fall-Winter 1994), 12–13.

11. Fiona Hill, *Russia's Tinderbox: Conflict in the North Caucasus and Its Implications for the Future of the Russian Federation* (Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Strengthening Democratic Institutions Project, September 1995), p. 104.

12. *New York Times*, 6 December 1994, p. A3.

13. See Mojzes, *Yugoslavian Inferno*, chap. 7, "The Religious Component in Wars"; Denitch, *Ethnic Nationalism: The Tragic Death of Yugoslavia*, pp. 29–30, 72–73, 131–133; *New York Times*, 17 September 1992, p. A14; Misha Glenny, "Carnage in Bosnia, for Starters," *New York Times*, 29 July 1993, p. A23.

14. *New York Times*, 13 May 1995, p. A3; 7 November 1993, p. E4; 13 March 1994, p. E3; Boris Yeltsin, quoted in Barnett R. Rubin, "The Fragmentation of Tajikistan," *Survival*, 35 (Winter 1993-94), 86.

15. *New York Times*, 7 March 1994, p. 1; 26 October 1995, p. A25; 24 September 1995, p. E3; Stanley Jeyaraja Tambiah, *Sri Lanka: Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 1986), p. 19.

16. Khalid Duran, quoted in Richard H. Schultz, Jr. and William J. Olson, *Ethnic and Religious Conflict: Emerging Threat to U.S. Security* (Washington, D.C.: National Strategy Information Center), p. 25.

17. Khaching Tololyan, "The Impact of Diasporas in U.S. Foreign Policy," in Robert L. Pfaltzgraff, Jr. and Richard H. Shultz, Jr., eds., *Ethnic Conflict and Regional Instability: Implications for U.S. Policy and Army Roles and Missions* (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 1994), p. 156.

18. *New York Times*, 25 June 1994, p. A6; 7 August 1994, p. A9; *Economist*, 31 October 1992, p. 38; 19 August 1995, p. 32; *Boston Globe*, 16 May 1994, p. 12; 3 April 1995, p. 12.

19. *Economist*, 27 February 1988, p. 25; 8 April 1995, p. 34; David C. Rapoport, "The Role of External Forces in Supporting Ethno-Religious Conflict," in Pfaltzgraff and Shultz, *Ethnic Conflict and Regional Instability*, p. 64.

20. Rapoport, "External Forces," p. 66; *New York Times*, 19 July 1992, p. E3; Carolyn Fluehr-Lobban, "Protracted Civil War in the Sudan: Its Future as a Multi-Religious, Multi-Ethnic State," *Fletcher Forum of World Affairs*, 16 (Summer 1992), 73.

21. Steven R. Weisman, "Sri Lanka: A Nation Disintegrates," *New York Times Magazine*, 13 December 1987, p. 85.

22. *New York Times,* 29 April 1984, p. 6; 19 June 1995, p. A3; 24 September 1995, p. 9; *Economist,* 11 June 1988, p. 38; 26 August 1995, p. 29; 20 May 1995, p. 35; 4 November 1995, p. 39.

23. Barnett Rubin, "Fragmentation of Tajikistan," pp. 84, 88; *New York Times,* 29 July 1993, p. 11; *Boston Globe,* 4 August 1993, p. 4. On the development of the war in Tajikistan, I have relied largely on Barnett R. Rubin, "The Fragmentation of Tajikistan," *Survival,* 35 (Winter 1993–94), 71–91; Roland Dannreuther, *Creating New States in Central Asia* (International Institute for Strategic Studies, Adelphi Paper No. 288, March 1994); Hafizulla Emadi, "State, Ideology, and Islamic Resurgence in Tajikistan," *Central Asian Survey,* 13 (No. 4, 1994), 565–574; and newspaper accounts.

24. Urszula Doroszewska, "Caucasus Wars," *Uncaptive Minds,* 7 (Winter-Spring 1994), 86.

25. *Economist,* 28 November 1992, p. 58; Hill, *Russia's Tinderbox,* p. 50.

26. *Moscow Times,* 20 January 1995, p. 4; Hill, *Russia's Tinderbox,* p. 90.

27. *Economist,* 14 January 1995, pp. 43ff.; *New York Times,* 21 December 1994, p. A18; 23 December 1994, pp. A1, A10; 3 January 1995, p. 1; 1 April 1995, p. 3; 11 December 1995, p. A6; Vicken Cheterian, "Chechnya and the Transcaucasian Republics," *Swiss Review of World Affairs,* February 1995, pp. 10–11; *Boston Globe,* 5 January, 1995, pp. 1ff.; 12 August 1995, p. 2.

28. Vera Tolz, "Moscow and Russia's Ethnic Republics in the Wake of Chechnya," Center for Strategic and International Studies, *Post-Soviet Prospects,* 3 (October 1995), 2; *New York Times,* 20 December 1994, p. A14.

29. Hill, *Russia's Tinderbox,* p. 4; Dmitry Temin, "Decision Time for Russia," *Moscow Times,* 3 February 1995, p. 8.

30. *New York Times,* 7 March 1992, p. 3; 24 May 1992, p. 7; *Boston Globe,* 5 February 1993, p. 1; Bahri Yilmaz, "Turkey's New Role in International Politics," *Aussenpolitik,* 45 (January 1994), 95; *Boston Globe,* 7 April 1993, p. 2.

31. *Boston Globe,* 4 September 1993, p. 2; 5 September 1993, p. 2; 26 September 1993, p. 7; *New York Times,* 4 September 1993, p. 5; 5 September 1993, p. 19; 10 September 1993, p. A3.

32. *New York Times,* 12 February 1993, p. A3; 8 March 1992, p. 20; 5 April 1993, p. A7; 15 April 1993, p. A9; Thomas Goltz, "Letter from Eurasia: Russia's Hidden Hand," *Foreign Policy,* 92 (Fall 1993), 98–104; Hill and Jewett, *Back in the USSR,* p. 15.

33. Fiona Hill and Pamela Jewett, *Back in the USSR: Russia's Intervention in the Internal Affairs of the Former Soviet Republics and the Implications for the United States Policy Toward Russia* (Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Strengthening Democratic Institutions Project, January 1994), p. 10.

34. *New York Times,* 22 May 1992, p. A29; 4 August 1993, p. A3; 10 July 1994, p. E4; *Boston Globe,* 25 December 1993, p. 18; 23 April 1995, pp. 1, 23.

35. Flora Lewis, "Between TV and the Balkan War," *New Perspectives Quarterly,* 11 (Summer 1994), 47; Hanns W. Maull, "Germany in the Yugoslav Crisis," *Survival,* 37 (Winter 1995–96), 112; Wolfgang Krieger, "Toward a Gaullist Germany? Some Lessons from the Yugoslav Crisis," *World Policy Journal,* 11 (Spring 1994), 31–32.

36. Misha Glenny, "Yugoslavia: The Great Fall," *New York Review of Books,* 23 March 1993, p. 61; Pierre Behar, "Central Europe: The New Lines of Fracture," *Geopolitique,* 39 (Autumn 1994), 44.

37. Pierre Behar, "Central Europe and the Balkans Today: Strengths and Weaknesses," *Geopolitique,* 35 (Autumn 1991), p. 33; *New York Times,* 23 September 1993, p. A9; *Washington Post,* 13 February 1993, p. 16; Janusz Bugajski, "The Joy of War,"

Post-Soviet Prospects, (Center for Strategic and International Studies), 18 March 1993, p. 4.

38. Dov Ronen, *The Origins of Ethnic Conflict: Lessons from Yugoslavia* (Australian National University, Research School of Pacific Studies, Working Paper No. 155, November 1994), pp. 23–24; Bugajski, "Joy of War," p. 3.

39. *New York Times*, 1 August 1995, p. A6; 28 October 1995, pp. 1, 5; 5 August 1995, p. 4; *Economist*, 11 November 1995, pp. 48–49.

40. *Boston Globe*, 4 January 1993, p. 5; 9 February 1993, p. 6; 8 September 1995, p. 7; 30 November 1995, p. 13; *New York Times*, 18 September 1995, p. A6; 22 June 1993, p. A23; Janusz Bugajski, "Joy of War," p. 4.

41. *Boston Globe*, 1 March 1993, p. 4; 21 February 1993, p. 11; 5 December 1993, p. 30; *Times* (London), 2 March 1993, p. 14; *Washington Post*, 6 November 1995, p. A15

42. *New York Times*, 2 April 1995, p. 10; 30 April 1995, p. 4; 30 July 1995, p. 8; 19 November 1995, p. E3.

43. *New York Times*, 9 February 1994, p. A12; 10 February 1994, p. A1; 7 June 1995, p. A1; *Boston Globe*, 9 December 1993, p. 25; *Europa Times*, May 1994, p. 6; Andreas Papandreou, "Europe Turns Left," *New Perspectives Quarterly*, 11 (Winter 1994), 53.

44. *New York Times*, 10 September 1995, p. 12; 13 September 1995, p. A11; 18 September 1995, p. A6; *Boston Globe*, 8 September 1995, p. 2; 12 September 1995, p. 1; 10 September 1995, p. 28.

45. *Boston Globe*, 16 December 1995, p. 8; *New York Times*, 9 July 1994, p. 2.

46. Margaret Blunden, "Insecurity on Europe's Southern Flank," *Survival*, 36 (Summer 1994), 145; *New York Times*, 16 December 1993, p. A7.

47. Fouad Ajami, "Under Western Eyes: The Fate of Bosnia" (Report prepared for the International Commission on the Balkans of the Carnegie Endowment for International Peace and The Aspen Institute, April 1996), pp. 5ff.; *Boston Globe*, 14 August 1993, p. 2; *Wall Street Journal*, 17 August 1992, p. A4.

48. Yilmaz, "Turkey's New Role," pp. 94, 97.

49. Janusz Bugajski, "Joy of War," p. 4; *New York Times*, 14 November 1992, p. 5; 5 December 1992, p. 1; 15 November 1993, p. 1; 18 February 1995, p. 3; 1 December 1995, p. A14; 3 December 1995, p. 1; 16 December 1995, p. 6; 24 January 1996, pp. A1, A6; Susan Woodward, *Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1995), pp. 356–357; *Boston Globe*, 10 November 1992, p. 7; 13 July 1993, p. 10; 24 June 1995, p. 9; 22 September 1995, pp. 1, 15; Bill Gertz, *Washington Times*, 2 June 1994, p. A1.

50. *Jane's Sentinel*, cited in *Economist*, 6 August 1994, p. 41; *Economist*, 12 February 1994, p. 21; *New York Times*, 10 September 1992, p. A6; 5 December 1992, p. 6; 26 January 1993, p. A9; 14 October 1993, p. A14; 14 May 1994, p. 6; 15 April 1995, p. 3; 15 June 1995, p. A12; 3 February 1996, p. 6; *Boston Globe*, 14 April 1995, p. 2; *Washington Post*, 2 February 1996, p. 1.

51. *New York Times*, 23 January 1994, p. 1; *Boston Globe*, 1 February 1994, p. 8.

52. On American acquiescence in Muslim arms shipments, see *New York Times*, 15 April 1995, p. 3; 3 February 1996, p. 6; *Washington Post*, 2 February 1996, p. 1; *Boston Globe*, 14 April 1995, p. 2.

53. Rebecca West, *Black Lamb and Grey Falcon: The Record of a Journey through Yugoslavia in* 1937 (London: Macmillan, 1941), p. 22 quoted in Charles G. Boyd, "Making Peace with the Guilty: the Truth About Bosnia," *Foreign Affairs*, 74 (Sept./Oct. 1995), 22.

54. Quoted in Timothy Garton Ash, "Bosnia in Our Future," *New York Review of Books*, 21 December 1995, p. 27; *New York Times*, 5 December 1992, p. 1.

55. *New York Times*, 3 September 1995, p. 6E, *Boston Globe*, 11 May 1995, p. 4.

56. See U.S. Institute of Peace, *Sudan: Ending the War, Moving Talks Forward* (Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace Special Report, 1994); *New York Times*, 26 February 1994, p. 3.

57. John J. Maresca, *War in the Caucasus* (Washington: United States Institute of Peace, Special Report, no date), p. 4.

58. Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games," *International Organization*, 42 (Summer 1988), 427–460; Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991), pp. 121–163.

59. *New York Times*, 27 January 1993, p. A6; 16 February 1994, p. 47. On the Russian February 1994 initiative, see generally Leonard J. Cohen, "Russia and the Balkans: Pan-Slavism, Partnership and Power," *International Journal*, 49 (August 1994), 836–845.

60. *Economist*, 26 February 1994, p. 50.

61. *New York Times*, 20 April 1994, p. A12; *Boston Globe*, 19 April 1994, p. 8.

62. *New York Times*, 15 August 1995, p. 13.

63. Hill and Jewitt, *Back in the USSR*, p. 12; Paul Henze, *Georgia and Armenia – Toward Independence* (Santa Monica, CA: RAND P-7924, 1995), p. 9; *Boston Globe*, 22 November 1993, p. 34.

Chapter 12

1. Arnold J. Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 12 vols., 1934–1961), VII, 7–17; *Civilization on Trial: Essays* (New York: Oxford University Press, 1948), 17–18; *Study of History*, IX, 421–422.

2. Matthew Melko, *The Nature of Civilizations* (Boston: Porter Sargent, 1969), p. 155

3. Carroll Quigley, *The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis* (New York: Macmillan, 1961), pp. 146ff.

4. Quigley, *Evolution of Civilizations*, pp. 138–139, 158–160.

5. Mattei Dogan, "The Decline of Religious Beliefs in Western Europe," *International Social Science Journal*, 47 (Sept. 1995), 405–419.

6. Robert Wuthnow, "Indices of Religious Resurgence in the United States," in Richard T. Antoun and Mary Elaine Hegland, eds., *Religious Resurgence; Contemporary Cases in Islam, Christianity, and Judaism* (Syracuse: Syracuse University Press, 1987), pp. 15–34; *Economist*, 8 (July 1995), 19–21.

7. Arthur M. Schlesinger, Jr., *The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society* (New York: W. W. Norton, 1992), pp. 66–67, 123.

8. Quoted in Schlesinger, *Disuniting of America*, p. 118.

9. Gunnar Myrdal, *An American Dilemma* (New York: Harper & Bros., 1944), 1 3 Richard Hofstadter quoted in Hans Kohn, *American Nationalism: An Interpretive Essay* (New York: Macmillan, 1957), p. 13.

10. Takeshi Umehara, "Ancient Japan Shows Post-Modernism the Way, *New Perspectives Quarterly*, 9 (Spring 1992), 10.

11. James Kurth, "The *Real* Clash," *National Interest*, 37 (Fall 1994), 2 19

12. Malcolm Rifkind, Speech, Pilgrim Society, London, 15 November 1994 (New York: British Information Services, 16 November 1994), p. 2.

13. *International Herald Tribune*, 23 May 1995, p. 13.

14. Richard Holbrooke, "America: A European Power," *Foreign Affairs*, 74 (March/April 1995), 49.

15. Michael Howard, *America and the World* (St. Louis: Washington University, the Annual Lewin Lecture, 5 April 1984), p. 6.

16. Schlesinger, *Disuniting of America*, p. 127.

17. For a 1990s statement of this interest, see "Defense Planning Guidance for the Fiscal Years 1994–1999," draft, 18 February 1992; *New York Times*, 8 March 1992, p. 14.

18. Z. A. Bhutto, *If I Am Assassinated* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1979), pp. 137–138, quoted in Louis Delvoie, "The Islamization of Pakistan's Foreign Policy," *International Journal*, 51 (Winter 1995–96), 133.

19. Michael Walzer, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994), pp. 1–11.

20. James Q. Wilson, *The Moral Sense* (New York: Free Press, 1993), p. 225.

21. Government of Singapore, *Shared Values* (Singapore: Cmd. No. 1 of 1991, 2 January 1991), pp. 2–10.

22. Lester Pearson, *Democracy in World Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1955), pp. 83–84.